আমীরুল মুমিনীন

'উসমান ইবনু আফ্‌ফান

রাদিআল্লাহু 'আনহু

ড. যুবাইর মুহাম্মাদ এহসানুল হক

আমীরুল মু'মিনীন

'উসমান ইবনু আফ্ফান
(রাদিআল্লাহু 'আনহু)

ড. যুবাইর মুহাম্মাদ এহসানুল হক

সহযোগী অধ্যাপক
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

প্রকাশক
এ.কে.এম. নাজির আহমদ
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
ফোন : ৮৬২৭০৮৬, Fax : ০২-৯৬৬০৬৪৭
সেল্‌স এন্ড সার্কুলেশান :
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৬২৭০৮৭, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০
Web : www.bicdhaka.com ই-মেইল : info@bicdhaka.com

ISBN : 978-984-8921-07-4

প্রথম প্রকাশ : সফর ১৪৩৫
পৌষ ১৪২০
ডিসেম্বর ২০১৩

প্রচ্ছদ : এম.এ আকাশ

মুদ্রণ :
আল ফালাহ্‌ প্রিন্টিং প্রেস
মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।

বিনিময় : তিনশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র

Usman Ibn Affan (Ra.) Written by Dr Zubair Muhammad Ehsanul Haque and published by AKM Nazir Ahmad Director Bangladesh Islamic Centre 230 New Elephant Road Dhaka-1205 Sales and Circulation Katabon Masjid Campus Dhaka-1000 First Edition December 2013 Price Taka 350.00 only.

প্রকাশকের কথা

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উম্মাতের মধ্যে সার্বিক বিবেচনায় সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন আবু বাকর আছ্ছিদ্দিক (রা)। তাঁর পরে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)। তাঁর পরে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন উসমান ইবনু আফ্ফান (রা)। অর্থাৎ মুসলিম উম্মাহর তৃতীয় সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন তিনি।

উসমান ইবনু আফ্ফান (রা) একজন সুদর্শন পুরুষ ছিলেন। আশৈশব তিনি পবিত্র চরিত্রের অধিকারী ছিলেন।

উসমান ছিলেন শ্রেষ্ঠ আল্লাহপ্রেমীদের একজন। আল্লাহর সন্তোষ অর্জনের জন্য নিবেদিত ছিলো তাঁর সমস্ত চিন্তাচেতনা ও কর্মপ্রবাহ। তিনি ছিলেন আল্লাহর রাসূলের (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাতে গড়া বিশিষ্টজনদের একজন।

আলকুরআনের জ্ঞানের প্রসার, জনগণের নৈতিক মানোন্নয়ন, জনগণের অভাব-অনটন দূরীকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাঁর অবদান ছিলো অতীব উন্নত মানের। দেশে দেশে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান ছিলো ঈর্ষণীয়।

উসমান ইবনু আফ্ফান (রা) ছিলেন একজন অসাধারণ সহিষ্ণু ব্যক্তি। বৈরি ব্যক্তি ও প্রতিকূল পরিস্থিতি মুকাবিলায় তাঁর সহিষ্ণুতা, সহনশীলতা ছিলো অতুলনীয়।

উসমান ইবনু আফ্ফান (রা) দীর্ঘ বারো বছর খিলাফাত পরিচালনা করেন। প্রথম ছয়টি বছর ছিলো খুবই শান্তিপূর্ণ। পরবর্তী বছরগুলো ছিলো গোলযোগপূর্ণ। এই গোলযোগ সৃষ্টির পেছনে ছিলো আবদুল্লাহ ইবনু সাবা নামের এক ব্যক্তির ভয়ংকর কালো হাত।

ড. যুবাইর মুহাম্মাদ এহসানুল হক উসমান ইবনু আফ্ফান (রা) এর জীবন ও কর্ম নিপুণভাবে সবিস্তারে তুলে ধরেছেন। উসমান ইবনু আফ্ফান (রা) সম্পর্কে কিছু ভুল বুঝাবুঝির জওয়াবও দিয়েছেন ঐতিহাসিক তথ্যউপাত্ত তুলে ধরে।

বাংলাভাষায় উসমান ইবনু আফ্ফান (রা) এর ওপর লিখিত এতো সমৃদ্ধ আর কোন গ্রন্থ আছে বলে আমার জানা নেই। এই গ্রন্থটি বাংলাভাষী পাঠক পাঠিকাদেরকে বিপুলভাবে আলোকিত করবে বলেই আমার বিশ্বাস। আমরা এই গ্রন্থটি প্রকাশ করতে পেরে আনন্দিত।

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন আমাদের সহায় হোন!

এ.কে.এম. নাজির আহমদ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
وَعَلٰى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ. أَمَّا بَعْدُ

ভূমিকা

আল্লাহ্‌র তা'আলার যমীনে তাঁরই বিধান কায়েমের মাধ্যমে মানবজাতির ইহলৌকিক শান্তি ও পারলৌকিক মুক্তি সাধনের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে প্রেরণ করেছিলেন। মহানবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ২৩ বছরের নুবুওয়াতী জিন্দেগীতে আল্লাহ্‌র নির্দেশনার আলোকে ওয়াহীভিত্তিক একটি সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেই রাষ্ট্রটি সুবিচার, ইনসাফ ও সাম্য প্রতিষ্ঠায় পৃথিবীর ইতিহাসে নযিরবিহীন ছিল। এই রাষ্ট্রের পার্থিব ও ধর্মীয় নির্দেশনার উৎস ছিল এক ও অভিন্ন অর্থাৎ ওয়াহীর আলোকে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড ও ধর্মীয় কর্তব্য সম্পাদিত হত।

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আদর্শ অনুসরণে পরবর্তী চার খালীফা রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন। তাই তাঁদের শাসনামলকে 'খিলাফাত 'আলা মিনহাজিন্ নুবুওয়াহ্' বা 'আল-খিলাফাতুর রাশিদা' বলা হয়। যারা ওয়াহীভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চান তাঁদের জন্য এঁদের শাসনামল আদর্শ। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজেই বলেছেন, 'তোমাদের উচিত আমার সুন্নাহ্ ও আমার পরবর্তী সৎপথপ্রাপ্ত ও ন্যায়নিষ্ঠ খালীফাগণের সুন্নাহ্ অনুসরণ করা।'

আবূ বাক্‌র ইবনু আবি কুহাফা (রা.) ও 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর পর 'উসমান ইবনু 'আফ্‌ফান (রা.) ছিলেন তৃতীয় খালীফা রাশিদ। তিনি বারো বছর রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন। তাঁর শাসনামলের প্রথম ছয় বছর শান্তিপূর্ণ ছিল। এই সময়ে ইসলামী রাষ্ট্রের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে। কিন্তু তাঁর আমলের শেষ ছয় বছর ছিল গোলযোগে ভরা; এই সময় খিলাফাতের আওতাধীন কয়েকটি শহরে কতিপয় দুষ্কৃতিকারী বিদ্রোহাত্মক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে, খালীফাকে হত্যার মাধ্যমে যা সাময়িকভাবে সমাপ্ত হলেও ঐ কর্মকাণ্ডের কুফল দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। 'উসমান (রা.) হত্যার পরিণাম থেকে মুসলিম বিশ্ব আজো মুক্তি পেয়েছে বলে মনে হয় না।

'উসমান (রা.)-এর শাসনামল সম্পর্কে তথ্য ও সূত্রের কোন ঘাটতি নেই; সঙ্কট রয়েছে নিরপেক্ষ, নিরাসক্ত ও বস্তুনিষ্ঠ ঐতিহাসিক রচনার। প্রাচীন ও আধুনিক ঐতিহাসিকদের

অনেকে তৃতীয় খালীফার আমল সম্পর্কে কলম ধরেছেন। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হল খুব কম গ্রন্থই বস্তুনিষ্ঠতা ও নিরপেক্ষতার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হতে পেরেছে। প্রাথমিক যুগে আরব রাবী ও ঐতিহাসিকগণের কেউ কেউ শী'আ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ সাহাবীদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতেন। ওইসব ঐতিহাসিকের (বিশেষত শী'আগণের) বিবরণ যাচাইবাছাই করতে ব্যর্থ হওয়ায় অনেক পূর্বসূরি ও উত্তরসূরি ঐতিহাসিক বিভ্রান্ত হয়েছেন। অপরদিকে বর্ণনাকারীদের সততা ও সত্যবাদিতার বিষয়টি প্রাচ্যবিদগণের নিকট একেবারে গৌণ হওয়ায় তারাও বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস রচনা করতে ব্যর্থ হয়েছেন। এই কারণে আমরা দেখতে পাই কোন কোন ঐতিহাসিক 'উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে কল্পিত অভিযোগ উপস্থাপন করে তাঁর আমলে সঙ্ঘটিত বিদ্রোহাত্মক কর্মকাণ্ডের নায্যতা প্রতিপাদন করার চেষ্ট করেছেন। বস্তুত 'উসমান (রা.) ছিলেন একজন মাযলুম খালীফা; বিদ্রোহীরা তাঁকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছিল।

'উসমান (রা.) সম্পর্কে এই গ্রন্থ রচনায় আমি পূর্বসূরি ঐতিহাসিকগণের– বিশেষত আত-তাবারী, ইবনুল আসীর, ইবনু কাসীর, আয-যাহাবী ও আল-বালাযুরীর রচনা বিবেচনায় রেখেছি। আস-সাল্লাবীসহ আধুনিক যুগে যাঁরা খিলাফাতের ইতিহাস রচনা করেছেন তাঁদের অনেকের রচনার সাহায্যও নিয়েছি। পাশাপাশি প্রাচ্যবিদগণের অভিযোগসমূহও খতিয়ে দেখা হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে– বিশেষত সাহাবায়ে কিরামের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ পর্যালোচনা করতে গিয়ে বর্ণনাকারীদের সততা-সত্যবাদিতার বিষয়ে হাদীস-অভিজ্ঞানে অনুসৃত নীতিমালা প্রয়োগ করা হয়েছে।

'উসমান (রা.)-এর আমলে ইসলামী রাষ্ট্রের বিপুল বিস্তৃতি ঘটেছিল। তাঁর আমলে বিজিত অঞ্চলগুলোর পরিচয় বর্তমান মানচিত্রে চিহ্নিত করার জন্য 'স্থান-পরিচিতি' নামে একটি পরিশিষ্ট যোগ করা হয়েছে। আশা করি এর মাধ্যমে পাঠকবৃন্দ তৃতীয় খালীফার আমলে ইসলামী রাষ্ট্রের বিস্তৃতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারবেন।

গ্রন্থটি রচনার বিভিন্ন পর্যায়ে আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ উপদেশ, পরামর্শ ও তাকিদ দিয়ে আমাকে ঋণী করেছেন। বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক এ কে এম নাজির আহমাদ 'খুলাফা রাশিদূনের জীবন ও শাসনকাল' প্রকল্পের আওতায় গ্রন্থটি প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করায় তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

পাঠকগণের সামনে ইসলামের সোনালী যুগের ইতিহাস উপস্থাপনের এই চেষ্টা আল্লাহ্ তা'আলা কবুল করুন এবং আমাদের দোষ-ত্রুটি ও অক্ষমতা মাফ করুন! আমীন!

ড. যুবাইর মুহাম্মদ এহসানুল হক
জানুয়ারী, ২০১৩

সূচিপত্র

অধ্যায়-১

অধ্যায়-২

'উসমান (রা.)-এর খিলাফাত ও শাসনপদ্ধতি ॥ ৯১-১৩২

প্রথম পরিচ্ছেদ

'উসমান (রা.) খালীফা হলেন ॥ ৯৩-১১৭

অধ্যায়-৪

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ফিকহী ইজতিহাদ ॥ ২৫৮-২৬৬

অধ্যায়-৬

আলকুরআন সংকলন ॥ ২৬৭-৩৮২

অধ্যায়-৭

অধ্যায়-৮

'উসমান (রা.)-এর শাহাদাত ॥ ৩১৯-৪০৬

প্রথম পরিচ্ছেদ

'উসমান (রা.) হত্যার কারণ ॥ ৩২১-৩৪২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ষড়যন্ত্রের সূচনা ও বিস্তার ॥ ৩৪৩-৩৬০

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

প্রথম অধ্যায়

‘উসমান ইবনু ‘আফ্‌ফান : খিলাফাত-পূর্ব জীবন

প্রথম পরিচ্ছেদঃ
ব্যক্তিগত তথ্যাবলী ও প্রাথমিক জীবন

এক. নাম, উপনাম, উপাধি ও বংশ-পরিচয়ঃ

ক. নামঃ

'উসমান ইব্নু 'আফ্ফান ইবনি আবিল 'আস ইবনি উমাইয়া ইবনি 'আবদি শাম্স ইবনি 'আবদি মানাফ ইবনি কুসাই ইবনি কিলাব আবূ 'আমর, আবূ 'আবদিল্লাহ আল-কুরাশী আল-উমাভী।[১] কুরাইশ বংশের উমাইয়া শাখায় জন্ম হওয়ায় তাকে 'কুরাশী-উমাভী' বলা হয়। আব্দ শামস্-এ গিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর সাথে 'উসমান (রা.)-এর বংশ মিলেছে।

খ. উপনামঃ

'উসমান (রা.)-এর দু'টি উপনাম (কুনিয়্যাহ) পাওয়া যায়ঃ

১. জাহিলী যুগে তাঁর উপনাম (কুনিয়্যাহ) ছিল আবু 'আমর।

২. রাসূল-তনয়া রুকাইয়াহ (রা.)-এর গর্ভে 'উসমান (রা.)-এর প্রথম পুত্রের জন্ম হলে তার নাম রাখা হয় 'আবদুল্লাহ। এরপর থেকে তিনি আবূ আবদিল্লাহ উপনামে পরিচিত হন।[২]

গ. উপাধিঃ

'উসমান (রা.)-এর উপাধি ছিল যুন্নূরাইন (ذوالنورين)। আল-হাসান-এর সূত্রে আয-যাহাবী উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহ্ আদমকে সৃষ্টি করার পর থেকে এ পর্যন্ত 'উসমান (রা.) ভিন্ন অন্য কোন পুরুষ কোন নাবীর দু'কন্যাকে বিয়ে করার সৌভাগ্য অর্জন করেননি। আর মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যেহেতু শেষ নাবী, সেহেতু কিয়ামাত পর্যন্ত কারো পক্ষে কোন নাবীর দু'কন্যাকে বিয়ে করা সম্ভব হবে না। এ কারণে 'উসমান (রা.)-কে যুন্নূরাইন বা দুই নূর-এর অধিকারী বলা হয়।[৩] আল-মুহাল্লাব

---

১. ইবনু সা'দ, আত্-তাবাকাতুল কুবরা, (বৈরুতঃ দারু সাদির ও দারু বাইরূত ১৯৫৭), ৩:৫৩; আত-তাবারী, তারীখুর রুসুল ওয়াল মুলূক (কায়রোঃ দারুল মা'আরিফ, ৫ম সং, ১৯৯২), ৪:৪২০; ইবনুল আসীর, আল-কামিল ফিত-তারীখ (কায়রোঃ দারুল হাদীস ২০১০), ২:৪৫৭; আয-যাহাবী, তারীখুল ইসলাম (কায়রোঃ আল-মাকতাবাতুত তাওফীকিয়্যাহ, তাবি), ৩:৯১।

২. ইবনু সা'দ, ৩:৫৩-৫৪; আত-তাবারী, ৪:৪১৯।

৩. আয-যাহাবী, তারীখ.. ৩:৯৩।

ইবনু আবি সুফরাহ বলেন, 'আমি কয়েকজন সাহাবীকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনারা কেন বলেন যে 'উসমান (রা.) আমাদের অনেক উপরে? তাঁরা জবাব দিলেন, 'কারণ 'উসমান (রা.) ব্যতীত প্রাচীন বা বর্তমান পৃথিবীর অন্য কেউ কোন নাবীর দু'কন্যাকে বিয়ে করতে পারেনি।'[৪] 'উসমান (রা.)-এর উপাধির বিষয়ে কেউ কেউ ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেনঃ 'তিনি প্রতি রাতে সালাতে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ সময় ধরে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। এজন্য তাঁকে যুন্নূরাইন বলা হয়ঃ কুরআন একটি নূর, অন্য নূর হল রাতের সালাত।'[৫]

ঘ. মাতা-পিতাঃ

আরওয়া বিন্তু কুরাইয ইবনি রাবী'আহ ইবনি হাবীব ইবনি আবদি শাম্স ইবনি আবদি মানাফ ইবনি কুসাই ইবনি কিলাব। 'উসমান (রা.)-এর নানী উম্মু হাকীম আল-বায়দা ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দাদা 'আবদুল মুত্তালিবের কন্যা এবং তাঁর পিতা 'আবদুল্লাহ-এর সহোদরা।[৬] এদিক থেকে 'উসমান (রা.) হলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ফুফাতো বোনের পুত্র। 'উসমান (আ.)-এর মা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং স্বীয় পুত্রের খিলাফতকালে তাঁর মৃত্যু হয়। 'উসমান (রা.) নিজেই তাঁর মায়ের লাশ কবরে নামান।[৭] 'উসমান (রা.)-এর পিতা 'আফ্ফান জাহিলী যুগে মারা যান।

ঙ. জন্মঃ

'আমুল ফীল[৮]-এর ছয় বছর পর তিনি মাক্কা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন।[৯] কারো মতে তাঁর জন্মস্থান হল তায়েফ। তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চেয়ে ছয় বছরের ছোট ছিলেন।[১০]

চ. 'উসমান (রা.)-এর শারীরিক অবয়বঃ

তিনি ছিলেন মধ্যম আকৃতির, তাঁর সুন্দর চেহারায় গুটিবসন্তের দাগ ছিল, ঘন-দীর্ঘ দাড়িতে তিনি হলুদ খিযাব লাগাতেন, তাঁর কাঁধ ছিল চওড়া এবং গ্রন্থি ছিল মোটা, সুন্দর দন্তরাজি তিনি স্বর্ণ দিয়ে বাঁধাতেন। মসৃণ ত্বকের শরীরে আভিজাত্যের পরশ ছিল।

---

৪. ইবনু কাসীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ (কায়রোঃ মাতবা'আতুস সা'আদাহ, তাবি), ৭:২১২।
৫. 'আব্বাস আল-'আক্কাদ, উসমান ইবনু 'আফ্ফান যুন্নূরাইন, পৃ. ৭৯।
৬. ইবনু সা'দ, ৩:৫৩; আত-তাবারী, ৪:৪২০; ইবনুল আসীর, ২:৪৫৭; আয-যাহাবী, তারীখ.. ৩:৯১।
৭. ইয়াহইয়া আল-ইয়াহইয়া, আল-খিলাফাতুর রাশিদা ওয়াদ দাওলাতুল উমাভিয়্যাহ মিন ফাতহিল বারী (দারুল হিজরাহ ১৯৯৬), পৃ. ৩৮৮।
৮. 'আমুল ফীল অর্থ হাতী'র বছর। ৫৭০ খৃস্টাব্দে ইয়ামানের শাসক আবরাহা কা'বা ঘর ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে বিশাল এক হস্তী বাহিনী নিয়ে মাক্কা আক্রমণ করেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর বাহিনীকে ধ্বংস করে দেন। এই বছরটি আরবদের নিকট "'আমুল ফীল" বা "হস্তী বছর" নামে পরিচিত।
৯. ইবনু হাজর আল-আসকালানী, আল-ইসাবা, ৪:৩৭৭।
১০. সাদিক 'উর্জূন, উসমান ইবনু 'আফ্ফান (আদ্দার আস-সা'উদিয়্যাহ্ ১৯৯০), পৃ. ৪৫।

গায়ের রঙ ছিল তামাটে।[১১] 'আবদুল্লাহ ইবনু হায্ম বলেন, 'আমি 'উসমান (রা.)-কে দেখেছি, তাঁর চেয়ে সুন্দর মুখাবয়ববিশিষ্ট কোন নারী বা পুরুষ আমি দেখিনি।'[১২]

ইবনু সা'দ উল্লেখ করেছেন যে, 'উসমান (রা.) বহুমুত্র রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন; সুস্থ হওয়ার জন্য চিকিৎসাও গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু নিরাময় না হওয়ায় তিনি প্রতি সালাতের জন্য ওযু করতেন।[১৩]

ছ. পরিবার:

'উসমান (রা.) আটটি বিয়ে করেন; প্রতিটি ইসলাম গ্রহণের পর। তাঁর স্ত্রীদের নাম:

(১) রাসূল তনয়া রুকাইয়াহ (রা.), (২) রাসূল তনয়া উম্ম কুলছুম (রা.) যাকে তিনি রুকাইয়্যাহ-এর মৃত্যুর পর বিয়ে করেন, (৩) ফাখিতাহ বিন্তু গাযওয়ান, (৪) বানূ আয্দ-এর উম্মু 'আমর বিন্তু জুনদুব, (৫) বানূ মাখযূম-এর ফাতিমাহ বিনতুল ওয়ালিদ ইবনু আবদি শাম্স ইবনিল মুগীরাহ, (৬) বানূ ফাযারাহ-এর উম্মুল বানীন বিন্তু 'উয়াইনাহ ইবনু হিসন, (৭) উমাইয়া গোত্রের রামলাহ বিন্তু শায়বা ইবনু রাবী'আহ, (৮) 'উসমান (রা.) তাঁর খিলাফাতের ৫ম বছরে ২৮ হিজরীতে বনু কাল্ব-এর খ্রিস্টান মহিলা নায়িলা বিনতুল ফারাফিসাহ্‌কে বিয়ে করেন; তবে বাসর যাপনের আগে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং পরবর্তী জীবনে মুসলিম হিসেবে একনিষ্ঠতার প্রমাণ রেখেছেন।[১৪] 'উসমান (রা.)-এর শাহাদাতের পর নায়িলা দামিশকে নীত হওয়ার পর মু'আবিয়া (রা.)-এর বিয়ের প্রস্তাব তিনি প্রত্যাখ্যান করেন।[১৫]

শাহাদাতের সময় তাঁর চার স্ত্রী বর্তমান ছিল: রামলা, উম্মুল বানীন, ফাখিতা ও নায়িলা। তবে কেউ কেউ বলেন, অবরুদ্ধ অবস্থায় তিনি উম্মুল বানীনকে তালাক দিয়েছিলেন।[১৬]

সন্তান-সন্ততি: 'উসমান (রা.) ছিলেন নয় পুত্র (মতান্তরে এগার) ও সাত কন্যার পিতা।

পুত্রদের পরিচয়: (১) রাসূল-তনয়া রুকাইয়্যাহ এর পুত্র 'আবদুল্লাহ। হিজরাতের দু'বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। মাদীনায় হিজরাতের অব্যবহিত পরে শিশু 'আবদুল্লাহর চোখের কোণায় মোরগ ঠোকর মারে, যার প্রতিক্রিয়ায় চতুর্থ হিজরীতে ৬ বছর বয়সে সে মারা যায়।[১৭] (২) 'আবদুল্লাহ আল-আসগার, মায়ের নাম ফাখিতা বিন্তু গাযওয়ান।

---

১১. ইবনুল আসীর, ২:৪৫৭; আত-তাবারী, ৪:৪১৯; ইবনু কাসীর, ৭:১৯৩।
১২. আয-যাহাবী, ৩:৯২।
১৩. ইবনু সা'দ, ৩:৫৮।
১৪. আত্-তাবারী, ৪:২৬৩, ৪২০; ইবনু কাসীর, ৭: ১৫৩, ২১৮।
১৫. আয-যাহাবী, ৩:১০০।
১৬. ইবনুল আসীর, ২:৪৫৭।
১৭. মাহমূদ শাকির, আল-আমীন যুন-নূরাইন (আল-মাকতাবুল ইসলামী ১৯৯৭), ৩৬৫।

(৩) 'আমর, তার মা উম্মু 'আমর বিন্তু জুনদুব। ইনি মুহাদ্দিস ছিলেন; স্বীয় পিতা 'উসমান (রা.) ও উসামা ইবনু যায়িদ (রা.)-এর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন 'আলী ইবনুল হুসাইন, সা'ঈদ ইবনুল মুসায়্যিব ও আবুয যিনাদ (রাহ.)। 'আমর অল্প সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বিয়ে করেছিলেন মু'আবিয়া-তনয়া রামলাকে। ৮০ হিজরীতে তিনি মারা যান। (৪) খালিদ, ইনি 'আমরের সহোদর। (৫) আবান, ইনিও উম্মু আমর বিন্তু জুনদুব-এর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। উমাইয়া খালীফা 'আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ানের আমলে আবু সা'ঈদ উপনামে পরিচিত আবান সাত বছর মাদীনার শাসক ছিলেন। তাঁর সময়ে মাদীনার অন্যতম ফকীহ হিসেবে তাঁকে গণ্য করা হতো। তিনি মুহাদ্দিসও ছিলেন। যায়িদ ইবনু সাবিত (রা.) ও স্বীয় পিতা 'উসমান (রা.) হতে তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন। ১০৫ হিজরীতে মারা যান।[১৮] (৬) উমার, ইনিও উম্মু 'আমর বিন্তু জুনদুব-এর গর্ভে জন্ম নেন। (৭) আল-ওয়ালীদ, এঁর মায়ের নাম ফাতিমা বিনতুল ওয়ালীদ। (৮) সা'ঈদ, ইনি আল-ওয়ালীদ-এর সহোদর। মু'আবিয়ার আমলে ৫৬ হিজরীতে তিনি খোরাসানের শাসক ছিলেন। (৯) 'আবদুল মালিক, তাঁর মায়ের নাম উম্মুল বানীন। শৈশবে মারা যান।[১৯]

হিশাম ইবনুল কালবী বলেন, উম্মুল বানীনের গর্ভে 'উতবা নামে 'উসমান (রা.)-এর আরেক পুত্র সন্তান এবং নায়িলার গর্ভে 'আনবাসা নামে এক পুত্র সন্তানের জন্ম হয়েছিল।[২০]

কন্যাদের পরিচয়ঃ 'উসমান (রা.)-এর সাত কন্যা ছিল:[২১]

(১) মারইয়াম, তার মা উম্মু 'আমর বিন্তু জুনদুব; (২) উম্মু সা'ঈদ, তার মা ফাতিমা বিনতুল ওয়ালীদ; (৩) 'আয়িশা, (৪) উম্মু আবান, (৫) উম্মু 'আমর, এদের মা রামলা; (৬) মারইয়াম, তার মা হলেন নায়িলা; (৭) উম্মুল বানীন, আল-ওয়াকিদী বলেন, ইনি নায়িলার কন্যা;[২২] 'আবদুল্লাহ ইবনু ইয়াযীদ ইবনু আবি সুফইয়ানের সাথে তাঁর বিয়ে হয়।[২৩]

'উসমান (রা.)-এর ভাই-বোনঃ

'উসমান (রা.)-এর কোন আপন ভাই ছিল না। আমিনা বিন্তু আফ্ফান নামে তাঁর আপন এক বোন ছিল। জাহিলী যুগে তিনি কেশ বিন্যাসকারিণীর পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। তিনি আল-হাকাম ইবনু কায়সানকে বিয়ে করেন। এক যুদ্ধে 'আবদুল্লাহ ইব্নু

---

১৮. আয্-যাহাবী, সিয়ারু 'আলামিন নুবালা (মুওয়াস্সাসাতুর রিসালাহ্ ১৪০২ হি.), ৪:২৫৩।
১৯. মাহমূদ শাকির, আল-আমীন, ৩৬৯।
২০. আত-তাবারী, ৪:৪২০-২১।
২১. ইবনুল আসীর, ২:৪৫৭; ইবনু কাসীর, ৭:২১৮।
২২. ইবনু সা'দ-এর মতে উম্মুল বানীন, 'উসমান (রা.)-এর এক দাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন (ইবনু সা'দ, ৩:৫৪)।
২৩. আত-তাবারী, ৪: ৪২০-২১।

জাহাশ (রা.), আল-হাকামকে বন্দী করে মদীনায় নিয়ে আসেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করে একনিষ্ঠ মুসলিম বনে যান। চতুর্থ হিজরীর প্রারম্ভে বী'র-এ-মা'উনার যুদ্ধে তিনি শহীদ হন। আমিনা বিন্তু 'আফ্ফান মুশরিক অবস্থায় মাক্কায় থেকে যান। শেষ পর্যন্ত মাক্কা বিজয়ের দিন তিনি নিজের মা ও অন্য বোনসহ ইসলাম গ্রহণ করেন। আবু সুফইয়ানের স্ত্রী হিন্দ বিনতু উতবার সাথে আমিনাও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে এই মর্মে বাইয়াত গ্রহণ করেন যে, তাঁরা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবেন না, চুরি করবেন না ও যিনা করবেন না।[২৪]

'উসমান (রা.)-এর বৈপিত্রেয় ভাই ছিলেন তিনজন। তারা হলেন: আল-ওয়ালীদ ইব্নু 'উকবা ইবনি আবি মু'আইত। 'উকবা বদর যুদ্ধের দিন মারা যান। আল-ওয়ালীদ মাক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণ করেন।

'উসমান (রা.)-এর আরেক বৈপিত্রেয় ভাই হলেন উমারা ইব্নু 'উকবা যিনি দেরিতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তৃতীয় বৈপিত্রেয় ভাইয়ের নাম খালিদ ইব্নু 'উকবা।

'উসমান (রা.)-এর বৈপিত্রেয় এক বোনের নাম উম্মু কুলছূম বিন্তু 'উকবা। হুদাইবিয়ার সন্ধির পর মাক্কা থেকে মাদীনায় হিজরাতকারী প্রথম মহিলা ছিলেন তিনি। 'উসমান (রা.)-এর আরো দুই বৈপিত্রেয় বোনের নাম জানা যায়। তাঁরা হলেন উম্মু হাকীম বিন্তু 'উকবা ও হিন্দ বিন্তু 'উকবা।[২৫]

দুই. জাহিলী যুগে তাঁর অবস্থান:

জাহিলী যুগে তিনি তাঁর গোত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত মর্যাদাবান, ধনাঢ্য, লাজুক ও মিষ্টভাষী। গোত্রের লোকেরা তাঁকে খুবই সম্মান করতো এবং ভালবাসতো। ইসলাম গ্রহণের আগেও তিনি কখনো মূর্তিপূজা করেননি, কোন অশ্লীল কাজও করেননি; এমনকি কোনদিন মদ পর্যন্ত স্পর্শ করেননি। তিনি বলতেন, 'মদ বুদ্ধি হরণ করে, আর বিবেক-বুদ্ধি হল আল্লাহর দেয়া সেরা দান। মানুষের কাজ হল বিবেক ব্যবহারে সমুন্নত হওয়া; এর বিরুদ্ধে লড়াই না করা।' জাহিলী যুগেও তরুণদের গান-বাজনা ও আমোদ-ফুর্তির আসর তাঁকে আকৃষ্ট করতো না। তিনি কখনো আপন লজ্জাস্থান উন্মোচন করেননি। তিনি বলেছেন, 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাতে বাই'আত গ্রহণের পর আমি কখনো গান গাইনি, কখনো ডান হাতে লজ্জাস্থান স্পর্শ করিনি, মুসলিম হওয়ার পূর্বে বা পরে কখনো মদ্যপান করিনি, কখনো যিনা করিনি।'[২৬] জাহিলী যুগে আরবদের মাঝে যেসব জ্ঞানের চর্চা হতো, যেমন :

---

২৪. ইবনুল আসীর, ২:১০৯।
২৫. মাহমূদ শাকির, ৩৫৪।
২৬. আবূ না'ঈম আল-আসফাহানী, হুলইয়াতুল আউলিয়া (বৈরুত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ্), ১:৬০-৬১।

বংশবিদ্যা, প্রবাদ-প্রবচন ও যুদ্ধবিগ্রহের ইতিকথা- সেসব জ্ঞানে উসমানের যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল। প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী হওয়ার সুবাদে বাণিজ্য-ব্যপদেশে তিনি আরবের সন্নিহিত নানা দেশ ও শহরে যেমন : সিরিয়া ও হাবশায় গমনাগমন করেছেন। ফলে বিভিন্ন জাতির অবস্থা সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান সমৃদ্ধ হয়েছে। এ সুযোগ খুব কম আরবেরই হয়েছিল।[২৭] পৈত্রিকসূত্রে প্রাপ্ত ব্যবসার ব্যাপারে 'উসমান (রা.) খুবই মনোযোগী ছিলেন। ব্যবসার উন্নতি 'উসমান (রা.)-এর জন্য এমন সামাজিক অবস্থান তৈরি করেছিল যে গোটা কুরাইশ গোত্রে তিনি বিশিষ্ট মর্যাদায় অভিষিক্ত ছিলেন। জাহিলী যুগে মাক্কার সমাজ ব্যক্তিকে সম্পদের নিরিখে মর্যাদা দিত আর সন্তান-সন্ততি, ভাই-বেরাদর ও আত্মীয়স্বজনের সংখ্যাধিক্যে ভক্তি করত। মর্যাদা ও ভক্তির আসন পাওয়ার সবকিছু 'উসমান (রা.)-এর ছিল। কুরাইশ গোত্রের লোকেরা তাঁকে এতই সম্মান করতো এবং ভালবাসতো যে তিনি প্রবাদতুল্য হয়েছিলেন। কুরাইশ রমণীরা শিশুদেরকে ঘুম পাড়ানো গান শুনাতে গিয়ে বলত:[২৮]

أحبك والرحمن   حب قريش لعثمان

আল্লাহর কসম, বাছা! আমি তোমাকে তেমনি ভালোবাসি যেমন কুরাইশ গোত্র 'উসমানকে ভালোবাসে।

তিন. 'উসমান (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণ:

'উসমান (রা.)-এর বয়স তখন ৩৪ ছুঁই ছুঁই। একদিন তাঁর খালা সু'দা বিন্‌তু কুরাইয তাঁকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নুবুওয়াত সম্পর্কে অবহিত করে ইসলাম গ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি আরো সুসংবাদ দেন যে, রাসূল-তনয়া রুকাইয়াহ-এর সাথে তাঁর বিয়ে হবে। এই ভবিষ্যদ্বাণী শুনে 'উসমান (রা.) খুবই অবাক হন, কারণ ইতোপূর্বে আবূ লাহাবের পুত্র 'উতবার সাথে রুকাইয়াহর বিয়ে সম্পন্ন হয়েছে। পরদিন বন্ধু আবু বাক্‌র আছ্ ছিদ্দিক (রা.)-এর সাথে দেখা হলে তিনি তাঁকে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে বললেন, "উসমান! তুমি তো ধীরস্থির, সত্যমিথ্যার কোন কিছুই তোমার কাছে গোপন নয়। আমাদের জাতি যে মূর্তিপূজা করে এর কোন অর্থ আছে? এগুলো কি নিথর পাথর নয়? এরা কি শুনতে পায়, উপকার-অপকার করতে পারে?' 'উসমান (রা.) বললেন, 'আপনার কথাই সঠিক।' তখন আবূ বাকর (রা.) বললেন, 'তোমার খালা ঠিকই বলেছেন, মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদিল্লাহ, ইনিই আল্লাহ্‌র রাসূল, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে রিসালাত সহকারে মানবজাতির কাছে প্রেরণ করেছেন। তুমি কি তাঁর

২৭. 'আব্বাস মাহমূদ আল-আক্কাদ, ৭২।
২৮. আহমদ শালাবী, মাওসূ'আহ আত-তারিখিল ইসলামী (মাকতাবাহ আন-নাহদাহ আল-মিসরিয়্যাহ্), ১:৬১৬।

কাছে যাবে?' আবূ বাকর (রা.)-এর এই আহবানে সাড়া দিয়ে 'উসমান (রা.) দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়াই কালবিলম্ব না করে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন।[২৯] প্রথমদিকে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন 'উসমান (রা.) তাঁদের একজন হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'দারুল আরকামে'[৩০] প্রবেশের পূর্বে 'উসমান (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন।[৩১] আবু ইসহাক বলেন,

كان أول الناس إسلاما بعد أبي بكر وعلي وزيد بن حارثة عثمان

আবু বাক্‌র, 'আলী ও যায়িদ ইবনু হারিছা (রা.)-এর পর (পুরুষদের মাঝে) প্রথম যিনি ইসলাম গ্রহণ করেন তিনি হলেন 'উসমান (রা.)।[৩২]

সিরিয়া থেকে ফেরার পথে বিস্ময়কর এক ঘটনা ঘটে যা তাঁকে ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে। নতুন দীনে দীক্ষিত হওয়ার পর 'উসমান (রা.) বলেন, 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! অতি সম্প্রতি আমি সিরিয়া থেকে ঘুরে এলাম। ফেরার পথে মু'আন ও যারকা'র মাঝামাঝি এক স্থানে আমরা বিশ্রাম নিচ্ছিলাম। হঠাৎ এক আহবানকারীর আওয়াজ শুনতে পেলাম, 'দ্রুত যাও; মাক্কায় আহমাদ আবির্ভূত হয়েছেন।' তারপর আমরা মাক্কায় এসে আপনার (নুবুওয়াতের) কথা শুনলাম।'[৩৩]

'উসমান (রা.) ইসলাম গ্রহণের পর ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকলেন শক্তিশালী পথ প্রদর্শক, ধৈর্যশীল-সহনশীল, তুষ্ট, ক্ষমাশীল-উদার ও পরোপকারী-দয়ালু বন্ধু হিসেবে; যিনি দানশীল, ব্যয়কুণ্ঠ নন, মুসলিমদের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং দুর্বলের সাহায্যকারী। তাঁর ইসলাম গ্রহণে ইসলামের বর্শা শক্ত হয়। তাঁর খালা সু'দা বিনতু কুরাইয বলেন[৩৪]

هدى الله عثمانا بقولي إلى الهدى   وأرشده والله يهدي إلى الحق

فتابع بالرأي السديد محمدا   وكان برأي لا يصد عن الصدق

وأنكحه المبعوث بالحق بنته   فكان كبدر مازج الشمس في الأفق

فداؤك يا بن الهاشميين مهجتي   وأنت أمين الله أرسلت للخلق

---

২৯. ইবনু কাসীর, ৭:১৯৮-৯৯।

৩০. দারুল আরকামের অর্থ– আল-আরকামের বাড়ি। মাক্কী জীবনের শুরুতে যখন গোপনে দা'ওয়াতী কাজ চলছিলো তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবী আল-আরকাম ইবন আবিল আরকামের বাড়িকে দা'ওয়াতী কাজের কেন্দ্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

৩১. ইবনুল আসীর, ২:৪৫৭; আত-তাবারী, ৪:৪১৯।

৩২. ইব্‌ন হিশাম, আস্-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ (দারু ইহয়াইত তুরাছ ১৯৯৭), ১:২৮৭-২৮৯।

৩৩. ইব্‌ন সা'দ, ৩:৫৫।

৩৪. ইবনু কাছীর, ৭:১৯৯।

আমার কথাই সঠিক হল, আল্লাহ 'উসমানকে হিদায়াত দিলেন,
তিনি তো সত্যের পথেই পরিচালিত করেন,
মুহাম্মাদকে অনুসরণ করে সে সঠিক মত গ্রহণ করল,
আমার মত হল এই যে তিনি সত্যবিমুখ নন।
প্রেরিত রাসূল তাঁর সাথে আপন কন্যার বিয়ে দিলেন,
দিগন্তে পূর্ণচন্দ্রের সাথে যেন সূর্যের মিলন হল।
হে হাশিমী পুত্র! আপনারই জন্য উৎসর্গীত হোক আমার প্রাণ,
আপনি তো সৃষ্টিকূলের জন্য প্রেরিত আল্লাহ্‌র বিশ্বস্ত বান্দা।

চার. রুকাইয়াহ বিন্‌তু রাসূলিল্লাহ-এর সাথে 'উসমান (রা.)-এর বিবাহ:

'উসমান (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জামাতা হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। তাঁর সাথে নবী-তনয়া রুকাইয়াহর বিয়ের কাহিনী নিম্নরূপ:

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর প্রথম মেয়ে রুকাইয়াহকে আবু লাহাবের ছেলে 'উতবার সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন, অপর মেয়ে উম্মু কুলসূমকে বিয়ে দিয়েছিলেন আবু লাহাবের অপর ছেলে 'উতাইবার সাথে। যখন সূরাতুল মাসাদ (আল লাহাব) নাযিল হল আবু লাহাব ও তার স্ত্রী উম্মু জামীল বিন্‌তু হার্‌ব ইবনু উমাইয়া দু'ছেলেকে নির্দেশ দিল তারা যেন মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দু'কন্যাকে তালাক দেয়। আবু লাহাবের দু'ছেলে তাদের পিতা-মাতার অভিপ্রায় অনুযায়ী রুকাইয়াহ ও উম্মু কুলসূমের সাথে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটাল। বাসর রাত যাপনের পূর্বেই বিচ্ছেদ হয়েছিল।[৩৫] রুকাইয়াহর বিবাহ বিচ্ছেদের কথা শুনে 'উসমান (রা.) যারপরনেই খুশী হন এবং কালবিলম্ব না করে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে তাঁর বিয়ের প্রস্তাব পাঠান। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করেন। উম্মুল মু'মিনীন খাদীজা বিন্‌তু খুওয়াইলিদ (রা.) স্বহস্তে কন্যা সম্প্রদানের দায়িত্ব পালন করেন। 'উসমান (রা.) ছিলেন কুরাইশের অন্যতম সুদর্শন যুবক। সৌন্দর্য-শোভায় রুকাইয়াহ তাঁর উপযুক্ত ছিলেন। বিদায়ের দিন রুকাইয়াহ-'উসমান জুটি সম্পর্কে গাওয়া হয়:[৩৬]

أحسن زوجين رآهما إنسان   رقية، وزوجها عثمان

মানুষের দেখা সবচেয়ে সুন্দর জুটি হল: রুকাইয়াহ ও তার স্বামী 'উসমান।

---

৩৫. আয-যাহাবী, তারীখ.., ৩: ৬৭৫।
৩৬. ইবনু কাছীর, ৭:১৯৯।

আবদুর রহমান ইব্‌নু 'উসমান আল-কুরাশী বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 'উসমান (রা.)-এর ঘরে গিয়ে দেখলেন রুকাইয়াহ (রা.) তাঁর স্বামীর মাথা ধুয়ে দিচ্ছেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেনঃ[৩৭]

يا بنية! أحسني إلى أبي عبد الله، فإنه أشبه أصحابي بي خلقا

> মা! আবূ আবদিল্লাহর (উসমানের) সাথে সদাচরণ করো। কারণ আমার সাহাবীদের মাঝে আকৃতির দিক দিয়ে আমার সাথে তাঁর সাদৃশ্যই সবচেয়ে বেশি।

উম্মু জামীল বিন্‌তু হারব ও আবু লাহাব মনে করেছিল রুকাইয়াহ ও উম্মু কুলসূমকে বিদায় করে তারা মুহাম্মাদকে অপদস্থ করতে পেরেছে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলের কন্যাদের জন্য মহা কল্যাণ নির্ধারণ করেছিলেন। উসমানের সাথে রুকাইয়ার বিয়ে হতে দেখে আবু লাহাব ও উম্মু জামীল রাগে-ক্ষোভে জর্জরিত হল। তাদের অনিষ্ট থেকে নাবী-পরিবারকে রক্ষা করার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আর আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছার বাস্তবায়ন তো অবশ্যম্ভাবী।

পাঁচ. নির্যাতনঃ

ইসলাম গ্রহণের কারণে 'উসমান (রা.) নির্যাতনের শিকার হন। তাঁর চাচা আল-হাকাম ইবনু আবিল 'আস ইবনি উমাইয়া তাঁকে রশি দিয়ে বেঁধে বলেছিলেন, 'তোমার বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করে তুমি নতুন ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হলে? আল্লাহর কসম! এই ধর্ম ত্যাগ না করা পর্যন্ত আমি তোমার বাঁধন খুলে দেব না।' জবাবে 'উসমান (রা.) বললেন, 'আল্লাহর কসম! আমি কখনো তা ত্যাগ করব না।' দীনের প্রতি ভ্রাতুষ্পুত্রের অবিচল আস্থা লক্ষ্য করে আল-হাকাম তাঁকে ছেড়ে দেয়।[৩৮]

ছয়. আবিসিনিয়ায় হিজরাতঃ

মাক্কায় মুসলিমদের ওপর মুশরিকদের নির্যাতন বেড়ে গেল। এ নির্যাতন থেকে সম্ভ্রান্ত বংশীয় মুসলিমরাও নিস্তার পাননি। কাফিরদের নিপীড়নে ইয়াসির ও তাঁর স্ত্রী সুমাইয়া (রা.) শহীদ হলেন। অনুসারীদের কষ্ট দেখে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিদারুণ ব্যথিত হলেন। কোথায় গেলে এ নির্যাতন থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে? এক পর্যায়ে তিনি হাবশায় হিজরাতের নির্দেশ দিয়ে বললেন,

---

৩৭. ঘটনাটি তাবারানী বর্ণনা করেছেন। আল-হায়সামী বলেন, এর বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত। [আল-মাজমা' ৯:৮১।]

৩৮. ইবনু সা'দ, ৩:৫৫।

لو خرجتم إلى الحبشة، فإن بها ملكا صالحا لا يظلم عنده أحد

তোমরা হাবশায় হিজরাত করতে পার; সেখানে এক ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ আছেন যাঁর হাতে কেউ নির্যাতিত হয় না।[৩৯]

হাবশার উদ্দেশ্যে হিজরাত শুরু হল। মু'মিনরা ছোট ছোট দলে মাক্কা ত্যাগ করছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ব্যথাতুর মনে ও স্নেহমাখা চোখে তা দেখছিলেন। মু'মিনদের কেউ সওয়ারে আরোহী হয়ে কেউবা পদব্রজে রওয়ানা হয়েছিলেন। লোহিত সাগরের তীরে এসে তারা 'উসমান ইবনু মায'উন (রা.)–কে দলনায়ক বানালেন। দু'টি নৌকা ভাড়া করা হল, জনপ্রতি অর্ধ দীনার ভাড়া নির্ধারিত হল। কুরাইশরা জানতে পেরে মুসলিমদের পশ্চাদ্ধাবন করল। কিন্তু তারা লোহিত সাগরের তীরে পৌঁছার আগেই মুসলিমদের বহনকারী নৌকা দু'টো ছেড়ে দিয়েছিল।[৪০] প্রথমবার যারা হাবশায় হিজরাত করেছিলেন তাদের মাঝে ছিলেন 'উসমান ইবনু আফ্ফান ও তাঁর স্ত্রী রুকাইয়াহ বিনতুর্ রাসূল (রা.)। নুবুওয়াতের পঞ্চম সনে রজব মাসে তাঁরা হাবশায় পৌঁছেন। সেখানে তাঁরা নিরাপত্তা লাভ করলেন এবং স্বাধীনভাবে দীন পালনের সুযোগ পেলেন। প্রাথমিক যুগের মুসলিমদের হাবশায় হিজরাতের বিষয়টি আলকুরআনে আলোচিত হয়েছেঃ

وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِي اللهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ،

যারা অত্যাচারিত হবার পর আল্লাহর পথে হিজরত করেছে আমি অবশ্যই তাদেরকে দুনিয়ায় উত্তম আবাস দিব; আর আখিরাতের পুরস্কারই তো শ্রেষ্ঠ। হায়, যদি তারা জানত। [আলকুরআন ১৬:৪১]।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল-কুরতুবী, বিখ্যাত তাবি'ঈ কাতাদার উক্তি বর্ণনা করেছেনঃ 'নির্যাতিত মুহাজির হলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ঐ সাহাবীগণ যাঁরা মাক্কায় মুশরিকদের হাতে নির্যাতিত হয়েছেন, তাদেরকে স্বীয় বাসভূম থেকে বের করে দেওয়ার পর তারা হাবশায় চলে যান। তারপর দারুল হিজরাতে আল্লাহ তাঁদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং মু'মিনদের একটি দলকে তাঁদের মদদগার বানিয়ে দেন।'[৪১]

---

৩৯. ইবনু হিশাম, ১:৪১৩।
৪০. ইবনু সা'দ, ১:২০৪।
৪১. আল-কুরতুবী, আল-জামি' লি আহকামিল কুরআন, ১০:১০৭।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوْا رَبَّكُمْ لِلَّذِيْنَ أَحْسَنُوْا فِيْ هَـٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُوْنَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ •

বল, 'হে আমার মু'মিন বান্দাগণ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর। যারা এই দুনিয়াতে কল্যাণকর কাজ করে তাদের জন্য আছে কল্যাণ। আর আল্লাহর জমীন প্রশস্ত, ধৈর্যশীলদেরকে তো অপরিমিত পুরস্কার দেওয়া হবে।' [আলকুরআন ৩৯: ১০]

ইবনু 'আব্বাস বলেন, এখানে হাবশায় হিজরাতকারী জা'ফর ইবনু আবি তালিব ও তাঁর সাথীদেরকে বুঝানো হয়েছে।[৪২] কথা বলা এই উম্মাতের মাঝে 'উসমান (রা.) হলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি সপরিবারে (হাবশায়) হিজরাত করেছিলেন।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন,

إن عثمان لأول من هاجر إلى الله بأهله بعد لوط

লূত (আ.)-এর পর 'উসমানই হলো প্রথম ব্যক্তি যে সপরিবারে আল্লাহর পথে হিজরাত করেছে।[৪৩]

একবার হাবশায় মাক্কাবাসীদের ইসলাম গ্রহণের খবর ছড়িয়ে পড়েছিলো। তখন হিজরাতকারী অনেকেই মাক্কায় ফিরে আসেন। কিন্তু মাক্কার কাছে এসে তারা জানতে পারেন যে খবরটি মিথ্যা, তখন তারা কতিপয় মাক্কাবাসীর কাছে আশ্রয় নেন। ঐ সময় 'উসমান (রা.) ও রুক্কাইয়াহ (রা.)ও ফিরে আসেন। তিনি আর হাবশায় ফিরে যাননি।[৪৪] মাদীনায় হিজরাতের আগ পর্যন্ত 'উসমান (রা.) মাক্কায় অবস্থান করেন। ইসলাম গ্রহণের পর থেকে 'উসমান (রা.), রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করেন। হিজরাত বা বিশেষ মিশনে দূরে না গেলে তিনি কখনো রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাহচর্য ত্যাগ করেননি। তিনি পরবর্তী দু'খালীফা আবু বাকর ও উমার (রা.)-এর ঘনিষ্ঠ সহযোগীতে পরিণত হন। ফলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর থেকে শুরু করে প্রথম দু'খালীফার শাসনকাল পর্যন্ত ইসলামী রাষ্ট্রের সকল বুনিয়াদী বিষয় 'উসমান (রা.)-এর নখদর্পণে ছিল।[৪৫]

---

৪২. আল-কুরতুবী, ১৫:২৪০।
৪৩. ইবনু সা'দ, ৩:৫৫; ইবনু কাসীর, ৭:১৯৯; আত-তাবারী ৪:৪১৯।
৪৪. ইবনু কাসীর, ৭:১৯৯। আত-তাবারী ও ইবনু সা'দ উল্লেখ করেছেন যে, 'উসমান (রা.) দু'বার আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন।
৪৫. আল-'আক্কাদ, ৮০।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মাদীনায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহচর্যে 'উসমান (রা.)

'উসমান (রা.)-এর ব্যক্তিত্ব ও রুচি-অভিরুচি গঠনে সবচাইতে বেশি প্রভাবকের ভূমিকা পালন করেছে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে তাঁর সাহচর্য। ইসলাম গ্রহণের পর মাক্কায় এবং হিজরাতের পর মাদীনায় তিনি দীর্ঘসময় ধরে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহচর্যে ধন্য হয়েছেন। নুবুওয়াতী পাঠশালার ছাত্রত্ব গ্রহণে তাঁর তীব্র আগ্রহ ছিল। 'উসমান (রা.) স্বয়ং বলেনঃ 'আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন এবং তাঁর ওপর কিতাব নাযিল করেছেন। যাঁরা প্রথমেই আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আহবানে সাড়া দিয়ে ঈমান এনেছিলেন আমি তাঁদেরই একজন। আমি হাবশা ও মাদীনায় হিজরাতের সৌভাগ্য অর্জন করেছি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জামাতা হওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছে আর আমি তাঁর পথ-নির্দেশনা স্বচক্ষে অবলোকন করেছি।'[৪৬]

'উসমান (রা.) কুরআনী পাঠক্রমে প্রশিক্ষিত হয়েছেন; তাঁর প্রশিক্ষক ছিলেন খোদ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। 'উসমান (রা.)-এর প্রশিক্ষণের সূচনা হয়েছিল রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে সাক্ষাতের সাথে সাথেই। নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে যোগাযোগের ফলে তাঁর মাঝে বিস্ময়কর পরিবর্তনের সূচনা হয়। তিনি অন্ধকারাচ্ছন্ন গোলক হতে আলোর বৃত্তে বের হয়ে আসেন, ঈমান অর্জন করেন, কুফ্‌রকে ছুঁড়ে ফেলেন এবং আল্লাহ্‌র পথে বিপদ-মুসীবত সহ্য করার শক্তি অর্জন করেন।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ব্যক্তিত্বে অপরকে আকৃষ্ট ও প্রভাবিত করার সহজাত ক্ষমতা ছিল। আল্লাহ তাঁকে স্বীয় চক্ষুর সামনে সৃজন করেছেন, পৃথিবীর ইতিহাসে তিনিই হলেন পূর্ণাঙ্গতম মানব। মহৎপ্রাণ, সর্বদা মানুষের ভালোবাসায় সিক্ত হন, মানুষের বিস্ময়ের পাত্র হন, মুগ্ধ ভক্তকুল তাঁকে ঘিরে আবর্তিত হয়, মুগ্ধতা ও ভালোবাসার কারণেই তারা মহৎপ্রাণের সাথে ওৎপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত থাকে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তো শুধু মহৎপ্রাণ ছিলেন না; তিনি আল্লাহর রাসূলও ছিলেন, ছিলেন ওয়াহী-এর ধারক ও মুবাল্লিগ। এটি আরেক উচ্চতা। তাঁর প্রতি মানুষের

---

৪৬. আহমদ ইবনু হাম্বল, ফাদাইলুস সাহাবাহ, ১:৫৯৭।

ভালোবাসা ও তীব্র আকর্ষণ শুধু মহত্ত্বের কারণে নয়; বরং সেই নুবুওয়াতী সুবাসের কারণেও যা তাঁকে সর্বদা বেষ্টন করে রাখত। তদুপরি তাঁর কাছে এসে মিশেছে দুটি স্রোতধারা; তিনি মহান মানুষ আবার শ্রেষ্ঠতম রাসূলও, এই স্রোতধারার শুরু-শেষ আলাদা করা যায় না। ফলে এই মানব-রাসূলকে কিংবা রাসূল-মানবকে গভীরভাবে ভালবাসলেন 'উসমান (রা.)। জীবনের নানা পাদে তাঁর সাথে 'উসমানের ঘনিষ্ঠতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে।

এক. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে জিহাদের ময়দানে 'উসমান (রা.):

মাদীনায় স্থায়ী হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি সুদৃঢ়করণে মনোনিবেশ করেন। এই লক্ষ্যে তিনি আনসার ও মুহাজিরগণের মাঝে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতি আনসারীর সাথে একজন মুহাজিরের বন্ধন প্রতিষ্ঠা করলেন। এই প্রক্রিয়ায় আউস ইবনু সাবিত (রা.)-এর সাথে 'উসমান (রা.)-এর ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা হয়।[৪৭] তারপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন এবং ইয়াহুদীদের সাথে চুক্তি করেন। এরপর তিনি নবপ্রতিষ্ঠিত মুসলিম সমাজের সামাজিক-অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত বুনিয়াদ সুদৃঢ়করণে মনোনিবেশ করলেন। 'উসমান (রা.) এই নতুন ইসলামী সাম্রাজ্যের অন্যতম পুরোধা ছিলেন। মন-মনন ও অর্থ-সম্পদ ব্যয়ে রাষ্ট্রের ভিত্তি সুদৃঢ়করণে তিনি কখনো বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করেননি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে বাদ্‌র যুদ্ধ ব্যতীত সকল যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন।[৪৮] মাদানী জীবনে জিহাদের ময়দানে 'উসমান (রা.)-এর ভূমিকার বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলো ঃ

কঃ বাদ্‌র যুদ্ধঃ

মুসলিমগণ যখন বাদ্‌র যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তখন 'উসমান (রা.)-এর স্ত্রী রাসূল-তনয়া রুকাইয়াহ (রা.) হাম রোগে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী ছিলেন। যুদ্ধ-প্রস্তুতির ডাকে সাড়া দিয়ে 'উসমান (রা.) প্রস্তুতি শুরু করলেন; কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নির্দেশে স্ত্রীর শুশ্রূষার জন্য তিনি মাদীনায় অবস্থান করতে বাধ্য হলেন। যুদ্ধকালে রুকাইয়াহর মৃত্যু হয়। ফলে স্বীয় কন্যার দাফনে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উপস্থিত থাকতে পারেননি। রুকাইয়াহর দাফন শেষে 'উসমান (রা.) যখন বিষণ্ন বদনে বাকী' গোরস্থান হতে ফিরছিলেন তখনই যায়িদ ইবনু হারিসা (রা.)-কে বাদ্‌র যুদ্ধে মুসলিমদের বিজয়ের সুসংবাদ নিয়ে ফিরে আসতে দেখেন।

---

৪৭. মাহমূদ শাকির, আল-আমীন যূন্-নূরাইন, ৪০।
৪৮. 'আবদুল ওয়াহহাব আল-নাজ্জার, আল-খুলাফা আর-রাশিদূন, ২৬৯।

যুদ্ধ বিজয়ের খবরে মুসলিমদের মাঝে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়; 'উসমান (রা.)-ও আনন্দিত হন, যদিও স্ত্রী-বিয়োগের বেদনা তিনি লুকোতে পারেননি। মাদীনায় ফিরে আসার পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে রুকাইয়াহর মৃত্যু সংবাদ দেওয়া হয়। তিনি বাকী'তে গিয়ে নিজের মেয়ের মাগফিরাতের জন্য দু'আ করেন।[৪৯]

অলসতা কিংবা কাপুরুষতার জন্য 'উসমান (রা.) যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি, এমন নয়। কেউ কেউ এ ধরনের মন্তব্য করে 'উসমান (রা.)-এর ওপর নিদারুণ যুল্ম করেছেন। কারণ বাদরী সাহাবীগণ মর্যাদা অর্জন করেছেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আনুগত্য করার কারণে। আর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আনুগত্য করতে গিয়েই 'উসমান (রা.) যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম), 'উসমান (রা.)-কে বাদ্‌র যুদ্ধের গানীমতের অংশ দিয়েছেন। পুরস্কার হোক আর সাওয়াব হোক- সবই অর্জিত হয়েছে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আনুগত্যের কারণে।

'উসমান (রা.)-এর খিলাফাতের শেষার্ধে কতিপয় দুষ্কৃতিকারী খালীফার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ তুলে অস্থিরতা সৃষ্টি করেছিল। বিদ্রোহীদের অন্যতম অভিযোগ ছিল বাদ্‌র যুদ্ধে 'উসমান (রা.)-এর অনুপস্থিতি। এই বিষয়টিকে পুঁজি করে তারা জাহিল লোকদেরকে উত্তেজিত করেছিল। ওই অপপ্রচারে সবচেয়ে বেশি বিভ্রান্ত হয়েছিল মিসরবাসী। অথচ সাহাবায়ে কিরাম জানতেন 'উসমান (রা.), রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নির্দেশে তাঁরই কন্যার সেবা করতে গিয়ে বাদ্‌র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে বাদ্‌রী সাহাবী হিসেবে গণ্য করেন এবং তাঁর জন্য এই যুদ্ধের গানীমাতের অংশ বরাদ্দ করেছিলেন।[৫০] 'উসমান ইবনু আবদিল্লাহ ইবনু মাওহাব হতে বর্ণিত, মিসরবাসী এক লোক হাজ্জ করতে এসে 'আবদুল্লাহ্ ইবনু 'উমার (রা.)-কে[৫১] জিজ্ঞেস করলেন, 'উসমান (রা.) কি বাদ্‌র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি?' হ্যাঁ সূচক জবাব দিয়ে ইবনু 'উমার (রা.) এর কারণ বর্ণনা করে বললেন:

أما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله فمرضت فقال له رسول الله: لك أجر رجل شهد بدرا وسهمه.

৪৯. দিমা' 'আলা কামীছি 'উসমান, ২০।

৫০. যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি এমন আটজন সাহাবীর জন্য রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাদর যুদ্ধের গানীমাতের অংশ নির্ধারণ করেন। তারা হলেন: 'উসমান ইবনু 'আফ্ফান, তালহা ইবনু 'উবাইদিল্লাহ, সা'ঈদ ইবনু যায়দ, আবূ লুবাবা, 'আসিম ইবনু 'আদী, আল-হারিস ইবনু হাতিব ও আল-হারিস ইবনুস সিম্মাহ (রা.)। [ইবনুল আসীর, ২: ২৯-৩০; ইবনু সা'দ, ৩:৫৬।]

৫১. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.) বাদর যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন; কিন্তু বয়স কম হওয়ায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে ফিরিয়ে দেন। [ইবনুল আসীর, ২:২৯।]

> 'উসমান (রা.)-এর বাদ্‌র যুদ্ধে অংশ না নেয়ার কারণ হলো এই যে, তাঁর স্ত্রী রাসূল-তনয়া (রুকাইয়া) সে সময় অসুস্থ ছিলেন, এ কারণে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে বলেছিলেন, '(তুমি রুকাইয়াহর সেবায় মাদীনায় অবস্থান কর।) তুমি বাদ্‌র যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীর সমান সাওয়াব ও গানীমতের অংশ পাবে।[৫২]

আবু ওয়ায়িল (রহ) হতে বর্ণিত, 'উসমান (রা.) বলেছেন, 'আমি রাসূল-তনয়ার শুশ্রূষার কারণে বাদ্‌র যুদ্ধে অংশ নিতে পারিনি।' যায়িদা বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যার জন্য বাদ্‌র যুদ্ধের গানীমতের অংশ নির্ধারণ করেছেন তাঁকে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বলে গণ্য করতে হবে।'[৫৩] ইমাম বুখারী বাদরী সাহাবীগণের যে তালিকা প্রস্তুত করেছেন তাতে 'উসমান ইবনু আফ্ফান (রা.)-এর নাম রয়েছে।[৫৪] এ কারণে 'উসমানকে সর্বসম্মতিক্রমে বাদ্‌রী সাহাবী বলে গণ্য করা হয়।[৫৫]

খঃ উহুদ যুদ্ধঃ

উহুদ যুদ্ধ মুসলিমদের জন্য মিশ্র অভিজ্ঞতার যুদ্ধ। যুদ্ধের শুরুর দিকে মুসলিমগণ সুবিধাজনক অবস্থায় ছিলেন। সাহাবীদের তরবারী কাফিরদের গর্দান উড়িয়ে দিচ্ছিল আর কাফিররা দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পলায়ন করছিল। কুরাইশ দলের সাথে আগত মহিলারা রণসঙ্গীত ভুলে দফ্ ফেলে পালিয়ে গেল। কিন্তু আচম্বিত যুদ্ধের পাল্লা বিপরীত দিকে ঘুরে গেল। সুবিধাজনক অবস্থানে থাকার পরও মুসলিমরা বিপর্যস্ত হয়ে পড়লেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উহুদ পাহাড়ের এক সরু পথে একদল তীরন্দাজ নিযুক্ত করে তাদেরকে সর্বাবস্থায় পথটি পাহারা দিতে বলেছিলেন। প্রাথমিক বিজয়ের পর যোদ্ধারা যখন গানীমতের সম্পদ সংগ্রহ করতে লাগলেন তখন তীরন্দাজ দলের অধিকাংশ সদস্য সেই স্থান ছেড়ে ময়দানে নেমে পরিত্যক্ত সম্পদ সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কাফিরদের অশ্বারোহী দলের প্রধান খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ সুবর্ণ সুযোগটি ব্যবহার করলেন; 'ইকরামা ইবনু আবি জাহলসহ তিনি একদল অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে সরু পথে হামলা চালিয়ে মুষ্টিমেয় মুসলিম তীরন্দাজদেরকে হত্যা করে গানীমতের সম্পদ সংগ্রহে ব্যস্ত মুসলিম বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। আকস্মিক হামলায় মুসলিম বাহিনীতে চরম বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ল। মুসলিম বাহিনী ত্রিধাবিভক্ত হয়ে পড়ল; এক দল পিছু হটে মাদীনার উপকণ্ঠ আ'ওয়াসে চলে গেলেন, এই দলে 'উসমানও (রা.) ছিলেন।[৫৬] আরেক

---

৫২. সহীহুল বুখারী, কিতাবুল মানাকিব, বাবু মানাকিবি 'উসমান ইবনি 'আফ্ফান (কায়রোঃ দারুত্ তাকওয়া ২০০১), ২:২৬৫।
৫৩. আয-যাহাবী, তারীখ, ৩:১১৬।
৫৪. সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, ২: ৩৪৩।
৫৫. সাদিক 'উরজূন, ৪৭।
৫৬. ইবনুল আসীর, ২: ৪৫।

দল রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শাহাদাতের খবর শুনে দিশেহারা হয়ে পড়ল। তৃতীয় দলটি জানবাজি রেখে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে প্রতিরোধে অটল রইলেন।

যে দলটি পিছু হটে মাদীনায় চলে এসেছিলেন তাঁদের সম্পর্কে কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয় :

إِنَّ الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوْا وَلَقَدْ عَفَا اللهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ۔

যেই দিন দুই দল পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল সেই দিন তোমাদের মধ্য হতে যারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছিল, তাদের কোন কৃতকর্মের জন্য শয়তানই তাদের পদস্খলন ঘটিয়েছিল। অবশ্য আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করেছেন। আল্লাহ্ ক্ষমাপরায়ণ ও পরম সহনশীল [আলকুরআন ৩:১৫৫]।

'উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে অপপ্রচারের অন্যতম হাতিয়ার ছিল উহুদ যুদ্ধে তাঁর ভূমিকা। পূর্বোক্ত সেই মিসরবাসী প্রশ্নকর্তার জবাবে ইবনু 'উমার (রা.) বলেছিলেন:

أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفا عنه وغفر له

উহুদের ময়দান থেকে তাঁর পিছু হটার ব্যাপারে আমি এই সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা ও মার্জনা করেছেন।[৫৭]

গ: গাতফান যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন:

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ৪০০ সাহাবী নিয়ে গাতফান গোত্রের উদ্দেশ্যে বের হন। তাঁর সাথে কয়েকটি ঘোড়া ছিল। এ সময় তিনি 'উসমান (রা.)-কে প্রতিনিধি হিসেবে মাদীনায় রেখে যান।[৫৮] যুল কুস্সা নামক এলাকায় মুসলিমরা গাতফানের এক লোককে আটক করলেন। লোকটি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বললেন, 'আপনি তাদের কাউকে পাবেন না। আপনার অগ্রযাত্রার খবর পেয়ে তারা পাহাড়ের শীর্ষদেশ পাড়ি দিয়ে পালিয়েছে। আমি আপনার সাথে যাচ্ছি।' রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিলেন। লোকটি ইসলাম গ্রহণ করল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে বিলাল (রা.)-এর সাথে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করে দিলেন। এগার দিন পর বাহিনী মাদীনায় ফিরে এল।[৫৯]

---

৫৭. সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুল মানাকিব, বাবু মানাকিবি 'উসমান ইবনি 'আফ্ফান, ২:২৬৫।
৫৮. ইবনু সা'দ, ২: ৫৭।
৫৯. ইবনু সা'দ, ২: ৩৪-৩৫।

ঘ. যাতুর রিকা' যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালনঃ

হিজরী চতুর্থ সনে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খবর পেলেন যে, গাতফান ও আনমার-এর একটি দল মাদীনা আক্রমণে এগিয়ে আসছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চারশ' যোদ্ধা নিয়ে মাদীনা হতে বের হলেন। এবারও তিনি প্রতিনিধি হিসেবে 'উসমান (রা.)-কে মাদীনায় রেখে গেলেন। মুসলিম বাহিনী গাতফানের এক বিরাট বাহিনীর মুখোমুখি হন। এ যুদ্ধের প্রাক্কালে দু'দলই একে অপরের ভয়ে ভীত হয়ে পড়ে। ফলে কোন সম্মুখ যুদ্ধ হয়নি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ যুদ্ধে সালাতুল খাওফ বা ভয়কালীন সালাত আদায় করেন। তিনি পনের দিন মাদীনার বাইরে ছিলেন।[৬০]

ঙ. বাই'আতুর রিদওয়ানঃ

হিজরী ষষ্ঠ সনে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ১৪০০ সাহাবী নিয়ে 'উমরাহর উদ্দেশ্যে বের হলেন। কাফিরদের বাধা দানের আশংকা দেখে তিনি হুদাইবিয়া নামক স্থানে অবতরণ করলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাফিরদের কাছে এই খবর পাঠানোর প্রয়োজন অনুভব করলেন যে, তিনি যুদ্ধ করতে আসেননি; বরং 'উমরাহ করতে এসেছেন। প্রথমে খুরাশ ইবনু উমাইয়া আল-খুজা'ঈকে দূত হিসেবে পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়। ছা'লাব নামী এক উষ্ট্রে চড়ে খুরাশ মাক্কার পথে রওয়ানা হন। কুরাইশরা খুরাশকে হত্যা করতে চাইলে হাবশীরা তাকে রক্ষা করল। বিফল মনোরথ হয়ে খুরাশ হুদাইবিয়ায় ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বিস্তারিত অবহিত করলেন। শান্তির বার্তাসহ আরেকজন দূত পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। প্রথমে 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.)-কে দূত হিসেবে মনোনীত করা হল। ওজর পেশ করে 'উমার (রা.) নিজের স্থলে 'উসমান (রা.)-কে পাঠানোর প্রস্তাব করলেন।[৬১] স্বীয় প্রস্তাবের পক্ষে 'উমার যুক্তিও পেশ করলেনঃ 'আমার ওপর কুরাইশদের হামলার আশঙ্কা করছি, আমার সাথে তাদের শত্রুতার বিষয়ে আপনি অবগত আছেন। মাক্কায় আমার গোত্র বানূ 'আদী-এর এমন কেউ নেই যে আমাকে রক্ষা করবে। তবুও হে রাসূলুল্লাহ! আপনি চাইলে আমি যেতে প্রস্তুত।'[৬২] রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কিছু বললেন না। 'উমার (রা.) আবারো বললেন, 'তবে আমি আপনাকে এমন

---

৬০. সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, বাবু গাযওয়াতি যাতির রিকা', ২ঃ ৩৭০-৭১; ইবনুল আসীর, ২ঃ৫৬-৭।
৬১. মুহাম্মদ 'উমর আল-ওয়াকিদী, আল-মাগাযী, ২ঃ ৬০০।
৬২. প্রাগুক্ত।

একজনের নাম বলতে পারি মাক্কায় যিনি আমার চেয়ে বেশি শক্তিশালী, সেখানে তার প্রতিপত্তিশালী আত্মীয়-স্বজনও আছে যারা তাঁকে রক্ষা করবে, তিনি হলেন 'উসমান ইবনু আফ্ফান।' এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'উসমান (রা.)-কে ডেকে বললেন,

> اذهب إلى قريش فخبرهم أنا لم نأت لقتال أحد، وإنما جئنا زوارا لهذا البيت، معظمين لحرمته، معنا الهدي، ننحره وننصرف.
>
> ('উসমান!) কুরাইশদের কাছে গিয়ে বলো, আমরা কারো সাথে যুদ্ধ করতে আসিনি, আমরা এসেছি সম্মানের সাথে এই মহান ঘর (কা'বা ঘর) যিয়ারত করতে। আমাদের সাথে হাদী আছে, আমরা ('উমরাহ শেষে) এগুলো যবেহ করে ফিরে যাব।

'উসমান (রা.) মাক্কার পথে রওয়ানা করে বালদাহ নামক স্থানে এসে কুরাইশ-এর একদল লোককে দেখতে পেলেন। তারা বলল: '('উসমান!) তুমি কোথায় যাচ্ছ?' 'উসমান বললেন, 'কুরাইশ নেতৃবৃন্দের কাছে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বার্তা নিয়ে যাচ্ছি।' তারা 'উসমান (রা.)-কে সেখান থেকে ফিরিয়ে দিতে চাইল। তখন আবান ইবনু সা'ঈদ ইবনিল 'আস তাঁকে নিরাপত্তা দিয়ে নিজ বাহনে চড়িয়ে মাক্কায় নিয়ে গেলেন। 'উসমান (রা.) এক এক করে কুরাইশ নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাৎ করলেন। আবু সুফইয়ান ইবনু হার্ব, সাফওয়ান ইবনু উমাইয়াসহ অন্যদের কাছে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শান্তিময় মিশনের বার্তা পৌঁছালেন। সকলের একই রা ঃ 'আমরা থাকতে মুহাম্মাদ কিছুতেই কখনই মাক্কায় প্রবেশ করতে পারবে না।'[৬৩]

মুশরিকরা 'উসমান (রা.)-কে কা'বা ঘর যিয়ারত করতে দিতে সম্মত হল। কিন্তু 'উসমান (রা.) এই প্রস্তাবে রাজি হলেন না।[৬৪] 'উসমান (রা.) মাক্কার দুর্বল মুসলিমদের কাছে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বার্তা পৌঁছে দিলেন এবং তাদেরকে আসন্ন মুক্তির সুসংবাদ দিলেন।[৬৫] তিনি তাদের কাছ থেকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্য এই মৌখিক বার্তা নিয়ে এলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে আমাদের সালাম পৌঁছাবেন। যিনি তাঁকে হুদাইবিয়ায় এনেছেন তিনি তাঁকে মাক্কায় পৌঁছাতে পারবেন।' এদিকে মুসলিমদের মাঝে এই গুজব ছড়িয়ে পড়ল যে 'উসমান (রা.) নিহত হয়েছেন। এই খবর শুনে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম), সাহাবীগণকে মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

---

৬৩. ইবনু হিশাম, ৩:৩৪৪।
৬৪. ইবনু কায়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ, যাদুল মা'আদ, ৩:২৯০।
৬৫. প্রাগুক্ত।

করার ব্যাপারে বাই'আত করার আহবান জানালেন। সাহাবীগণ আমৃত্যু লড়াই করার বাই'আত করলেন।[৬৬] সর্বপ্রথম বাই'আত করলেন আবূ সিনান 'আবদুল্লাহ ইবনু ওয়াহাব আল-আসাদী।[৬৭] তারপর একে একে সকল সাহাবী রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাতে হাত রেখে বাই'আত করলেন। সালামা ইবনু আল-আকওয়া' তিনবার বাই'আত গ্রহণ করলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজের ডান হাত ধরে বললেন, এটি 'উসমান (রা.)-এর হাত। তারপর ডান হাত দিয়ে বাম হাতে আঘাত করলেন। সেদিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাতে ১৪০০ সাহাবী বাই'আত করেছিলেন।[৬৮] এটিকে বাইয়াতুর রিদওয়ান বলা হয়।

আলকুরআনুল কারীমে বাইয়াতুর রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারীদের বিষয়ে কয়েকবার-ই আলোচনা এসেছে। তাঁদের মর্যাদা সম্পর্কে অনেক হাদীসও বর্ণিত হয়েছে। 'আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

إِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللهَ يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيْهِمْ ۚ فَمَنْ نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللهَ فَسَيُؤْتِيْهِ أَجْرًا عَظِيْمًا ،

যারা তোমার হাতে বাই'আত করে তারা তো আল্লাহ্‌রই হাতে বাই'আত করে। আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর। অতঃপর যে তা ভঙ্গ করে তা ভঙ্গ করার পরিণাম তারই এবং যে আল্লাহ্‌র সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে তিনি অবশ্যই তাকে মহাপুরস্কার দেবেন [আলকুরআন ৪৮:১০]।

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ وَمَنْ يُّطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَّتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا ، لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا ،

অন্ধের জন্য কোন অপরাধ নেই, খঞ্জের জন্য কোন অপরাধ নেই, এবং পীড়িতের জন্য কোন অপরাধ নেই; এবং যে কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে আল্লাহ তাকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত; কিন্তু যে ব্যক্তি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে তিনি তাকে মর্মন্তুদ শাস্তি দেবেন। আল্লাহ তো মু'মিনগণের উপর সন্তুষ্ট হলেন যখন তারা বৃক্ষতলে তোমার বাই'আত গ্রহণ করল, তাদের অন্তরে যা ছিল তা তিনি অবগত ছিলেন; তাদেরকে তিনি দান

৬৬. সহীহ আল-বুখারী, বাবু গাযওয়াতিল হুদাইবিয়া, ২:৩৮২।
৬৭. আস্-সীরাতুন নাবাভিয়্যাহ ফী দাউইল মাসাদিরিল আসালিয়্যাহ, ৪৮৬।
৬৮. প্রাগুক্ত, ৪৮২।

করলেন প্রশান্তি এবং তাদেরকে পুরস্কার দিলেন আসন্ন বিজয় [আলকুরআন ৪৮:১৭-১৮]।

عن جابر بن عبد الله قال: قال لنا رسول الله يوم الحديبية: أنتم خير أهل الأرض، وكنا ألفا وأربع مائة ولو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان الشجرة.

জাবির ইবনু আবদিল্লাহ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হুদাইবিয়ার দিন বলেছেন: 'তোমরা সর্বশ্রেষ্ঠ জগতবাসী।' আমরা ছিলাম ১৪০০ জন। আমি যদি আজ দেখতে পেতাম তবে তোমাদেরকে বৃক্ষের জায়গাটি দেখাতে পারতাম।[৬৯]

যারা বৃক্ষতলে বাই'আত করেছিলেন তাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের সুস্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে এই হাদীসে।

হুদাইবিয়ার ঘটনায় 'উসমান (রা.)-এর বেশ কিছু বিশিষ্টতা প্রকাশ পেয়েছে। যেমন, (১) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজের এক হাতকে 'উসমান (রা.)-এর হাত বলে ঘোষণা দিয়েছেন এবং 'উসমান (রা.)-এর পক্ষে শপথ নিয়েছেন। (২) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাণী তিনি মাক্কায় আটকে পড়া মু'মিনদের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন।

'উসমানের ব্যাপারে অন্যায়ভাবে এই অপবাদ দেওয়া হয় যে, তিনি বাই'আতুর রিদওয়ানে অনুপস্থিত ছিলেন। সাধারণত শী'আদের পক্ষ থেকে এই অন্যায় অপবাদ দেওয়া হয়। আনাস ইবনু মালিক (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন বাই'আতুর রিদওয়ান-এর নির্দেশ দেন তখন 'উসমান (রা.) তাঁর বার্তা নিয়ে মাক্কায় অবস্থান করছিলেন। উপস্থিত জনসমষ্টি তার হাতে বাই'আত হলেন আর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

إن عثمان في حاجة الله وحاجة رسوله

নিশ্চয় 'উসমান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রয়োজনে রয়েছেন।

তারপর তিনি এক হাতে মাটির ওপর আঘাত করলেন।[৭০]

চ. মাক্কা বিজয়ের দিন 'আবদুল্লাহ ইবনু সা'দ ইবনি আবি সারহ-এর ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে 'উসমান (রা.)-এর সুপারিশ :

মাক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছিলেন; তবে চারজন ব্যক্তিকে এই সাধারণ ক্ষমার আওতার বাইরে রেখে বলেছিলেন:

---

৬৯. সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, বাবু গাযওয়াতিল হুদাইবিয়া, ২:৩৮০।
৭০. সুনানুত তিরমিযী, ৩৭০২।

اقتلوهم، وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة: عكرمة بن أبي جهل، عبد الله بن خطل، مقيس بن صبابة وعبد الله بن سعد بن أبي السرح

এদেরকে হত্যা করো যদিও এরা কা'বা-এর পর্দার সাথে ঝুলে থাকে: 'ইকরামা ইবনু আবি জাহল, 'আবদুল্লাহ ইবনু খাতাল, মিকইয়াস ইবনু সাবাবাহ ও 'আবদুল্লাহ ইবনু সা'দ ইবনি আবি সার্‌হ।[৭১]

'আবদুল্লাহ ইবনু খাতালকে কা'বাঘরের সাথে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। তাকে দেখে সা'ঈদ ইবনু হারিস ও 'আম্মার ইবনু ইয়াসির (রা.) ছুটে গেলেন। সা'ঈদ যিনি কিনা তরুণতর ছিলেন- আম্মারকে পেছনে ফেলে সামনে এগিয়ে গিয়ে আল্লাহর দুশমনের শিরচ্ছেদ করলেন।

'ইকরামাহ ছুটে গেল জিদ্দা পানে। সেখানে সে একটি নৌকায় ওঠল। হঠাৎ সাগরে প্রবল ঝড় ওঠল। নৌকারোহীরা বলল, তোমরা তোমাদের দীনকে একনিষ্ঠ কর। কারণ তোমাদের খোদাগুলো এই বিপদে কোন কাজে আসবে না। একথা শুনে 'ইকরামাহ মনে মনে বলল, ইলাহরা যদি আমাকে জল-এর বিপদ হতে উদ্ধার করতে না পারে তারা স্থলের বিপদ হতেও উদ্ধার করতে পারবে না। 'হে আল্লাহ, আপনার সাথে আমি এই চুক্তিতে আবদ্ধ হলাম যে, আপনি যদি আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করেন তাহলে আমি মুহাম্মাদের কাছে গিয়ে তাঁর হাতে হাত রাখব।' বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়ার পর 'ইকরামা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করলেন।

অপরদিকে 'আবদুল্লাহ ইবনু সা'দ ইবনু আবি সার্‌হ 'উসমান ইবনু আফফান (রা.)-এর কাছে এসে আত্মগোপন করল। পরে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-যখন জনসমষ্টির বাই'আত নিচ্ছিলেন তখন 'উসমান (রা.) তাকে নিয়ে হাজির হন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম), 'উসমান (রা.)-এর মর্যাদার খাতিরে তাকে ক্ষমা করে দেন।[৭২]

'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, 'আবদুল্লাহ ইবনু সা'দ ইবনি আবি সার্‌হ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাতিবে ওয়াহী ছিলেন; শয়তান তার পদস্খলন ঘটায় অর্থাৎ তিনি মুরতাদ হয়ে যান। তাই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাক্কা বিজয়ের দিন তাকে হত্যার নির্দেশ দেন। 'উসমান (রা.), রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে তার নিরাপত্তা প্রার্থনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে নিরাপত্তা দেন।[৭৩]

---

৭১. সাবির আবু সুলায়মান, আদওয়াউল বায়ান ফী তারীখিল কুরআন, ৭৯-৮০।
৭২. প্রাগুক্ত।
৭৩. প্রাগুক্ত।

ইবনু ইসহাক এ বিষয়ে লিখেছেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু সা'দ ইবনি আবি সারহ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তিনি কাতিবুল ওয়াহী (ওয়াহী লেখক)-এর মর্যাদাও লাভ করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি মুশরিক হয়ে মাক্কায় ফিরে যান। এ কারণে মাক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে হত্যার নির্দেশ দেন। ভীতসন্ত্রস্ত 'আবদুল্লাহ তাঁর দুধ ভাই 'উসমান (রা.)-এর কাছে আত্মগোপন করলেন। 'উসমান (রা.) তাঁর জন্য সুপারিশ করলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে ক্ষমা করে দেন। 'আবদুল্লাহ ইবনু সা'দ ইবনু আবি সারহ পরবর্তীতে একনিষ্ঠ মুসলিমে পরিণত হয়েছিলেন। 'উমার ও 'উসমান (রা.) তাঁকে নানা রাষ্ট্রীয় পদে নিয়োগ করেছিলেন।[৭৪]

ছ: তাবুক যুদ্ধ:

হিজরী নবম সনে রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস আরব উপদ্বীপের দিকে শ্যেন দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিশাল রোমান বাহিনীর মুকাবিলায় প্রস্তুতি শুরু করলেন। তখন ছিল গ্রীষ্মকাল, এক দিকে প্রচণ্ড গরম, অন্যদিকে এটি ছিল ফসল কাটার মৌসুম। এহেন কঠিন পরিস্থিতিতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যুদ্ধযাত্রার প্রস্তুতি শুরু করেন। কঠিন পরিস্থিতির এই বাহিনীকে جيش العسرة বলা হয়। শুধু বিরাট সেনাবাহিনী গঠন করলেই চলবে না; তাদের জন্য প্রয়োজনীয় রসদও যোগাড় করতে হবে। জাইশ আল-'উসরাহ-এর প্রস্তুতিতে 'উসমান (রা.) যেভাবে সহযোগিতা করেন তা ইসলামের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে।

ইবনু শিহাব যুহরী বলেন, তাবুক যুদ্ধে জাইশ আল-'উসরাহ-এর প্রস্তুতিতে 'উসমান (রা.) ৯৪০টি উট ও ৬০টি ঘোড়া দান করেন। শুধু তাই নয়, তিনি নগদ দশ হাজার স্বর্ণমুদ্রাও প্রদান করেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুদ্রাগুলো নেড়েচেড়ে বললেন,

ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم

> আজকের পর থেকে 'উসমান যে আমলই করুক তা তার ক্ষতি করবে না।' তিনি কথাটি দু'বার বললেন।[৭৫]

'আবদুর রহমান ইবনু খাব্বাব (রা.) বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জাইশ আল-'উসরাহ অর্থাৎ তাবুকের সামরিক অভিযানে আর্থিক সাহায্য প্রদানের জন্য উদ্বুদ্ধ করছিলেন তখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। 'উসমান (রা.) দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আমি সুসজ্জিত এক শত উট (গদি-পালানসহ)

---

৭৪. ইবনু হিশাম, আস্-সীরাহ, ৪:৫৭-৫৮।
৭৫. জামে আত-তিরমিযী, আবওয়াবুল মানাকিব, (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার ২০০৬), ৬:৩০৪।

আল্লাহর রাস্তায় দান করলাম। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবার যুদ্ধের (আর্থিক ব্যয় বহনের) জন্য লোকদেরকে উদ্বুদ্ধ করলেন। 'উসমান (রা.) আরেকবার দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, (গদি-পালানসহ) আমি দুই শত উট আল্লাহর পথে দান করলাম। তিনি আবারো লোকদেরকে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করলেন। 'উসমান (রা.) দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমি (গদি-পালানসহ) তিন শত উট আল্লাহ্র রাস্তায় দান করলাম। রাবী 'আবদুর রহমান বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে মিম্বার থেকে এ কথা বলতে বলতে নামতে দেখেছি ঃ

ما على عثمان ماعمل بعد هذه ما على عثمان ما عمل بعد هذه

> আজকের পর থেকে 'উসমান যাই করুক তার জন্য তাকে জবাবদিহি করতে হবে না। আজকের পর থেকে 'উসমান যাই করুক তার জন্য তাকে জবাবদিহি করতে হবে না।[৭৬]

আবদুর রহমান ইবনু সামুরাহ বলেন, 'উসমান (রা.) এক হাজার দীনারসহ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে মুদ্রাগুলো তাঁর কোলে ঢেলে দিলেন। রাবী বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে সেগুলো ওলট-পালট করতে করতে বলতে শুনলামঃ

ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم

> আজকের পর থেকে 'উসমান যে আমলই করুক তা তার ক্ষতি করবে না। তিনি কথাটি দু'বার বললেন।[৭৭]

মনে হয় 'উসমান-ই যেন এই নব-প্রতিষ্ঠিত ইসলামী সাম্রাজ্যের একমাত্র অর্থদাতা। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেনাবাহিনী নিয়ে তাবুক নামক স্থানে পৌঁছলেন। এটি মাদীনা ও দামিশ্কের মধ্যবর্তী একটি স্থান। সেখানে পৌঁছে তিনি জানতে পারলেন যে, রোমান বাহিনী মুসলিম বাহিনীর অগ্রযাত্রার খবর পেয়ে ফিরে গেছে। 'উসমান (রা.) যে রসদ যোগান দেন তা খরচ না করেই মুসলিম বাহিনী ফিরে আসে। প্রশ্ন হলঃ 'উসমান (রা.) কি তাঁর দানের কোন অংশ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। কখ্খনো নয়। 'উসমান (রা.)-এর ব্যাপারে এটি অসম্ভব চিন্তা।

জঃ অন্যান্য যুদ্ধে অংশগ্রহণঃ

উপর্যুক্ত অভিযান ব্যতীত 'উসমান (রা.) অন্যান্য যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেন। তিনি যেসব যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন সেগুলো হলঃ খন্দক যুদ্ধ, খাইবার যুদ্ধ, মাক্কা বিজয়ের অভিযান, হাওয়াযিন, তায়িফ ও তাবুক যুদ্ধ। তাছাড়া তিনি 'উমরাতুল কাদা-এ অংশগ্রহণ করেন।[৭৮]

---

৭৬. প্রাগুক্ত।
৭৭. প্রাগুক্ত ৩০৫।
৭৮. ইবনু কাসীর, ৭ঃ ১৯৯-২০০।

দুই. মাদীনায় 'উসমান (রা.)-এর সামাজিক জীবনঃ

কঃ ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধঃ

মাদীনায় হিজরাতের পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আনসার ও মুহাজিরদের মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন প্রতিষ্ঠা করেন। 'উসমান (রা.)-এর সাথে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল বানূন্ নাজ্জার-এর আওস ইবনু সাবিত (রা.)-এর সাথে। ইনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কবি হাস্সান ইবনু সাবিত (রা.)-এর ভাই।[৭৯]

খঃ বাড়ি নির্মাণঃ

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুহাজির সাহাবীদের জন্য জমি বরাদ্দ দিয়েছিলেন। 'উসমান (রা.)-এর অনুকূলেও জমি বরাদ্দ দেওয়া হয়। বরাদ্দকৃত জমিতে তিনি বাড়ি নির্মাণ করেন। মাসজিদ-ই-নববীর বাবুন নাবী-এর বিপরীতে 'উসমান (রা.)-এর বাড়ির একটি ছোট দরজা ছিল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'উসমান (রা.)-এর বাড়িতে গেলে এই দরজা দিয়ে বের হতেন।[৮০]

গঃ রুকাইয়াহ (রা.)-এর মৃত্যুঃ

'উসমান (রা.)-এর স্ত্রী রাসূল-তনয়া রুকাইয়াহ (রা.)-এর মৃত্যু সম্পর্কে বাদর যুদ্ধ সম্পর্কিত আলোচনায় আলোকপাত করা হয়েছে।

ঘঃ উম্মু কুলসূম (রা.)-এর সাথে 'উসমান (রা.)-এর বিয়ে (৩য় হিজরী):

রাসূল-তনয়া উম্মু কুলসূম (রা.)-এর প্রকৃত নাম জানা যায় না। ফাতিমা (রা.)-এর চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ এই রাসূল-কন্যা উম্মু কুলসূম (রা.) উপনামে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

সা'ঈদ ইবনুল মুসায়্যিব বলেন, 'উসমান (রা.)-এর স্ত্রী রাসূল-তনয়া রুকাইয়াহ মারা গেলেন, ওদিকে হাফসা বিন্তু 'উমার (রা.)-এর স্বামীও মারা গেলেন। অতঃপর একদিন 'উমার (রা.)-এর সাথে 'উসমান (রা.)-এর দেখা হয়। 'উমার (রা.) বললেন, 'আপনি কি হাফসাকে বিয়ে করার ব্যাপারে আগ্রহী?' 'উসমান (রা.) ইতোঃপূর্বে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে হাফসার নাম উল্লেখ করতে শুনেছেন। তাই তিনি চুপ রইলেন। 'উমার (রা.) বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জানালেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

هل لك في خير من ذلك؟ أتزوج حفصة، وأزوج عثمان خيرا منها: أم كلثوم

তুমি কি এর চেয়ে উত্তম কিছু চাও? আমি হাফসাকে বিয়ে করব। আর 'উসমান (রা.)-এর সাথে আরো উত্তম কনের বিয়ে দেবঃ তার নাম হল উম্মু কুলসূম।[৮১]

---

৭৯. ইবনু সা'দ, ৩:৫৫-৬।
৮০. প্রাগুক্ত, ৩: ৫৫।
৮১. মুসতাদরাকুল হাকিম, ৪:৪৯।

উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা ছিদ্দিকা (রা.) 'উসমান (রা.)-এর সাথে উম্মু কুলসূমের বিয়ের বর্ণনা দিয়ে বলেন, বিয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর পরিচারিকা উম্মু আইমান (রা.)-কে বললেনঃ

هيئي ابنتي أم كلثوم وزفيها إلى عثمان، واخفقي بين يديها بالدف.

তুমি আমার মেয়ে উম্মু কুলসূমকে বধুর সাজে প্রস্তুত করে 'উসমান (রা.)-এর কাছে পাঠিয়ে দাও এবং তার সামনে দফ্ বাজিয়ে সানন্দ পরিবেশ সৃষ্টি কর।

উম্মু আইমান (রা.) তাই করলেন। তিনদিন পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উম্মু কুলসূম (রা.)-এর কাছে গিয়ে বললেন, 'মা! তোমার স্বামীকে কেমন পেলে?' জবাবে তিনি বললেন, 'উত্তম স্বামী।'[৮২]

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাসজিদের দ্বারে দাঁড়িয়ে 'উসমানকে বললেন,

هذا جبريل أخبرني أن الله قد زوجك أم كلثوم بمثل صداق رقية وعلى مثل صحبتها

এইতো জিবরীল (আ.) আমাকে খবর দিয়ে গেল যে আল্লাহ তোমার সাথে উম্মু কুলসূমকে বিয়ে দিয়েছেন রুকাইয়াহর সমান মোহরানার বিনিময়ে।[৮৩]

এটি ছিল হিজরী তৃতীয় সনের রবিউল আউয়াল মাসের ঘটনা। জুমাদাল উখ্‌রা মাসে তিনি বাসর যাপন করেন। তাঁর কোন সন্তান ছিল না।[৮৪]

ঙঃ 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উসমানের মৃত্যুঃ

হিজরী চতুর্থ সনের জুমাদাল উলা মাসে 'উসমান ও রুকাইয়াহ (রা.)-এর পুত্র 'আবদুল্লাহ মারা যায়। তার বয়স হয়েছিল মাত্র ছয় বছর। তার চোখের কোণায় মোরগ ঠোকর মারলে তার চোখ-মুখ ফুলে যায় এবং অসুস্থ হয়ে সে মারা যায়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার জানাযার নামায পড়ান। 'উসমান (রা.) নিজ হাতে পুত্রকে কবরে শুইয়ে দেন।[৮৫] এটি 'উসমান (রা.)-এর জন্য এক বড় পরীক্ষা ছিল। যারা আল্লাহর পথে মানুষকে আহবান করেন তাদেরকে অনেক বড় পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়।

চঃ উম্মু কুলসূমের মৃত্যুঃ

হিজরী নবম সনের শা'বান মাসে উম্মু কুলসূম (রা.) মারা যান। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর জানাযার নামায পড়ান। আনাস ইবনু মালিক

---

৮২. দিমা 'আলা কামীছি উসমান, ২২।
৮৩. ইবনু কাসীর, ৭: ২১১-১২; আয- যাহাবী, তারীখ.., ৩: ৯২। আলবানী বলেন, হাদীসটি দুর্বল।
৮৪. আয-যাহাবী, তারীখ., ৩:৬৭৮।
৮৫. ইবনুল আসীর, ২:৪৫৭; আয-যাহাবী, তারীখ., ৩:৯১।

(রা.) বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে উম্মু কুলসূমের কবরের পাশে বসতে দেখেছেন। আনাস (রা.) আরো বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দু'চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরতে দেখেছি। তিনি বললেন, তোমাদের মাঝে এমন কেউ আছে কি যে গত রাতে স্ত্রী সঙ্গম করেনি। আবু তালহা বলেন, আমি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তুমি কবরে নাম।[৮৬] লায়লা বিনতু কানিফ আস-সাকাফিয়্যাহ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কন্যা উম্মু কুলসূমের মৃত্যুর পর তাঁর গোসলদানকারী মহিলাদের সাথে আমিও ছিলাম। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে (কাফনের জন্য) প্রথমে দিলেন ইজার, অতঃপর জামা, অতঃপর ওড়না, অতঃপর চাদর, অতঃপর অন্য একটি কাপড় দিলেন। তা দ্বারা কাফনের ওপর দিয়ে লাশ পেঁচিয়ে দেওয়া হল। লায়লা বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর কাফনের কাপড় নিয়ে দরজার কাছে বসা ছিলেন। তিনি একটি একটি করে আমাদেরকে কাপড়গুলো দিলেন।[৮৭] ইবনু সা'দের বর্ণনায় এসেছে, 'আলী ইবনু আবু তালিব, আল-ফাদল ইবনু আব্বাস ও উসামা ইবনু যায়িদ (রা.), উম্মু কুলসূমের কবরে নেমেছিলেন। আর আসমা বিনতু 'উমাইস ও সাফিয়্যা বিনতু 'আবদিল মুত্তালিব তাঁর গোসল দিয়েছিলেন।[৮৮]

উম্মু কুলসূম (রা.)-এর মৃত্যুতে 'উসমান (রা.) ভীষণভাবে ব্যথিত হন। তাঁর ব্যথাতুর চেহারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দৃষ্টি এড়াতে পারেনি। তিনি স্ত্রী-বিয়োগে ভারাক্রান্ত 'উসমান (রা.) কে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন,

لو كانت عندنا ثالثة لزوجناكها يا عثمان

'উসমান, আমাদের তৃতীয় এক কন্যা থাকলে তোমার সাথে তার বিয়ে দিতাম।[৮৯]

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে 'উসমানকে অত্যন্ত ভালবাসতেন তার প্রমাণ রয়েছে এই বর্ণনায়। এই হাদীস হতে আরো বুঝা যায় যে এ ধরনের পরিস্থিতিতে মানুষ যেসব কুসংস্কারে বিশ্বাস করে সেগুলোরও কোন ভিত্তি নেই।

তিন. ইসলামী রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠায় 'উসমানের (রা.) আর্থিক কুরবানীঃ

জাহিলী যুগেই ধনাঢ্য ব্যক্তি হিসেবে 'উসমান (রা.) প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর এই সম্পদ তিনি অকাতরে আল্লাহর পথে বিলিয়ে দিয়েছেন। কখনো

---

৮৬. সহীহুল বুখারী, কিতাবুল জানাইয, ১: ৩০৭।
৮৭. সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল জানাইয, বাবুন ফী কাফনিল মারআহ, (ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার ২০০৮), ৪:৪২৩।
৮৮. আয-যাহাবী, তারীখ., ৩: ৬৭৮।
৮৯. ইবনু সা'দ, ৩:৫৬; আয-যাহাবী, ৩:৯৩।

দারিদ্রের ভয়ে কুণ্ঠিত হননি। 'উসমান (রা.)-এর উল্লেখযোগ্য ইনফাকের মধ্য থেকে কয়েকটির বর্ণনা দেয়া হচ্ছেঃ

কঃ রূমা কূপঃ

মাদীনায় হিজরাতের পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুপেয় পানির সঙ্কট অনুভব করলেন। রূমা কূপ ছাড়া মাদীনায় সুপেয় পানির আর কোন বড় সংগ্রহ ছিল না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

من يشترى بئر رومة فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة

যে ব্যক্তি রূমা কূপ কিনে তার বালতির সাথে মুসলিমদের বালতি কল্যাণে পূর্ণ করবে সে জান্নাতে তার প্রতিদান পাবে।[৯০]

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বললেন,

من حفر بئر رومة فله الجنة.

যে ব্যক্তি রূমা কূপ খনন করবে তাঁর জন্য রয়েছে জান্নাত।[৯১]

হিজরাতের পূর্বে রূমা কূপ থেকে পানি কিনে পান করতে হত। হিজরাতের পর মুহাজিরদের পানি পানে অসুবিধা দেখা দিল। রূমা কূপের মালিক ছিল বানূ গিফার-এর এক ব্যক্তি। প্রতি মশক পানি সে এক মুদ খাবারের বিনিময়ে বিক্রি করত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বললেন, 'জান্নাতের একটি ঝর্ণার বিনিময়ে তুমি এটি বিক্রি কর।' লোকটি বলল, 'আমার ও আমার পরিবারের জন্য এটি ছাড়া আর কিছু নেই।' এই খবর শুনে 'উসমান ৩৫ হাজার দিরহামের বিনিময়ে সেটি কিনে নিলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বললেন, 'আমিও কি ওই লোকটির সমান প্রতিদান পাব?' তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ। 'উসমান বললেন, 'আমি এই কূপটি মুসলিমদের জন্য উৎসর্গ করলাম।'[৯২] কেউ কেউ বলেন, রূমার মালিক ছিল জনৈক ইয়াহুদী; সে মুসলিমদের নিকট পানি বিক্রি করত। 'উসমান (রা.) তার কাছ থেকে সেটি ২০ হাজার দিরহামের বিনিময় কিনে নিয়ে ধনী, গরিব ও মুসাফির- সকলের জন্য ওয়াক্‌ফ করে দেন।[৯৩]

খঃ মাসজিদে নববীর সম্প্রসারণঃ

রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাদীনায় হিজরাতের পর মাসজিদে নববী নির্মিত হয়। এটি নব-প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের সমস্ত কর্মকাণ্ডের

---

৯০. আল-আলবানী, সহীহ সুনানিন নাসা'ঈ, ২:৭৬৬।
৯১. সহীহ আল-বুখারী, নং ২৭৭৮।
৯২. আত-তাবারানী, আল-মু'জামুল কাবীর, উদ্ধৃত আয-যাহাবী, তারীখ., ৩: ৯৩-৪; তুহফাতুল আহওয়াযী, ১০:১৯৬।
৯৩. ইবনু হাজর আল-আসকালানী, ফাতহুল বারী, ৫:৪০৮।

কেন্দ্রবিন্দু ছিল। মুসলিমগণ এই মাসজিদে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করতেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রতি শুক্রবারে জুম'আর নামাযে দিক-নির্দেশনামূলক ভাষণ দিতেন। এই মাসজিদে দীনি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হত। আবার বিভিন্ন স্থানে সৈন্যবাহিনীও প্রেরণ করা হত এই মাসজিদ হতে। যুদ্ধ-ফেরত মুজাহিদরা এখানেই রিপোর্ট করতেন। ধীরে ধীরে মুসলিমদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে মাসজিদে নববীতে স্থান সংকুলান হচ্ছিল না। ফলে এটির সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। পার্শ্ববর্তী জমি কিনে মাসজিদে প্রদানের জন্য সাহাবায়ে কিরামকে উদ্বুদ্ধ করে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

من يشترى بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد بخير له منها في الجنة

এমন কে আছে যে অমুক পরিবারের ভূখণ্ড কিনে তা মাসজিদের সাথে যোগ করে তার বিনিময়ে জান্নাতে উত্তম প্রতিদান লাভ করবে।

একথা শুনে 'উসমান (রা.) তা ২৫ বা ২০ হাজার দিরহামে কিনে মাসজিদের সাথে যোগ করেন, এতে মাসজিদের স্থানিক সংকীর্ণতা দূর হয়।[৯৪]

গ: জাইশ আল-'উসরাহ ও 'উসমান (রা.)-এর বদান্যতা

তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবীগণকে উদারহস্তে দান করার আহবান জানালেন। প্রত্যেকে সাধ্যানুযায়ী তহবিল গঠনে অংশগ্রহণ করলেন। 'উসমান (রা.)-এর দান সবার দানকে ছাড়িয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে আবূ হুরাইরা (রা.) বলেন,

اشترى عثمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة مرتين: يوم رومة ويوم جيش العسرة

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছ থেকে 'উসমান (রা.) দু'বার জান্নাত কিনেছেন; একবার রূমা কূপ ক্রয়ের দিন, আরেকবার জাইশ আল-উসরাহ-এর দিন।[৯৫]

---

৯৪. সহীহ সুনানিত তিরমিযী, আবওয়াবুল মানাকিব, ৬:৩০৬।
৯৫. আয-যাহাবী, তারীখ.,৩:৯৪।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
আবূ বাক্র (রা.) ও 'উমার (রা.)-এর শাসনামলে 'উসমান (রা.)

এক. আবূ বাক্র (রা.)-এর শাসনকালে

ক: পরামর্শ সভার সদস্য (আহলুশ শূরা):

আবূ বাক্র (রা.)-এর আমলে গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় বিষয়ে যাঁদের পরামর্শ নেওয়া হত 'উসমান (রা.) ছিলেন তাঁদের অন্যতম। তিনি ছিলেন আবূ বাক্র (রা.)-এর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ দু'সহযোগীর একজন। কঠোরতা ও দৃঢ়তার প্রতীক ছিলেন 'উমার ইবনুল খাত্তাব আর নম্রতার প্রতীক ছিলেন 'উসমান ইবনু 'আফ্ফান। আবূ বাক্র (রা.)-এর আমলে 'উমার (রা.) কে যদি ইসলামী খিলাফাতের উজির গণ্য করা হয় তাহলে 'উসমান ছিলেন এই ব্যবস্থার চীফ সেক্রেটারী। তাঁর মতামতকে প্রথম খালীফা যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতেন। রিদ্দার যুদ্ধের সমাপ্তির পর আবূ বাক্র (রা.) রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে মনস্থির করলেন। শুধু তাই নয়, পৃথিবীর নানাপ্রান্তে ইসলামী বাহিনী প্রেরণের আগ্রহও পোষণ করলেন। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে তিনি নেতৃস্থানীয় সাহাবীদের পরামর্শ নিলেন। 'উসমান (রা.) বললেন,

> إني أرى أنك ناصح لأهل هذا الدين، شفيق عليهم، فإذا رأيت رأيا لعامتهم صلاحا فاعزم على إمضائه فإنك غير ظنين
>
> আমি তো আপনাকে এই দীনের অনুসারীদের স্নেহময় কল্যাণকামী বলেই জানি। সর্বসাধারণের কল্যাণে আপনি কোন সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকলে তা বাস্তবায়নে সংকল্পবদ্ধ থাকুন; কারণ আপনি অবিশ্বাসযোগ্য নন।[৯৬]

'উসমান (রা.)-এর এই বক্তব্য শুনে তালহা, যুবাইর, সা'দ, আবু 'উবাইদা, সা'ঈদ ইবনু যায়িদ (রা.) ও উপস্থিত অন্যান্য আনসার ও মুহাজিরগণ বললেন, 'উসমান (রা.) সত্য বলেছেন। আপনি সিদ্ধান্তে অটল থাকুন।'[৯৭]

আরেকবার বাহরাইনে শাসনকর্তা পাঠানোর বিষয়ে সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করেন আবূ বাক্র (রা.)। 'উসমান (রা.) বললেন,

> ابعث رجلا قد بعثه رسول الله إليهم، فقدم عليه بإسلامهم وطاعتهم وقد عرفوه وعرفهم وعرف بلادهم—يعني العلاء بن الحضرمي

---

৯৬. ইবনু 'আসাকির, তারিখু দিমাশক (দামেশ্ক: আল-মাজলিসুল 'ইলমী ১৯৮৪), ২:৬৩-৬৫।
৯৭. আস-সাল্লাবী, আবু বাকর ছিদ্দিক, ৩৬৪।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাহরাইনে এক শাসনকর্তা প্রেরণ করেছিলেন, যার হাতে বাহরাইনবাসী ইসলাম গ্রহণ করেছিল ও আনুগত্য প্রকাশ করেছিল। তারা তাঁকে চিনে, তিনিও তাদেরকে চেনেন এবং তাদের দেশ সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিবহাল আছেন। তাঁর নাম আল-'আলা ইবনুল হাদরামী। আপনি তাঁকেই বাহরাইনে প্রেরণ করুন।

আবূ বাক্র (রা.) 'উসমান (রা.)-এর পরামর্শ গ্রহণ করলেন এবং আল-'আলা ইবনুল হাদরামীকে বাহরাইনের শাসনকর্তা হিসেবে প্রেরণ করলেন।[৯৮]

আবু বাক্র (রা.)-এর অসুস্থতা বেড়ে গেলে তিনি পরবর্তী খালীফার বিষয়ে বিশিষ্টজনের পরামর্শ গ্রহণ করেন। অন্যান্যদের ন্যায় 'উসমান (রা.)-এর মতামতও ছিল 'উমার (রা.)-এর পক্ষে:

اللهم علمي به أن سريرته خير من علانيته وأنه ليس فينا مثله

হে আল্লাহ, আমি জানি তাঁর ('উমারের) অন্তর বাইরের দিকের চেয়ে ভাল। আমি এটাও জানি আমাদের মাঝে তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।[৯৯]

আবূ বাক্র (রা.)-এর কাছে 'উসমান (রা.)-এর গুরুত্ব কেমন ছিল তা বুঝানোর জন্য নিম্নের ঘটনাটি উল্লেখ করা যায়: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর তাঁর রেখে যাওয়া সম্পদ ওয়ারিশদের মাঝে বণ্টন করার ব্যাপারে মতভেদ দেখা দেয়। ঐ সময় উম্মাহাতুল মু'মিনীন তাঁদের আরজি জানানোর জন্য 'উসমান (রা.)-কে খালীফার কাছে প্রেরণ করেন।[১০০] আবূ বাকর (রা.)-এর নিকট 'উসমান (রা.) অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য ছিলেন বলেই উম্মাহাতুল মু'মিনীন তাঁকে বাছাই করেন।

আবূ বাক্র (রা.) মৃত্যুর পূর্বে টানা পনের দিন জ্বরে আক্রান্ত ছিলেন; এই সময় সাহাবীগণ তাঁর খোঁজ-খবর নিতেন, সেবাযত্ন করতেন। আবূ বাকর-তনয়া 'আয়িশা (রা.) বলেন, মৃত্যু রোগে 'উসমান (রা.)-ই সবচেয়ে বেশি দেখভাল করেছেন আবূ বাকর (রা.)-এর।[১০১]

খ. আবূ বাক্র (রা.)-এর সচিব:

আবূ বাকর (রা.)-এর সচিব বা কাতিব ছিলেন 'উসমান (রা.)।[১০২] কাতিব হওয়ার জন্য লিখতে ও পড়তে পারার যোগ্যতার প্রয়োজন ছিল। জাহিলী ও ইসলামের প্রাথমিক যুগে লেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যা ছিল খুব কম। কারণ আরবরা ছিল বাগ্মী জাতি, তারা স্মরণশক্তির ওপর ভরসা করত, তারা মনে করত যাদের স্মরণশক্তি কম

---

৯৮. কানযুল 'উম্মাল, ৫:৬২০।
৯৯. ইবনুল আছীর, আল-কামিল, ২:৭৯।
১০০. আয-যাহাবী, ৩:২৫।
১০১. প্রাগুক্ত, ৩:১০।
১০২. প্রাগুক্ত, ৩:১৪।

তারাই কেবল লিখে রাখে। সেই যুগে হাতেগোনা যে ক'জন মানুষ লেখাপড়া জানত 'উসমান (রা.) ছিলেন তাঁদের একজন। তাছাড়া 'উসমান (রা.) অত্যন্ত বিশ্বস্ত হওয়ায় আবূ বাক্‌র (রা.) তাঁর ওপর কাতিবের দায়িত্ব অর্পণ করেন। খালীফার ডিক্টেশন অনুযায়ী তিনি বিভিন্ন ফরমান লিখে প্রদেশসমূহে প্রেরণ করতেন।

আবূ বাক্‌র (রা.) অসুস্থ হয়ে পড়লে শীর্ষস্থানীয় সাহাবায়ে কিরামের সাথে পরামর্শ করে 'উমার (রা.)-কে পরবর্তী খালীফা নিয়োগ করেন। 'উমার (রা.)-কে খালীফা নিয়োগ দিয়ে আবূ বাকর যে ফরমান জারি করেছিলেন সেটি 'উসমান (রা.) স্বহস্তে লিখেছিলেন:

> بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما عهد أبو بكر ابن قحافة في آخر عهده بالدنيا خارجا منها، وعند أول عهده بالآخرة داخلا فيه، حيث يؤمن الكافر، ويوقن الفاجر، ويصدق الكاذب، إني استخلفت عليكم بعدي عمر بن الخطاب فاستمعوا له وأطيعوا، وإني لم آلُ الله ورسوله ودينه ونفسي وإياكم خيرا، فإن عدل فذلك ظني به وعلمي فيه، وإن بدل فلكل امرئ ما اكتسب، والخير أدرت ولا أعلم الغيب وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُوْنَ
>
> বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম! আবূ বাক্‌র ইবনু আবি কুহাফা দুনিয়ায় তার সর্বশেষ সময়ে এবং আখিরাতের প্রবেশের প্রাক্কালে এই প্রতিশ্রুতি নিচ্ছেন - এটি এমন এক সময় যখন কাফির বিশ্বাসী হয়, পাপী বিশ্বাস স্থাপন করে, মিথ্যাবাদী সত্য কথা বলে- আমার পরে তোমাদের খালীফা হিসেবে আমি 'উমার ইবনুল খাত্তাবকে নিয়োগ দিচ্ছি। ....আমি জানি সে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করে থাকে, আমার ধারণা ভবিষ্যতেও সে তাই করবে। কিন্তু সে যদি পাল্টে যায় তবে তার অর্জন সে-ই বহন করবে। এই নিয়োগের মাধ্যমে আমি কল্যাণই কামনা করেছি, অদৃশ্যের জ্ঞান নেই আমার। 'অত্যাচারীরা শিগগিরই জানবে কোন স্থলে তারা প্রত্যাবর্তন করবে।[১০৩]

গ. আবূ বাকর (রা.)-এর প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন:

ইতোপূর্বে আমরা দেখেছি বিভিন্ন সময় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাদীনার বাইরে গেলে 'উসমান (রা.)-কে স্থলাভিষিক্ত করতেন। আবূ বাকর (রা.)-এর আমলেও 'উসমান (রা.) অনুরূপ দায়িত্ব পালন করেছেন। হিজরী দ্বাদশ সনে আবূ বাক্‌র (রা.) আমীরুল হাজ্জ হিসেবে মাক্কা গমন করেন। ঐ সময় খালীফার স্থলাভিষিক্ত হিসেবে মাদীনায় 'উসমান (রা.) দায়িত্ব পালন করেন।[১০৪]

---

১০৩. আয-যাহাবী, ৩:১১।
১০৪. ইবনু সা'দ, ৩:১৮৭।

ঘঃ আবূ বাক্‌র (র)-এর আমলে অর্থনৈতিক সঙ্কট ও 'উসমান (রা.)-এর বদান্যতা

ইবনু আব্‌বাস (রা.) হতে বর্ণিত, আবূ বাক্‌র (রা.)-এর আমলে একবার অনাবৃষ্টি হল। লোকজন খালীফার কাছে এসে বললঃ 'আকাশে বৃষ্টি নেই, জমিনে ফসল নেই, আর মানুষ নিদারুণ কষ্টে দিনাতিপাত করছে।' আবূ বাক্‌র (রা.) বললেন, 'তোমরা ফিরে যাও, ধৈর্য ধারণ কর। আল্লাহর কাছে দু'আ করি তিনি যেন সত্বর এই সঙ্কট দূর করেন।' রাবী বলেন, অল্পদিনের মধ্যেই সিরিয়া হতে 'উসমান (রা.)-এর খাদ্যবাহী শত উষ্ট্রের কাফিলা এল। ব্যবসায়ী দল 'উসমান (রা.)-এর দরজায় একত্রিত হয়ে কড়া নাড়তে লাগল। 'উসমান (রা.) দরজা খুলেই দেখলেন তাঁর দোরে এক দঙ্গল মানুষ। তিনি তাদেরকে বললেন, 'তোমরা কি চাও?' তারা বলল, 'আকাশ বৃষ্টিহীন, জমিন ফসলহীন আর মানুষের দারুণ কষ্ট। আমরা জানতে পেরেছি আপনার কাছে অনেক খাদ্যদ্রব্য আছে। ওগুলো আমাদের কাছে বিক্রি করে দিন যাতে আমরা মাদীনার দরিদ্রদের মাঝে তা বিলিয়ে দিতে পারি।' 'উসমান (রা.) বললেন, 'তোমরা সসম্মানে এসো, দেখেশুনে কিনো।' ব্যবসায়ী দল 'উসমান (রা.)-এর ঘরে প্রবেশ করেই স্তূপাকারে সজ্জিত খাদ্যশস্য দেখতে পেল। 'উসমান (রা.) বললেন, 'শামী খাদ্যশস্য কেনার ক্ষেত্রে তোমরা আমাকে কত লাভ দেবে?' তারা বলল, 'দশ দিরহামে বারো দিরহাম?' 'উসমান (রা.), 'কেউ আরো বেশি দিতে চায়।' তারা বলল, 'দশে পনর?' 'উসমান (রা.) বললেন, 'আরো বেশি!' ব্যবসায়ীরা বলল, 'আবূ 'আমর! মাদীনায় আমরা ছাড়া অন্য কোন ব্যবসায়ী নেই। কে আপনাকে আরো বেশি দেবে?' 'উসমান (রা.) বললেন, 'আল্লাহ আমাকে আরো বাড়িয়ে দেবেন, তিনি এক দিরহামের বিনিময়ে দশ দিরহাম দেবেন। তোমরা কি আরো বেশি দিতে রাজী?' ব্যবসায়ীরা বলল, 'না।' 'উসমান (রা.) বললেন, 'আল্লাহ্‌কে সাক্ষী রেখে বলছি, আমি এই খাদ্যদ্রব্য দরিদ্র মুসলিমদের জন্য সাদাকাহ করে দিলাম।'[১০৫] ইবনু 'আব্বাস (রা.) বলেন, সেই রাতে আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে স্বপ্নে দেখলাম। তিনি একটি শ্বেত-কৃষ্ণ বাহনে বসে আছেন। তাঁর গায়ে একটি আলোর পোশাক, পায়ে আলোর জুতো, হাতে আলোর দণ্ড, হন্তদন্ত হয়ে ছুটে যাচ্ছেন। আমি বললাম, 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আপনার কথা শুনার জন্য আমি কতইনা ব্যাকুল হয়ে আছি। আপনি এভাবে কোথায় যাচ্ছেন?' জবাবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

يابن عباس! إن عثمان قد تصدق بصدقة، وإن الله قد قبلها منه وزوجه عروسا في الجنة، وقد دعينا إلى عرسه.

---

১০৫. ইবনু কুদামা, আর-রিক্কাহ ওয়াল বুকাহ, পৃ. ১৯০।

> হে 'ইবনু 'আব্বাস! 'উসমান এক মহান সাদাকাহ করেছে। আর আল্লাহ্ তা কবুল করেছেন এবং জান্নাতের এক পাত্রীর সাথে তাঁর বিয়ে দিয়েছেন, আমাদেরকে তাঁর বিয়ের ভোজে দাওয়াত দেওয়া হয়েছে।[১০৬]

'উসমান (রা.)-এর অনেক সাদাকাহর একটি দৃষ্টান্ত হল এটি। সৃষ্টিকুলের প্রতি দয়ার্দ্র মানুষের একজন হলেন 'উসমান। দানশীলতা ও দয়ার এই শিক্ষা 'উসমান (রা.) পেয়েছেন আলকুরআন থেকে। তিনি কুরআনের এই আয়াত অধ্যয়ন করে অবাধ্যতা থেকে নিরস্ত হন: كَلاَّ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى 'বস্তুত মানুষ তো সীমালঙ্ঘন করেই থাকে (আলকুরআন ৯৬:৬)।' আল-কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত থেকেও তিনি শিক্ষা নিয়ে স্ববিরোধিতামুক্ত হন :

أَتَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ،

> তোমরা কি মানুষকে সৎকার্যের নির্দেশ দাও, আর নিজেদেরকে বিস্মৃত হও? অথচ তোমরা কিতাব অধ্যয়ন কর। তবে কি তোমরা বুঝ না? [আলকুরআন ২:৪৪]।

নিম্নোক্ত আয়াতটিও 'উসমান (রা.)-এর ওপর প্রভাব বিস্তার করে থাকবে:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَــكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ وَالصَّابِرِيْنَ فِي الْبَأْسَاءِ والضَّرَّاءِ وَحِيْنَ الْبَأْسِ أُولَــئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَأُولَــئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ،

> পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোতে কোন পুণ্য নেই; কিন্তু পুণ্য আছে কেউ আল্লাহ, আখিরাত, ফেরেশতাগণ, সমস্ত কিতাব এবং নবীগণের প্রতি ঈমান আনয়নে এবং আল্লাহ-প্রেমে আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, পর্যটক, সাহায্যপ্রার্থীগণকে এবং দাসমুক্তির জন্য অর্থ দান করায়, সালাত কায়েম ও যাকাত প্রদান করায় এবং প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা পূর্ণ করায়, অর্থ-সংকটে, দুঃখ-ক্লেশে ও সংগ্রাম-সংকটে ধৈর্য ধারণ করায় [আলকুরআন ২:১৭৭]।

উপর্যুক্ত আয়াত অনুসারে আমল করে 'উসমান (রা.) আলকুরআনের ঘোষণার উপযুক্ততা অর্জন করেন:

أُولَــئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَأُولَــئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ،

এরাই তারা যারা সত্যপরায়ণ এবং এরাই মুত্তাকী [আলকুরআন ২:১৭৭]।

---

১০৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০।

দুই. 'উমার (রা.)-এর যুগে 'উসমান (রা.)-এর ভূমিকাঃ

দ্বিতীয় খালীফা 'উমার (রা.)-এর কাছে 'উসমান (রা.)-এর বিরাট মর্যাদা ছিল। লোকেরা 'উমার (রা.)-এর কাছে কোন আরজি পেশ করতে চাইলে 'উসমান অথবা আবদুর রহমান ইবনু 'আউফ (রা.)-কে মধ্যস্থ হিসেবে ধরতেন। এ দু'জন রাজি না হলে বা কোন কাজ সম্পাদনে ব্যর্থ হলে তারা 'আব্বাস (রা.)-কে মধ্যস্থ বানাতেন। 'উসমান (রা.)-কে রাদীফ বলা হত। কোন লোকের পেছনে যিনি আসেন বা বাহনের পিঠে আসল সওয়ারীর পেছনে যে বসে তাকে রাদীফ বলা হত। শীর্ষ নেতাদের দ্বিতীয়জনকেও রাদীফ বলা হত।[১০৭]

'উমার (রা.)-এর খিলাফাতকালে 'উসমান (রা.)-এর স্থান ছিল খালীফার কাছে 'উজিরের ন্যায়। অথবা এভাবেও বলা যায়, আবূ বাক্র (রা.)-এর খিলাফাতকালে 'উমার (রা.) যে মর্যাদায় আসীন ছিলেন 'উমার (রা.)-এর খিলাফাতকালে 'উসমান (রা.)ও সেই মর্যাদায় অভিষিক্ত ছিলেন। অন্য কথায় বলা যায়, আবূ বাক্র (রা.)-এর খিলাফাতকালে 'উমার (রা.) যে ভূমিকা পালন করেছেন 'উমার (রা.)-এর খিলাফাতকালে 'উসমান (রা.) সেই ভূমিকাই পালন করেছেন। আবূ বাক্র (রা.) সাধারণভাবে প্রজাসাধারণের প্রতি এবং বিশেষভাবে মুসলিমদের প্রতি অত্যন্ত দয়ার্দ্র ছিলেন। আবার সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে 'উমার (রা.) ছিলেন অত্যন্ত কঠোর। আল্লাহ আবূ বাক্র (রা.)-এর দয়ার সাথে 'উমার (রা.)-এর কঠোরতার মিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন। এই দুয়ের সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সত্য ও ন্যায়ের শাসন।

দয়া ও কোমলতায় 'উসমান (রা.), আবূ বাক্র (রা.)-এর অনুরূপ ছিলেন। অন্যদিকে 'উমার (রা.) ছিলেন সত্য ও ন্যায়ের পথে কঠোর ও নিরাপোষ। আবূ বাক্র (রা.)-এর পর 'উমার (রা.) যখন খালীফা হলেন তখন আবূ বাক্র (রা.)-এর দয়ার বিপরীতে 'উসমান (রা–)-এর দয়া ও কোমলতাকে আল্লাহ্ তা'আলা 'উমার (রা.)-এর সাথী করে দিলেন। এই দুয়ের সংমিশ্রণে সর্বাধিক প্রাজ্ঞ ও ন্যায়নিষ্ঠ শাসনব্যবস্থ্যা প্রবর্তিত হল। 'উমার (রা.)-এর শাসনামলে 'উসমান (রা.)-এর এই অবস্থানের স্বীকৃতি জনগণ দিয়েছে। কোন কোন বর্ণনা মতে দিওয়ান প্রতিষ্ঠা ও হিজরী সন প্রবর্তনের পরামর্শ 'উসমান (রা.)-ই দিয়েছিলেন।

কঃ দিওয়ানঃ

'উমার (রা.)-এর আমলে বিজয়াধিক্যের কারণে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রচুর সম্পদ জমা হয়। এই সম্পদ ব্যবস্থাপনার বিষয়ে পরামর্শ করার জন্য 'উমার (রা.) একদল সাহাবীকে ডাকলেন। এ বিষয়ে 'উসমানের (রা.) পরামর্শ ছিল নিম্নরূপঃ

---

১০৭. আত-তাবারী, ৪: ৮৩।

أرى مالا كثيرا يسع الناس، وإن لم يُحصوا حتى يعرف من أخذ منهم ممن لم يأخذ خشيت أن ينتشر الأمر

আমি প্রভূত সম্পদ দেখতে পাচ্ছি যা মানুষের জন্য পর্যাপ্ত। কার কাছ থেকে সম্পদ নেয়া হল আর কাকে দেওয়া হল তার সঠিক পরিসংখ্যান রাখা না হলে পুরো ব্যাপারটি নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়বে বলে আমি আশঙ্কা করছি।

'উমার (রা.), 'উসমান (রা.)-এর পরামর্শ গ্রহণ করে সম্পদের সঠিক হিসাব রাখার জন্য দিওয়ান প্রতিষ্ঠা করলেন।[১০৮]

খঃ হিজরী সনের প্রবর্তনঃ

কোন কোন বর্ণনায় পাওয়া যায় হিজরী সনের প্রবর্তনের বিষয়ে 'উসমান (রা.)-এর পরামর্শ ভূমিকা রেখেছিল। সাহাবীদের পরামর্শক্রমে 'উমার (রা.) এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, হিজরাতের সন থেকে ইসলামী ক্যালেন্ডারের সূচনা হবে। কোন্ মাসকে প্রথম মাস বলে গণ্য করা হবে- এ প্রশ্নে নানা মতের উদ্ভব হয়। তখন 'উসমান (রা.) পরামর্শ দিয়ে বললেন, 'মুহাররমকে প্রথম মাস হিসেবে নির্ধারণ করা হোক; এটি একটি হারাম মাস, গণনার ক্ষেত্রে এটি প্রথম মাস আর এই মাসেই হাজ্জযাত্রীরা ফিরে আসে।' 'উমার (রা.) ও উপস্থিত সবাই 'উসমান (রা.)-এর এ পরামর্শ গ্রহণ করলেন। মুহাররম হিজরী সনের প্রথম মাস হিসেবে নির্ধারিত হল।[১০৯]

গ. খারাজী ভূমিঃ

বিজিত অঞ্চলের ভূমি বিজয়ী সৈনিকদের মাঝে বণ্টন না করে সাধারণ মুসলিম ও তাদের বংশধরদের জন্য রেখে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন 'উমার (রা.)। 'উসমান (রা.), 'উমার (রা.)-এর এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করেন।[১১০]

ঘঃ উম্মুল মু'মিনীনদের সাথে 'উসমান (রা.)-এর হাজ্জ আদায়ঃ

হিজরী ২৩ সনে 'উমার (রা.), রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্ত্রীগণকে হাজ্জ করার অনুমতি দেন। এই সফরে তাঁদের সাথে 'উসমান (রা.) ও আবদুর রহমান ইবনু 'আউফ (রা.)-কে প্রেরণ করা হয়। নবীপত্নিগণ হাওদায় আরোহন করে হাজ্জযাত্রা করেছিলেন। তাঁদের সাওয়ারীগুলোর সামনে ছিলেন 'উসমান (রা.) আর পেছনে ছিলেন আবদুর রহমান ইবনু 'আউফ (রা.)। এই দুই বিশিষ্ট সাহাবী তাঁদের সাথে থাকায় কেউ তাঁদের কাছে ঘেঁষতে পারেনি।[১১১]

---

১০৮. আল-বালাযূরী, ৪৪৯।
১০৯. সাদিক 'উরজূন, ৯০।
১১০. আস-সিয়াসাতুল মালিয়্যা লি 'উসমান, ২৫।
১১১. ইবনু সা'দ, ৩:১৩৪।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

'উসমান (রা.) সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাণী

এক. 'উসমান (রা.) ও অন্যদের ফযীলত বর্ণনাকারী হাদীসসমূহ

কঃ 'উসমান (এর)-এর ওপর আপতিত বিপদ সত্ত্বেও তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও'

আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা.) সংবাদ দিচ্ছেন যে, একদিন তিনি নিজ ঘরে ওযু করে বের হলেন আর মনে মনে বললেন, আজ সারাদিন আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে থাকব। তারপর তিনি মাসজিদে নববীতে এসে লোকজনের কাছে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে জানতে চাইলেন। তারা বললো, তিনি বের হয়ে ওদিকে গেছেন। আবূ মূসা বলেন, আমি তাঁর সন্ধান নিতে নিতে এগিয়ে গেলাম। একসময় দেখলাম রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রাচীরঘেরা আরীস কূপের এলাকায় প্রবেশ করলেন। আমি খেজুর ডালায় তৈরী তোরণের কাছে বসলাম। প্রয়োজন সেরে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওযু করলেন। তাঁর কাছে এগিয়ে যেতেই দেখলাম তিনি আরীস কূপের ঘাটলার ঠিক মাঝখানে বসে জঙ্ঘার ওপরে কাপড় তুলে পা দু'টি পানিতে ডুবিয়ে দিলেন। আমি তাকে সালাম দিয়ে বাগানের ফটকের কাছে গিয়ে বসলাম। মনে মনে বললাম, আজ সারাদিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দারোয়ান হিসেবে দায়িত্ব পালন করব। কিছুক্ষণ পর আবু বাক্র (রা.) এসে দরজায় আঘাত করলেন। আমি তাকে বললাম, 'একটু থামুন।' তারপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে গিয়ে বললাম, আবু বাকর (রা.) প্রবেশের অনুমতি চাইছেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 'আসতে দাও আর তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও।' আমি ফটকের কাছে গিয়ে আবু বাকর (রা.)-কে বললাম, 'আসুন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আপনাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছেন।' আবু বাকর (রা.) গিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ডান পাশে ঘাটলায় বসলেন আর জঙ্ঘার ওপরে কাপড় তুলে পা দু'টি পানিতে ডুবিয়ে দিলেন। আমি আবার ফটকের কাছে গিয়ে বসলাম। কিছুক্ষণ পর আরেক লোক কড়া নাড়ল। আমি বললাম, কে? উত্তর এল, "উমার ইবনুল খাত্তাব।' আমি বললাম। 'একটু থামুন।' তারপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে গিয়ে তাঁকে সালাম দিয়ে বললাম, 'উমার (রা.) প্রবেশের অনুমতি চাচ্ছেন।' রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 'আসতে দাও আর তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও।' আমি উমার (রা.)-এর কাছে গিয়ে বললাম, আপনাকে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়েছে আর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি

ওয়া সাল্লাম) আপনাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছেন। 'উমার (রা.), রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-বামে ঘাটলায় গিয়ে বসলেন আর পানিতে পা ডুবিয়ে দিলেন। আমি আবার ফটকের কাছে ফিরে গেলাম। কিছুক্ষণ পর তৃতীয় একজন এসে ফটকে নাড়া দিল। আমি বললাম, 'কে?' জবাব এল, 'আমি 'উসমান ইবনু 'আফ্‌ফান।' আমি বললাম, 'একটু থামুন।' তারপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে গিয়ে সংবাদ দিলাম। তিনি বললেন,

ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه

তাকে প্রবেশের অনুমতি দাও আর তার ওপর আপতিত বিপদ সত্ত্বেও তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও।

তারপর আমি গিয়ে 'উসমানকে বললাম, 'আসুন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আপনাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছেন যদিও আপনার ওপর দুর্যোগ নেমে আসবে।' 'উসমান (রা.) প্রবেশ করে দেখলেন আসন পূর্ণ হয়ে গেছে। তিনি অপর পাশে গিয়ে তাঁদের মুখোমুখি হয়ে বসলেন।

সা'ঈদ ইবনুল মুসায়্যিব বলেন, আমরা এই দৃশ্যের ব্যাখ্যা 'কবর' দিয়ে করতাম। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম), আবু বাক্‌র (রা.) ও 'উমার (রা.) একই স্থানে কবরস্থ হয়েছেন। আর 'উসমান (রা.) কবরস্থ হয়েছেন অনেক দূরে বাকী'তে।[১১২]

এই হাদীসে উল্লেখিত তিন সম্মানিত সাহাবীর ফযীলত বর্ণিত হয়েছে: আবু বাকর, 'উমার ও 'উসমান (রা.)। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মু'জিযাও প্রকাশ পেয়েছে এই হাদীসে। 'উসমান (রা.)-এর আপতিত বিপদ সম্পর্কে তিনি পূর্বেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। এই হাদীসে এই ইঙ্গিতও রয়েছে যে এই তিন মহান সাহাবী ঈমান ও হিদায়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবেন।

খ:'শান্ত হও উহুদ! তোমার ওপর এক নাবী, এক ছিদ্দিক দুই শহীদ ছাড়া কেউ নেই':

আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম), আবু বাক্‌র, 'উমার ও 'উসমান (রা.) উহুদ পাহাড়ে ওঠলেন। পাহাড়টি হঠাৎ কেঁপে ওঠল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

اسكن أحد—اظنه ضربه برجله— فليس عليك إلا نبي وصديق وشهيدان

'শান্ত হও উহুদ!' রাবী বলেন, আমার ধারণা তিনি পা দিয়ে আঘাত করলেন। 'তোমার ওপর এক নাবী, এক ছিদ্দিক ও দুই শহীদ ছাড়া কেউ নেই।'[১১৩]

---

১১২. সহীহ মুসলিম, কিতাবু ফাদাইলিস সাহাবাহ: বাব মিন ফাদাইলি 'উসমান ইবনু 'আফফান, ৪:১৭৩-৭৪, (টীকাসহ)।

১১৩. সহীহুল বুখারী, কিতাবুল মানাকিব, বাবু মানাকিবি 'উমার ইবনিল খাত্তাব, ২:২৬৫।

গঃ 'শান্ত হও। তোমার ওপর নাবী, ছিদ্দিক ও শহীদ ছাড়া কেউ নেই':

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে আবু বাক্‌র, 'উমার, 'উসমান, 'আলী, তালহা ও যুবাইর (রা.) হেরা পর্বতের ওপর ছিলেন। এমন সময় পাথরখণ্ড কেঁপে ওঠল। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

اهدأ فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد

স্থির হও! তোমার ওপর নাবী, ছিদ্দিক ও শহীদ ছাড়া কেউ নেই।[১১৪]

ঘঃ 'উসমান (রা.)-এর লজ্জাশীলতাঃ

সা'ঈদ ইবনুল 'আস বলেন, নবীপত্নি আয়িশা (রা.) 'উসমান (রা.) সম্পর্কিত একটি হাদীস বর্ণনা করে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বীয় বিছানায় আয়িশা (রা.)-এর চাদর গায়ে শায়িত ছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি আবু বাকর (রা.)-কে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। তিনি প্রয়োজন শেষে চলে গেলেন। তারপর 'উমার (রা.) অনুমতি চাইলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেই অবস্থায় তাঁকে অনুমতি দিলেন। তিনিও প্রয়োজন শেষে চলে গেলেন। 'উসমান (রা.) বলেন, তারপর আমি অনুমতি চাইলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওঠে বসলেন এবং 'আয়িশা (রা.) কে বললেন, 'তুমি কাপড় ঠিকঠাক করে নাও।' তারপর আমি প্রয়োজন শেষে চলে এলাম। অতঃপর 'আয়িশা (রা.) বলেন, হে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! 'উসমান (রা.)-এর আগমনে আপনি যেমন তটস্থ হলেন আবু বাক্‌র ও 'উমার (রা.) এর আগমনে তেমন হলেন না কেন?' রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

إن عثمان رجل حيي، وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحال، أن لا يبلغ إلي في حاجته

'উসমান লাজনম্র ব্যক্তি; আমার আশঙ্কা ছিল ঐ অবস্থায় আমি তাকে অনুমতি দিলে সে প্রয়োজন পূরণে আমার কাছে আসত না।[১১৫]

ঙঃ 'উসমান (রা.)-কে দেখে ফেরেশতারাও লজ্জা পায়ঃ

নবীপত্নি আয়িশা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার ঘরে এলোগোছে শুয়ে ছিলেন, তাঁর জঙ্ঘাদ্বয় উন্মুক্ত ছিল। এমন সময় আবু বাক্‌র (রা.) প্রবেশের অনুমতি চাইলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঐ

---

১১৪. সহীহ মুসলিম, কিতাবু ফাদাইলিস সাহাবাহঃ বাব মিন ফাদাইলি তালহা ওয়ায্‌ যুবাইর (রা.), ৪:১৮২।

১১৫. সহীহ মুসলিম, কিতাবু ফাদাইলিস সাহাবাহঃ বাব মিন ফাদাইলি 'উসমান ইবনু 'আফফান, ৪:১৭১-৭২।

অবস্থায় শুয়ে থেকে তাকে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। কথাবার্তা শেষে আবু বাকর (রা.) চলে গেলেন। তারপর 'উমার (রা.) প্রবেশের অনুমতি চাইলে তিনি ঐ একই অবস্থায় শুয়ে তাকে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। 'উমারও (রা.) কথাবার্তা শেষে চলে গেলেন। তারপর 'উসমান (রা.) অনুমতি চাইলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাপড়চোপড় ঠিকঠাক করে ওঠে বসলেন। তিনি এসে কথাবার্তা বলে চলে গেলেন। অতঃপর 'আয়িশা (রা.) বললেন, 'আবু বাক্‌র (রা.) এলেন, 'উমার (রা.) এলেন, আপনি তেমন গুরুত্ব দিলেন না। কিন্তু 'উসমান (রা.) যখনই আসলেন তখনই আপনি ওঠে বসলেন ও কাপড়চোপড় ঠিকঠাক করেন নিলেন!? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة

যে ব্যক্তিকে দেখে ফেরেশতারা লজ্জা পায় আমি কি তাকে দেখে লজ্জা পাব না?[১১৬]

চ: 'আমার উম্মাতের মাঝে লজ্জাশীলতায় সবচাইতে সত্যবাদী হলেন 'উসমান':

আনাস ইবনু মালিক (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

أرحم أمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر وأصدقها حياء عثمان وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأقرأها لكتاب الله أبيّ، وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح

আমার উম্মাতের মাঝে সবচাইতে দয়াবান হল আবু বাক্‌র (রা.), আল্লাহর দীনের ব্যাপারে সবচাইতে কঠোর হল 'উমার (রা.), লজ্জাশীলতায় সবচাইতে সত্যবাদী হল 'উসমান (রা.), হালাল-হারাম বিষয়ে সবচাইতে জ্ঞানী হল মু'আয ইবনু জাবাল (রা.), আল্লাহর কিতাবের সবচাইতে বিশুদ্ধ তিলাওয়াতকারী হল উবাই ইবনু কা'ব (রা.), ফারাইদ বিষয়ে সবচাইতে বড় পণ্ডিত হল যায়িদ ইবনু সাবিত (রা.), প্রত্যেক উম্মাতে একজন করে আমীন (বিশ্বস্ত ব্যক্তি) থাকে। আমার উম্মাতের আমীন হল আবু 'উবাইদা ইবনুল জার্‌রাহ (রা.)।[১১৭]

দুই. 'উসমান (রা.)-এর শাহাদাত সম্পর্কে রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ভবিষ্যদ্বাণী:

ক: যে তিনটি ফিতনা থেকে মুক্তি পেল সে সত্যিই মুক্তি পেল:

'আবদুল্লাহ ইবনু হাওয়ালা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

---

১১৬. প্রাগুক্ত, ২:১৭১।
১১৭. মুসনাদুল ইমাম আহমাদ, বাকিয়ু কিতাবি মুসনাদিল মুকসিরীন, বাবু মুসনাদি আনাস ইবনু মালিক।

من نجا من ثلاث فقد نجا– ثلاث مرات–موتي، والدجال، وقتل خليفة مصطبر بالحق معطيه

যে তিনটি ফিতনা থেকে মুক্তি পেল সে আসলেই মুক্তি পেল-তিনবার বললেন- মৃত্যুর ফিতনা, দাজ্জালের ফিতনা ও সত্যনিষ্ঠ খালীফাকে হত্যা করার ফিতনা।[১১৮]

যে সত্যনিষ্ঠ খালীফা ধৈর্যের সাথে শাহাদাতবরণ করেছেন তিনি 'উসমান (রা.), আর কেউ নন। এ হাদীসে 'উসমান (রা.) হত্যার সাথে সরাসরি ও পরোক্ষভাবে জড়িত না থাকার ইঙ্গিতমূলক নির্দেশনা রয়েছে। যারা তাঁকে হত্যা করেছিল বা হত্যা করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল তারা তাঁর হত্যার ফিতনায় সরাসরি জড়িত ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর যারা অন্যায়ভাবে সে ফিতনা বিষয়ে আলোচনা করবে তারাও যেন পরোক্ষভাবে ফিতনায় জড়িত হবে।

খঃ 'সেইদিন এই তুষ্ট বান্দা নিহত হবে':

ইবনু 'উমার (রা.)-হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক ফিতনার বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন,

يقتل فيها هذا المقنع يومئذ مظلوما

সেইদিন এই তুষ্ট বান্দাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হবে।

তিনি বলেন, ইঙ্গিতকৃত ব্যক্তির দিকে তাকিয়ে আমি 'উসমান ইবনু 'আফফান (রা.)-কে দেখতে পেলাম।[১১৯]

গঃ 'এই ব্যক্তি সেই দিন হিদায়াতের ওপর থাকবে':

কা'ব ইবনু 'উজরাহ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক ফিতনার বিষয়ে আলোচনা করলেন। হঠাৎ এক লোক পাশ দিয়ে চলে গেল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

هذا يومئذ على الهدى

এই ব্যক্তি সেইদিন হিদায়াতের ওপর থাকবে।

আমি ঝট করে ওঠে 'উসমান (রা.)-এর দু'বাহু ধরে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দিকে ফিরে বললাম, 'এই কি সেই?' তিনি বললেন, হ্যাঁ।[১২০]

---

১১৮. আল-মুসনাদ ৪:৪১৯।

১১৯. আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু হাম্বল, ফাদাইলুস সাহাবাহ (দার ইবনিল জাওযী ১৯৯৯), ১:৫৫১, সনদ সহীহ।

১২০. আল-আলবানী, সহীহ সুনানু ইবনু মাজাহ (রিয়াদঃ মাকতাবুত-তারবিয়্যাহ আল-আরাবী ১৯৮৮), ১:২৪।

ঘঃ 'আঁকড়ার ন্যায় ফিতনার আগুন দাউদাউ করে জ্বলবে, এই ব্যক্তি ও তার সহযাত্রীরা সত্যের ওপর থাকবে':

বাহায বলেন, একদা আলোচনাকালে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন:

تهيج فتنة كالصياصي، فهذا ومن معه على الحق

আঁকড়ার ন্যায় ফিতনার আগুন জ্বলবে, এই ব্যক্তি ও তার সহযাত্রীরা সত্যের ওপর থাকবে।

আমি ইশারাকৃত লোকটির জামা ধরে ফেললাম, দেখলাম 'উসমান ইবনু 'আফ্ফান (রা.)।[১২১]

ঙঃ 'এই ব্যক্তি ও তার সাথীরা সেইদিন সত্য ও হিদায়াতের ওপর থাকবে':

আবুল আশ'আস বলেন, মু'আবিয়া (রা.)-এর শাসনকালে ইলিয়ায় (জেরুসালেমে) কয়েকজন বক্তা বক্তব্য রাখছিলেন। সর্বশেষে বক্তা ছিলেন মুররা ইবনু কা'ব। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাদীস না শুনলে আমি দাঁড়াতাম না। আমি তাঁকে একটি নিকটবর্তী ফিতনা সম্পর্কে আলোচনা করতে শুনেছি। এক পর্যায়ে একজন মুখঢাকা লোক পাশ দিয়ে অতিক্রম করল। তখন তিনি বললেন,

هذا يومئذ وأصحابه على الحق والهدى

সেইদিন এই ব্যক্তি ও তার সাথীরা সত্য ও হিদায়াতের ওপর থাকবে।

আমি লোকটিকে ধরে তাঁর মুখ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দিকে ঘুরিয়ে বললাম: 'ইনিই কি?' রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 'হ্যাঁ'। দেখা গেল লোকটি 'উসমান ইবনু 'আফ্ফান (রা.)।[১২২]

চঃ 'তোমরা আল-আমীন ও তার সাথীদেরকে আঁকড়ে ধরো':

আবু হাবীবা হতে বর্ণিত, 'উসমান (রা.)-এর গৃহবন্দীত্বকালে তিনি তাঁর ঘরে প্রবেশ করেছিলেন। ওই সময় তিনি আবু হুরাইরা (রা.)-কে 'উসমান (রা.)-এর অনুমতি নিয়ে কথা বলতে দেখেন। তিনি প্রথমেই আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করলেন। তারপর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে নিম্নোক্ত কথা বলতে শুনেছি:

إنكم تلقون بعدي فتنة اختلافا

তোমরা আমার মৃত্যুর পর অনেক ফিতনা ও মতভেদের সম্মুখীন হবে।

---

১২১. আল-মুসনাদ, ৫:৩৩, কয়েক সনদে বর্ণিত।
১২২. মুসনাদু আহমাদ, কিতাবু মুসনাদিশ শামিয়্যিন, বাবু হাদীসি কা'ব ইবনি মুররা আস-সুলামী।

একথা শুনে এক ব্যক্তি বলল, ‘তখন আমাদের জন্য কে থাকবে? জবাবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

عليكم بالأمين وأصحابه

তোমরা আল-আমীন ও তার সাথীদেরকে আঁকড়ে ধরো।

এখানে আল-আমীন বলতে ‘উসমানকে বুঝানো হয়েছে।[১২৩]

ছঃ ‘মুনাফিকরা তোমার জামা খুলে ফেলতে চাইলে তুমি খুলবে না’ঃ

‘আয়িশা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ‘উসমান (রা.) কে ডেকে পাঠালেন। পরে তিনিও তাঁর দিকে এগিয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে এগিয়ে যেতে দেখে আমরাও একে অপরের দিকে এগিয়ে গেলাম। এই সময় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সর্বশেষ বাণী ছিল এই যে, তিনি ‘উসমান (রা.)-এর কাঁধের মাঝে আঘাত করে বললেন,

يا عثمان!إن الله عسى أن يلبسك قميصا فإذا أرادك المنافقون على خلعه،
فلا تخلعه حتى تلقاني

‘উসমান, আল্লাহ তা’আলা তোমাকে শীঘ্রই একটি জামা পরিধান করাবেন। মুনাফিকরা তোমার কাছে সেটি খুলে ফেলার দাবি করলে তুমি আমার সাথে সাক্ষাৎ না হওয়া পর্যন্ত তা খুলবে না।[১২৪]

জঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার কাছ থেকে একটি বিষয়ে প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন, সে ব্যাপারে আমি আত্মসংযম প্রদর্শন করবঃ

আবূ সাহলা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আয়িশা (রা.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদিন বললেন, ‘আমার এক সাহাবীকে ডাকো।’ আমি বললাম, ‘আবু বাকর (রা.)-কে?’ তিনি বললেন, ‘না’। আমি বললাম, “উসমান (রা.) কে?’ তিনি বললেন, ‘হ্যাঁ।’ ‘উসমান (রা.) এলে তিনি আমাকে দূরে সরে যেতে বললেন। তারপর তিনি ‘উসমান (রা.)-এর সাথে গোপনে আলাপ করলেন। ‘উসমান (রা.)-এর চেহারার রং পাল্টে গেল। ফিতনার সময় ‘উসমান (রা.) যখন স্বগৃহে অবরুদ্ধ হয়ে পড়লেন তখন আমরা তাঁকে বললাম, ‘আমীরুল মু’মিনীন, আপনি কি আত্মরক্ষার জন্য বিদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধ করবেন না?’ জবাবে তিনি বললেন, ‘না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার কাছ থেকে একটি বিষয়ে প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন। সে প্রতিশ্রুতি পালনে আমি আত্মসংযম প্রদর্শন করব।’[১২৫]

---

১২৩. ফাদাইলুস সাহাবাহ, ১:৫৫০, সনদ সহীহ।
১২৪. মুসনাদু আহমাদ, বাকীয়ু মুসনাদিল আনসারী।
১২৫. ফাদাইলুস সাহাবাহ, ১:৬০৫। সনদ সহীহ।

'উসমান (রা.)-এর প্রতি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর গভীর ভালবাসা ও উম্মাহর জন্য তাঁর কল্যাণ কামনার প্রমাণ রয়েছে এই হাদীসে। 'উসমান (রা.)-কে তিনি ফিতনার অনেক বিষয়ে সংবাদ দেন। তিনি তা গোপনও রাখতে চেয়েছেন। এমনকি অবরুদ্ধ হওয়ার আগে 'উসমান (রা.)ও তা প্রকাশ করেননি।

'উসমান (রা.)-এর এ বক্তব্যে বুঝা যায়, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে ফিতনার সময় সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণের ব্যাপারে নির্দেশনা দিয়েছিলেন। কোন কোন বর্ণনায় ঐ গোপনীয়তার আরো কিছুটা বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম), 'উসমান (রা.)-কে বলেছিলেন, 'তারা যদি তোমার কাছে আল্লাহ প্রদত্ত জামা খোলার দাবি করে তুমি তাতে সাড়া দেবে না।'[১২৬] 'উসমান (রা.) এর বক্তব্য থেকে বুঝা যায়, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর কাছ থেকে যে প্রতিজ্ঞা নিয়েছিলেন তা হলো আত্মসংযম প্রদর্শন ও শক্তি প্রয়োগ না করা এবং পদত্যাগ না করার প্রতিজ্ঞা।

এসব বর্ণনা পাঠে অনুমিত হয় ফিতনা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'উসমানকে (রা.) অবহিত করার পাশাপাশি অনেক দিক-নির্দেশনাও দিয়েছিলেন, যা 'উসমান (রা.) ছাড়া কেউ জানতেন না। ফিতনার বিষয়ে তো তিনি প্রকাশ্যেই বলেছেন। কিন্তু ফিতনার সময়ে করণীয় সম্পর্কে অনেক নির্দেশনা তিনি গোপনে শুধু 'উসমান (রা.)-কেই জানিয়েছিলেন। বিষয়গুলো রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজে গোপন রাখতে চেয়েছিলেন। এজন্য তিনি 'আয়িশা (রা.) কে দূরে সরে যেতে বলেন। 'উসমানও (রা.) অবরুদ্ধ হয়ে শক্তি প্রয়োগে অনুরুদ্ধ হওয়ার আগে তা প্রকাশ করেননি। বিষয়গুলো গোপন রাখার পশ্চাতে নিশ্চয়ই কোন উদ্দেশ্য ছিল যা আমরা জানি না।

বিদ্রোহী দল কর্তৃক অবরুদ্ধ হয়ে 'উসমান (রা.) অস্ত্রধারণ করেননি? কেন তিনি শক্তিপ্রয়োগ করেননি? কেনইবা পদত্যাগ করেননি? এসব বিষয়ে গবেষকগণ অনেক কার্যকারণ উদ্ঘাটন করেছেন। কিন্তু আমাদের মনে হয় 'উসমান (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নির্দেশনা অনুসারেই সঙ্কটকালে কর্মনীতি নির্ধারণ করেছিলেন।

অন্য অনেক বিষয়ের মত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'উসমান (রা.) হত্যার ফিতনা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যা পরবর্তীতে অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, তিনি অদৃশ্যের (গায়েবের) জ্ঞান রাখতেন।

---

১২৬. প্রাগুক্ত, ১: ৬১৩। সহীহ সনদ।

গায়েবের জ্ঞানভাণ্ডারের একমাত্র মালিক তো আল্লাহ্। সেই ভাণ্ডার হতে আল্লাহ্ যা তাঁকে জানিয়েছেন তা-ই তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

قُلْ لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِيْ نَفْعًا وَّ لَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوْءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيْرٌ وَّ بَشِيْرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ ،

বল, 'আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত আমার নিজের ভাল-মন্দের উপরও আমার কোন অধিকার নেই। আমি যদি অদৃশ্যের খবর জানতাম তবে তো আমি প্রভূত কল্যাণই লাভ করতাম এবং কোন অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করত না। আমি তো শুধু মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা বৈ আর কিছু নই। (আলকুরআন ৭:১৮৮)।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ
'উসমান (রা.)-এর উল্লেখযোগ্য গুণাবলী

'উসমান (রা.) অনন্যসাধারণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। তাঁর ব্যক্তিত্বে আল্লাহ্‌ওয়ালা নেতৃত্বের সকল গুণাবলী বিদ্যমান ছিল। এখানে কয়েকটি গুণ সম্পর্কে সবিস্তারে আলোচনা করা হচ্ছে।

এক. জ্ঞান, শিক্ষা ও নির্দেশনা প্রদানে সক্ষমতাঃ

'উসমান (রা.)-কে শ্রেষ্ঠ সাহাবীগণের মধ্যে গণ্য করা হয় যারা আলকুরআন ও আস-সুন্নাহর জ্ঞানে সমৃদ্ধ ছিলেন। বিচার, অর্থ, প্রশাসন ও জিহাদসহ নানা বিষয়ে তাঁর ইজতিহাদী মতামত রয়েছে যার বিবরণ পরবর্তী পর্যায়ে উপস্থাপন করা হবে। তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম), আবূ বাকর (রা.) ও 'উমার (রা.) এর হিদায়াত বা দিক-নির্দেশনা অনুসরণে উদগ্রীব ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দিক-নির্দেশনা অনুসরণ বিষয়ে এখানে একটি ঘটনা উল্লেখ করা হচ্ছে। উরওয়াহ্ ইবনুয্ যুবাইর বর্ণনা করেছেন, 'উবাইদুল্লা ইবনু 'আদী ইবনিল খিয়ার তাকে ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন যে, মিসওয়ার ইবনু মাখরামা ও আবদুর রহমান ইবনুল আসওয়াদ ইবনু আবদি ইয়াগূস তাঁকে ('উবাইদুল্লাহকে) বললেন, 'তোমার মামার সাথে আল-ওয়ালীদ ইবনু 'উকবা সম্পর্কে কথা বলছ না কেন? অথচ তার (আল-ওয়ালীদের) কর্মকাণ্ড সম্পর্কে লোকজন অনেক কথা বলাবলি করছে।' 'উবাইদুল্লাহ বলেন, 'উসমান (রা.) যখন সালাত আদায়ে বের হলেন তখন আমি তাঁর গতিরোধ করে বললাম, 'আপনার কাছে আমার একটি প্রয়োজন আছে, সেটি অবশ্য উপদেশ বৈ কিছু নয়।' তিনি ('উসমান) বললেন, 'ওহে লোক, আমি তোমার ব্যাপারে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই।' তিনি একথা বললে আমি চলে গেলাম, সালাত শেষে আমি মিসওয়ার ও ইবনু আবদি ইয়াগূসের কাছে গিয়ে সব ঘটনা বললাম। তারা বলল, 'তোমার দায়িত্ব তুমি পালন করেছ।' আমরা ওঠার আগেই 'উসমান (রা.)-এর দূত এসে আমাকে বলল, 'আমীরুল মু'মিনীন আপনাকে ডেকেছেন।' 'উসমান (রা.)-এর কাছে গেলে তিনি আমাকে বললেন, 'একটু আগে তুমি আমাকে কোন নসীহতের কথা বলেছিলে?' উবাইদুল্লাহ বলেন, কালিমার সাক্ষ্য দিয়ে আমি বললাম, 'আল্লাহ্ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন, তাঁর ওপর কিতাব নাযিল করেছেন। আপনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন, তাঁর (রাসূলের) হিদায়াত স্বচক্ষে

প্রত্যক্ষ করেছেন, বর্তমানে মানুষ আল-ওয়ালীদ সম্পর্কে অনেক কথাবার্তা বলছে, আপনার উচিত এখনই তার (ওয়ালীদের) ওপর শাস্তি (হদ) প্রয়োগ করা।' একথা শুনে 'উসমান (রা.) বললেন, 'ভাগ্নে, তুমি কি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে পেয়েছিলে?' আমি বললাম, 'না, তবে তাঁর জ্ঞান আমার কাছে পৌঁছেছে।' তৎপর 'উসমান (রা.) কালিমার সাক্ষ্য দিয়ে বললেন, আল্লাহ্, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন, আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আহবানে সাড়া প্রদানকারীদের একজন ছিলাম, আমি দু'বার হিজরাত (হাবশা ও মাদীনায়) করেছি, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জামাতা হওয়ার গৌরব অর্জন করেছি, তাঁর কাছে বাই'আত করেছি, তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত কখনো তাঁর অবাধ্য হইনি এবং অবিশ্বস্ততা প্রদর্শন করিনি। তারপর আবূ বাকর (রা.) খালীফা হলেন, আমরা তাঁর হাতে বাই'আত করলাম; আল্লাহর শপথ! তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত আমি কখনো তাঁর অবাধ্য হইনি বা অবিশ্বস্ত হইনি। তারপর 'উমার (রা.) খালীফা হলেন, আল্লাহর শপথ! মৃত্যু পর্যন্ত আমি কখনো তাঁর অবাধ্য হইনি বা অবিশ্বস্ত হইনি। তারপর আল্লাহ্ আমাকে খালীফা পদে আসীন করেন; পূর্ববর্তী খালিফাদ্বয় যেমন আমার কাছে আনুগত্যের হকদার ছিলেন আমিও কি তোমাদের কাছ থেকে তেমনি আনুগত্য পাওয়ার অধিকারী নই? আমি (উবাইদুল্লাহ) বললাম, 'হ্যাঁ।' 'উসমান (রা.) বললেন, 'তোমাদের ব্যাপারে (আনুগত্যহীনতার) কিসব কথা আমার কানে আসে? আর আল-ওয়ালীদের বিষয়ে তুমি যা বললে সে ব্যাপারে আমি ন্যায়ানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করব।' এরপর 'উসমান (রা.), আল-ওয়ালীদের ওপর মদ্যপানের শাস্তি প্রয়োগের ব্যবস্থা করেন; খালীফার নির্দেশে 'আলী (রা.) আল-ওয়ালীদের ওপর চল্লিশ বেত্রাঘাতের শাস্তি প্রয়োগ করেন।[১২৭]

'উসমান (রা.) আমৃত্যু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহচর্যে সময় কাটান; তাঁর জ্ঞান ও নির্দেশনা দ্বারা উপকৃত হয়েছেন; যা তাঁকে মহান জ্ঞানী সাহাবীতে পরিণত করেছিল। তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছ থেকে অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন। এখানে 'উসমান (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হচ্ছে:

১. ওযুর গুরুত্ব:

'উসমান একবার ওযু করলেন, তারপর বললেন, আমি অবশ্যই এমন একটি হাদীস তোমাদের কাছে বর্ণনা করব যা আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছ থেকে শুনেছি। তিনি বলেছেন,

---

১২৭. ফাদাইলুস সাহাবাহ ১:৫৯৭।

من توضأ فأحسن الوضوء، ثم دخل فصلى، غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها

যে ব্যক্তি সুন্দরভাবে ওযু করে, অতঃপর মসজিদে প্রবেশ করে সালাত আদায় করে তবে তার ঐ সালাত ও তার পরবর্তী সালাতের মধ্যবর্তী সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। যতক্ষণ পরবর্তী সালাত আদায় না করে।[১২৮]

২. ওযুতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আনুগত্যঃ

হুমরান ইবনু আবান হতে বর্ণিত, 'উসমান (রা.) পানি আনতে বললেন, পানি আনা হলে তিনি ওযু করলেন, প্রথমেই গড়গড়া ও নাক পরিষ্কার করলেন। অতঃপর তিনবার মুখ ধৌত করলেন এবং কনুই পর্যন্ত তিনবার হাত ধৌত করলেন। মাথা মসেহ করার পর পা উন্মুক্ত করলেন। তারপর হেসে ওঠলেন, অতঃপর সাহাবীদেরকে বললেন, তোমরা কেন আমাকে জিজ্ঞেস করছ না আমি কি কারণে হাসলাম? একথা শুনে তারা বললেন, আমীরুল মু'মিনীন, আপনি কেন হাসলেন? জবাবে 'উসমান (রা.) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে এই স্থানের কাছাকাছি এক জায়গায় ওযু করতে দেখেছি। পানি আনা হলে তিনি ঐভাবে ওযু করলেন যেভাবে আমি করেছি। তারপর হেসে ওঠলেন, তারপর বললেন, 'তোমরা কেন আমার হাসির হেতু জানতে চাইছ না?' একথা শুনে সাহাবীরা বললেন, 'হে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আপনি কেন হাসলেন?' জবাবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

إن العبد اذا دعا بوضوء فغسل وجهه، حط الله عنه كل خطيئة أصابها بوجهه، فإذا غسل ذراعيه كان كذلك، وإن مسح برأسه كان كذلك، وإذا طهر قدميه كان كذلك.

বান্দা যখন ওযুর পানি এনে চেহারা ধৌত করে তখন তার মুখমণ্ডলের মাধ্যমে অর্জিত প্রত্যেকটি পাপ আল্লাহ ক্ষমা করে দেন। যখন সে হাত ধৌত করে তখনও তেমনটি হয় (অর্থাৎ হাতে অর্জিত গুনাহ আল্লাহ ক্ষমা করে দেন)। সে যখন মাথা মাসেহ করে তখনও অনুরূপ হয় এবং যখন সে পা দুটো পবিত্র করে তখন অনুরূপভাবে তার পা-দ্বারা অর্জিত গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়।[১২৯]

৩. 'উসমান (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

من أتم الوضوء كما أمره الله فالصلوات المكتوبة كفارات لما بينهن

১২৮. আল-মাওসূ'আতুল হাদীসিয়্যা মুসনাদু আহমাদ, নং ৪০০।
১২৯. প্রাগুক্ত, নং ৪১৫।

যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গভাবে ওযূ করবে, ফরয সালাতগুলো দু'নামাযের মধ্যবর্তী সকল গুনাহের কাফ্ফারা হবে।[১৩০]

৪. ওযূ ও দু'রাক'আত নামায পাপ মোচনকারী:

একবার 'উসমান (রা.) আসনে বসে ওযুর পানি আনার নির্দেশ দিলেন। পানি আনা হলে তিনি ডান হাতের ওপর পানি ঢেলে পরিষ্কার করলেন। তারপর ডান হাত পাত্রে ঢুকিয়ে দিয়ে তিনবার ধৌত করলেন। তারপর মুখমণ্ডল তিনবার ধৌত করলেন এবং গড়গড়া করলেন ও নাকে পানি দিয়ে পরিষ্কার করলেন। তারপর কনুই পর্যন্ত তিনবার হাত ধুইলেন, তারপর মাথা মাসেহ করলেন, তারপর টাখনু পর্যন্ত তিনবার পা ধৌত করলেন। তারপর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি:

من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث نفسه فيهما، غفر الله ما تقدم من ذنبه

যে ব্যক্তি আমার এই ওযুর মত ওযূ করবে তারপর দু'রাক'আত নামায আদায় করবে এমনভাবে যে এই দু'টি করতে গিয়ে তার অন্তরে অন্য কোন বিষয় উদয় হয়নি, তাহলে আল্লাহ তার পূর্ববর্তী (সাগীরা) গুনাহ মাফ করে দেবেন।[১৩১]

৫. কালিমাতুল ইখলাস ও কালিমাতুত্ তাকওয়া:

'উসমান (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি:

إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد حقا من قلبه إلا حرم على النار

আমি এমন একটি কালিমা জানি কোন বান্দা যদি সেটি অন্তর দিয়ে সত্য জেনে উচ্চারণ করে তবে সে জাহান্নামের জন্য হারাম হয়ে যাবে।

এ কথা শুনে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) বললেন, 'আমি বলতে পারব সেটি কি?' সেটি হল ইখলাস তথা একনিষ্ঠতার কালিমা যার দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর সাহাবীদেরকে সম্মানিত করেছেন, আর সেটি হল সেই তাক্ওয়ার কালিমা যার প্রতি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর চাচা আবূ তালিবকে মৃত্যুর সময় আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেছিলেন: শাহাদাতু আন্ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।[১৩২]

---

১৩০. প্রাগুক্ত, নং ৪০৬।
১৩১. প্রাগুক্ত, নং ৪১৮।
১৩২. মুসনাদ আহমাদ, নং ৪৪৭।

৬. তাওহীদের জ্ঞান মানুষকে জান্নাতে পৌছে দেয়:

'উসমান (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন,

من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة

কোন ব্যক্তি এমন অবস্থায় মারা গেল যে সে নিশ্চিত জ্ঞানে জানে 'আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই' তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[১৩৩]

৭. সৎকর্ম ও স্থায়ীকর্ম:

'উসমান (রা.)-এর আযাদকৃত দাস আল-হারিছ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আমরা 'উসমান (রা.)-এর সাথে বসা ছিলাম। কিছুক্ষণ পর মুআয্‌যিন এলে তিনি একটি পাত্রে পানি আনতে বললেন। আমার মনে হয় পাত্রভরে এক মুদ পানি আনা হয়েছিল। সেই পানি দিয়ে তিনি ওযু করলেন। অতঃপর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে আমার এই ওযুর মত ওযু করতে দেখেছি। তারপর তিনি বলেছেন:

من توضأ وضوئي هذا، ثم قام فصلى صلاة الظهر، غفر له ما كان بينها وبين الصبح، ثم صلى العصر غفر له ما بينها وبين صلاة الظهر، ثم صلى المغرب غفر له ما بينها وبين صلاة العصر، ثم صلى العشاء غفر له ما بينها وبين صلاة المغرب، ثم لعله أن يبيت يتمرغ ليلته، ثم إن قام فتوضأ وصلى الصبح غفر له ما بينها وبين صلاة العشاء وهن الحسنات يذهبن السيئات. قالوا هذه الحسنات فما الباقيات يا عثمان؟ قال: هن: لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

যে আমার এই ওযুর মত ওযু করবে তারপর দাঁড়াবে ও সালাতুয্ যুহর আদায় করবে তার ফাজর ও যুহরের মধ্যবর্তী সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। তারপর সে যদি সালাতুল আসর আদায় করে তবে যুহ্‌র ও আসরের মধ্যবর্তী সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। তারপর সে যদি সালাতুল মাগরিব আদায় করে তবে আসর ও মাগরিবের মধ্যবর্তী সমস্ত গুনাহ্ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। তারপর সে যদি সালাতুল 'ইশা আদায় করে তবে মাগরিব ও 'ইশার মধ্যবর্তী সমস্ত গুনাহ্ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। তারপর সে হয়ত গড়াগড়ি দিয়ে রাত কাটাবে। অতঃপর ভোরে ওঠে ওযু করে যদি সে সালাতুল ফাজর আদায় করে তবে 'ইশা ও ফাজরের মধ্যবর্তী সমস্ত গুনাহ্ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। এগুলো (ওযূ ও নামায) সৎকর্ম, যা অসৎকর্মকে দূরিভূত করে দেয়।

---

১৩৩. মুসনাদ আহমাদ, নং ৪৬৪।

লোকেরা বললো, (বুঝলাম) এগুলো সৎকর্ম; তাহলে স্থায়ীকর্মগুলো কি কি হে 'উসমান? তিনি বললেন, স্থায়ীকর্মগুলো হলঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবর, লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।[১৩৪]

৮. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওপর মিথ্যারোপের ভয়াবহতাঃ

'উসমান (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

من تعمد عليّ كذبا فليتبوأ بيتا في النار

কেউ যদি আমার ওপর মিথ্যারোপ করতে মনস্থ করে সে যেন জাহান্নামে একটি ঘর বানিয়ে নেয়।[১৩৫]

এখানে 'উসমান (রা.)-কর্তৃক বর্ণিত মাত্র কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হল। জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর গভীরতা ও প্রোজ্জ্বল ইসলামী ফিকহে তাঁর দক্ষতা প্রমাণের জন্য এ হাদীসগুলোর উল্লেখই যথেষ্ট।

দুই. সহনশীলতাঃ

সহনশীলতা প্রজ্ঞার অন্যতম খুঁটি। আল্লাহ তা'আলার গুণাবলীর অন্যতম হল হিল্‌ম বা সহনশীলতাঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوْا وَلَقَدْ عَفَا اللهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ •

যেদিন দুই দল পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল সেই দিন তোমাদের মধ্য হতে যারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছিল, তাদের কোন কৃতকর্মের জন্য শয়তানই তাদের পদস্খলন ঘটিয়েছিল। অবশ্য আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করেছেন। আল্লাহ্ ক্ষমাপরায়ণ ও পরম সহনশীল। (আলকুরআন ৩:১৫৫)।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ও ছিলেন সহনশীলতার মূর্তপ্রতিক। তৃতীয় খালীফা 'উসমানও (রা.) কথায় ও কাজে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করতেন। তাঁর পুরো জীবন ছিল সহনশীলতার দৃষ্টান্তে পরিপূর্ণ। শাহাদাতের প্রাক্কালে বিদ্রোহীদের দ্বারা তিনি যখন অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন তখন তিনি সহনশীলতার চরম নিদর্শন প্রদর্শন করেন। সেই দুর্যোগের সময় মাদীনায় অবস্থানরত আনসার ও মুহাজিরগণ 'উসমান (রা.)-এর পক্ষে অস্ত্রধারণ

---

১৩৪. প্রাগুক্ত, নং ৫১৩।
১৩৫. প্রাগুক্ত, ৫০৭।

করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু 'উসমান (রা.) তাদেরকে বুঝিয়ে শুনিয়ে বাড়ি ফেরত পাঠান। নিজের জীবন বাঁচাতে গিয়ে একজন মুসলিমের রক্ত ঝরবে, তা তিনি চাননি। চরম ধৈর্যের সাথে শক্তি প্রয়োগ না করেই তিনি পরিস্থিতি সামাল দেয়ার চেষ্টা করেন। শেষ পর্যন্ত মুসলিম রক্ত না ঝরিয়ে নিজের রক্ত বিলিয়ে দিয়ে শাহাদাত বরণ করেন।

তিন. উদারতাঃ

উদারতা ছিল 'উসমান (রা.)-এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তিনি শুধু শাসক হিসেবে উদার ছিলেন এমন নয়, ব্যক্তিগত লেনদেনের ক্ষেত্রেও তিনি উদার ও দুনিয়াবিমুখ ছিলেন। 'আতা ইবনু ফাররুখ নিম্নের ঘটনাটি বর্ণনা করেছেনঃ 'উসমান (রা.) এক ব্যক্তির কাছ থেকে একটি ভূখণ্ড কিনেছিলেন, কিন্তু লোকটি জমির মূল্য নিতে গড়িমসি করছিল। একদিন 'উসমান (রা.) লোকটির দেখা পেয়ে বললেন, 'কি ব্যাপার? তুমি জমির মূল্য নিচ্ছ না কেন?' সে বলল, 'আপনি আমাকে ঠকিয়েছেন, যার সাথেই আমার দেখা হচ্ছে সে-ই আমাকে (কম মূল্যে জমি বিক্রির জন্য) তিরস্কার করছে।' 'উসমান (রা.) বললেন, 'আচ্ছা, এজন্যই তাহলে তুমি মূল্য নিতে গড়িমসি করছ?' সে বলল, 'হ্যাঁ।' 'উসমান (রা.) বললেন, 'ঠিক আছে, জমি বা জমির দাম, যেটি ইচ্ছা সেটি তুমি নিতে পার।' তারপর তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এই হাদীসটি উল্লেখ করলেন, 'আল্লাহ্ ওই ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেনঃ যে ক্রেতা, বিক্রেতা, পাওনা পরিশোধকারী ও পাওনা দাবীকারী-যাইহোক, সর্বাবস্থায় বিনম্র ও উদার হবে।'[১৩৬]

চার. নম্রতা ও কোমলতাঃ

আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় রাসূলকে নম্রতার ও কোমলতার গুণ দিয়েছেনঃ

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانفَضُوْا مِنْ حَوْلِكَ

আল্লাহ্‌র দয়ায় তুমি তাদের প্রতি কোমল-হৃদয় হয়েছো; তুমি যদি রূঢ় ও কঠোরচিত্ত হতে তাহলে তারা তোমার আশপাশ হতে সরে পড়ত। (আলকুরআন ৩: ১৫৯)।

এ আয়াত পাঠে জানা গেল যে নম্রতা ও কোমলতা আল্লাহ্‌র বিশেষ দান যা তিনি তাঁর বাছাইকৃত বান্দাদেরকে দান করেন। 'উসমান (রা.)-ও আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহে নম্রতা ও কোমলতার গুণে গুণান্বিত ছিলেন; তিনি শাসিতদের প্রতি সহৃদয়, নম্র ও কোমল ছিলেন। তিনি সর্বদা এই ভয়ে থাকতেন তাঁর অজ্ঞাতসারে শাসিতদের ওপর যেন কোন দুর্ভোগ নেমে না আসে। তাহলে তিনি তাদের প্রয়োজনে সাড়া দিতে পারবেন না। তিনি মাযলূমের পক্ষে দাঁড়াতেন এবং সবলের কাছ থেকে দুর্বলের অধিকার আদায় করতেন।

---

১৩৬. মুসনাদ আহমাদ, নং ৪১০।

পাঁচ. ক্ষমা:

'ইমরান ইবনু আবদিল্লাহ ইবনু তালহা হতে বর্ণিত, একবার 'উসমান (রা.) সালাতুল ফাজ্র আদায়ের জন্য বের হলেন। যে দরজা দিয়ে সাধারণত মাসজিদে প্রবেশ করতেন তার কাছে গিয়ে দেখলেন প্রচণ্ড ভীড়। তিনি দেখলেন খঞ্জর হাতে এক লোক দাঁড়িয়ে আছে। তিনি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। সশস্ত্র লোকটিকে 'উসমান (রা.) বললেন, 'তোমার হাতে এটা কি?' সে বলল, 'আমি আপনাকে হত্যা করতে চাই।' 'উসমান (রা.) বললেন, 'সুবহানাল্লাহ, তোমার ধ্বংস হোক! তুমি কেন আমাকে হত্যা করতে চাও?' লোকটি বলল, 'ইয়ামানে নিযুক্ত আপনার শাসনকর্তা আমার ওপর যুল্ম করেছে।' 'উসমান (রা.) বললেন, 'তুমি কি আমাকে এই যুল্মের কথা আগে বলেছ? আমি যদি শাসনকর্তার কাছ থেকে তোমার জন্য ইনসাফ আদায় না করতাম তাহলে তুমি যা করার করতে? তুমি তো আমাকে আগে কিছুই বলোনি?' অতঃপর তিনি লোকদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমরা কি বল?' উপস্থিত জনতা বলল, 'আমীরুল মু'মিনীন, একজন শত্রুকে আল্লাহ্ আপনার নাগালে এনে দিয়েছেন, (আপনি তাকে শাস্তি প্রদান করুন)।' 'উসমান (রা.) বললেন, 'না, আল্লাহ্র এক বান্দা পাপ করতে চেয়েছিল, আল্লাহ্ আমার ক্ষতি করা থেকে তাকে রক্ষা করেছেন, তার দায়িত্ব নিতে পারে এমন কাউকে আমার কাছে নিয়ে এসো। যতদিন আমি (খিলাফাতের) দায়িত্বে থাকব ততদিন এই ব্যক্তি মাদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না।' অতঃপর স্বগোত্রীয় এক ব্যক্তি ঐ অপরাধীর জিম্মাদার হলে 'উসমান (রা.) তাকে ছেড়ে দিলেন।[১৩৭]

'উসমান (রা.) ক্ষমার মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। যে ব্যক্তি তাকে হত্যা করতে চেয়েছিল তাকে তিনি ক্ষমা করে দিলেন। প্রতিশোধ গ্রহণের সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা করে দেয়া হল আসল ক্ষমা। বিশাল মুসলিম জাহানের খালীফা হিসেবে তিনি লোকটিকে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারতেন। কিন্তু 'উসমান (রা.) স্বভাবজাত ঔদার্য প্রদর্শন করে তাকে ক্ষমা করে দিলেন। এতে পরকালে তাঁর মর্যাদা বুলন্দ হবে। পাশাপাশি পার্থিব দৃষ্টিকোণেও এটিকে প্রজ্ঞাময় আচরণ বলা যেতে পারে। 'উসমান (রা.) যদি কঠোর হতেন এবং লোকটিকে কঠিন শাস্তি দিতেন তাহলে তাঁর গ্রোত্রের লোকদের মনে প্রতিশোধ স্পৃহা জেগে ওঠত এবং সময়-সুযোগ বুঝে তারা আরো বড় ধ্বংসাত্মক কর্ম সম্পাদন করতে পারত। অন্যদিকে 'উসমান (রা.) তাকে ক্ষমা করে দেয়ার কারণে সে খালীফার ভক্তে পরিণত হয়।

---

১৩৭. তারীখুল মাদীনাতিল মুনাওওয়ারাহ, ১০২৭-২৮।

ছয়. বিনয়:

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ قَالُوْا سَلَامًا •

রাহমান-এর বান্দা তারাই যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদেরকে যখন অজ্ঞ ব্যক্তিরা সম্বোধন করে তখন তারা বলে, 'সালাম। আলকুরআন ২৫:৬৩)।

বিনয়কে দয়াময় আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাদের প্রথম গুণ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহর প্রিয় বান্দা 'উসমান (রা.) এই গুণে গুণান্বিত ছিলেন। 'আবদুল্লাহ আর-রূমী হতে বর্ণিত, 'উসমান (রা.) শেষরাতে যখন নামায আদায়ের জন্য ওযু করতেন তখন নিজেই পানির ব্যবস্থা করতেন। একবার তাঁকে বলা হল, 'আপনি খাদেমদের ডাকলেই পারেন।' জবাবে তিনি বললেন, 'না, রাত তাদের বিশ্রামের জন্য।'[১৩৮] এটিই হল 'উসমান (রা.)-এর বিনয় ও দয়ার উদাহরণ। তিনি বিশাল মুসলিম সাম্রাজ্যের খালীফা, তদুপরি বয়োবৃদ্ধ; এতদসত্ত্বেও তিনি খাদেমদেরকে কষ্ট দিতে চাইতেন না। তিনি মনে করতেন খাদেমরাও মানুষ, সারাদিনের পরিশ্রমে তারা ক্লান্ত হয়, তাদেরও বিশ্রামের অধিকার রয়েছে। তিনি তাদের বিশ্রামের বিঘ্ন ঘটাতে চাইতেন না। 'উসমান (রা.)-এর বিনয়ের আরেকটি দৃষ্টান্ত হল: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চাচা 'আব্বাস (রা.)-এর সামনে তিনি বাহনে আরোহন করতেন না। কখনো আরোহী অবস্থায় 'আব্বাস (রা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ হলে তাঁর সম্মানার্থে তিনি বাহন থেকে নেমে যেতেন।[১৩৯]

সাত. লজ্জাশীলতা ও নিষ্কলুষতা:

'উসমান (রা.) লজ্জাশীলতার ক্ষেত্রে প্রবাদপ্রতিম ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজেই তাঁর লজ্জাশীলতার গুণের স্বীকৃতি দিয়েছেন: واصدقهم حياء عثمان 'আমার উম্মাতের মাঝে লজ্জাশীলতায় সবচেয়ে সত্যবাদী হল 'উসমান।' ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে 'উসমান (রা.)-এর লজ্জাশীলতা দেখে ফেরেশতারাও লজ্জা পেতেন। 'উসমান (রা.)-এর লজ্জাশীলতার বর্ণনা দিতে গিয়ে হাসান বাসরী বলেন, 'তিনি ('উসমান) ঘরে থাকলে দরজা বন্ধ করে থাকতেন। গোসল করার জন্য অনাবৃত হলেও লজ্জার কারণে মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে পারতেন না।' তাঁর স্ত্রীর দাসী

১৩৮. ইবনু সা'দ, ৩:৬০; ইবনু কাসীর, ৭:২১৪।
১৩৯. আত-তাবঈন ফি আনসাবিল কারশিয়্যীন, ১৫৩।

বুনানাহ বলেন, গোসল করার সময় 'উসমান (রা.)-এর জন্য কাপড় নিয়ে গেলে তিনি বলতেন, 'তুমি আমার দিকে তাকিয়ো না, কারণ এটি তোমার জন্য বৈধ নয়।'[১৪০] 'উসমান (রা.)-এর লজ্জাশীলতা সম্পর্কে আরো বিবরণ ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

'উসমান (রা.) নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি জাহিলী বা ইসলামী যুগে কখনোই কোন অশ্লীলতায় লিপ্ত হননি। তিনি বলেন,

ما تغنيت ولا تمنيت ولا مسست ذكري بيميني منذ بايعت بها رسول الله ولا شربت خمرا في جاهلية ولا في الإسلام، ولا زنيت في جاهلية ولا في الإسلام

আমি কখনো গান গাইনি, মিথ্যা রটনা করিনি, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাতে বাই'আত করার পর কখনো ডান হাতে আমার লজ্জাস্থান স্পর্শ করিনি। জাহিলী বা ইসলামী যুগে কখনো মদ্যপান করিনি, জাহিলী বা ইসলামী যুগে কখনোই যিনা করিনি।[১৪১]

আট. দানশীলতা:

'উসমান (রা.) ছিলেন বদান্য ও দানবীর। মানবেতিহাসে দানশীলতার ক্ষেত্রে তাঁর জুড়ি পাওয়া ভার। রূমা কূপ ক্রয় করে মুসলিমদের জন্য দান করে দেয়া এবং তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতিতে বিপুল পরিমাণে দান করার বিবরণসহ তাঁর দানশীলতার বিভিন্ন দৃষ্টান্ত ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

এখানে তাঁর দানশীলতার আরো কিছু দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হচ্ছে:

ক. দাসমুক্তি: মানবতার মুক্তি ও কল্যাণে তাঁর দান ছিল অপরিসীম। ইসলাম গ্রহণের পর হতে প্রতি জুম'আর দিনে তিনি একজন করে দাস-দাসী মুক্ত করতেন। হিসেব করলে দেখা যায় তিনি প্রায় দুই হাজার চারশ' জন দাস মুক্ত করেছেন।[১৪২]

খ. তালহা ইবনু 'উবাইদিল্লাহ (রা.)-এর কর্জ মওকুফ: সাহাবী তালহা ইবনু 'উবাইদিল্লাহ নিজেই দানশীল ছিলেন। একবার তিনি 'উসমান (রা.)-এর কাছ থেকে পঞ্চাশ হাজার দিরহাম কর্জ করেছিলেন। কিছুদিন পর তিনি 'উসমান (রা.)-কে বললেন, 'আমি কর্জ পরিশোধে প্রস্তুত, অনুগ্রহ করে আপনার টাকাগুলো নিন।' জবাবে 'উসমান (রা.) বললেন, 'আপনার বদান্যতার প্রতিদান হিসেবে তা আমি আপনাকে দিয়ে দিলাম।'[১৪৩]

---

১৪০. ইবনু সাদ, ৩:৫৯।
১৪১. সহীহুত তাওসীক, ৪৪।
১৪২. ইবনু হাজর আল-হায়সামী, আস-সাওয়াইকিল মুহরিকাহ, ১: ৩২৭।
১৪৩. ইবনু কাসীর, ৭:২১৫; আত-তাবারী, ৪:৪০৫।

বস্তুত 'উসমান (রা.)-এর বদান্যতা ছিল তাঁর বিরল ব্যক্তিত্বের অংশ। জিহাদ, ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাসহ নানাবিধ ক্ষেত্রে তিনি অকাতরে দান করেছেন।

নয়. সাহসিকতা:

'উসমান (রা.)-কে সাহসী পুরুষ হিসেবে গণ্য করা হয়। তাঁর সাহসিকতার অনেক দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা যায়:

১. জিহাদে অংশগ্রহণ: 'উসমান (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে বহু জিহাদে অংশগ্রহণ করে সাহসিকতা প্রদর্শন করেছেন। নিন্দুকের দল অভিযোগ করে যে 'উসমান (রা.) বাদর যুদ্ধে অংশ নেননি। আমরা ইতোপূর্বে সবিস্তারে উল্লেখ করেছি যে, 'উসমান (রা.), রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নির্দেশে অসুস্থ স্ত্রীর সেবার জন্য মাদীনায় রয়ে গিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজে তাঁকে বাদ্‌রী সাহাবী হিসেবে গণ্য করেছেন এবং তাঁকে গানীমতের অংশ দিয়েছেন। অন্যান্য যুদ্ধে 'উসমান (রা.) সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করেন।

২. হুদাইবিয়া সন্ধির সময় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দূত হিসেবে কুরাইশদের কাছে গমন: ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হিজরী ৬ষ্ঠ সনে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাইতুল্লাহ যিয়ারত করতে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে যখন হুদাইবিয়ায় অবস্থান করছিলেন তখন তাঁর দূত হিসেবে 'উসমান (রা.) মাক্কায় গমন করেছিলেন। তখন পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত নাজুক, উত্তেজনা ছিল চরমে। সাহসী মানুষ ব্যতীত কারো পক্ষে ঐ সময় শত্রুদের এলাকায় যাওয়ার দুঃসাহস দেখানো সম্ভব ছিল না।

৩. আত্মোৎসর্গ করা: শাহাদাতের প্রাক্কালে 'উসমান (রা.) যখন বিদ্রোহীদের দ্বারা অবরুদ্ধ ছিলেন তখন তিনি চরম সাহসিকতা প্রদর্শন করেন। বিদ্রোহীরা তাঁকে তিনটি অপশন দিয়েছিল: হয় তাকে পদত্যাগ করতে হবে, অথবা তাকে হত্যা করা হবে, অথবা কতিপয় ব্যক্তিকে তাদের হাতে সমর্পন করতে হবে। প্রত্যেকটি ছিল অযৌক্তিক দাবি; জনগণের পরামর্শে নির্বাচিত খালীফা কতিপয় বিদ্রোহীর দাবিতে পদত্যাগ করতে পারেন না। এটি করলে একটি বদ রসম চালু হয়ে যেত, নির্বাচিত খালীফাদেরকে দুষ্কৃতকারীরা নিজেদের মর্জিমত পদত্যাগ করাতে পারত। তাই 'উসমান (রা.) এটি প্রত্যাখ্যান করেন। কোন ব্যক্তি দোষী হলে আদালতে তার বিচার হতে পারে; কিন্তু কারো দাবীর ভিত্তিতে তার হাতে কাউকে তুলে দেয়া যেতে পারে না। তাই 'উসমান (রা.) এই দাবীও প্রত্যাখ্যান করেন। মাদীনায় অবস্থানরত আনসার ও মুহাজিরগণ 'উসমান (রা.)-এর পক্ষে অস্ত্রধারণ করতে চেয়েছিলেন। নিজের জীবন ও নিরাপত্তার জন্য কোন মুসলিমের রক্ত ঝরুক, তা 'উসমান (রা.) চাননি। তাই তিনি সাহাবায়ে কিরামকে নিবৃত্ত করেন এবং আল্লাহর ওপর

তাওয়াক্কুল করে নিজেই বিদ্রোহীদের মুখোমুখি হন। অমিত সাহসী না হলে একজন ব্যক্তির পক্ষে নিরস্ত্র অবস্থায় সশস্ত্র ও খুনোম্মত্ত দলের মুখোমুখি হওয়া সম্ভব ছিল না। নিজের জীবন দিয়ে তিনি ইসলামী খিলাফাতের ধারাবাহিকতা ও মুসলিমদের জীবন রক্ষা করেন।

৪. ধন-মাল দিয়ে জিহাদ: আলকুরআনে আল্লাহ তা'আলা জীবন দিয়ে জিহাদ করাকে সম্পদ দিয়ে জিহাদ করার সাথে সম্পৃক্ত করেছেন:

لاَ يَسْتَوِي الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِي سَبِيْلِ اللهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللهُ الْمُجَاهِدِيْنَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ دَرَجَةً وَكُــلاًّ وَعَدَ اللهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللهُ الْمُجَاهِدِيْنَ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ أَجْرًا عَظِيْمًا.

মু'মিনদের মধ্যে যারা অক্ষম নয় অথচ ঘরে বসে থাকে ও যারা আল্লাহর পথে ধন-প্রাণ দিয়ে জিহাদ করে তারা সমান নয়। যারা স্বীয় ধন-প্রাণ দ্বারা জিহাদ করে আল্লাহ তাদের, যারা ঘরে বসে থাকে তাদের উপর মর্যাদা দিয়েছেন; আল্লাহ সকলকেই কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যারা ঘরে বসে থাকে তাদের উপর যারা জিহাদ করে তাদেরকে আল্লাহ মহাপুরস্কারের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন (আলকুরআন ৪:৯৫)।

'উসমান (রা.) দানবীর ছিলেন; তিনি জান-প্রাণ ও ধন-মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজেই দানের ক্ষেত্রে 'উসমানের শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি দিয়েছেন; তাবুক যুদ্ধের প্রাক্কালে জাইশ আল-উসরাহ-এর প্রস্তুতির সময় 'উসমান (রা.)-এর দান দেখে তিনি বলেছিলেন, **ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم**। 'আজকের পর কোন 'আমল না করলেও 'উসমানের কোন ক্ষতি হবে না।'

দশ. দৃঢ় সঙ্কল্প:

'উসমান (রা.)-এর চরিত্রে সংকল্পের গুণ ছিল স্বভাবজাত। আবূ বাকর (রা.) তাঁকে যখন ইসলাম গ্রহণ করতে আহবান করেছিলেন তখন বলেছিলেন,

ويحك يا عثمان!! إنك رجل حازم، ما يخفى عليك الحق من الباطل، ما هذه الأصنام التي يعبدها قومنا

তোমার জন্য আফসোস 'উসমান! তুমি তো স্থির প্রতিজ্ঞ, সত্য ও মিথ্যা তোমার কাছে গোপন নয়। আমাদের কাওম যে মূর্তিগুলোর পূজা করে এগুলো কি?

হিজরী ২৬ সনে 'উসমান (রা.) কা'বাঘর সংস্কার ও সম্প্রসারণ করেন; এ কাজে একদল লোকের কাছ থেকে জায়গা খরিদ করেন। কিন্তু কিছু লোক বাধ সাধে, তারা জমি বিক্রি করতে অস্বীকৃতি জানায়। 'উসমান (রা.) তাদের বাড়িঘর ভেঙ্গে দেন এবং এর মূল্য বাইতুল মালে সমর্পণ করে কা'বাঘর সম্প্রসারণের কাজ সম্পন্ন করেন। উচ্ছেদকৃত লোকেরা 'উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে আওয়াজ তুললে তিনি তাদেরকে বন্দী করেন। 'উসমান (রা.) বললেন, 'তোমরা জান কি এই লোকগুলো কেন চিৎকার-চেচাঁমেচি করছে? আমি ধৈর্যশীল বলে। এই ধরনের সংস্কার কাজ 'উমার (রা.)-ও করেছেন। তখন তো কেউ শোরগোল করেনি!' তারপর 'আবদুল্লাহ ইবনু খালিদ ইবনু উসাইদ-এর মধ্যস্থতায় ওদেরকে ছেড়ে দেয়া হয়।[১৪৪]

এগার. ধৈর্যঃ

'উসমান (রা.) ছিলেন ধৈর্যের মূর্তপ্রতিক। জীবনের শেষ পাদে বিদ্রোহীরা তাঁকে অবরুদ্ধ করে রাখলে তিনি চরম উস্কানির মুখে ধৈর্যের মাধ্যমে পরিস্থিতি সামাল দেয়ার চেষ্টা করেন। উম্মাহ্র ঐক্য ছিল তাঁর প্রধান ভাবনা; তাই তিনি অস্ত্রধারণ করেননি। তিনি যদি স্বার্থপর হতেন তবে পদত্যাগ করে নিজেকে রক্ষা করতে পারতেন। সেক্ষেত্রে ইসলামী খিলাফাতের মারাত্মক ক্ষতি হত। খালীফাগণ বিদ্রোহী ও দুষ্টচক্রের ক্রীড়নকে পরিণত হতেন। আত্মরক্ষার অন্য উপায়ও ছিল তাঁর; বিদ্রোহীদের দাবি অনুযায়ী কয়েকজন ব্যক্তিকে তাদের হাতে তুলে দিলেও তিনি প্রাণে বেঁচে যেতেন। কিন্তু এর মাধ্যমে ইসলামী বিচারব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যেত। তাঁর পক্ষে যারা অস্ত্রধারণ করতে চেয়েছিলেন তাদেরকেও তিনি ফেরত পাঠান। পক্ষ-বিপক্ষ সৃষ্টির মাধ্যমে মুসলিম উম্মার ঐক্যে ফাটল ধরাতে চাননি তিনি। বরং ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতি সামাল দেয়ার চেষ্টা করেন।

আল্লাহ্র ওপর তাঁর ঈমান ছিল প্রগাঢ়। তিনি ছিলেন মহৎপ্রাণ, বিদ্ধকর অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী, চরম ধৈর্যশীল। তাঁর ধৈর্য সম্পর্কে ইবনু তাইমিয়া বলেন,

> পরম্পরাসূত্রে জানা গেছে যে 'উসমান (রা.) রক্তপাত থেকে সর্বাধিক দূরত্বে অবস্থান করতেন, তিনি এত বেশি ধৈর্যশীল ছিলেন যে, তাঁর হত্যাকারীদের মুকাবিলা করতে গিয়েও তিনি ধৈর্যচ্যুত হননি। তারা কয়েকদিন অবরুদ্ধ করে রাখার পর তাঁকে হত্যা করে। 'উসমান (রা.) তাদের বদ অভিসন্ধি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন; মুসলিমগণ তাঁর সাহায্যে এগিয়ে এসেছিল; কিন্তু তিনি অনুগতদেরকে সশস্ত্র লড়াই থেকে বিরত রাখেন। তাঁকে বলা হলঃ 'আপনি মাক্কায় চলে যান।' .. .. তাঁকে বলা হলঃ 'তাহলে আপনি সিরিয়ায় চলে

---

১৪৪. আত্-তাবারী, ৪:২৫১।

যান।' তিনি বললেন, 'আমি হিজরাতের শহর ছেড়ে যেতে পারব না।' তারপর তাঁকে বলা হল: তাহলে ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করুন।' তিনি বললেন, 'মুহাম্মাদের খালীফাদের মধ্যে তার উম্মাতের বিরুদ্ধে প্রথম অস্ত্রধারণকারী আমি হতে পারব না।' এভাবে ধৈর্য অবলম্বন করে 'উসমান (রা.) শাহাদাত বরণ করলেন।[১৪৫]

বারো. ইনসাফ:

'উসমান (রা.) অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। আদল ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠায় তিনি সর্বদা সতর্ক-সচেতন থাকতেন। ইবনু শাবাহ্ বর্ণনা করেছেন, একবার 'উসমান (রা.) তাঁর এক গোলামকে দেখলেন যে সে উষ্ট্রীকে খাদ্য দিচ্ছে। পশুর খাবারে তিনি অপছন্দনীয় বা ঘৃণিত কোন বস্তু দেখতে পেয়ে গোলামকে কানমলা দিলেন। পরে তিনি খুব অনুতপ্ত হয়ে গোলামকে বললেন: তুমি আমার কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ কর। দাসটি অস্বীকার করলে 'উসমান বারবার পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। বাধ্য হয়ে গোলামটি 'উসমান (রা.)-এর কান ধরে টানল। 'উসমান (রা.) বললেন, আখিরাতের কিসাসের পূর্বে দুনিয়ায় কিসাস আদায় হয়ে যাওয়া কতইনা চমৎকার![১৪৬]

তেরো. ইবাদাত:

'উসমান (রা.) ইবাদাতে বিপুল মেহনত করতেন। বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তিনি হাজ্জের সময় হাজরে আসওয়াদের কাছে দাঁড়িয়ে এক রাক'আতে পুরো কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতেন।[১৪৭] আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ ءَانَاءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَآئِمًا يَحْذَرُ ٱلْأٓخِرَةَ وَيَرْجُوا۟ رَحْمَةَ رَبِّهِۦ

যে ব্যক্তি রাত্রির বিভিন্ন ক্ষণে সিজদাবনত হয়ে ও দাঁড়িয়ে আনুগত্য প্রকাশ করে, আখিরাতকে ভয় করে এবং তাঁর প্রতিপালকের অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে, সে কি তার সমান, যে তা করে না? (আলকুরআন ৩৯:৯)।

এই আয়াত সম্পর্কে ইবনু 'উমার (রা.) বলেন, এই আয়াতে ইবাদাতগোযার যে বান্দার কথা বলা হয়েছে তিনি হলেন 'উসমান ইবনু 'আফফান (রা.)। 'উসমান (রা.) দীর্ঘ কিরাত পাঠ করে রাতের নামায আদায় করতেন বলে ইবনু উমার (রা.) এ কথা বলেছেন।[১৪৮]

আলকুরআনের বাণী:

---

১৪৫. মিনহাজুস সুন্নাহ, ৩:২০২-০৩।
১৪৬. ইবনু শাবাহ, আখবারুল মাদীনা, ৩:২৩৬।
১৪৭. ইবনু সা'দ, ৩:৭৬।
১৪৮. মুহাম্মাদ 'আলী আস-সাবূনী, মুখতাসার তাফসীর ইবনু কাসীর, ৩: ২১৪।

هَلْ يَسْتَوِىْ هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ

সে কি সমান হবে ঐ ব্যক্তির যে ন্যায়ের নির্দেশ দেয় এবং যে আছে সরল পথে। (আলকুরআন ১৬:৭৬)।

ইবনু 'আব্বাস (রা.) বলেন, এই আয়াতে ন্যায়নিষ্ঠ ও সরল পথের পথিক যে ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে তিনি হলেন 'উসমান ইবনু 'আফ্ফান (রা.)।[১৪৯]

'উসমান (রা.)-এর কুরআন অধ্যয়ন ইতিহাসে দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। তিনি প্রতি জুমু'আবার রাতে কুরআন তিলাওয়াত শুরু করতেন এবং বৃহস্পতিবার রাতে তাঁর এক খতম তিলাওয়াত সম্পন্ন হত। বছরের অধিকাংশ সময় তিনি সাওম পালন করতেন; রাতের প্রথমাংশে সামান্য ঘুমাতেন আর বাকি রাত তিনি সালাত আদায় করে কাটিয়ে দিতেন।[১৫০]

চৌদ্দ. আলকুরআন অধ্যয়ন:

'উসমান (রা.)-সহ সকল সাহাবীর প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল ছিল আলকুরআন। যে কিতাব আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের তরফ থেকে অবতীর্ণ, এটিই ছিল শিক্ষার একমাত্র মাধ্যম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলকুরআনকেই শিক্ষা-প্রশিক্ষণের একমাত্র মাধ্যম বানিয়েছিলেন। আলকুরআনের ক্যারিকুলামেই প্রশিক্ষিত হয়েছিল মুসলিম ব্যক্তি ও সমাজ। 'উসমান (রা.), রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছ থেকে সরাসরি যে আয়াতগুলো শুনতেন তাঁর ব্যক্তিত্ব গঠনে সেগুলোর অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা ছিল। যা তাঁর অন্তর পরিশুদ্ধ করেছিল, যার প্রভাবে তাঁর আত্মা প্রভাবিত হয়েছিল। ফলে তিনি নতুন এক মানুষে পরিণত হয়েছিলেন যার মূল্যবোধ, অনুভূতি, চরিত্র, প্রত্যাশা সবই ছিল ভিন্ন। 'উসমান (রা.) আলকুরআনকে ভালোবেসেছিলেন, তাঁর কতিপয় উদ্ধৃতি থেকে বুঝা যায় আলকুরআনকে তিনি কতোটা গভীরভাবে আঁকড়ে ধরেছিলেন। আবদুর রহমান আস-সুলামী বলেন,

حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن–كعثمان بن عفان، وعبد الله بن مسعود وغيرهما–أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يتجاوزها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل ، قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة.

---

১৪৯. প্রাগুক্ত, ২:৩৪০।
১৫০. ইবনুল জাওযী, সিফাতুস সাফওয়াহ, ১:৩০২।

'উসমান ইব্নু আফ্ফান ও 'আবদুল্লাহ ইব্নু মাস'উদ (রা.)-সহ যাঁরা আমাদেরকে আলকুরআন শিক্ষা দিতেন তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছ থেকে দশটির বেশি আয়াত শিখতেন না। তাঁরা এটা এজন্যই করতেন যাতে আয়াতে অন্তর্ভুক্ত জ্ঞান অর্জন করতে পারেন এবং তদনুযায়ী আমল করতে পারেন। তাঁরা বলতেন, আমরা কুরআন, ইলম ও আমল একসাথেই শিখতাম।' এ কারণেই তাঁরা বেশ সময় নিয়ে সূরা মুখস্থ করতেন।[১৫১]

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوْا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُو الْأَلْبَابِ

এক কল্যাণময় কিতাব, এটি আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ গ্রহণ করে উপদেশ। (আলকুরআন ৩৮: ২৯)।

'উসমান (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন:

خيركم من تعلم القرآن وعلمه

তোমাদের মাঝে সে-ই উত্তম যে কুরআন শিখে ও শিখায়।[১৫২]

'উসমান (রা.), রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে পুরো কুরআন মুখস্থ তিলাওয়াত করে শুনিয়েছিলেন। পরবর্তীতে বিখ্যাত তাবি'ঈগণ আলকুরআন শিক্ষায় তাঁর ছাত্রত্ব গ্রহণ করেন। আবদুর রহমান আস-সুলামী, আল-মুগীরা ইব্নু আবি শিহাব, আবুল আসওয়াদ ও যার ইব্নু হুবাইশ তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।[১৫৩] আলকুরআন সম্পর্কে 'উসমান (রা.)-এর কিছু বাণী ইতিহাস আমাদের জন্য সংরক্ষণ করেছে। তিনি বলেন:

إني لأكره أن يأتي عليّ يوم لا أنظر فيه إلى عهد الله

কুরআনে দৃষ্টি না দিয়ে কোন দিন অতিবাহিত করা আমি অপছন্দ করি।[১৫৪]

তিনি আরো বলেন:

حبب إليّ من الدنيا ثلاث: إشباع الجيعان، وكسوة العريان وتلاوة القرآن

---

১৫১. আল-ফাতাওয়া, ১৩:১৭৭।
১৫২. সাহীহুল বুখারী, কিতাবু ফাদাইলিল কুরআন (কায়রো: দারুত-তাকওয়া ২০০১), ২:৬৫৪।
১৫৩. আয-যাহাবী, তারিখুল ইসলাম: 'আহদুল খুলাফাইর রাশিদীন, পৃ. ৪৬।
১৫৪. ইবনু কাসীর, ৭:২২৫।

দুনিয়ায় তিনটি কাজ আমার কাছে প্রিয়: ক্ষুধার্তকে অন্ন দান, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দান আর কুরআন অধ্যয়ন।[১৫৫]

'উসমান (রা.) আরো বলেন :

أربعة ظاهرهن فضيلة وباطنهن فريضة: مخالطة الصالحين فضيلة، والاقتداء بهم فريضة، وتلاوة القرآن فضيلة والعمل به فريضة، وزيارة القبور فضيلة، والاستعداد للموت فريضة، وعيادة المريض فضيلة واتخاذ الوصية منه فريضة.

চারটি বিষয়ের বহিরাংশ মুস্তাহাব কিন্তু অভ্যন্তরভাগ ফারয: সৎকর্মশীলদের সাথে উঠাবসা করা ভালো কাজ, কিন্তু তাদের অনুসরণ করা ফারয। কুরআন তিলাওয়াত করা মুস্তাহাব, কিন্তু তদনুযায়ী আমল করা ফারয। কবর যিয়ারত করা পুণ্যের কাজ, কিন্তু মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নেওয়া ফারয। রোগীদর্শন মুস্তাহাব, কিন্তু তার কাছ থেকে ওয়াসীয়াত গ্রহণ করা ফারয।[১৫৬]

'উসমান (রা.) বলেন:

أضيع الأشياء عشرة: عالم لا يسأل عنه، وعلم لا يعمل به، ورأي صواب لا يقبل، وسلاح لا يستعمل، ومسجد لا يصلى فيه، ومصحف لا يقرأ فيه، ومال لا ينفق منه، وخيل لا تركب، وعلم الزهد في بطن من يريد الدنيا، وعمر طويل لا يتزود صاحبه فيه لسفره.

সর্বাধিক বিনষ্ট বস্তু দশটি: যে 'আলিম জিজ্ঞাসিত হয় না, যে 'ইলম অনুসারে আমল করা হয় না, যে অভিমত সঠিক অথচ তা গৃহীত হয় না, যে তরবারি ব্যবহৃত হয় না, যে মাসজিদে নামায আদায় করা হয় না, যে কুরআন অধ্যয়ন করা হয় না, যে সম্পদ ব্যয়িত হয় না, যে ঘোড়ায় আরোহন করা হয় না, দুনিয়াদারের পেটস্থিত যুহ্দ-এর জ্ঞান, এমন দীর্ঘ জীবন যার মালিক সফরের প্রস্তুতি নেয় না।[১৫৭]

'উসমান (রা.) আলকুরআনের হাফিয ছিলেন। বলতে গেলে কখনো তার ক্রোড় আলকুরআন হতে বিচ্ছিন্ন হতো না। বিষয়টি তাঁর কাছে উপস্থাপন করা হলে তিনি বলেছিলেন:

إنه مبارك جاء به مبارك

নিশ্চয় এটি বরকতময় এবং একজন বরকতময় ব্যক্তি এটি নিয়ে এসেছেন।[১৫৮]

---

১৫৫. ইরশাদুল 'ইবাদ লিল-ইসতি'দাদ লি ইয়াওমিল মা'আদ, ৮৮।
১৫৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০।
১৫৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১।
১৫৮. আল-বায়ান ও আত্ তাবঈন ফী মাকতালিশ শাহীদ উসমান, ৩/১৭৭।

আলকুরআনের যে কপিটি উসমানের কাছে ছিল অতিরিক্ত অধ্যয়নের কারণে সেটি প্রায় জীর্ণ হয়ে পড়েছিল। হত্যাকারীদের উদ্দেশ্যে তাঁর স্ত্রী নায়িলা বলেছিলেন:

اقتلوه أو دعوه، فوالله لقد كان يحيى الليل بالقرآن في ركعة

তোমরা ভেবে দেখো, তাঁকে হত্যা করবে না ছেড়ে দেবে। আল্লাহর কসম, এক রাকআতে পুরো আলকুরআন তিলাওয়াত করে তিনি রাত্রি জাগরণ করতেন।[১৫৯]

'উসমান (রা.)-এর ব্যাপারে আলকুরআনের নিম্নোক্ত বাণী সত্যে পরিণত হয়েছিল:

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ ءَانَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوْ رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوْ الْأَلْبَابِ .

যে ব্যক্তি রাত্রির বিভিন্ন যামে সিজদাবনত হয়ে ও দাঁড়িয়ে আনুগত্য প্রকাশ করে, আখিরাতকে ভয় করে এবং তার প্রতিপালকের অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে, সে কি তার সমান যে তা করে না? বল, 'যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি সমান? বোধশক্তি সম্পন্ন লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে। (আলকুরআন ৩৯: ০৯)।

পনের. আল্লাহ্র ভয় ও আত্মসমালোচনা :

এক ভাষণে 'উসমান (রা.) বলেন,

أيها الناس! اتقوا الله، فإن تقوى الله غنم، وإن أكيس الناس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، واكتسب من نور الله نورا لقبره، وليخش أن يحشره الله أعمى وقد كان بصيرا

হে মানুষ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। কেননা আল্লাহর ভয় গানীমতস্বরূপ। সবচেয়ে বিজ্ঞ মানুষ নিজের নাফ্সকে নিয়ন্ত্রণে রাখে, আখিরাতের জন্য 'আমল করে এবং তাঁর কবরের জন্য আল্লাহ্র নূর হতে আলো সংগ্রহ করে। মানুষের ভয় করা উচিৎ, আল্লাহ তাকে অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করতে পারেন অথচ সে দৃষ্টিবান ছিল।[১৬০]

আখিরাতের কথা স্মরণ হলে 'উসমান (রা.)-এর অন্তর কেঁপে ওঠত এবং তাঁর দু'চোখ বেয়ে অঝোর ধারায় অশ্রু ঝরত। 'উসমান (রা.)-এর জনৈক দাস বলেন, 'কবরের পাশে দাঁড়ালে 'উসমান (রা.) এমনভাবে কাঁদতেন যে তাঁর দাড়ি ভিজে যেত।'

---

১৫৯. ইবনু কাসীর, ৭:২২৫।
১৬০. মাজদী ফাতহী আস-সাইয়িদ, সহীহুত তাওসীক, ১০৭।

একবার তাঁকে বলা হল, 'আপনি জান্নাত-জাহান্নামের কথা মনে করে কাঁদছেন?' তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه

কবর হল আখিরাতের প্রথম মানযিল, যে ব্যক্তি কবরে মুক্তি পাবে পরবর্তী মানযিল তার জন্য সহজ হবে। আর যদি সেখানে মুক্তি না পায় তাহলে পরবর্তী মানযিলগুলো তার জন্য আরো কঠিন হবে।

'উসমান (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিম্নোক্ত বাণীও উল্লেখ করলেনঃ

والله ما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع منه

আল্লাহ্র শপথ, কবরের চেয়ে ভয়ঙ্কর কোন দৃশ্য আমি দেখিনি।

'উসমান (রা.) আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) লাশ দাফন সম্পন্ন করার পর কবরের পাশে দাঁড়াতেন, তারপর বলতেন,

استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل

তোমাদের ভায়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং দু'আ কর যেন সে দৃঢ় থাকতে পারে; কারণ এখন তাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে।[১৬১]

এভাবেই 'উসমান (রা.) আখিরাতের ভয়ে কম্পিত হতেন এবং হৃদয়ে সর্বদা আল্লাহর ভয় জাগরূক রেখে পরকালের জন্য আমল করতেন।

ষোল. যুহদ :

'উসমান (রা.) ধনাঢ্য ব্যক্তি হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। এতদসত্ত্বেও তাঁর সম্পর্কে এমন কিছু বর্ণনা পাওয়া যায় যা প্রমাণ করে যে তিনি পার্থিব ভোগবিলাসের ব্যাপারে নিরাসক্ত ছিলেন। হুমাইদ ইবনু না'ঈম বলেন, একবার 'উমার (রা.) ও 'উসমান (রা.) এক ভোজের অনুষ্ঠানের দাওয়াত পেলেন, যাওয়ার পথে 'উমার (রা.)-কে 'উসমান (রা.) বললেন, 'আমরা তো অনেক ভোজে অংশগ্রহণ করেছি, আজকের দাওয়াতে না খেলে ভালো হয়।' 'উমার (রা.) বললেন, 'কেন?' তিনি বললেন, 'আমার ভয় হয় এটি অহঙ্কার প্রদর্শনের কাজ।'[১৬২]

---

১৬১. ফাদাইলুস সাহাবাহ, নং ৭৭৩।
১৬২. ইমাম আহমদ, আয-যুহদ, ১২৬।

দানশীলতা ও বদান্যতার বিষয়ে এটিই ছিল 'উসমান (রা.)-এর উপলব্ধি। ইসলামে বদান্যতা বলতে দান করে কিংবা খাদ্য বিতরণ করে অহঙ্কার প্রদর্শন করাকে বুঝায় না। বদান্যতার প্রকাশ পাওয়া যায় অপচয়-অপব্যয় ছাড়া সম্পদ ব্যয়, আল্লাহ্‌র প্রতি শোকরগোজার থাকা ও মানুষের প্রতি বিনয় প্রদর্শনে।

আল-হামদানী বলেন, আমি 'উসমান (রা.)-কে মাসজিদে লেপ গায়ে ঘুমাতে দেখেছি, তখন তিনি খালীফা অথচ তার আশেপাশে কেউ নেই।[১৬৩]

মধ্যম আয়ের বা নিম্ন আয়ের কোন ব্যক্তি যদি দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি দেখায় তা আলোচনার বিষয় হয় না। কিন্তু 'উসমান (রা.)-এর মত ধনাঢ্য ব্যক্তি যখন পার্থিব ভোগ-বিলাসের ব্যাপারে অনাসক্তি প্রকাশ করেন তখন সেটি আলোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়। সম্পদের আধিক্য মানুষকে পার্থিব ভোগ-বিলাসের পথে ধাবিত করে। কিন্তু 'উসমান (রা.) ছিলেন ব্যতিক্রম। আখিরাতে আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাতের বিষয়টি সবসময় তাঁর মনে জাগরুক থাকত। পার্থিব ভোগ-বিলাসে নিরাসক্ত ছিলেন বটে, 'উসমান (রা.) কৃপণ ছিলেন না। ইসলামের জন্য সবচেয়ে বেশি দান করেছেন তিনি। যে ধনীরা আল্লাহর প্রিয়পাত্র হতে ইচ্ছুক 'উসমান (রা.) তাদের জন্য আদর্শস্থানীয় ছিলেন, বিপুল সম্পদের অধিকারী হয়েও ভোগবিলাস বর্জনের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন 'উসমান ইবনু 'আফ্ফান (রা.)।

সতের. শোকরগোজারী:

বচন, অন্তর, ও কর্মকাণ্ডের দ্বারা 'উসমান (রা.) আল্লাহর শোকর আদায় করতেন। একবার সন্দেহভাজন একটি দল পাকড়াও করার জন্য তাঁকে সংবাদ দেওয়া হল। তিনি তাদেরকে ধরার জন্য গেলেন, কিন্তু তিনি সেখানে পৌছার আগেই ওরা পালিয়ে গেল। নিজের হাতে কোন মুসলিম লাঞ্ছিত হয়নি বলে 'উসমান (রা.) একজন গোলাম আযাদ করে দিলেন।[১৬৪]

আঠার. জনগণের খোঁজ খবর নেওয়া:

শাসিতদের প্রতি 'উসমান (রা.) খুবই দয়ার্দ্র ছিলেন। তিনি সরকারী মেকানিজমের মাধ্যমে এবং ব্যক্তিগতভাবে নাগরিকদের খোঁজ খবর নিতেন, তাদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করার চেষ্টা করতেন। মূসা ইবনু তালহার সূত্রে ইমাম আহমদ (রহ) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি 'উসমান (রা.)-কে মিম্বারে দাঁড়িয়ে জনগণের হাল হাকিকত ও বাজার

---

১৬৩. প্রাগুক্ত, ১২৭।
১৬৪. 'উলুওউল হিম্মাহ, ৫:৪৮১।

মূল্যের খবরাখবর নিতে দেখেছেন।[১৬৫] ইবনু সা'দ বর্ণনা করেছেন, মূসা (রহ) বলেন, আমি এক জুমু'আর দিনে দেখলাম 'উসমান মিম্বারে দাঁড়িয়ে জনগণের খবরাখবর, বিশেষত অসুস্থদের খবর নিচ্ছেন।[১৬৬] জনগণের দুঃখ-দুর্দশা লাঘবে তিনি সদা সচেষ্ট থাকতেন, অভাবীদেরকে সাহায্য করতেন, নবজাতকের জন্য বাইতুল মাল থেকে দান করতেন। 'উরওয়া ইবনুয যুবাইর বলেন, আমি 'উসমান (রা.)-এর যুগ পেয়েছি, আমি দেখেছি তাঁর আমলে বাইতুল মালের সম্পদে প্রত্যেক মুসলিমের হক ছিল।[১৬৭]

উনিশ. যোগ্য ব্যক্তিদের কাছ থেকে সহযোগিতা গ্রহণ:

যোগ্য ব্যক্তিদের যথাযথ কর্মক্ষেত্রে নিয়োগ ও তাদের কাছ থেকে সেবা গ্রহণের মাধ্যমে আমাদের পূর্বসূরিগণ এই পৃথিবীতে সম্মান ও মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। 'উসমান (রা.)ও এই গুণের অধিকারী ছিলেন। কুরআন সংকলনের ক্ষেত্রে তিনি এ বিষয়ে সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি যায়িদ ইবনু সাবিত (রা.) ও তাঁর পারিষদকে কাজে লাগিয়েছিলেন।

এগুলো হল 'উসমান (রা.) -এর ব্যক্তিত্বে প্রকাশিত কিছু গুণাবলী যার মাধ্যমে তিনি মুসলিম নেতৃত্ব ও সর্বসাধারণের আদর্শস্থানীয় হয়েছিলেন। যাঁরা এই দুনিয়ায় নবী ও খুলাফা রাশিদূনের হিদায়াত অনুসরণ করতে চায় সেই সব মানুষের জন্য 'উসমান (রা.) আদর্শ ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছিলেন।

কবি, কবিতা ও 'উসমান (রা.):

'উসমান (রা.)-এর শাসনকাল তুলনামূলকভাবে দীর্ঘ হলেও কবি ও কবিতার সাথে 'উসমান (রা.)-এর সম্পৃক্ততার বিষয়ে খুব বেশি বর্ণনা আমাদের হস্তগত হয়নি। স্বল্পসংখ্যক বর্ণনা পর্যালোচনায় আমরা দেখতে পাই কবি ও কবিতা সম্পর্কে তাঁর মনোভাব রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও পূর্ববর্তী দু'খালীফার মনোভাবের চেয়ে ভিন্নতর ছিল না। তবে ব্যক্তিগত রুচি-অভিরুচি অনুযায়ী প্রত্যেকে কবিদের সাথে আচরণ প্রদর্শন করেছেন। আবূ বাক্র (রা.) বংশনামা সম্পর্কে ভাল জ্ঞান রাখতেন, কালেভদ্রে কবিদের সাথে বৈঠকে বসতেন এবং কবিতা আবৃত্তিও করতেন। উমার (রা.) কবিতা চর্চায় উৎসাহ দিতেন। আরবী ভাষার জটিল শব্দ ও বাক্যের অর্থ নির্ধারণে তিনি প্রাচীন কবিতার সাহায্য নিতেন। তাছাড়া তিনি নিজেও কবি ছিলেন। তবে 'উসমান (রা.) কবিতার সাথে খুব বেশি সম্পৃক্ত ছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। কবিদের ব্যাপারে এটি খুব ব্যাপক প্রচলিত বক্তব্য যে তারা দক্ষিণা লাভের আশায়

---

১৬৫. ফাদাইলুস সাহাবাহ, নং ৮১২

১৬৬. ইবনু সাদ, ৩:৫৯।

১৬৭. ইবনু শায়বা, আল-মুসান্নাফ ফীল হাদীস, ৩: ১০২৩।

শাসকদের দরবারে ভিড় জমাতেন। কিন্তু 'উসমান (রা.)-এর শাসনকাল সম্পর্কে বর্ণনাকারীরা আমাদেরকে ভিন্ন তথ্য জানাচ্ছেন। তাঁর আমলে কবিরা খালীফার দরবার ও শহর ছেড়ে গ্রামের দিকে ছুটেন।[১৬৮]

'উসমান কবি না হলেও কিছু চরণ রচনা করেছেন। নমুনাস্বরূপ কয়েকটি উল্লেখ করছি:

واعلم بأن الله ليس كصنعه   صنع ولا يخفى عليه ملحد

জেনে রেখো, আল্লাহ্‌র সৃষ্টির অনুরূপ কিছু নেই, নাস্তিকও তা জানে।

أرى الموت لا يُبقي عزيزا ولم يدع لعادٍ ملاذا في البلاد ومرتعا

শাহাদাতের প্রাক্কালে অবরুদ্ধ অবস্থায় 'উসমান (রা.) বলেছিলেন, 'আমি তো দেখছি মৃত্যু কোন বন্ধুকে অবশিষ্ট রাখে না, আর না কোন শত্রুর জন্য দেশে কোন আশ্রয়স্থল ও বিরচণক্ষেত্র রাখে।[১৬৯]

يبيت أهل الحصن والحصن مغلق ويأتي الجبالَ الموتُ شمراخَها العلا

দুর্গের দরজা বন্ধ করে দুর্গবাসী রাতযাপন করে, অথচ পর্বতের উঁচু চূড়ায় মৃত্যু নামে।[১৭০]

'উসমান (রা.) নিজে কবি ছিলেন না, কবিদের খাতিরও করেননি, তবুও তিনি বিরাট কাব্য আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন; তাঁর শাহাদাত মুসলিম উম্মাহকে এত বেশি নাড়া দিয়েছিলো যে বিপুল সংখ্যক কবি তাঁর মৃত্যুতে শোকগাথা রচনা করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে যে রাজনৈতিক বিভক্তি সৃষ্টি হয়েছিল তার পরিণতিতে বিপুল রাজনৈতিক কবিতা রচিত হয়েছিল।

---

১৬৮. ওয়াদিহ্ আস-সামাদ, আদাবু সাদরিল ইসলাম, ৯৯।
১৬৯. ইবনু কাসীর, আল-বিদায়াহ.., ৭: ১৯২।
১৭০. প্রাগুক্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

‘উসমান (রা.)-এর খিলাফাত ও শাসনপদ্ধতি

প্রথম পরিচ্ছেদ
'উসমান (রা.) খালীফা হলেন

এক. পরবর্তী খালীফা নির্বাচনে 'উমার (রা.) কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ:

দ্বিতীয় খালীফা 'উমার (রা.) ছুরিকাহত হয়ে যখন মৃত্যুযন্ত্রণায় কাতর ছিলেন তখনও তিনি মুসলিম উম্মাহ্‌র ঐক্য, সংহতি ও কল্যাণ কামনায় ব্যাপৃত ছিলেন। সেই সঙ্কটময় মুহূর্তে আল-ফারূক 'উমার (রা.) পরবর্তী খালীফা নির্বাচনের এক অভূতপূর্ব পন্থা উদ্ভাবনে সক্ষম হন। মৃত্যুশয্যায় 'উমার (রা.) কে পরবর্তী খালীফা নির্ধারণ করতে বলা হলে তিনি চিন্তাভাবনার জন্য কিছুক্ষণ সময় নেন। তারপর স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনায় অভূতপূর্ণ একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করেন যা পূর্ববর্তী পদ্ধতিগুলোর তুলনায় ভিন্নতর ছিল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সরাসরি কাউকে মনোনীত না করে মারা গেলেও পরবর্তী খালীফা নির্ধারণে খুব বেগ পেতে হয়নি। কারণ আবূ বাক্‌র (রা.)-এর শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে সামগ্রিকভাবে সাহাবায়ে কিরাম একমত ছিলেন। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ও বিভিন্ন সময় নানা ইঙ্গিতে আবূ বাক্‌র (রা.)-এর শ্রেষ্ঠত্বের সাক্ষ্য দিয়েছিলেন।

আবূ বাক্‌র (রা.) মৃত্যুর পূর্বেই শীর্ষস্থানীয় সাহাবায়ে কিরামের সাথে পরামর্শ করে উপলব্ধি করেন যে 'উমার (রা.)-এর নেতৃত্বের ব্যাপারে এক প্রকার মতৈক্য রয়েছে। তাই তিনি নির্দ্বিধায় 'উমার (রা.) কে পরবর্তী খালীফা হিসেবে নির্ধারণ করেন। এ বিষয়ে কোন মতভেদ হয়নি। তাই বলা যায়, 'উমার (রা.) এর খিলাফাতের বিষয়ে সাহাবায়ে কিরামের 'ইজমা' সম্পাদিত হয়েছে। 'উমার (রা.) একটি সমন্বিত পন্থা উদ্ভাবন করলেন: খালীফা নির্বাচনের জন্য পরামর্শ সভার সদস্য নির্ধারণ করলেন, পরামর্শ পদ্ধতি ঠিক করে দিলেন, খালীফা নির্বাচনের প্রয়োজনীয় ভোট সংখ্যা নির্ধারণ করে দিলেন, আবার পক্ষে-বিপক্ষে সমান ভোট হলে কাস্টিং ভোট প্রদান-পদ্ধতি ঠিক করে দিলেন। শুধু তাই নয় পরামর্শ সভার সদস্যদের নিরাপত্তার জন্য সৈনিক নিযুক্ত করলেন, খালীফা নির্বাচন প্রক্রিয়া বানচাল বা নির্বাচিত খালীফার বিরোধিতা করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের কঠোর হাতে দমনের নির্দেশও প্রদান করেন। নিম্নে পুরো প্রক্রিয়ার বিবরণ প্রদত্ত হল:

ক. দু'জনের কেউ বেঁচে থাকলে তাকে খালীফা বানাতাম:

ছুরিকাহত হওয়ার পর 'উমার (রা.)-কে পরবর্তী খালীফা নিয়োগের জন্য অনুরোধ করা হলে তিনি বললেন, 'আমি কাকে খালীফা হিসেবে মনোনয়ন দেব? যদি আবূ 'উবাইদা (রা.) বেঁচে থাকতেন তাহলে তাঁকে আমি খালীফা মনোনীত করতাম। আমি তো রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি,

إنه أمين هذه الأمة

নিশ্চয় সে এই উম্মাহ্-এর বিশ্বস্ত।[১]

আবূ হুযাইফার আযাদকৃত গোলাম সালিম[২] (রা.) বেঁচে থাকলে আমি তাঁকে খালীফা হিসেবে মনোনয়ন দিতাম। আমার রব্ যদি এজন্য আমাকে প্রশ্ন করতেন তাহলে আমি এই বলে জবাব দিতাম যে: আমি আপনার রাসূলকে এই কথা বলতে শুনেছি যে:

إن سالما شديد الحب لله

নিশ্চয় সালিম (রা.) আল্লাহ্‌কে খুব ভালোবাসে।[৩]

খ. স্বীয় পুত্রকে খালীফা নিয়োগের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান:

তারপর 'উমার (রা.)-কে প্রস্তাব দেওয়া হয় তিনি যেন আপন পুত্র 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.)-কে খালীফা হিসেবে নিয়োগ দেন। 'উমার (রা.) অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। প্রস্তাবকের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন,

قاتلك الله؛ والله ما أردتَ الله بهذا، ويحك! كيف أستخلف رجلا عجز عن طلاق امرأته! لا أَرَبَ لنا في أموركم، ما حمدتها فأرغبَ فيها لأحد من أهل بيتي؛ وإن كان خيرا فقد أصبنا منه، وإن كان شرا فشرعنا آل عمر؛ بحسب آل عمر أن يحاسب منهم رجل واحد؛ ويسأل عن أمر أمة محمد؛ أما لقد جهدت نفسي، وحرمت أهلي؛ وإن نجوت كفافا لا وزر ولا أجر وإني لسعيد؛ وأنظر فإن استخلفت فقد استخلف من هو خير مني، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، ولن يضيع الله دينه.

আল্লাহ্ তোমাকে অভিশপ্ত করুন! এই প্রস্তাবের মাধ্যমে তুমি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করতে চাওনি। তোমার জন্য আফসোস! এমন এক ব্যক্তিকে আমি কিভাবে খালীফা মনোনীত করি যে কিনা নিজ স্ত্রীকে তালাক দিতে অক্ষম![৪] তোমাদের বিষয়ে (রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্জনে) আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। এই দায়িত্ব পালন করে আমি প্রশংসিত হইনি; অতএব আমার পরিবারের কারো দায়িত্ব লাভের ব্যাপারে আমি আগ্রহী নই। এতে যদি কল্যাণ থাকে তবে আমরা তা ইতোমধ্যে লাভ করেছি, আর যদি অকল্যাণ থাকে তবে তা

---

১. সাহীহুল বুখারী, কিতাবুল মানাকিব, ২:২৭৬।
২. সালিম (রা.), কুরাইশ গোত্রভুক্ত ছিলেন না; এদতসত্ত্বেও 'উমার (রা.) তাঁকে খালীফা মনোনীত করার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন। এতে বুঝা যায়, খালীফা কুরাইশভুক্ত হতে হবে, এটি 'উমার (রা.) বাধ্যতামূলক মনে করতেন না।
৩. আত-তাবারী, ৪: ২২৭-২৮; ইবনুল আসীর, ২:৩৬৭-৬৮।
৪. এটি একটি রূপক বক্তব্য; এর অর্থ এই নয় যে, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার স্ত্রী তালাক দিতে পারলে 'উমার (রা.) তাকে খালীফা বানাতেন। পরবর্তী বক্তব্য হতে এটি পরিষ্কার যে, 'উমার (রা.) মুসলিমদের ওপর বংশানুক্রমিক শাসন চাপিয়ে দিতে চাননি বলেই তাঁর পুত্রকে খালীফা হিসেবে মনোনয়ন দেননি।

> আমাদের দিক হতে ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে।[৫] 'উমার পরিবারের জন্য এটাই যথেষ্ট যে তাঁদের একজনকেই উম্মাতে মুহাম্মাদ সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। এই দায়িত্ব পালনে আমি সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করেছি এবং আমার পরিবারকে বঞ্চিত করেছি; আমি যদি সামান্য ব্যবধানে কোন পাপ-বোঝা ও পুণ্য-প্রতিদান ব্যতীত মুক্তি লাভ করি তবুও নিজেকে ভাগ্যবান মনে করব। আমি চিন্তাভাবনা করে দেখি; আমি যদি কাউকে খালীফা নিযুক্ত করে যাই তাহলে কোন অসুবিধা নেই, আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ যিনি (অর্থাৎ আবূ বাক্‌র), তিনিও খালীফা নিযুক্ত করেছিলেন। আর আমি যদি কাউকে খালীফা নিয়োগ না করি তাতেও কোন অসুবিধা নেই, আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ আরেকজন (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্) কোন খালীফা নিযুক্ত না করেই মারা গেছেন। আল্লাহ্ কিছুতেই তাঁর দীনকে ধ্বংস হতে দেবেন না।[৬]

'উমার (রা.)-এর এই বক্তব্য শুনে প্রস্তাবকসহ অন্যরা বের হয়ে গেল।

গ. ছয় সদস্যের নির্বাচক পরিষদ গঠন:

তারপর তাঁকে আবারো খালীফা নিয়োগের পরামর্শ দেওয়া হয়। 'উমার (রা.) কোন একক মনোনয়ন দিলেন না; বরং ছয় সদস্যের নির্বাচক পরিষদ গঠন করলেন; পরিষদে তিনি তাঁদেরকেই অন্তর্ভুক্ত করলেন যারা জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত বা আশারা মুবাশ্‌শারার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং মৃত্যুর সময় রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এঁদের ওপর সন্তুষ্ট ছিলেন। এঁরা হলেন: (১) আলী ইবনু আবি তালিব (রা.), তাঁর অনুরূপ হলেন (২) আয-যুবাইর ইবনুল 'আওয়াম (রা.), (৩) 'আবদুর রহমান ইবনু 'আওফ (রা.), ও তাঁর অনুরূপ (৪) 'উসমান ইবনু 'আফ্‌ফান (রা.), (৫) তালহা ইবনু 'উবাইদিল্লাহ (রা.) ও তাঁর অনুরূপ (৬) সা'দ ইবনু মালিক[৭] (রা.)। আশারা মুবাশ্‌শারার অন্যতম সদস্য সা'ঈদ ইবনু যায়িদ (রা.)-কে তিনি পরামর্শ সভায় অন্তর্ভূত করেননি। সা'ঈদ (রা.) ছিলেন 'উমার (রা.)-এর চাচাতো ভাই। শাসনকাজ পরিচালনায় 'উমার (রা.)-এর একটি কর্মনীতি ছিল এই যে, তিনি নিজ আত্মীয়স্বজন ও আপন গোত্রের লোকদেরকে কোন রাষ্ট্রীয় পদ ও দায়িত্বে নিয়োগ করতেন না। নির্বাচক পরিষদে সংখ্যাতিরিক্ত সদস্য হিসেবে তিনি 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.)-কে নিয়োগ দিলেন, যিনি পরামর্শ দিতে পারবেন কিন্তু খালীফা হওয়ার জন্য প্রার্থী হতে পারবেন না।[৮]

ঘ. খালীফা নির্বাচন পদ্ধতি:

ঐ সময় তালহা ইবনু 'উবাইদিল্লাহ (রা.) মাদীনার বাইরে ছিলেন। বাকি

---

৫. খালীফা হিসেবে দায়িত্ব পালন যদি কল্যাণকর হয় তবে আমরা তা অর্জন করেছি; আর যদি তাতে অকল্যাণ থাকে তবে আমার মৃত্যুর মাধ্যমে তার অবসান হবে।

৬. আত-তাবারী, ৪:২২৮; ইবনুল আসীর, ২:৩৬৮।

৭. ইনি সা'দ ইবনু আবি ওয়াক্কাস (রা.); আবূ ওয়াক্কাসের প্রকৃত নাম ছিল মালিক। [আয-যাহাবী ৩:২৩০।]

৮. ইবনু কাসীর, ৭:১৪৪-৪৫; ইবনুল আসীর, ২:৩৬৮; আত-তাবারী, ৪:২২৮; ইবনু সা'দ, ৩:৬১; সাহীহুল বুখারী, কিতাবুল মানাকিব, ২:২৬৭।

পাঁচজনকে ডেকে 'উমার (রা.) বললেন, 'আমি অনেক চিন্তাভাবনা করে দেখতে পেলাম যে তোমরাই হলে জননেতা; রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মৃত্যুর সময় তোমাদের ওপর সন্তুষ্ট ছিলেন। তোমরা ঠিক থাকলে জনগণ নিয়ে আমার কোন উৎকণ্ঠা নেই। কিন্তু তোমাদের মতভেদের ব্যাপারে আমার ভয় হয়; তোমরা মতভেদ করলে জনগণ বিভক্ত হয়ে যাবে। তোমরা 'আয়িশা (রা.)-এর কক্ষে (তার অনুমতি সাপেক্ষে) বসে পরামর্শ কর এবং আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে নির্বাচিত কর।' এতটুকু বলার পর রক্তশূন্যতার কারণে তাঁর মাথা হেলে পড়ে।[৯]

ঙ. বিভক্ত মতের সময় করণীয়:

নির্বাচকমণ্ডলীর ছয় সদস্যের মধ্যে চার বা ততোধিক সদস্যের ভোটে খালীফা নির্বাচিত হতে পারেন। কিন্তু তিন তিন করে ভোট ভাগ হয়ে গেলে অচলাবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। এই সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থাও 'উমার (রা.) করেছিলেন। কাস্টিং ভোট দেওয়ার দায়িত্ব দেন 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.)-কে। অর্থাৎ দু'জন ব্যক্তি যদি তিনটি করে ভোট পেয়ে থাকেন তবে 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.) যাঁকে সমর্থন করবেন তিনিই খালীফা নির্বাচিত হবেন। তবে 'উমার-পুত্র 'আবদুল্লাহ্ কিছুতেই খালীফা হতে পারবে না। 'উমার (রা.) আরো একটি বিকল্প ব্যবস্থা স্থির করেছিলেন: 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.)-এর ভোটেও যদি সমস্যার সমাধান না হয় তবে 'আবদুর রহমান ইবনু 'আউফ (রা.) যে পক্ষে থাকবেন তাকেই যেন খালীফা নির্বাচিত করা হয়। ইবনু 'আউফ (রা.)-কে তিনি ন্যায়পরায়ণ বলে আখ্যা দেন:

ونعم ذو الرأي عبد الرحمن بن عوف مسدد رشيد، له من الله حافظ، فاسمعوا منه

> 'আবদুর রহমান ইবনু 'আউফ কতই না উত্তম মতপ্রদানকারী, সত্যপন্থী ও ন্যায়পরায়ণ! আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তার হিফাযতকারী রয়েছে; অতএব, তোমরা তার কথা শুন।[১০]

চ. আনুগত্যহীনতার ব্যাপারে সাবধানবাণী:

নির্বাচক পরিষদ সর্বসম্মতভাবে বা সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে খালীফা নির্ধারণের পর কেউ যদি নবনির্বাচিত দায়িত্বশীলের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনে বিমুখ হয় তাহলে তাকে কঠোর হস্তে দমন করার নির্দেশ দেন 'উমার (রা.)। নির্বাচিত খালীফার প্রতি আনুগত্য প্রকাশে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন রাষ্ট্রদ্রোহিতার শামিল; সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার স্বার্থে আনুগত্য প্রত্যাখ্যানকারীর গর্দান উড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন 'উমার (রা.)।[১১]

---

৯. আত-তাবারী ৪:২২৮-২৯; ইবনুল আসীর ২:৩৬৮।
১০. আত্-তাবারী, ৪: ২২৯।
১১. প্রাগুক্ত।

ছ. পরামর্শের মেয়াদঃ

একটি রাষ্ট্র দীর্ঘদিন নেতৃত্বহীন অবস্থায় থাকতে পারে না। কারণ খালীফা নির্বাচনে দীর্ঘসূত্রিতার কারণে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ার আশংকা থাকে। এজন্য 'উমার (রা.) পরামর্শ করার জন্য সময় নির্ধারণ করে দেন। তিনি নির্দেশ দেন তাঁর মৃত্যুর তিনদিনের মধ্যে পরামর্শ শেষ করে যেন একজন খালীফা নির্বাচন করা হয়:

لايأتي اليوم الرابع إلا وعليكم أمير

চতুর্থ দিন আসার আগেই যেন তোমাদের একজন আমীর থাকে।[১২]

জ. অন্তর্বর্তী ইমাম সুহাইব (রা.):

খালীফার অন্যতম দায়িত্ব হচ্ছে সালাতে ইমামতি করা। আহত হওয়ার কারণে 'উমার (রা.)-এর পক্ষে সালাতে ইমামতি করা সম্ভব ছিল না। পরবর্তী খালীফা নির্বাচনের পূর্ব পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালের জন্য তিনি একজন ইমাম নিযুক্ত করলেন। সুহাইব আর-রূমীকে এই তিনদিন সালাতে ইমামতির নির্দেশ দেওয়া হল।[১৩]

ঝ. নির্বাচক পরিষদের নিরাপত্তার দায়িত্বে আবূ তালহা আনসারী (রা.):

নির্বাচক পরিষদ নিয়োগের পর 'উমার (রা.) তাঁদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করলেন। আবূ তালহা আল-আনসারী (রা.)-কে ডেকে বললেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের মাধ্যমে ইসলামকে শক্তিশালী করেছেন, পঞ্চাশজন আনসারী নিয়ে একটি দল গঠন করে নির্বাচক পরিষদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা কর; আমার ধারণা তাঁরা শীঘ্রই কোন ঘরে মিলিত হবে। তোমাদের সাথীদের নিয়ে দোরে অবস্থান কর; আহলুশ শূরা নয় এমন কাউকে তথায় প্রবেশ করতে দিও না। তিনদিন অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই যেন তারা খালীফা নির্বাচন সম্পন্ন করে। আল্লাহর দোহাই, আমার প্রতিনিধি হিসেবে তুমি এই খিদমাতটুকু আঞ্জাম দাও।'[১৪]

ঞ. আল-মিকদাদ ইবনু 'আমর (রা.) ছিলেন হুইপের দায়িত্বেঃ

আল-মিকদাদ ইবনু 'আমর (রা.)-কে ডেকে 'উমার (রা.) বললেন, 'আমাকে কবরস্থ করার পর তুমি এই দলটিকে (নির্বাচক পরিষদের সদস্যদেরকে) একটি ঘরে অধিবেশনে মিলিত হওয়ার ব্যবস্থা কর। তাঁরা একজন খালীফা নির্ধারণ করা পর্যন্ত এই দায়িত্বটুকু পালন কর।'[১৫] আল-মিকদাদের ওপর খালীফা যে দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন আধুনিক সংসদীয় ব্যবস্থায় তা হুইপের দায়িত্ব।

---

১২. ইবনু সা'দ, ৩:৬২।
১৩. আত-তাবারী, ৪:২২৯; ইবনু সা'দ, ৩:৬১; ইবনুল আসীর, ২:৩৬৮; ইবনু কাসীর, ৭:১৪৫।
১৪. আয-যাহাবী, ৩: ১০১-০২; ইবনু সা'দ উল্লেখ করেছেন যে, 'উমার (রা.) মৃত্যুর এক ঘন্টা পূর্বে আবূ তালহাকে এই দায়িত্ব দিয়েছিলেন। ইবনু সা'দ, ৩:৬১-২।
১৫. আত-তাবারী, ৪:২২৯; ইবনুল আসীর ২:৩৬৯।

ট. পরামর্শ ছয়জনে সীমাবদ্ধ ছিল না:

ছয় সদস্যের নির্বাচক পরিষদ গঠন করা হলেও পরামর্শ ছয়জনে সীমাবদ্ধ ছিল না। 'উমার (রা.) নিজেও এটি জানতেন। কারণ কোন এক বিষয়ে ছয়জন লোকের পরামর্শের জন্য তিনদিন সময়ের প্রয়োজন ছিল না। জনসাধারণের পরামর্শ গ্রহণের জন্য এই সময় দেওয়া হয়েছিল। আবার তিনদিনের বেশি সময় দেওয়াও সম্ভব ছিল না। এত বড় রাষ্ট্র খালীফা ছাড়া বেশি দিন পরিচালিত হতে পারত না। তবে রাষ্ট্রের বিশালতা ও সময়স্বল্পতার কারণে কেবল খিলাফাতের রাজধানী মাদীনার জনগণের কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়া হয়। তাছাড়া পরামর্শদানের যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ তথা সাহাবায়ে কিরামের বড় অংশ মাদীনায় বসবাস করতেন। 'উমার (রা.) তাঁদেরকে নিজের কাছে রেখেছিলেন এবং মাদীনা ছেড়ে বাইরে যেতে দেননি।

ঠ. আহলুশ শূরা-ই ছিল সর্বোচ্চ রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ:

'উমার (রা.) নির্বাচক পরিষদের সদস্যদের হাতে তাঁদের মধ্য থেকে একজন খালীফা নির্বাচনের ক্ষমতা অর্পণ করেন। এই ছয়জনের সবাই জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত। তাছাড়া জ্ঞানগরিমা ও তাকওয়া-পরহেজগারীতে তাঁরাই ছিলেন শীর্ষস্থানীয়। তাঁর এই প্রক্রিয়া কেউ চ্যালেঞ্জ করেননি। ছয় বিশিষ্ট সাহাবী বা মাদীনায় অবস্থানরত অন্য কোন সাহাবী বা কোন ব্যক্তি খালীফা নির্বাচনে উমার (রা.) কর্তৃক গৃহীত কর্মপন্থার সমালোচনা বা প্রতিবাদ করেননি। কেউ নতুন কোন প্রস্তাবও উত্থাপন করেননি। বিষয়টিকে আমরা এভাবে বলতে পারি, 'উমার (রা.) একটি সর্বোচ্চ রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ গঠন করলেন যার দায়িত্ব ছিল নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে খালীফা বা রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচন। উমার (রা.) প্রবর্তিত এই নতুন সাংবিধানিক ব্যবস্থাপনা নেতৃত্ব নির্বাচনের ইসলামী মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক নয়। কারণ খালীফা নির্বাচন চূড়ান্ত হবে জনগণের বাই'আতের মাধ্যমে। সুতরাং এই প্রশ্ন করা অবান্তর যে কে 'উমার (রা.)-কে এই ক্ষমতা দিল? তাঁর এই পদক্ষেপের উৎস কি? আমাদের জন্য এটাই যথেষ্ট যে তাঁর গৃহীত পদক্ষেপ সর্বজন গৃহীত হয়েছিল। বিরোধী কোন কণ্ঠের আওয়াজ শুনা যায়নি। ফলে আমরা বলতে পারি 'উমার (রা.)-এর পদক্ষেপের সঠিকতার ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরামের 'ইজমা সম্পন্ন হয়েছিল যা ইসলামী শারী'আহ-এর অন্যতম উৎস।[১৬] এই বিষয়টি অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে, 'উমার (রা.) ছিলেন সত্যপন্থী (রাশিদ) খালীফা। এটিও জোর দিয়ে বলা যায়, যে মূলনীতিটি 'উমার (রা.) প্রয়োগ করেছিলেন 'মাজলিসে শূরা বা সর্বোচ্চ রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ' সেটি খিলাফাতে রাশিদার সময়ে ইসলামী শাসনব্যবস্থার অন্যতম মূলনীতি ছিল। খালীফা নির্বাচনের জন্য 'উমার যে কর্তৃপক্ষটি গঠন করে তার সদস্যরা এমন একটি মর্যাদার অধিকারী ছিলেন অন্য মুসলিমগণ যার অধিকারী ছিলেন না-তারা ছিলেন

---

১৬. যাফির আল-কাসিমী, নিযামুল হুকম ফীশ-শারী'আতি ওয়াত-তারীখিল ইসলামী, ১:২২৭-২৮।

জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত। এটি আল্লাহ-প্রদত্ত মর্যাদা যার ঘোষণা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দিয়েছিলেন। এই দশজন তাকওয়া ও আমানতের যে স্তরে উন্নীত হয়েছিলেন অন্য মুসলিমদের পক্ষে সে পর্যায়ে উন্নীত হওয়া সম্ভব ছিল না।[১৭]

'উমারের (রা.) জীবনের শেষ ক'টি দিন এভাবেই অতিবাহিত হয়। আহত হয়ে ভীষণ অসুস্থ হওয়া সত্ত্বেও তিনি উম্মাহর কল্যাণে দায়িত্ব পালন হতে বিমুখ হননি। শুধু তাই নয়, তিনি অভূতপূর্ব অথচ যুগোপযোগী একটি নির্বাচন পদ্ধতিও প্রবর্তন করতে সক্ষম হন। পরামর্শের মূলনীতি তো আলকুরআনে বর্ণিত ছিল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাচনিক ও কার্যমূলক সুন্নাহ-এ পরামর্শ মূলনীতির প্রয়োগ ছিল। আবূ বাক্‌রও (রা.) খিলাফাত পরিচালনায় এই মূলনীতি প্রয়োগ করেছেন। পরামর্শের ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় কার্য সম্পাদন এমন অভিনব কোন বিষয় নয় যেটি 'উমার (রা.) আবিষ্কার করেছিলেন। 'উমার (রা.)-এর কৃতিত্ব এখানে যে তিনি এই মূলনীতি প্রয়োগের যুৎসই ও যুগোপযোগী পদ্ধতি আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর এই নব আবিষ্কার কতইনা উত্তম আবিষ্কার!

দুই. পরবর্তী খালীফার প্রতি উমার (রা.)-এর উপদেশ:

পরবর্তী খালীফার প্রতি 'উমার (রা.) দিকনির্দেশনামূলক যে ওয়াসীয়াত করেন তার বিবরণ প্রদত্ত হল:

আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি যে তুমি একক, অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌কে ভয় করবে। আমি তোমাকে আরো উপদেশ দিচ্ছি যে তুমি প্রাথমিক যুগের মুহাজিরদের সাথে সদাচরণ করবে, তাদের অগ্রবর্তিতার স্বীকৃতি দেবে। আনসারদের সাথে ভালো আচরণের উপদেশ দিচ্ছি; তাঁদের মাঝে যারা সৎকর্মশীল তাদেরকে সাদরে গ্রহণ করো আর কেউ ভুল করলে ক্ষমা করে দেবে। আমি তোমাকে এই উপদেশ দিচ্ছি যে, তুমি শহরবাসীর সাথে সদাচরণ করবে; কারণ তারা শত্রুকে প্রতিহত করে এবং কর আদায় করে। সম্মতি ছাড়া তাদের ওপর কোন বোঝা চাপিয়ে দিয়ো না। তোমার প্রতি আমার উপদেশ এই যে তুমি গ্রামবাসীর সাথে সদাচরণ করবে; তারা অবিমিশ্র আরব ও ইসলামের মূল, তাদের অতিরিক্ত সম্পদ তাদের দরিদ্রদের মাঝে বিলিয়ে দেবে। জিম্মীদের সাথে ভাল আচরণ করবে, তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে, তারা যদি স্বেচ্ছায় স্বহস্তে বিনয়ী ভঙ্গিতে মুমিনদের প্রাপ্য আদায় করে তবে তাদের ওপর সাধ্যাতীত বোঝা চাপিয়ে দিয়ো না। তোমাকে আবারো আল্লাহ্‌কে ভয় করার উপদেশ দিচ্ছি, সতর্কতার সাথে তাঁর ক্রোধ থেকে বেঁচে থাকবে, তোমার কোন সন্দেহপ্রবণ আচরণ যেন তাঁর কাছে প্রকাশিত না হয়। আমি তোমাকে এই উপদেশ দিচ্ছি যে, মানুষের সাথে আচরণের বিষয়ে আল্লাহকে ভয়

---

১৭. প্রাগুক্ত, ১:২২৯।

করবে। কিন্তু আল্লাহর অধিকার আদায় করতে গিয়ে মানুষকে ভয় করো না। শাসিতদের সাথে ইনসাফপূর্ণ আচরণের উপদেশ দিচ্ছি, তাদের প্রয়োজন পূরণে সক্রিয় হবে। ধনীকে দরিদ্রের ওপর প্রাধান্য দিয়ো না। যদি তুমি এগুলো পালন করতে পার তবে আল্লাহ্ চান তো তোমার অন্তর প্রশান্তি লাভ করবে, তোমার বোঝা হালকা হবে এবং তোমার শেষ পরিণতি কল্যাণময় হবে যখন তুমি সেই সত্তার সান্নিধ্যে পৌঁছবে যিনি তোমার গোপনীয়তা জানেন এবং তোমার ও তোমার অন্তরের মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে থাকেন। আমি তোমাকে আল্লাহ্র নির্দেশ বাস্তবায়নে কঠোর হওয়ার নির্দেশ দিচ্ছি, আল্লাহ-নির্দেশিত হদ ও নাফরমানির ব্যাপারে কঠোর হবে, সে ব্যক্তি কাছের হোক কিংবা দূরের, আত্মীয়-পড়শি হোক কিংবা অপরিচিত। কারো অপরাধের সমুচিত শাস্তি দেয়ার ক্ষেত্রে কোমলতা যেন তোমাকে পেয়ে না বসে। সকল মানুষকে সমান দৃষ্টিতে দেখবে। কারো ওপর কোন হক বর্তালে তা আদায়ে পরোয়া করো না। আল্লাহর ব্যাপারে নিন্দুকের নিন্দা যেন তোমাকে পেয়ে না বসে।

মু'মিনদেরকে আল্লাহ যে সম্পদ দিয়েছেন তার তত্ত্বাবধানের ক্ষেত্রে স্বজনপ্রীতি হতে বিরত থাকবে। যদি স্বজনপ্রীতি কর তবে তুমি বাড়াবাড়ি ও যুল্ম করবে এবং তুমি নিজেকে বঞ্চিত করবে ঐ নিয়ামত হতে আল্লাহ যা দিয়ে তোমাকে ভরিয়ে দিয়েছেন। তুমি দুনিয়া ও আখিরাতের একটি মানযিলে উপনীত হয়েছ; তুমি যদি দুনিয়ায় ইনসাফ কায়েম ও সংযম অর্জন করতে পার তাহলে তুমি ঈমান ও সন্তুষ্টি কামাই করবে। আর প্রবৃত্তি যদি তোমার ওপর বিজয়ী হয় তবে তুমি আল্লাহর ক্রোধ কামাই করবে। আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, তুমি নিজেকে বা অন্য কাউকে জিম্মীদের ওপর অত্যাচারের সুযোগ দেবে না। আমি তোমাকে উপদেশ ও নসিহত করলাম, এগুলো পালন করে তুমি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও আখিরাতের সাফল্য অর্জন করবে। তোমাকে আমি ঐ নির্দেশনাই দিয়েছি যা আমি নিজেকে ও আপন পুত্রকে দিয়ে থাকি। আমার উপদেশ অনুসারে যদি কাজ কর আর আমার নির্দেশ বাস্তবায়ন কর তাহলে তুমি সাফল্যের পূর্ণ অংশ লাভ করবে। আর তুমি যদি এগুলো গ্রহণ না কর এবং এই উপদেশগুলো যদি তোমার কাছে কোন গুরুত্ব বহন না করে তাহলে তা তোমার ক্ষতির কারণ হবে আর তোমার এহেন সিদ্ধান্ত হবে বিভ্রাটগ্রস্ত।

সকল পাপের মূল হল ইবলিসঃ সে ধ্বংসের পথে আহবানকারী, তোমাদের পূর্ববর্তী অনেক প্রজন্মকে ধ্বংস করে নিকৃষ্টতম ঘাট তথা জাহান্নামে নামিয়েছে। কোন মানুষের ললাট লিখন যদি হয় আল্লাহর দুশমনি তথা শাইতানের বন্ধুত্ব তাহলে তা হবে অত্যন্ত নিকৃষ্ট মূল্য। শাইতান তো পাপ ছাড়া অন্য কিছুর রাস্তা দেখাতে পারে না। তারপর আমি তোমাকে এই উপদেশ দিচ্ছি যে, তুমি সত্যের বাহনে আরোহন করবে এবং সত্যের পথে প্রয়োজন হলে বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়বে। নিজের জন্য নিজেই উপদেশ-

দানকারী হবে। আল্লাহর ওয়াস্তে তোমার কাছে মিনতি করি, মুসলিম জামা'আতের ওপর তুমি দয়াপরবশ হবে, বড়দেরকে সম্মান করবে, ছোটদেরকে স্নেহ করবে, জ্ঞানীদেরকে যথোপযুক্ত মর্যাদার আসনে অভিষিক্ত করবে। মুসলিম জনগোষ্ঠীর কোন ক্ষতি করো না, অন্যথায় তুমি তাদেরকে অপমান করবে। রাষ্ট্রীয় সম্পদ থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করে নিজে আত্মসাৎ করো না, অন্যথায় তাদেরকে তুমি ক্রুদ্ধ করবে। যারা ছাদাকা পাওয়ার হকদার তাদেরকে পাওনা হতে বঞ্চিত করো না, অন্যথায় তুমি তাদেরকে দরিদ্র বানিয়ে ফেলবে। তাদেরকে সেনাবাহিনীতে দীর্ঘদিন আটকে রেখো না, তাহলে তাদের বংশধারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। জনগণের সম্পদ যেন শুধু ধনীদের মাঝে আবর্তিত না হয়। তোমার দ্বার যেন তাদের সামনে রুদ্ধ না হয়। জনসাধারণের খোঁজখবর না নিয়ে তুমি যদি দ্বার রুদ্ধ করে বসে থাক, তবে ধনীরা দরিদ্রদেরকে খেয়ে ফেলবে। তোমাকে আমি এই উপদেশ দিলাম আর এ ব্যাপারে আল্লাহকে সাক্ষী বানালাম। আমার সালাম নিও।[১৮]

'উমার (রা.)-এর উপদেশে বর্ণিত সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়সমূহ:

১. তাকওয়া ও পরহেজগারী অবলম্বন, প্রকাশ্যে-গোপনে ও কথায়-কাজে আল্লাহকে ভয় করা।

২. আত্মীয়-অনাত্মীয় ও পরিচিত-অপরিচিত নির্বিশেষে সকলের ওপর সমতা ও ন্যায্যতার সাথে শারী'আতের বিধান প্রয়োগ করা।

৩. ইস্তিকামাত তথা স্থিতধী হওয়া। এটি একজন শাসকের অপরিহার্য গুণ।

৪. ইনসাফ কায়েম করা; কারণ এটি শাসনকাজের ভিত্তি।

৫. প্রাথমিক যুগের মুহাজির ও আনসারদের সাথে সদাচরণ করা; এরাই ইসলামের বাহক ও সংরক্ষক।

৬. সেনাবাহিনীকে যথোপযুক্ত পন্থায় প্রস্তুত করা, তাদের প্রয়োজন পূরণে সচেষ্ট হওয়া।

৭. সৈনিকদেরকে দীর্ঘদিন স্ত্রী ও পরিবারের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন না রাখা।

৮. প্রত্যেক যোদ্ধাকে গানীমত ও ফাই-এর ন্যায্য অংশ দেওয়া।

৯. জনগণের মাঝে ইনসাফ ও সমতার ভিত্তিতে সম্পদ বণ্টনে সচেষ্ট হওয়া, সম্পদ যেন শুধু ধনীদের মাঝে আবর্তিত না হয়।

১০. জিম্মীদের ওপর সাধ্যাতীত করের বোঝা না চাপানো যদি তারা রাষ্ট্রের পাওনা আদায় করে।

১১. জনসাধারণকে গুরুত্ব দেওয়া, তাদের প্রয়োজন পূরণে খোঁজখবর নেওয়া, তাদের অধিকার প্রদান।

---

১৮. ইবনু সা'দ, ৩:৩৩৯; আল-জাহিয, আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, ২:৪৬; ইবনুল আসীর, ২:২১০; সাহীহুল বুখারী, ২:২৬৭।

১২. স্বজনপ্রীতি বর্জন, প্রবৃত্তির অনুসরণ না করা, স্বজনপ্রীতি সমাজকে দূষিত করে ও সামাজিক সম্পর্কে অস্থিরতা সৃষ্টি করে।

১৩. জনসাধারণকে সম্মান করা, তাদের সাথে সবিনয় ব্যবহার, বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও ছোটদেরকে স্নেহ করা, এতে শাসক-শাসিতের সম্পর্ক মজবুত হয় ও ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়।

১৪. জনসাধারণের জন্য নিজের দ্বার উন্মুক্ত রাখা, তাদের অভাব-অভিযোগ শোনা ও সমাধানের চেষ্টা করা জনসাধারণের সামনে দ্বাররুদ্ধ করলে দরিদ্রদের ওপর ধনীদের নির্যাতন বেড়ে যায়।

১৫. সত্যের অনুসরণ, রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে সত্য প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হওয়া।

১৬. সব ধরনের যুল্ম পরিহার করা, বিশেষত জিম্মীদের ওপর যুল্ম না করা; কারণ জনসাধারণের মাঝে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা রাষ্ট্রের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

১৭. গ্রামীণ জনগোষ্ঠী ও বেদুইনদের বিষয়ে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া।

তিন. 'আবদুর রহমান ইবনু 'আউফ (রা.) কর্তৃক পরামর্শ-কার্যক্রম পরিচালনা:[১৯]

ক. পরামর্শ সভার সদস্যদের বৈঠক:

উমার (রা.)-এর লাশ দাফন[২০] হওয়ার পর নির্বাচক পরিষদের সদস্যরা আল-মিসওয়ার ইবনু মাখরামা (রা.)-এর ঘরে বৈঠকে বসলেন।[২১] বৈঠকে তারা খালীফা নির্বাচনের উপায় নিয়ে আলোচনা করলেন। ঐ সময় মুসলিম উম্মাহ্‌র কাছে এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয় ছিল না। আলোচনা শেষে তারা এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যা সর্বসাধারণের জন্য কল্যাণকর বলে প্রমাণিত হয়েছিল।

খ. আবদুর রহমান ইবনু 'আউফ (রা.) প্রার্থিতা প্রত্যাহারের আহবান জানালেন:

নির্বাচক পরিষদের ছয় সদস্যই খালীফা হওয়ার যোগ্য ছিলেন। পরামর্শ কর্ম সহজে সুসম্পন্ন করার জন্য 'আবদুর রহমান ইবনু 'আউফ (রা.) প্রথমে প্রার্থী সংখ্যা কমিয়ে আনার প্রস্তাব দিয়ে বললেন, 'তোমরা প্রার্থী সংখ্যা তিন-এ নামিয়ে আন।' আয্-

---

১৯. 'উমার (রা.) কর্তৃক পরামর্শ পরিষদ গঠিত হওয়ার অব্যবহিত পরেই পরিষদের সদস্যরা বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন। কিন্তু বৈঠকের আওয়াজ আহত ও অসুস্থ 'উমার (রা.)-এর কানে গেলে তিনি অস্বস্তি বোধ করেন এবং তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত পরামর্শ-কার্যক্রম স্থগিত করার নির্দেশ দেন। [আত-তাবারী, ৪:২২৯; ইবনুল আসীর ২:৩৬৮।]

২০. অন্তর্বর্তীকালীন ইমাম সুহাইব আর-রূমী সালাতুল জানাযায় ইমামতি করেন আর পরামর্শ পরিষদের উপস্থিত পাঁচ সদস্য তাঁর কবরে নেমেছিলেন।

২১. কোন কোন বর্ণনায় এসেছে বৈঠকটি হয়েছিল দাহহাক ইবনু কায়স-এর সহোদরা ফাতিমা বিনতু-কায়স আল-ফিহরিয়্যা-এর ঘরে। ভিন্নমতে 'আয়িশা (রা.)-এর ঘরে বা বাইতুল মালে। ইবনু কাসীর, ৭: ১৪৫।

যুবাইর (রা.) বললেন, আমি 'আলী (রা.)-এর সমর্থনে প্রার্থিতা প্রত্যাহার করলাম।' তালহা[২২] (রা.) বললেন, 'আমি 'উসমান (রা.)-কে সমর্থন করলাম।' সা'দ (রা.) বললেন, আমি আবদুর রহমান ইবনু 'আউফ (রা.)-এর সমর্থনে প্রার্থিতা প্রত্যাহার করলাম।' ফলে প্রার্থীর সংখ্যা নেমে এল তিন-এ: উসমান ইবনু 'আফ্ফান (রা.), আবদুর রহমান ইবনু 'আউফ (রা.) ও 'আলী ইবনু আবি তালিব (রা.)।

(উল্লেখ্য, নির্বাচক পরিষদের কোন সদস্যই নেতৃত্ব পদপ্রার্থী ছিলেন না। তাঁরা আমিরুল মু'মিনীন 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তি বা নমিনি ছিলেন।)

গ. প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে 'আবদুর রহমান ইবনু 'আউফ (রা.) নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্ব পালন করলেন:

প্রার্থী সংখ্যা তিন-এ নেমে আসার পর ইবনু 'আউফ (রা.) বললেন, 'আপনাদের মধ্যে কে এই দাবি ছেড়ে দিতে রাজি অর্থাৎ প্রার্থিতা প্রত্যাহারে সম্মত যাতে তিনি খালীফা নির্বাচনের দায়িত্ব পালন করতে পারেন?' এই বক্তব্য শুনে 'আলী (রা.) ও 'উসমান (রা.) চুপ রইলেন। ইবনু 'আউফ (রা.) আবার বললেন, 'আমি নিজের দাবী ত্যাগ করলাম' অর্থাৎ তিনি নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্ব পালন করবেন। সাথে সাথে 'উসমান (রা.) তা সমর্থন করলেন। 'আলী (রা.) এই বিষয়ে প্রতিশ্রুতি চাইলেন যে, ইবনু 'আউফ স্বজনপ্রীতি-মুক্ত নিরপেক্ষতা, বিশ্বস্ততা ও আমানতদারীর সাথে দায়িত্ব পালন করবেন। ইবনু 'আউফ (রা.) অনুরূপ প্রতিশ্রুতি দিলে 'আলী (রা.) তা মেনে নিলেন। পরামর্শ সভার অন্য সদস্যরাও ইবনু 'আউফ (রা.) ওপর আস্থা জ্ঞাপন করে তাঁর পদক্ষেপকে সমর্থন করলেন।[২৩] এই পর্যায়ে খিলাফাতের প্রার্থী রইলেন দু'জন: 'আলী ইবনু আবি তালিব (রা.) ও 'উসমান ইবনু 'আফ্ফান (রা.)। নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্ব পালন করবেন আবদুর রহমান ইবনু 'আউফ (রা.)।

ঘ. আবদুর রহমান ইবনু 'আউফ (রা.) পরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করলেন:

প্রার্থী সংখ্যা কমে দুই-এ নেমে এল; ইবনু 'আউফ (রা.)-এর জন্য পরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা সহজ হয়ে গেল। তিনি প্রথমে দু'প্রার্থীর মতামত গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেন। তিনি 'আলী (রা.)-কে বললেন, 'আপনি যদি বলেন আপনিই খিলাফাতের হকদার, কারণ আপনার সাথে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আত্মীয়তা রয়েছে, ইসলাম গ্রহণে আপনি অগ্রবর্তীদের অন্যতম এবং এই দীন-প্রতিষ্ঠায় আপনার অবদান সুবিদিত, তাহলে আপনার এই বক্তব্য যথার্থ হবে। তবে

---

২২. এটি ইবনু কাসীরের বক্তব্য [৭:১৪৫], সাহীহুল বুখারীর বর্ণনায়ও পাওয়া যায় যে, তালহা পরামর্শ-প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেছিলেন [সাহীহুল বুখারী, কিতাবুল মানাকিব, ২:২৬৭]। অন্যরা বলেন, পরামর্শকালে তালহা (রা.) অনুপস্থিত ছিলেন, 'উসমান (রা.)-এর হাতে লোকজনের বাই'আত সম্পন্ন হওয়ার পর তিনি মাদীনায় উপস্থিত হন [ইবনুল আসীর, ২:৩৭২]।

২৩. আত-তাবারী, ৪: ২৩১; ইবনুল আসীর, ২:৩৭০; ইবনু কাসীর ৭: ১৪৫; সাহীহুল বুখারী, কিতাবুল মানাকিব, ২:২৬৭।

আমি জানতে চাই আপনার হাতে যদি এই দায়িত্ব অর্পণ করা না হয় তাহলে আপনি কাকে এই দায়িত্ব পালনের জন্য সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত মনে করেন?' আলী (রা.) বললেন, 'উসমান (রা.)'। এবার ইবনু 'আউফ, 'উসমান (রা.)-এর সাথে একান্তে মিলিত হয়ে বললেন, 'আপনি যদি বলেন, আপনি আবদ মানাফ গোত্রের জ্যেষ্ঠ সদস্য, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জামাতা, আপনার অগ্রবর্তিতা ও শ্রেষ্ঠত্ব আছে; তাহলে আপনার বক্তব্য যথার্থই হবে। তবে আমি জানতে চাচ্ছি আপনার হাতে যদি এই দায়িত্ব অর্পণ না করা হয় তাহলে এই দায়িত্ব পালনে কাকে আপনি সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত বলে মনে করেন?' 'উসমান (রা.) বললেন, 'আলী (রা.)।'[২৪] খিলাফাতের দু'প্রার্থীর পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও আস্থা রয়েছে দেখে আবদুর রহমান ইবনু 'আউফ (রা.) খুশী হলেন। তিনি পরামর্শ পরিষদের অপর দু'সদস্য তথা আয-যুবাইর ও সা'দ (রা.)-এর সাথে একান্তে মিলিত হয়ে পরামর্শ করলেন। দু'জনই 'উসমান (রা.)-কে সমর্থন করলেন।[২৫]

ঙ. বিস্তৃত প্রাঙ্গনে পরামর্শ:

এরপর আবদুর রহমান ইবনু 'আউফ (রা.) সর্বসাধারণের মতামত নিলেন। মাদীনায় উপস্থিত সাহাবায়ে কিরাম, সেনাপতি ও প্রাদেশিক প্রশাসকদের সাথেও তিনি পরামর্শ করলেন। হাজ্জ আদায় শেষে প্রাদেশিক শাসক ও সেনাপতিদের অনেকে 'উমার (রা.)-এর সাথে মাদীনায় এসেছিলেন। ইবনু 'আউফ পর্দার অন্তরালের মহিলাদের পরামর্শও নিলেন। পাঠশালার কিশোর-যুবা-তরুণ এবং দাসরাও পরামর্শ থেকে বাদ গেল না। কার্যব্যপদেশে রাজধানীতে আগত মুসাফির ও বেদুইনদের পরামর্শও নেওয়া হল। এভাবে মাদীনার বাইরের নাগরিকদের মতামতও নমুনা আকারে পাওয়া গেল। তিনদিন তিনরাত তিনি পরামর্শ গ্রহণ, সালাত আদায়, দু'আ ও ইস্তিখারায় কাটিয়ে দিলেন। অধিকাংশ ব্যক্তির মতামত এসেছিল 'উসমান (রা.)-এর পক্ষে। কেউ কেউ 'আলী (রা.)-এর নামও বলেছিলেন।[২৬]

চ. পরিষদের সাথে সর্বশেষ পরামর্শ:

তিনদিনের পরামর্শ ও আলাপ-আলোচনায় 'আবদুর রহমান ইবনু 'আউফ (রা.) জনগণের মনোভাব বুঝতে পেরেছিলেন। তবুও চূড়ান্ত ঘোষণা প্রদানের পূর্বে তিনি পরিষদের সাথে পুনরায় পরামর্শ করতে চাইলেন। তৃতীয় দিন দিবাগত রাতে তিনি আপন

---

২৪. আত-তাবারী, ৪:২৩১; ইবনুল আসীর, ২:৩৭০; ইবনু কাসীর, ৭:১৪৫।

২৫. আত-তাবারী, ৪:২৩১।

২৬. ইবনু কাসীর উল্লেখ করেছেন যে, 'আম্মার (রা.) ও আল-মিকদাদ (রা.), খালীফা হিসেবে 'আলী (রা.)-এর নাম প্রস্তাব করেছিলেন। বাকী সবাই 'উসমান (রা.)-কে সমর্থন করেছিলেন। মতামত প্রদানে এই বিভক্তি ছিল আলোচনার পর্যায়ে। খালীফা হিসেবে 'উসমান (রা.)-এর নাম চূড়ান্তভাবে ঘোষণা করা হলে সবাই বিনা দ্বিধায় বাই'আত করেন। [ইবনু কাসীর, ৭:১৪৬।]

ভাগ্নে আল-মিসওয়ার ইবনু মাখরামা[২৭] (রা.)-কে ঘুম থেকে ডেকে তুলে আয-যুবাইর ও সা'দ (রা.)-কে ডেকে আনতে পাঠালেন। তাঁরা এলে ইবনু 'আউফ (রা.) তাঁদের সাথে পরামর্শ করলেন। তারপর 'আলী (রা.)-কে ডেকে আনা হলো এবং তার সাথে ইবনু 'আউফ (রা.) মধ্যরাত পর্যন্ত পরামর্শ করলেন। সর্বশেষে 'উসমান (রা.)-এর সাথে দীর্ঘ পরামর্শ করলেন। মুআয্‌যিনের আযান তাদের পরামর্শে ছেদ দিল।[২৮]

ছ. 'উসমান (রা.)-এর হাতে বাই'আত গ্রহণের ব্যাপারে মতৈক্য:

সালাতুল ফাজর-এর পর বাই'আত অধিবেশন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেওয়া হয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম), আবদুর রহমান ইবনু 'আউফ (রা.)কে যে পাগড়িটি পরিধান করিয়ে দিয়েছিলেন সেটি মাথায় পেঁচিয়ে তিনি এগিয়ে এলেন। মিম্বারের কাছে ছিলেন নির্বাচক পরিষদের সদস্যবৃন্দ, আরো ছিলেন কয়েকজন নেতৃস্থানীয় প্রাদেশিক গভর্নর: সিরিয়ার গভর্ণর মু'আবিয়া (রা.), হিমস-এর গভর্ণর 'উমাইর ইবনু সা'দ (রা.), মিসরের গভর্ণর 'আমর ইবনুল 'আস (রা.)। এঁরা হাজ্জ সমাপনান্তে 'উমার (রা.)-এর সাথে মাদীনায় এসেছিলেন। সাহীহুল বুখারী-এর বর্ণনা মতে, ফাজরের নামাযের পর নির্বাচক পরিষদের সদস্যরা মিম্বারের কাছে মিলিত হলেন। মুহাজির, আনসার ও সাধারণ জনগণের উপস্থিতিতে মাসজিদ লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। জনাধিক্যে মাসজিদের অবস্থা এমন হয়ে গেল যে লাজনম্র 'উসমান (রা.) ভিড় ঠেলে সামনে যেতে পারলেন না; তিনি পেছনে পড়ে রইলেন। সবাই একত্র হলে আবদুর রহমান ইবনু 'আউফ (রা.), রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মিম্বরে আরোহন করে দীর্ঘ সময় ক্ষীণ কণ্ঠে দু'আ করলেন। তারপর বললেন, 'হে উপস্থিতি! আমি গোপনে ও প্রকাশ্যে ইমাম সম্পর্কে তোমাদের মতামত গ্রহণ করেছি; তোমাদের পরামর্শে ঘুরেফিরে দু'জনের নাম এসেছে: 'উসমান ও আলী (রা.)।[২৯] হে 'আলী! আপনি দাঁড়ান।' মিম্বারের পাশে 'আলী (রা.) দণ্ডায়মান হলে 'আবদুর রহমান ইবনু 'আউফ (রা.) তাঁর হাত ধরে বললেন,

هل أنت مبايعي على كتاب الله وسنة نبيه وفعل أبي بكر وعمر؟

আপনি কি আল্লাহ্‌র কিতাব, তাঁর নাবীর সুন্নাহ্ এবং আবূ বাক্‌র ও 'উমার-এর

---

২৭. আল-মিসওয়ার ইবনু মাখরামা-এর মা 'আতিকা বিনতু 'আউফ ছিলেন 'আবদুর রহমান ইবনু 'আউফ (রা.)-এর সহোদরা। [আত-তাবারী, ৪:২৩৪।]

২৮. আত-তাবারী, ৪:২৩২; ২৩৭-৩৯; ইবনুল আসীর, ২:৩৭০-৭১।

২৯. অত্যন্ত বিস্ময়কর হলেও সত্য এই যে, 'উমার (রা.) নিজেও ধারণা করেছিলেন এই দুই জনের কোন একজন খালীফা নির্বাচিত হবেন। وما أظن يلي إلا هذين الرجلين: علي وعثمان، فإن ولي عثمان فرجل فيه لين، وإن ولي علي ففيه دعابة. 'আমার ধারণা তো কেবল এই যে এই দু'জনের কোন একজন তথা 'উসমান বা 'আলী (রা.) খালীফা হবেন। 'উসমান (রা.) যদি খালীফা হন তা ভালো, তিনি নম্রভদ্র ব্যক্তি। আর 'আলী (রা.) যদি খালীফা হন তাও ভাল, রসিক এই ব্যক্তি জনগণকে সত্যপথে পরিচালনার ক্ষেত্রে যোগ্যতর। [ইবনুল আসীর, ২: ৩৬৯]।

কর্মনীতির আলোকে (রাষ্ট্র পরিচালনা করতে) আমার হাতে বাই'আত করতে প্রস্তুত?

'আলী (রা.) বললেন, 'হে আল্লাহ! না, তবে আমি সাধ্যানুযায়ী সচেষ্ট হব।' 'আবদুর রহমান ইবনু 'আউফ (রা.), 'আলী (রা.)-এর হাত ছেড়ে দিয়ে বললেন, "উসমান! আপনি দাড়াঁন।' তারপর তাঁর হাত ধরে একই কথা বললেন। জবাবে 'উসমান বললেন, 'হে আল্লাহ, হ্যাঁ।' একথা শুনে 'আবদুর রহমান ইবনু 'আউফ (রা.) 'উসমান (রা.)-এর হাত ধরে মাসজিদের ছাদের দিকে মাথা তুলে বললেন, 'হে আল্লাহ, শুনুন ও সাক্ষী থাকুন! হে আল্লাহ, শুনুন ও সাক্ষী থাকুন! হে আল্লাহ, শুনুন ও সাক্ষী থাকুন! দায়িত্বের যে বোঝা আমার স্কন্ধে ছিল তা আমি 'উসমান (রা.)-এর কাঁধে অর্পণ করলাম।' সর্বপ্রথম 'আবদুর রহমান ইবনু 'আউফ (রা.) বাই'আত করলেন; তারপর মিম্বারের ওপরের ধাপে তিনি বসলেন। এক ধাপ নিচে বসলেন নবনির্বাচিত খালীফা 'উসমান (রা.)। এরপর দ্বিতীয় ব্যক্তি হিসেবে 'আলী (রা.) বাই'আত করলেন[৩০]; অতঃপর দলে দলে লোকজন বাই'আত করতে লাগল।[৩১]

নির্বাচক পরিষদের অন্যতম সদস্য তালহা ইবনু 'উবাইদিল্লাহ (রা.) ঐদিন উপস্থিত হয়ে জানতে পারলেন জনগণ খালীফা হিসেবে 'উসমান (রা.)-এর হাতে বাই'আত করেছে। তালহা (রা.), 'উসমান (রা.)-এর সাথে দেখা করতে এলে তাকে বললেন, 'সিদ্ধান্তের ব্যাপারে আপনি স্বাধীন, আপনি চাইলে আমি দায়িত্ব ছেড়ে দেব।' তালহা (রা.) বললেন, 'তাই?' খালীফা বললেন 'হ্যাঁ, তাই।' সবাই বাই'আত করেছে জেনে তালহা (রা.) বললেন, 'সমষ্টির সিদ্ধান্তের বাইরে আমি যাব না। আমি সানন্দে বাই'আত করলাম।'[৩২]

জ. বাই'আতের তারিখ:

বাই'আতের তারিখের ব্যাপারে জীবনীকারগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে:

১. আল-ওয়াকিদী-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, ২৩ হিজরীর যুলহিজ্জা মাসের শেষ দিনে 'উসমান (রা.)-এর বাই'আত সম্পন্ন হয়। নতুন বছরের প্রথম দিনে তাঁর খিলাফাতের কর্মকাণ্ড শুরু হয়।[৩৩]

২. আল-ওয়াকিদী-এর সূত্রে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, ২৪ হিজরীর ১০ মুহার্‌রম 'উসমান (রা.)-এর বাই'আত সম্পন্ন হয়।[৩৪]

---

৩০. সাহীহুল বুখারী, কিতাবুল মানাকিব, ২:২৬৭।
৩১. আত-তাবারী, ৪:২৩৩; ২৩৮-৩৯; আয-যাহাবী, ৩:১০২; ইবনুল আসীর, ২:৩৭২, ইবনু কাসীর, ৭:১৪৬-৪৭; ইবনু সা'দ, ৩:৬২।
৩২. ইবনুল আসীর, ২: ৩৭২; আত-তাবারী, ৪: ২৩৩-৩৪।
৩৩. আত-তাবারী, ৪: ২৪২। ইবনু কাসীর বলেন, এই মতটি অসমর্থিত (ইবনু কাসীর, ৭: ১৪৭)।
৩৪. আত-তাবারী, ৪:২৪২। ইবনু কাসীর বলেন, এটি একেবারেই অসমর্থিত (ইবনু কাসীর, ৭:১৪৭)।

৩. সর্বাধিক বিশুদ্ধ মত এই যে, ২৪ হিজরীর ৩ মুহার্‌রম জনগণ 'উসমান (রা.)-এর হাতে বাই'আত করেন।[৩৫]

ঋ. পরামর্শ-কার্যক্রম পরিচালনায় 'আবদুর রহমান ইবনু 'আউফ (রা.)-এর প্রজ্ঞা:

'আবদুর রহমান ইবনু 'আউফ (রা.)-কে 'উমার (রা.) পরবর্তী খালীফা নির্বাচনের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। তিনি ছয় সদস্যের প্যানেলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। দুনিয়াবী কোন নেতা হলে নিজেই নেতৃত্ব গ্রহণের সব ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করত। বস্তুতঃ নির্বাচক পরিষদের ছয় সদস্যের সকলেই খালীফা হওয়ার যোগ্য ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহচর্যে সাহাবায়ে কিরাম যে পরশ পাথরে পরিণত হয়েছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় আবদুর রহমান ইবনু 'আউফ (রা.)-এর কর্মপন্থায়। ব্যক্তিস্বার্থ বিসর্জন দিয়ে সমষ্টির স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়ার অপূর্ব নজির স্থাপন করেছেন ইবনু 'আউফ (রা,); এতে করে সমন্বিত পরামর্শ বাস্তবায়নের প্রথম নজির স্থাপিত হয়েছিল।

- 'উমার (রা.) কর্তৃক নির্ধারিত মেয়াদের শুরুতে তিনি নির্বাচক পরিষদের প্রথম সভা আহবান করেন। ঐ সভায় সকল সদস্য নিজের অভিমত প্রকাশ করেন। ফলে সকলের দৃষ্টিভঙ্গি তিনি জানতে পারেন প্রথম সভায়-ই।
- অন্যতম মনোনীত ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও ইবনু 'আউফ খিলাফাতের দাবি প্রত্যাহার করেন। এতে সকল জল্পনার অবসান হয়; তাঁর নির্লোভ মানসিকতা পরিষ্কার হয় এবং তাঁর ওপর সকলের আস্থা বেড়ে যায়।
- ইবনু 'আউফ (রা.)-এর পদাঙ্ক অনুসরণে আরো কয়েকজন সদস্য প্রার্থিতা প্রত্যাহার করায় শেষ পর্যন্ত বাকি থাকেন দু'জন: 'উসমান (রা.) ও 'আলী (রা.)।
- পরস্পরের প্রতি এই দু'জনের মনোভাব জানার চেষ্টা করলেন ইবনু 'আউফ (রা.)। 'উসমান ও 'আলী (রা.)-দু'জনই পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন; দু'জনেই জানালেন, তিনি খালীফা নির্বাচিত না হলে অপরজনকে পরিত্যাগ করবেন না।
- ইবনু 'আউফ (রা.) শুধু নির্বাচক পরিষদের সদস্যদের মতামত নিলেন এমন নয়; তিনি উম্মাহ্‌র নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের পরামর্শ নিলেন। সর্বশেষে সাধারণ জনগণের পরামর্শও নিলেন, দেখলেন অধিকাংশের মত 'উসমান (রা.)-এর পক্ষে। আর তাই তিনি প্রথম ব্যক্তি হিসেবে 'উসমান (রা.)-এর হাতে বাই'আত করলেন।

স্বীয় বিচক্ষণতা, আমানতদারী, ঋজুতা ও নিঃস্বার্থতার বলে ইবনু 'আউফ (রা.) এই সুকঠিন দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে সক্ষম হন। অত্যন্ত দক্ষতা ও নিরপেক্ষতার সাথে তিনি খালীফা নির্বাচনের কাজ সম্পন্ন করতে সক্ষম হন। আয-যাহাবী বলেন,

---

৩৫. ইবনুল আসীর, ২: ৩৭৭; আত-তাবারী, ৪:২৪২; ইবনু কাসীর, ৭:৪৭।

ومن أفضل أعمال عبد الرحمن عزله نفسه من الأمر وقت الشورى، واختياره للأمة من أشار به أهل الحل والعقد، فنهض في ذلك أتم نهوض على جمع الأمة على عثمان، ولو كان محابيا فيها، لأخذها لنفسه، أو لولاها ابن عمه وأقرب الجماعة إليه سعد بن أبي وقاص.

আবদুর রহমান ইবনু 'আউফ (রা.)-এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি হল পরামর্শের সময় খিলাফাতের দাবি হতে নিজের নাম প্রত্যাহার ও আহলুল হিল্ল ওয়াল 'আকদ নির্দেশিত ব্যক্তিকে খালীফা নির্বাচন। ফলে উম্মাহ্কে 'উসমান (রা.)-এর খিলাফাতের ব্যাপারে ঐকমত্যে উপনীত করার কাজ সূচারুরূপে সম্পাদনে সমর্থ হন। তিনি যদি পক্ষপাতদুষ্ট হতেন তবে নিজে ক্ষমতা গ্রহণ করতেন বা তাঁর নিকটাত্মীয় সা'দ ইবনু আবি ওয়াক্কাস (রা.)-কে খালীফার পদে নিয়োগ করতেন।[৩৬]

চার. 'উসমান (রা.)-এর খিলাফাত লাভের বিষয়ে মিথ্যাচারের অপনোদন:

ইসলামের ইতিহাসের যেসব ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইসলামের শত্রুরা মিথ্যাচারের কালিমা লেপনে সচেষ্ট হয়েছে সেগুলোর মাঝে 'উসমান (রা.)-এর খিলাফাত লাভ অন্যতম। কতিপয় ঐতিহাসিকের অসাবধানী বর্ণনার ওপর ভিত্তি করে শী'আ সম্প্রদায় এই অপপ্রচারের জন্ম দেয়। পরবর্তীতে প্রাচ্যবিদ্যার বিকাশের সাথে প্রাচ্যবিদগণ ওসব বর্ণনার ওপর কল্পনার রঙ মেখে মিথ্যাচারের ফানুস উড্ডীন করেন।

'উসমান (রা.)-এর খিলাফাতের দায়িত্ব লাভের ঘটনা নিয়ে অপপ্রচারমূলক অনেক স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচিত হয়েছে। আবার কোন কোন গ্রন্থে সত্য-মিথ্যার মিশ্রণ রয়েছে। আবু মিখনাফ রচনা করেছেন কিতাবুশ শূরা, ইবনু 'আকদাহ ও ইবনু বাবওয়াইও স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন।[৩৭] ইব্ন সা'দ এই সম্পর্কে আল-ওয়াকিদী-এর সূত্রে নয়টি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন,[৩৮] তিনি 'উবাইদুল্লাহ ইবনু মূসা'র একটি বর্ণনাও উল্লেখ করেছেন যাতে 'উমার (রা.)-এর আহত হওয়া থেকে শুরু করে 'উসমান (রা.)-এর খিলাফাতের দায়িত্ব গ্রহণ পর্যন্ত ঘটনাবলী বিধৃত হয়েছে।[৩৯]

আল-বালাযুরী প্রধানত আবূ মিখনাফ-এর সূত্রে 'উসমান (রা.)-এর বাই'আত-এর ঘটনা বর্ণনা করেছেন।[৪০] তিনি আল-কালবী, আল-ওয়াকিদী ও 'উবাইদুল্লাহ ইবনু

৩৬. শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১:৮৬।
৩৭. আয-যরী'আহ ইলা তাসানীফিশ শী'আ, ১৪:২৪৬।
৩৮. ইবনু সা'দ, ৩:৬৩, ৬৭।
৩৯. প্রাগুক্ত, ৩: ৩৪০।
৪০. আল-বালাযুরী, আনসাবুল আশরাফ, ৫: ১৮-১৯।

মূসা-এর সূত্রেও বর্ণনা করেছেন।[৪১] আত্-তাবারী'র প্রধান সূত্রও ছিল আবূ মিখনাফের বর্ণনা। এই বর্ণনাগুলোর কোন কোনটার ওপর ভিত্তি করে শী'আ লেখকগণ মিথ্যাচার ছড়িয়ে দিয়েছেন। নিম্নে কতিপয় মিথ্যাচার অপনোদন করা হচ্ছে:

ক. সাহাবীদের বিরুদ্ধে দায়িত্বপালনে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ খণ্ডন:

সাহাবীদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনা হয় যে তাঁরা দায়িত্বপালনে পক্ষপাতিত্ব ও স্বজনপ্রীতি করেছেন। 'আলী (রা.) সম্পর্কেও একথা বলা হয় যে, খালীফা নির্বাচনের দায়িত্ব 'আবদুর রহমান ইবনু 'আউফ (রা.)-এর ওপর অর্পণ করায় তিনি নাখোশ ছিলেন। কারণ খিলাফাতের দু'নমিনির পক্ষে সমর্থন সমান হলে 'উমার (রা.), আবদুর রহমান ইবনু 'আউফ (রা.)-কে নির্ণায়কের ভূমিকা পালনের ক্ষমতা দিয়েছিলেন। এতেই নাকি 'আলী (রা.) বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁকে ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করা হবে। বৈবাহিকসূত্রে আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকায় আবদুর রহমান, 'উসমান (রা.)-কে সমর্থন করবেন– এটা নাকি 'আলী (রা.) আগে থেকেই জানতেন।[৪২]

বস্তুত: 'উসমান (রা.) ও আবদুর রহমান ইবনু 'আউফের মাঝে রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয়তা ছিল না। আবদুর রহমান, 'উসমান (রা.)-এর ভাই বা ভাইপো ছিলেন না। শুধু তাই নয়, তাঁরা দু'জন ছিলেন ভিন্ন ভিন্ন গোত্রভুক্ত। আবদুর রহমান ইবনু 'আউফ (রা.) ছিলেন বানূ যুহরাভুক্ত আর 'উসমান (রা.)-এর গোত্র ছিল বানূ উমাইয়া। আত্মীয়তার সম্পর্কে বানূ যুহরা, বানূ হাশিম তথা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর গোত্রের কাছাকাছি ছিল। অবশ্য সা'দ ইবনু আবি ওয়াক্কাস (রা.) বানূ যুহরার লোক ছিলেন। 'আবদুর রহমান ইবনু 'আউফ (রা.) তাঁকে খালীফা নির্বাচিত করলে স্বজনপ্রীতির অভিযোগ করা যেত। অথচ তিনি খালীফা ঘোষণা করলেন 'উসমান (রা.)-কে যার সাথে তাঁর রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয়তা ছিল না।[৪৩]

শী'আ লেখকগণ যখন আবদুর রহমান ইবনু 'আউফ (রা.)-এর বিরুদ্ধে স্বজনপ্রীতির অভিযোগ করে তখন তারা একথা ভুলে যায় যে, ইসলামের সেই সোনালী যুগে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সরাসরি তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সাহাবায়ে কিরাম রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়তার চাইতে ঈমানী আত্মীয়তাকে অনেক বেশি গুরুত্ব দিতেন। আর আবদুর রহমান ইবনু 'আউফের সাথে 'উসমান (রা.)-এর যে বৈবাহিকসূত্রে আত্মীয়তার কথা বলা হয় তার স্বরূপ ছিল এরূপ: আবদুর রহমান ইবনু 'আউফ (রা.), 'উসমান (রা.)-এর বৈপিত্রেয় ভাই আল-ওয়ালীদ ইবনু 'উকবা-এর বৈমাত্রেয় বোন উম্মু কুলসূম বিন্তু 'উকবাকে বিয়ে করেছিলেন।[৪৪]

---

৪১. প্রাগুক্ত।

৪২. আবদুল আজীজ নূর ওয়ালী, আছরুত তাশাইয়ু' 'আলার রিওয়ায়াতিত তারীখিয়্যাহ (মাদীনা: দারুল খুদাইরী ১৯৯৬), ৩২২।

৪৩. ইবনু তাইমিয়্যা, মিনহাজুস সুন্নাতিন নাবাবিয়্যাহ, ৬: ২৭১-৭২।

৪৪. ইবনু সা'দ, ৩: ১২৭।

খ. বানূ উমাইয়া ও বানূ হাশিম দ্বন্দ্বের অপপ্রচার:

'উসমান (রা.)-এর বাই'আত সম্পাদনকালে বানূ উমাইয়া ও বানূ হাশিমের দ্বন্দ্ব প্রকট হয়েছিল বলে আবূ মিখনাফের কয়েকটি রিওয়ায়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।[৪৫] এই ধরনের বর্ণনাগুলোকে জোড়াতালি দিয়ে ও ভুল বিশ্লেষণ করে কয়েকজন ঐতিহাসিক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, 'উমার (রা.)-এর শাহাদাতের পর নতুন খালীফা নির্বাচনকালে সাহাবায়ে কিরামের মাঝে পুরনো গোত্রবাদ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠেছিল। জনগণ নাকি দু'ভাগে বিভক্ত হয়েছিলেন: বানূ হাশিম ও বানূ উমাইয়া সমর্থক। এইসব বিশ্লেষণ মিথ্যা ও জাল বর্ণনার ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই অনুসিদ্ধান্তের পক্ষে কোন ঐতিহাসিক সত্যতা বিদ্যমান নেই। সেই সাহাবায়ে কিরামের ব্যাপারে এই বক্তব্য কিভাবে সঠিক হতে পারে যে, তারা পুরনো গোত্রবাদে ফিরে গিয়েছিলেন অথচ তারাই নিজেদের দীনি ভাইদেরকে সাহায্য করতে গিয়ে আপন বাপ-ভায়ের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন, দীনের খাতিরে তাঁরা দুনিয়ার সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়েছিলেন! যারা এই অপপ্রচার চালায় তারা জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সোনার মানুষগুলোর স্বভাব-প্রকৃতি ও মর্যাদা সম্পর্কে অনবহিত বা অজ্ঞতার ভান করে। গোত্রীয় স্বার্থরক্ষার মত ক্ষুদ্র মনোভাবের অনেক উর্ধ্বে ছিলেন নির্বাচক পরিষদের সদস্যবৃন্দ, যাঁদের সবাই ছিলেন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, আবদুর রহমান ইবনু 'আউফ (রা.) যদি গোত্রীয় স্বার্থ রক্ষা করার চিন্তা করতেন তাহলে তিনি স্বগোত্রীয় সা'দ ইবনু আবি ওয়াক্কাস (রা.)-কে পরবর্তী খালীফা নিয়োগের চেষ্টা করতেন।

গ. আলী (রা.)-এর ওপর অপবাদ আরোপ:

ইবনু জারীর আত-তাবারীসহ কয়েকজন ঐতিহাসিক অজ্ঞাত বর্ণনাকারীর সূত্রে উল্লেখ করেছেন যে, 'আবদুর রহমান ইবনু 'আউফ (রা.) যখন 'উসমান (রা.)-এর হাতে বাই'আত গ্রহণ করলেন তখন আলী (রা.) বলেছিলেন, 'আপনি আমাকে ধোঁকা দিয়েছেন, উসমান (রা.) আপনার বৈবাহিকসূত্রে আত্মীয় বলেই আপনি তাঁকে খালীফা নিযুক্ত করেছেন। এখন তিনি প্রতিদিন আপনার পরামর্শে রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন।' 'আলী (রা.) নাকি বাই'আত করতে গড়িমসি করেছিলেন। পরবর্তীতে আবদুর রহমান ইবনু 'আউফ (রা.) সূরা আল ফাতহ-এর ১০নং আয়াত তিলাওয়াত করে আলী (রা.)-কে উদ্বুদ্ধ করলে শেষমেষ তিনি বাই'আত করতে সম্মত হন।

এই কাহিনী বিশুদ্ধ বর্ণনার বিপরীত। বিশুদ্ধ বর্ণনার সূত্রে ইতোঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'আবদুর রহমান ইবনু 'আউফ-এর পরেই 'আলী (রা.), 'উসমান (রা.)-এর

---

৪৫. ইয়াহইয়া ইবরাহীম ইয়াহইয়া, মারবিয়্যাতু আবি মিখনাফ ফী তারীখিত তাবারী (রিয়াদ: দারুল 'আসিমাহ্ ১৪১০ হি), ১৭৭-৭৮।

হাতে বাই'আত করেন। সাহাবায়ে কিরামের প্রোজ্জ্বল চরিত্র বিশুদ্ধ ও জাল বর্ণনার মাঝে প্রভেদরেখা অঙ্কনে অপারগ কতিপয় নির্বোধ বর্ণনাকারীর কল্পনার অনেক উর্ধ্বে।[৪৬]

ঘ. আমর ইবনুল 'আস ও আল-মুগীরা ইবনু শু'বা (রা.)-এর ওপর অপবাদ আরোপ:

আবূ মিখনাফ এক বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন, আমর ইবনুল 'আস ও আল-মুগীরা ইবনু শুবা (রা.) নাকি পরামর্শ সভায় যোগদানের জন্য এসেছিলেন; কিন্তু সা'দ (রা.) তাঁদেরকে দোর থেকে ফিরিয়ে দেন। এটি একেবারেই উদ্ভট ও হাস্যকর কাহিনী। পরামর্শ সভার সদস্যদের নাম গোপনীয় কোন বিষয় ছিল না। সবাই তাঁদের নাম জানতেন; তাঁরা সবাই জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত ছিলেন। এটি খুবই হাস্যকর যে, 'আমর ইবনুল 'আস ও আল-মুগীরা ইবনু শু'বা (রা.)-এর মত সাহাবী জোর করে পরামর্শ সভায় প্রবেশ করে অনধিকার চর্চা করবেন।[৪৭]

পাঁচ. খিলাফাতের দায়িত্ব লাভে উসমান (রা.)-এর অগ্রগণ্যতা:

কোন মু'মিনের মনে বিন্দুমাত্র সংশয় নেই যে, উমার (রা.)-এর পর খিলাফাত লাভে 'উসমান (রা.)-ই অগ্রগণ্য ছিলেন। রাফিযী শী'আ ছাড়া কেউ এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করে না। রাফিযীদের অন্যতম কাজ হল সাহাবায়ে কিরামের নিন্দাবাদ। তারা শুধূ 'উসমান (রা.)-এর নিন্দা করে এমন নয়, ওরা আবূ বাক্‌র (রা.) ও 'উমার (রা.)-কেও গালামন্দ করে। খিলাফাত লাভে 'উসমান (রা.)-এর অগ্রগণ্যতার বিষয়ে অনেকগুলো হাদীস পাওয়া যায়:

ক. আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা.)-এর হাদীস যা ইতোঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একটি প্রাচীরঘেরা বাগিচায় প্রবেশ করেছিলেন আর আবূ মূসা তার দ্বাররক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। পরপর তিন ব্যক্তি ঐ বাগিচায় প্রবেশ করেছিলেন তাঁদের সবাইকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন; তাঁরা ছিলেন আবূ বাকর (রা.), 'উমার (রা.) ও 'উসমান (রা.)।

এখানে এই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে আবু বাকর (রা.), 'উমার (রা.) ও 'উসমান (রা.) পরপর খালীফা হবেন।

খ. জাবির ইবনু 'আবদিল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

---

৪৬. ইবনু কাসীর, ৭:১৫২।
৪৭. মারবিয়্যাতু আবি মিখনাফ ফী তারীখিত তাবারী, ১৭৯।

أرى الليلة رجل صالح: أن أبا بكر نيط برسول الله، ونيط عمر بأبي بكر ونيط عثمان بعمر

রাতে আমাকে এক সৎকর্মশীল ব্যক্তিকে দেখানো হয়েছে: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে আবু বাকর (রা.), 'উমার (রা.) আবু বাকর (রা.)-এর সাথে আর 'উসমান (রা.) 'উমার (রা.)-এর সাথে সংযুক্ত ছিলেন।

জাবির (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওঠে গেলে আমরা বলাবলি করলাম: সৎকর্মশীল ব্যক্তি হলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। তাঁরা একে অপরের সাথে সংযুক্ত থাকার অর্থ হল ধারাবাহিকভাবে একে অপরের প্রতিনিধি হওয়া।[৪৮]

গ. আবূ আবদিল্লাহ আল-হাকিম নিরবচ্ছিন্ন সনদে আবূ হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছেন:

إنها ستكون فتنة واختلاف، قال: قلنا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: عليكم بالأمير وأصحابه.

'শীঘ্রই এমন সময় আসবে যখন ফিতনা ও মতভেদ দেখা যাবে।' আবূ হুরাইরা (রা.) বলেন, আমরা বললাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আমাদের করণীয় কি হবে?' তিনি বললেন, 'তোমরা আমীর ও তাঁর সাথীদের পক্ষে থাকবে।' আমীর বলতে 'উসমানকে বুঝানো হয়েছে।[৪৯]

ঘ. আবূ ঈসা আত-তিরমিযী নিরবচ্ছিন্ন সূত্রে 'আয়িশা (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

يا عثمان! لعل الله يقمصك قميصا فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه لهم

হে 'উসমান, আল্লাহ হয়ত তোমাকে একটি জামা পরিধান করাবেন। লোকেরা তা খুলে নিতে চাইলে তাদের দাবিতে তা খুলবে না।[৫০]

এ হাদীসে জামা বলতে খিলাফাতকে বুঝানো হয়েছে, অর্থাৎ আল্লাহ 'উসমান (রা.)-কে খিলাফাত দান করবেন। আর নির্বোধের দল যদি তাঁর কাছে পদত্যাগ দাবি করে তবে তাদের দাবি অনুসারে তাকে পদত্যাগ করতে বারণ করা হয়েছে।

ঙ. তিরমিযী নিরবচ্ছিন্ন সূত্রে আবু সাহলা হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, 'উসমান (রা.) স্বগৃহে অবরুদ্ধ থাকাকালে আমাকে বলেন:

---

৪৮. সুনানু আবি দাউদ, ৪৬৩৬।
৪৯. মুসতাদরাকুল হাকিম, ৩:৯৯।
৫০. জামিউত তিরমিযী, কিতাবুল মানাকিব, ৬: ৩০৮-০৯।

إن رسول الله قد عهد إليّ عهدا فأنا صابر عليه

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে একটি ওয়াদা দিয়েছেন। সুতরাং আমি তাতে ধৈর্য ধারণ করব।[৫১]

এখানে ওয়াদা বলতে উপদেশ বুঝানো হয়েছে। আর সে উপদেশ হল: আল্লাহ 'উসমান (রা.)-কে যে জামা পরিধান করিয়েছেন সেটি যেন বিশৃঙ্খলাকারীদের দাবিতে তিনি খুলে না ফেলেন। এই উপদেশ পালনে উসমান ধৈর্য ধারণ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন।[৫২] এই হাদীসেও 'উসমান (রা.)-এর খিলাফাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে।

চ. 'উসমান (রা.)-এর আযাদকৃত দাস আবূ সাহলা, 'আয়িশা (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 'আমার এক সাথীকে ডাকো।' আমি বললাম 'আবূ বাকর (রা.)-কে?' তিনি বললেন, 'না।' আমি বললাম, ''উমার (রা.)-কে ডাকব?' তিনি বললেন, 'না।' আমি আবার বললাম, 'আপনার চাচাতো ভাই 'আলী (রা.)-কে ডাকব?' তিনি বললেন, 'না।' আমি বললাম, 'তাহলে কি 'উসমান (রা.)-কে ডাকব?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ।' 'আয়িশা (রা.) বলেন, 'উসমান (রা.) এলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে ওঠে যেতে বললেন। তারপর 'উসমানের সাথে একান্তে কিছু কথা বললেন। কথা শুনতে শুনতে 'উসমান (রা.)-এর রঙ পাল্টে যাচ্ছিল। আবূ সাহলা বলেন, অবরুদ্ধ হওয়ার দিনে আমরা 'উসমান (রা.)-কে বললাম, 'আপনি কি যুদ্ধ করবেন না?' তিনি বললেন, 'না, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে একটি ওয়াদা (উপদেশ) দিয়েছেন। তা পালনে আমি ধৈর্য ধারণ করব।'[৫৩]

এ হাদীসেও উপদেশ বলতে জামা না খোলার কথা তথা বিদ্রোহীদের দাবি অনুসারে খিলাফাতের দায়িত্ব হতে পদত্যাগ না করার কথা বলা হয়েছে। 'উসমান (রা.)-এর খিলাফাতের বৈধতার পক্ষে এটিও একটি প্রমাণ।

ছ. 'উসমান (রা.)-এর খিলাফাতের বৈধতার সপক্ষে আল-বুখারী বর্ণিত নিম্নের হাদীসটিও উল্লেখ করা যায়:

ইবনু 'উমার (রা.) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে আমরা কাউকে আবূ বাকর (রা.)-এর সমকক্ষ হিসেবে গণ্য করতাম না। মর্যাদার

---

৫১. প্রাগুক্ত, ৬: ৩১৩।
৫২. মুহাম্মাদ আবদুর রহমান আল-মুবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াজী, ১০: ২০৯।
৫৩. মুসতাদরাকুল হাকিম, ৩:৯৯।

দিকে তারপর ‘উমার (রা.) ও ‘উসমান (রা.)-কে গণ্য করতাম। তারপর সাহাবায়ে কিরামের মাঝে আমরা প্রভেদ করতাম না।’[৫৪]

ইবনু তাইমিয়া (রাহ) বলেন, এই বর্ণনায় এই প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পর আবূ বাকর (রা.), ‘উমার (রা.) ও ‘উসমান (রা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত ছিল। কোন কোন বর্ণনায় পাওয়া যায়, বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জানানো হয়েছিল, তিনি কোন আপত্তি করেননি। অতএব প্রমাণিত হল যে, মর্যাদা দানের এই ধারাবাহিকতা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। পরবর্তীতে এই অগ্রগণ্যতার বাস্তব প্রমাণও পাওয়া যায়। আবূ বাকর (রা.) এর পর ‘উমার (রা.) খালীফা হন। ‘উমার (রা.)-এর পর ‘উসমান (রা.) খলীফা হন। সাহাবায়ে কিরাম কোনরূপ প্রলোভন ও ভীতি ছাড়াই তা মেনে নেন, এই নির্বাচন প্রক্রিয়ার কেউ বিরোধিতা করেছেন বলে জানা যায় না।[৫৫]

উপর্যুক্ত বর্ণনাগুলোতে খিলাফাত লাভে ‘উসমান (রা.)-এর অগ্রগণ্যতার বিষয়টি প্রমাণিত হয়। এই বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহ অনুসরণকারীদের বিন্দুমাত্র শোবা-সন্দেহ নেই। প্রত্যেক মুসলিমের উচিত উপর্যুক্ত বর্ণনাগুলো সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করে খিলাফাত লাভে ‘উসমান (রা.)-এর অগ্রগণ্যতার বিষয়টি মেনে নেওয়া।

ছয়. ‘উসমান (রা.)-এর খিলাফাত লাভের বিষয়ে ইজমা’ সম্পাদিত হয়েছেঃ

সাহাবায়ে কিরাম ও পরবর্তী যুগের আহলুস সুন্নাহ-এর অনুসারীগণ এ বিষয়ে একমত ছিলেন যে ‘উমার (রা.)-এর পর খিলাফাত লাভে ‘উসমান (রা.) অগ্রগণ্য ছিলেন। এ ব্যাপারে কেউ মতভেদ বা বিরোধিতা করেননি, বরং সবাই বিষয়টি মেনে নিয়েছেন; কারণ তারা জানতেন আবূ বাকর (রা.) ও উমার (রা.)-এর পর এই উম্মাতে শ্রেষ্ঠজন ছিলেন ‘উসমান (রা.)। ‘উমার (রা.)-এর পর খিলাফাত লাভে ‘উসমান (রা.)-এর অগ্রগণ্যতার বিষয়ে ইজমা’ সম্পাদনের বিষয়ে মুহাদ্দিসগণ অনেক রিওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন। নিম্নে কয়েকটি রিওয়ায়াত উল্লেখ করা হলঃ

ক. ইবনু আবি শাইবা নিরবচ্ছিন্ন সনদে হারিসা ইবনু মাদরাব থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি ‘উমার (রা.)-এর খিলাফাতকালে হজ্জ করেছি। আমি দেখেছি লোকজন ‘উমার (রা.)-এর পর ‘উসমান (রা.)-এর খালীফা হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ পোষণ করত না।[৫৬]

---

৫৪. সহীহুল বুখারী, কিতাবু ফাদাইলি আসহাবিন্ নাবী।
৫৫. ইবনু তাইমিয়া, ‘আকীদাতু আহলিস সুন্নাহ, ২ঃ ৬৬৪।
৫৬. ইবনু আবি শাইবা, আল-মুসান্নাফ, ১৪:৫৮৮।

খ. আবু নাঈম আল-ইস্পাহানী হুযাইফা (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি 'উমার (রা.)-এর সাথে বসা ছিলাম, আমার হাঁটু তার হাঁটুর সাথে লাগছিল। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার পরে তোমার সম্প্রদায়ের লোকেরা কাকে আমীর বানাতে চায় বলে তুমি মনে কর?' আমি বললাম, 'জনগণ তো আমীর হওয়ার বিষয়টি 'উসমান (রা.)-এর সাথে সম্পৃক্ত করে।'[৫৭]

গ. হাফিয আয-যাহাবী, শুরাইক ইবনু আবদিল্লাহ আল-কাযী হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মৃত্যুর পর জনগণ আবূ বাকর (রা.)-কে খালীফা নির্বাচন করলেন। তারা যদি জানত তাঁদের মধ্যে আবূ বাকর (রা.)-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কেউ আছে তাহলে তারা এটি মেনে নিত না। তারপর আবূ বাকর (রা.), 'উমার (রা.)-কে খালীফা ঘোষণা করলেন। তিনি সত্য-সুন্দর ও আদল-ইনসাফের সাথে রাষ্ট্র পরিচালনা করলেন। অতঃপর আহত হয়ে মৃত্যুশয্যায় পতিত হলে তাঁর উত্তরাধিকারীর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ছয় সদস্যের নির্বাচক পরিষদ গঠন করলেন। তাঁরা 'উসমান (রা.)-কে খালীফা নির্বাচন করার ব্যাপারে একমত হলেন। তাঁরা যদি জানতেন তাঁদের মাঝে 'উসমান (রা.)-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কেউ আছে তাহলে তাঁরা অবশ্যই প্রবঞ্চনা দিয়েছেন।[৫৮]

ঘ. ইবনু সা'দ, নাযাল ইবনু সাবরা হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, 'উসমান (রা.)-এর খিলাফাত লাভের সংবাদ শুনে 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ বললেন, 'জীবিতদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠজনকে আমরা খালীফা নির্বাচন করেছি আর শ্রেষ্ঠজনকে নির্বাচন করার ক্ষেত্রে আমরা কসুর করিনি।'[৫৯]

ঙ. ইবনু তাইমিয়া, আহমদ ইবনু হাম্বল (রা.)-এর মত বর্ণনা করে বলেন, ''উসমান (রা.)-এর হাতে বাই'আত গ্রহণের ব্যাপারে জনগণ যেভাবে একমত হয়েছিলেন অন্য কোন বাই'আতের ব্যাপারে সেভাবে একমত হননি।'[৬০]

চ. আবুল হাসান আল-আশ'আরী বলেন, 'উসমান (রা.)-এর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে উমার (রা.) কর্তৃক গঠিত শূরা সদস্যদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে। তাঁরা 'উসমান (রা.)-কে নির্বাচিত করেছেন, তাঁর নেতৃত্ব সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করেছেন এবং তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও ন্যায়পরায়ণতার ব্যাপারে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছেন।'[৬১]

---

৫৭. আবূ না'ঈম আল-আসবাহানী, কিতাবুল ইমামাহ ওয়ার রাদ্দু 'আলার রাফিদাহ (মাদীনাঃ মাকতাবাতুল 'উলূম ২০০১), ৩০৬।

৫৮. আয-যাহাবী, মীযানুল ই'তিদাল ফী নাকদির রিজাল (কায়রোঃ দারু ইহইয়াইল কুতুবিল 'আরাবিয়্যাহ ১৩৮২ হি.), ২ঃ ২৭৩।

৫৯. ইবনু সা'দ, ৩ঃ ৬৩।

৬০. ইবনু তাইমিয়্যাহ্, মিনহাজুস সুন্নাহ, ৩ঃ ১৬৬।

৬১. আবুল হাসান আল-আশ'আরী, আল-ইবানাহ ফী উসূলিদ দিয়ানাহ (মাদীনাঃ আল-জামি'আ আল-ইসলামিয়্যাহ্ ১৯৭৫), ৬৮।

ছ. উসমান আস-সাবূনী বলেন, 'আহলুশ শূরা ও সকল সাহাবীর ঐকমত্য ও সন্তুষ্টির ভিত্তিতে 'উসমান (রা.)- এর খিলাফাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।'[৬২]

জ. শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া বলেন:

সমগ্র মুসলিম উম্মাহ 'উসমান (রা.)-এর হাতে বাই'আত করেছেন, কেউ পিছিয়ে ছিলেন না.. মর্যাদাবান, সম্ভ্রান্ত ও কর্তৃত্বশালীরা বাই'আত করলে 'উসমান (রা.) ইমাম হন। যদি এমন হত আবদুর রহমান ইবনু 'আউফ ছাড়া অন্য কেউ তাঁর হাতে বাই'আত করেননি, তাহলে তিনি ইমাম হতে পারতেন না। কিন্তু ব্যাপারটি তেমন ছিল না। 'উমার (রা.) ছয় সদস্যের নির্বাচক পরিষদ গঠন করে তাদের মধ্য থেকে একজনকে খালীফা নির্বাচনের দায়িত্ব অর্পণ করেন আবদুর রহমান ইবনু 'আওফের ওপর। তালহা, যুবাইর ও সা'দ (রা.) স্বেচ্ছায় খিলাফাতের দাবি পরিত্যাগ করলে বাকি রইলেন তিনজন: 'উসমান, 'আলী ও আবদুর রহমান ইবনু 'আওফ (রা.)। ইবনু 'আওফ তিনদিন বিনিদ্র রাত কাটান; তিনি শীর্ষস্থানীয় সিনিয়র সাহাবীদের পরামর্শ নিলেন, পরামর্শ করলেন তাঁদের অনুগামীদের সাথে, প্রাদেশিক শাসনকর্তদের সাথেও পরামর্শ করলেন যারা সে বছর উমার (রা.)-এর সাথে হাজ্জ সমাপনান্তে মাদীনায় এসেছিলেন। মুসলিমগণ 'উসমান (রা.)-কে খালিফা নির্বাচনের পরামর্শ দিয়েছিলেন। আর তাই তাঁরা স্বেচ্ছায়-স্বজ্ঞানে 'উসমান (রা.)-এর হাতে বাই'আত করলেন। এমন নয় যে, 'উসমান তাঁদেরকে উপঢৌকন দিয়েছিলেন কিংবা ভয় দেখিয়েছিলেন। আর এ কারণে পূর্বসূরিদের অনেকে, যেমন- আবূ আইয়ূব সাখতিয়ানী, আহমদ ইবনু হাম্বল ও দারাকুতনীসহ অনেকে বলেন, যে ব্যক্তি 'আলী (রা.)-কে 'উসমান (রা.)-এর চেয়ে এগিয়ে রাখে সে ব্যক্তি মুহাজির ও আনসার সাহাবীগণকে অপমান-অপদস্থ করে। এই দলীল প্রমাণ করে যে, 'উসমান (রা.), আলী (রা.)-এর চেয়ে অগ্রগণ্য ছিলেন; কারণ সাহাবায়ে কিরাম (রা.) স্বেচ্ছায় পরামর্শের ভিত্তিতে 'উসমান (রা.)-কে 'আলী (রা.)-এর পূর্বে খালীফা নির্বাচন করেছিলেন।[৬৩]

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিগুলো এই বিষয়ে অকাট্য প্রমাণ উপস্থাপন করছে যে সাহবায়ে কিরামের ইজমা' এর ভিত্তিতে খালীফা হিসেবে 'উসমান (রা.)-এর নিযুক্তি সম্পন্ন হয়েছিল।

---

৬২. ইসমা'ঈল আস-সাবূনী, 'আকীদাতুস সালাফ.. বৈরুত: আমীন দাম্‌জ ১৯৭০), ১:১৩৯।
৬৩. ইবনু তাইমিয়া, মিনহাজুস সুন্নাহ, ১:১৩৪।

সাত. 'উসমান (রা.)-এর ওপর 'আলী (রা.)-কে অগ্রগণ্য করার হুকমঃ

এখানে একটি বিষয় পরিষ্কার করে উল্লেখ করছি যে সাহাবায়ে কিরাম সকলেই সত্যনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁদের কাউকে অপবাদ দেওয়া যায় না। তাঁদের মাঝে যেসব মতভেদ ছিল তা ছিল দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতার ফল।

'উসমান (রা.) ও 'আলী (রা.) মর্যাদা সম্পর্কে ইবনু তাইমিয়্যাহ্ বলেন,

''উসমান (রা.)-কে 'আলী (রা.)-এর ওপর অগ্রগণ্য করার ব্যাপারে আহ্লুস সুন্নাহ স্থির মতৈক্যে পৌঁছেছে। যদিও এটি এমন আবশ্যকীয় 'আকীদাগত বিষয় নয় যার অস্বীকারকারী গোমরাহ বলে গণ্য হবে। যে বিষয়টি অস্বীকার করলে গোমরাহ হবে সেটি হল খিলাফাতের বিষয়। ব্যাপারটি হল এই যে, আহ্লুস সুন্নাহ-এর রায় হল, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পর খালীফা হলেন 'আবূ বাকর (রা.), তারপর 'উমার (রা.), তারপর 'উসমান (রা.), তারপর 'আলী (রা.)। যে ব্যক্তি এই চার খালীফার কোন একজনের খিলাফাত ও পর্যায়ক্রম অপ্রমাণ করতে চাইবে সে স্বগৃহের গর্দভের চেয়ে ভ্রষ্ট ও অধম বলে গণ্য হবে।[৬৪]

খিলাফাতের বিষয় বাদ দিয়ে সাধারণভাবে 'আলী ও 'উসমান (রা.)-এর অগ্রগণ্যতার বিষয়ে দু'টি মত পাওয়া যায়ঃ

১. 'উসমান (রা.)-এর চেয়ে 'আলী (রা.) শ্রেষ্ঠ' এই ধরনের বক্তব্য অনুমোদনযোগ্য নয়। যে এই অভিমত পোষণ করবে সে বিদ'আতী বলে গণ্য হবে। কারণ এটি সাহাবায়ে কিরামের ইজমা'-এর বিপরীত। আইয়ূব সাখতিয়ানী, আহমদ ইবনু হাম্বল ও দারাকুতনীসহ অনেকে এই অভিমত পোষণ করেন।

২. আলী (রা.)-কে অগ্রগণ্য করলে বিদ'আতী হবে না। কারণ 'উসমান ও 'আলী (রা.)-এর মর্যাদা কাছাকাছি।[৬৫]

---

৬৪. ইবনু তাইমিয়া, মাজমূ'উল ফাতওয়া, ৩:১০১-০২।
৬৫. প্রাগুক্ত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

'উসমান (রা.)-এর শাসন-পদ্ধতি

শাসনকাজে 'উসমান (রা.) কোন অভিনব পন্থা উদ্ভাবন করেননি। পূর্বসূরি দু'খালীফার শাসন প্রণালীই ছিল তাঁর আদর্শ। খালীফা হওয়ার পর প্রদত্ত ভাষণে এবং বিভিন্ন দায়িত্বশীল ও পদস্থ ব্যক্তিদের উদ্দেশে প্রেরিত পত্রাবলিতে তাঁর শাসনপদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। খালীফা হওয়ার অব্যবহিত পর 'উসমান (রা.) যে ভাষণ দেন তা হলো:[৬৬]

أما بعد فإني كلفت وقبلت، ألا وإني متبع ولست بمبتدع، ألا وإن لكم عليّ بعد كتاب الله وسنة نبيه ثلاثا: اتباع من كان قبلي فيما اجتمعتم عليه وسننتم وسنُّ سنة أهل الخير فيما لم تسنوا عن ملإ، والكف عنكم إلا فيما استوجبتم العقوبة، وإن الدنيا حضرة وقد شهيت إلى الناس ومال إليها كثير منهم فلا تركنوا إلى الدنيا ولا تثقوا بها، فإنها ليست بثقة، واعلموا أنها غير تاركة إلا من تركها

অতঃপর আমার ওপর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে এবং আমি তা গ্রহণ করেছি। মনে রেখো, আমি অনুসরণকারী, নবপন্থা উদ্ভাবক্ নই। আরো জেনে রাখ, আল্লাহর কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাহ-এর পর আমার ওপর তোমাদের তিনটি অধিকার রয়েছে: (১) ঐসব বিষয়ে আমার পূর্বসূরিদের অনুসরণ যে বিষয়গুলোতে তোমরা একমত হয়ে কর্মপন্থা নির্ধারণ করেছ; (২) যেসব বিষয়ে পরামর্শের ভিত্তিতে কর্মপন্থা নির্ধারিত হয়নি সে বিষয়গুলোতে কল্যাণকামীদের কর্মপন্থার অনুসরণ; এবং (৩) তোমরা নিজেদের ওপর শাস্তি অত্যাবশ্যকীয় করে না নিলে তোমাদের কর্মকাণ্ডে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকা। জেনে রেখো, দুনিয়া সতেজ-সজিব, ইতোমধ্যে তা মানুষের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে আর অনেক মানুষও দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয়েছে। অতএব তোমরা দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে পড়ো না এবং তাকে বিশ্বাস করো না, কারণ দুনিয়া নিজেই বিশ্বস্ত নয়। জেনে রাখ, যে দুনিয়াকে ছাড়ে না দুনিয়াও তাকে ছাড়ে না।

---

৬৬. আত্-তাবারী, ৪:৪২২।

কোন কোন গ্রন্থে এসেছে যে খালীফা হওয়ার পর 'উসমান (রা.) প্রথম ভাষণ দিতে গিয়ে এমনভাবে কেঁপে ওঠেন যে তিনি কী বলেছেন তাও বুঝতে পারেননি। পরে অন্যদিন বক্তৃতা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি কথা শেষ করেন। এই তথ্য দিয়েছেন আল-'ইকদুল ফরীদ জাতীয় গ্রন্থসমূহ, যেগুলো ঐতিহাসিক গ্রন্থ নয় বরং কেচ্ছা-কাহিনীতে ভরপুর।[৬৭]

খিলাফাতের দায়িত্ব গ্রহণের পর 'উসমান (রা.) তাঁর প্রাদেশিক শাসনকর্তা, সেনাপতি, রাজস্ব কর্মকর্তা ও সাধারণ মানুষের উদ্দেশে ফরমান জারি করেন। এসব ফরমানে তাঁর শাসন প্রণালী সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। এখানে কয়েকটি পত্র উল্লেখ করা হল:

এক. শাসনকর্তা, সেনাপতি, রাজস্ব কর্মকর্তা ও সাধারণ মানুষের প্রতি 'উসমান (রা.) প্রেরিত পত্রাবলি:

খালীফা হওয়ার পর 'উসমান (রা.) শাসনব্যবস্থায় কোন পরিবর্তন আনেননি; 'উমার (রা.)-এর উপদেশ ধারণ করে পূর্বে নিযুক্ত শাসনকর্তাদের তিনি বহাল রাখেন। প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের উদ্দেশে তিনি দিক-নির্দেশনামূলক পত্র জারি করেন। মূল টেক্সটসহ পত্রগুলো উপস্থাপন করা হচ্ছে:

ক. শাসনকর্তাদের প্রতি প্রেরিত 'উসমান (রা.)-এর প্রথম পত্র:[৬৮]

أما بعد فإن الله أمر الأئمة أن يكونوا رعاة، ولم يتقدم إليهم أن يكونوا جباة، وإن صدر هذه الأمة خلقوا رعاة، لم يخلقوا جباة، وليوشكن أئمتكم أن يصيروا جباة ولا يكونوا رعاة، فإذا عادوا كذلك انقطع الحياء والأمانة والوفاء. ألا وإن أعدل السيرة أن تنظروا في أمور المسلمين فيما عليهم فتعطوهم ما لهم، وتأخذوهم بما عليهم، ثم تثنّوا بالذمة، فتعطوهم الذي لهم، وتأخذوهم بالذي عليهم، ثم العدو الذي تنتابون، فاستفتحوا عليهم بالوفاء

অতঃপর, নিশ্চয় আল্লাহ শাসকদেরকে দায়িত্বশীল (বা রাখাল) হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। কর আদায়কারী বলে শাসকদেরকে আল্লাহ্ অগ্রাধিকার দেননি। এই উম্মাহ-এর অগ্রবর্তীদেরকে আল্লাহ্ তত্ত্বাবধায়ক (বা রাখাল)[৬৯] হিসেবে সৃষ্টি

---

৬৭. ইবনু কাসীর, ৭:১৪৮।
৬৮. আত-তাবারী, ৪:২৪৪।
৬৯. মূসা (আ.) ও মহানবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রাখাল হিসেবে ছাগল/মেষ তত্ত্বাবধান করেছেন।

করেছেন, কর আদায়কারী হিসেবে সৃষ্টি করেননি। আমার আশঙ্কা তোমাদের শাসকরা তত্ত্বাবধায়ক হওয়ার বদলে যেন কর আদায়কারী না হয়ে পড়ে। তারা যদি কর আদায়কারী হয়ে পড়ে তবে লজ্জাশীলতা, আমানতদারী ও বিশ্বস্ততার অবসান হবে। সাবধান! নিশ্চয় সর্বাধিক ন্যায়ানুগ কর্মপদ্ধতি হল এই যে, তোমরা মুসলিমদের ব্যাপারে মনোযোগী হবে, তাদেরকে তাদের প্রাপ্য প্রদান করবে এবং রাষ্ট্রের প্রাপ্য তাদের কাছ থেকে আদায় করবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে তোমরা জিম্মীদের ব্যাপারে মনোযোগী হবে, তাদের প্রাপ্য তাদেরকে প্রদান করবে আর রাষ্ট্রের পাওনা তাদের কাছ থেকে আদায় করবে। অতঃপর আমি শত্রুদের ব্যাপারে বলছি যাদের ওপর তোমরা আঘাত হেনে থাক, তাদের ভূমি তোমরা উন্মোচন করবে বিশ্বস্ততার সাথে।

রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উদ্দেশে প্রেরিত প্রথম পত্রে 'উসমান (রা.) শাসকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে নির্দেশনা দিয়েছেন: কেবল কর আদায় করা শাসকদের দায়িত্ব নয়, বরং তাদের উচিত শাসিতদের কল্যাণ সাধন করা। আর এ কারণেই তিনি শাসন পরিচালনার মূলনীতি বাতলে দেন: রাষ্ট্রের প্রাপ্য জনগণের কাছ থেকে আদায় করার পাশাপাশি তাদের প্রাপ্যও আদায় করা। এভাবেই উম্মাহ-এর কল্যাণসাধন সম্ভব। পক্ষান্তরে শাসকরা যদি নিরেট কর আদায়কারীতে পরিণত হয়, তবে লজ্জাশীলতার অবসান হবে এবং আমানতদারী ও বিশ্বস্ততা অবলুপ্ত হবে।

শাসকদের তত্ত্বাবধায়ক হওয়ার পরিবর্তে নিরেট কর আদায়কারী হওয়ার পরিণতি সম্পর্কেও 'উসমান (রা.) সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। এটি উচ্চতর নৈতিকতা হ্রাস করে; ফলে লজ্জাশীলতা, বিশ্বস্ততা ও আমানতদারী নির্বাসিত হয়। 'উসমান (রা.)-এর মতে শাসক ও শাসিত অত্যন্ত মজবুত বন্ধনে আবদ্ধ, তাদের এই বন্ধন আরো মজবুত হবে যদি সবার জীবনোদ্দেশ্য এক হয়: আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। এই লক্ষ্যে শাসকের সমস্ত চেষ্টা-প্রচেষ্টা নিয়োজিত করা উচিত; তবেই লজ্জাশীলতা সকলকে ছায়া দেবে, শাসক-শাসিত সবাই গর্হিত কাজ থেকে বিরত থাকবে এবং অপরের অনুভূতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে। 'উসমান (রা.) তাঁর শাসকবর্গকে ন্যায় প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়েছেন। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন: তা হল চুক্তির শর্তাবলী মেনে চলা; কারণ শত্রুদের ওপর বিজয় লাভের এটি বড় উপায়। সত্যিই তো ইতিহাসের পাতায় মুসলিমদের সামরিক ও প্রশাসনিক শ্রেষ্ঠত্বের অনেক নজির রয়েছে যা অর্জিত হয়েছে উচ্চতর নৈতিকতার বদৌলতে।

খ. সেনাপতিদের প্রতি 'উসমান (রা.)-এর প্রথম পত্র:

সেনাপতিদের প্রতি 'উসমান (রা.) সর্বপ্রথম যে পত্রটি প্রেরণ করেন সেটি নিম্নরূপ:[৭০]

---

৭০. আত্-তাবারী, ৪:২৪৫।

أما بعد، فإنكم حماة المسلمين وذادهم، وقد وضع لكم عمر ما لم يغب عنا، بل كان على ملأ منا، ولا يبلغني عن أحد منكم تغيير ولا تبديل فيغير الله بكم، ويستبدل بكم غيركم، فانظروا كيف تكونون، فإني أنظر فيما ألزمني الله النظر فيه والقيام عليه.

(হামদ ও সালাতের পর) তোমরা মুসলিমদের রক্ষক, তোমাদের জন্য 'উমার (রা.) যে নীতি প্রবর্তন করেছিলেন তা আমাদের অগোচরে নয়, বরং আমাদের পরামর্শেই প্রবর্তিত হয়েছিল। ঐ মূলনীতিতে তোমাদের কারো পক্ষ থেকে কোনরূপ পরিবর্তন সাধনের খবর যেন আমার কাছে না পৌছে। সে রকম কিছু হলে আল্লাহ তোমাদের অবস্থার পরিবর্তন করবেন এবং তোমাদের স্থলে অন্য জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করবেন। তোমাদের কর্মকাণ্ডের দিকে দৃষ্টিপাত কর; যেসব বিষয়ের তত্ত্বাবধান ও দেখাশোনার দায়িত্ব আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন আমি তা সম্পাদন করব।

এই পত্রে রাষ্ট্রপরিচালনার একটি মূলনীতি উল্লেখ করা হয়েছে, আর তা হল শাসক বা খালীফার পরিবর্তনে হুকম পরিবর্তিত হয় না। কারণ খালীফা ও শাসকবর্গের সর্বপ্রধান কর্তব্য হল বাস্তব জীবনে ইসলামের বিধানের প্রয়োগ। পত্রটিতে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে (বরং তা আমাদের পরামর্শেই প্রণীত হয়েছিল): পূর্ববর্তী খালীফাগণের পরামর্শ-ভিত্তিক রাষ্ট্র পরিচালনা। পরামর্শ গ্রহণের সেই মূলনীতিতে কোনরূপ পরিবর্তন আসবে না। আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার চিরস্থায়ী শর্তের প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে এই পত্রে। আল্লাহর সাহায্য ও সুরক্ষা পাওয়ার শর্ত হল ইসলামী শারী'আহ-এর পরিপালন। তাতে যদি কোন পরিবর্তন আসে তবে আল্লাহর সাহায্য আসবে না, তিনি অন্য জাতিকে মুসলিমদের স্থলে প্রতিষ্ঠিত করবেন (ঐ মূলনীতিতে তোমাদের কারো পক্ষ থেকে কোনরূপ পরিবর্তন সাধনের খবর যেন আমার কাছে না পৌছে। সে রকম কিছু হলে আল্লাহ তোমাদের অবস্থার পরিবর্তন করবেন)।

গ. রাজস্ব কর্মকর্তাদের প্রতি 'উসমান (রা.)-এর প্রথম পত্র:

'উসমান (রা.) রাজস্ব কর্মকর্তাদের প্রতি প্রথম যে পত্র প্রেরণ করেন সেটি নিম্নরূপ:[৭১]

أما بعد، فإن الله خلق الخلق بالحق فلا يقبل إلا الحق، خذوا الحق واعطوا الحق به، والأمانة الأمانة، قوموا عليها، ولا تكونوا أول من يسلبها، فتكونوا شركاء من بعدكم إلى ما اكتسبتم، والوفاء والوفاء، لا تظلموا اليتيم، لا المعاهد، فإن الله خصم لمن ظلمهم.

৭১. প্রাগুক্ত।

(হামদ ও সালাতের পর) নিশ্চয় আল্লাহ সত্য সহকারে (যথাযথভাবে) সৃষ্টিকূল সৃষ্টি করেছেন; সুতরাং তিনি সত্য ব্যতীত অন্য কিছুই কবুল করবেন না। সত্যকে আঁকড়ে ধর আর সত্যের ভিত্তিতে হক প্রদান কর। আর আমানত! আমানত সংরক্ষণে যত্নবান হও এবং আমানতের প্রথম হরণকারী হয়ো না। (যদি তোমরা আমানত হরণ কর) তবে তোমাদের অর্জনে পরবর্তীদেরকে অংশীদার বানাবে। বিশ্বস্ততা! বিশ্বস্ততার ভিত্তিতে কাজ কর। ইয়াতিম ও চুক্তিবদ্ধের ওপর যুল্‌ম করো না। কারণ তাদের ওপর যারা যুল্‌ম করবে আল্লাহ্‌ই তাদের প্রতিপক্ষ হবেন।

রাজস্ব কর্তকর্তাদের প্রতি প্রেরিত এই পত্রে 'উসমান (রা.) আমানতদারীর ব্যাপারে সবিশেষ তাকিদ দিয়েছেন। আমানতদারী ও বিশ্বস্ততার ভিত্তিতে রাজস্ব আহরণ ও বিতরণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। অতঃপর দু'ধরনের নাগরিকের ব্যাপারে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন: ইয়াতিম ও চুক্তিবদ্ধ; তাদের ওপর যুল্‌ম করা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। কারণ তাদের ওপর অত্যাচার করা হলে আল্লাহ্‌র আযাব নেমে আসবে। 'উসমান (রা.)-এর এই পত্রে ইসলামের সৌন্দর্যের এক বিরাট দিক রয়েছে: তিনি চুক্তিবদ্ধ কাফিরদের ওপর নির্যাতনের ব্যাপারে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন।

ঘ. সর্বসাধারণের প্রতি 'উসমান (রা.)-এর পত্র[৭২]:

খালীফা হওয়ার পর 'উসমান (রা.) সর্বসাধারণের প্রতি যে ফরমান জারি করেন তা নিম্নরূপ:

أما بعد، فإنكم إنما بلغتم بالاقتداء والاتباع، فلا تلفتنكم الدنيا عن أمركم، فإن أمر هذه الأمة صائر إلى الابتداع بعد اجتماع ثلاث منكم: تكامل النعم، و بلوغ أولادكم من السبايا، وقراءة الأعراب والأعاجم القرآن، فإن رسول الله (ص) قال: الكفر في العجمة، فإذا استعجم عليهم أمر تكلفوا وابتدعوا

'(হামদ ও সালাতের পর) তোমরা বর্তমান অবস্থানে উপনীত হয়েছ (রাসূলের) অনুসরণের কারণে। দীনের ব্যাপারে দুনিয়া যেন তোমাদেরকে নোয়াতে না পারে। তিনটি বিষয়ের সমাবেশ হলে এই উম্মাত বিদ'আতের দিকে ধাবিত হবে: নি'আমাতের পূর্ণতা, দাসীদের গর্ভে জন্ম নেওয়া তোমাদের সন্তানদের বালিগ হওয়া এবং বেদুইন ও অনারবদের কিরাতচর্চা। কারণ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'অনারবত্বে কুফ্‌রির উপাদান রয়েছে।' তোমাদের কোন বিষয়ে যদি অনারব সংস্কৃতি প্রবলভাবে মিশ্রিত হয় তবে তোমরা কৃত্রিমতা, প্রদর্শনেচ্ছা ও বিদ'আতের পথ গ্রহণ করবে।'

---

৭২. আত-তাবারী, ৪:২৪৫।

এই পত্রে উসমান (রা.) জনসাধারণকে রাসূলের আনুগত্যের দিকে উদাত্ত আহবান জানিয়েছেন; পাশাপাশি তিনি কৃত্রিমতা ও বিদ'আত পরিহারের নির্দেশ দিয়েছেন। তার মতে মুসলিম সমাজে তিনটি বিষয় একত্র হলে তাদের অবস্থার পরিবর্তন হবে:
(১) নিয়ামতের প্রাচুর্য যা মানুষকে অহঙ্কারী ও বিলাসী করে তোলে এবং তাদেরকে কষ্টবিমুখ ও অলস করে দেয়, ফলে মানুষের প্রাণশক্তি স্তিমিত হয় এবং চারিত্রিক দৃঢ়তা লোপ পায়। (২) দাস-দাসীর মালিক হওয়া: মুসলিম উম্মাহ্র ইতিহাস এ বিষয়ে জীবন্ত সাক্ষী যে দাস-দাসীদের অপব্যবহারের ফলে মুসলিমরা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। (৩) বেদুইন ও অনারবদের কুরআন তিলাওয়াত: 'উসমান (রা.) এখানে বেদুইনদের চরিত্রের কঠোরতা, নির্মমতা ও রুক্ষতার প্রতি নির্দেশ করেছেন যা কুরআনের মর্মবাণী তাদের অন্তর্মূলে পৌছতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। অনারবদের সর্বপ্রকার গুণাবলীকে তিনি অস্বীকার করেননি; বরং তাদের অন্ধবিশ্বাস ও অনৈসলামিক রীতিনীতির সমালোচনা করেছেন। 'উসমান (রা.)-এর আশঙ্কা সত্য প্রমাণিত হয়েছিল- বেদুইন প্রভাব দেখা গিয়েছিল 'খারিজী' উপদলে; তাদের অনেকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে কুরআন তিলাওয়াত করতে পারত, কিন্তু কুরআনের হিদায়াত থেকে তারা ছিল বহু ক্রোশ দূরে। অন্যান্য উপদলের ওপর অনারবদের প্রভাব সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়েছিল। এই উপদলগুলো এমন মতাদর্শ ও চিন্তাধারার প্রবর্তন করেছিল যা মুসলিমদের জন্য ক্ষতির কারণ হয়েছিল।

দুই. রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি:

'উসমান (রা.) ঘোষণা দেন যে, তাঁর রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি হল আলকুরআন ও আস-সুন্নাহ' এবং দুই মহান পূর্বসূরির [আবূ বাক্র (রা.) ও 'উমার (রা.)] অনুসরণ: 'মনে রেখো আমি অনুসরণকারী, নবপন্থা উদ্ভাবক নই। আরো জেনে রাখো, আল্লাহর কিতাব ও তাঁর নাবীর সুন্নাহ-এর পর আমার ওপর তোমাদের তিনটি বিষয় রয়েছে: ঐসব বিষয়ে আমার পূর্বসূরিদের অনুসরণ যে বিষয়গুলোতে তোমরা একমত হয়ে কর্মপন্থা নির্ধারণ করেছ।

১. প্রথম উৎস হল আল্লাহ্র কিতাব; যেমনটি আল্লাহ্ বলেছেন,

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللهُ وَلاَ تَكُنْ لِّلْخَآئِنِيْنَ خَصِيْمًا ۔

আমি তো তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি আল্লাহ তোমাকে যা জানিয়েছেন সেই অনুসারে মানুষের মধ্যে বিচার-মীমাংসা কর এবং বিশ্বাস ভংগকারীদের সমর্থনে তর্ক করো না [আলকুরআন ৪:১০৫]।

২. দ্বিতীয় উৎস হল আস-সুন্নাহ আন-নাবাবিয়্যাহ: রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতির দ্বিতীয় উৎস হল রাসূলের সুন্নাহ। কুরআনের পর এটি দ্বিতীয় স্তরের মূলনীতি। তাছাড়া আলকুরআনের বিধানাবলীর প্রয়োগের বাস্তব প্রমাণও পাওয়া যায় সুন্নাহ্-এ।

৩. পূর্বসূরি দুই খালিফার অনুসরণ: উসমান বিঘোষিত নীতিমালায় রাষ্ট্রপরিচালনার তৃতীয় মূলনীতি হল পূর্বসূরি দুই খালিফার অনুসরণ। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাণীতে এই মূলনীতির উল্লেখ রয়েছে:

اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر

আমার পরবর্তী দু'জন তথা আবূ বাক্‌র ও 'উমার (রা.)-এর আনুগত্য কর।[৭৩]

'উসমান (রা.) পরিচালিত রাষ্ট্র ছিল শারী'আহ-এর অধীন। ঐ রাষ্ট্রে সকল আইন ও বিধানের ওপর শারী'আহ-এর শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য ছিল। এমনকি খালীফা নিজেও ছিলেন শারী'আহ-এর শৃঙ্খলে আবদ্ধ। খিলাফাতে রাশিদার সময়ে শারী'আহ-এর অবস্থান ছিল সর্বোচ্চ শিখরে; শাসক-শাসিত সবাই ছিলেন এর অধীন। তবে খালীফার আনুগত্য নিঃশর্ত ছিল না; কেবল সৎকর্মেই আনুগত্য অপরিহার্য ছিল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

لا طاعة في المعصية، إنما الطاعة في المعروف

অন্যায় ও অবাধ্যতায় আনুগত্য নেই, আনুগত্য কেবল সৎকর্মে।[৭৪]

শারী'আহ আইনের প্রাধান্য ছিল খিলাফাতে রাশিদার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অন্যান্য কতিপয় বৈশিষ্ট্য হল:

- সরকারের সংশ্লিষ্টতা ছিল ব্যাপক অর্থাৎ সরকার শুধু পার্থিব বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ছিল এমন নয়; বরং দুনিয়াবী ও ধর্মীয় সকল বিষয় সরকারের কর্মের আওতাভুক্ত ছিল।
- শারী'আহ আইন বাস্তবায়নে সরকার বাধ্য ছিল।
- খিলাফাতের অধীনে সমগ্র মুসলিম বিশ্ব ঐক্যবদ্ধ ছিল।

তিন. খালিফার জবাবদিহির ক্ষেত্রে নাগরিকের অধিকার:

এই বিষয়টি পরিষ্কার জেনে রাখা ভাল যে, খালিফার ক্ষমতা নিরঙ্কুশ ছিল না; বরং তা ছিল শর্তযুক্ত:

প্রথমত: তিনি কুরআন-সুন্নাহর সুস্পষ্ট বিধানের বিপরীতে কোন নির্দেশ দিতে পারবেন না।

দ্বিতীয়ত: যেসব বিষয়ে মুসলিম উম্মাহ ঐকমত্যে পৌঁছেছেন সেগুলোর বিরোধিতাও তিনি করতে পারবেন না।

---

৭৩. জামে আত-তিরমিযী, আবওয়াবুল মানাকিব (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার ২০০৬), ৬:২৮২।
৭৪. সহীহুল বুখারী, নং ৭১৪৫।

এর অর্থ খালিফা হলেন জনগণের প্রতিনিধি, তিনি জনগণের পক্ষে ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। জনগণ চাইলে ক্ষমতা প্রয়োগের ইখতিয়ার সম্প্রসারণ ও সঙ্কোচন করতে পারেন। আর এটি প্রয়োগ করা হবে মাজলিসে শূরা-এর মাধ্যমে। জনগণের নিকট জবাবদিহির বিষয়টি 'উসমান (রা.) স্বীকার করে নিয়েছেন এই বলে যে,

إن وجدتم في كتاب الله أن تضعوا رجلي في القيد فضعوا رجلي في القيد

আল্লাহ্র কিতাবে যদি তোমরা এটি পাও যে আমার পা শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা উচিত তাহলে তোমরা তাই করবে।[৭৫]

একবার খালীফা 'উসমান (রা.)-এর কর্মকাণ্ডে ত্রুটি লক্ষ্য করে একদল লোক বিক্ষোভ করলে উসমান (রা.) জবাবদিহি করে তাদের দাবি পূরণ করেন এবং আপন কর্ম সংশোধনের প্রতিশ্রুতি দেন।[৭৬]

চার. পরামর্শ:

ইসলামী রাষ্ট্রপরিচালনার অন্যতম মূলনীতি হল শূরা বা পরামর্শ ব্যবস্থা। মুসলিম শাসকগণ শাসিতদের সাথে পরামর্শের ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনা করতেন। স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা শাসকবর্গকে পরামর্শের নির্দেশ দিয়েছেন:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ

আল্লাহ্র দয়ায় তুমি তাদের প্রতি কোমল-হৃদয় হয়েছিলে; যদি রূঢ় ও কঠোরচিত্ত হতে তবে তারা তোমার আশপাশ হতে সরে পড়ত। সুতরাং তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর, এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ কর। অতঃপর তুমি কোন সংকল্প করলে আল্লাহর উপর নির্ভর করবে; যারা নির্ভর করে আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন [আলকুরআন ৩:১৫৯।]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوْا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُوْرَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۔

যারা তাদের প্রতিপালকের আহ্বানে সাড়া দেয়, সালাত কায়েম করে, নিজেদের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যম নিজেদের কর্ম সম্পাদন করে এবং আমি তাদেরকে যে রিয্ক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে [আলকুরআন ৪২: ৩৮।]

---

৭৫. মুসনাদুল ইমাম আহমদ।
৭৬. আত-তাবারী, ৪:৩৩৮-৩৯।

এই আয়াতগুলোর নির্দেশনায় অনুপ্রাণিত হয়ে 'উসমান (রা.) শীর্ষস্থানীয় আনসার ও মুহাজিরদের নিয়ে মাজলিসে শূরা (পরামর্শ সভা) গঠন করেছিলেন।[৭৭] প্রাদেশিক গভর্ণর ও সেনাপতিদেরকেও তিনি একই আদেশ দিয়েছিলেন,

> أما بعد، فقوموا على ما فارقتم عليه عمر، ولا تبدلوا، ومهما أشكل عليكم فردوه إلينا نجمع عليه الأمة ثم نرده عليكم
>
> (হামদ ও সালাতের পর) 'উমার (রা.) তোমাদেরকে যে কর্মনীতির ওপর রেখে গিয়েছেন তদনুযায়ী কর্ম সম্পাদন করবে; এতে কোন পরিবর্তন আনা যাবে না। কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে জটিলতার সৃষ্টি হলে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেবে, আমরা সে বিষয়ে উম্মাহর ঐকমত্যের সিদ্ধান্ত তোমাদেরকে জানাব।[৭৮]

সেনাপতিগণ 'উসমান (রা.)-এর এই পরামর্শ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন; কোন অঞ্চলে দাওয়াতী দল ও সৈন্যবাহিনী প্রেরণের পূর্বে তাঁরা কেন্দ্রের পরামর্শ চাইতেন এবং অনুমতি নিতেন। অন্যদিকে 'উসমান (রা.) শীর্ষস্থানীয় সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করে গভর্ণর ও সেনাপতিদেরকে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দিতেন।[৭৯] একবার মিসর-শাসনকর্তা 'আবদুল্লাহ ইবনু সা'দ ইবনু আবি সারূহ দূর আফ্রিকার রোমান দ্বীপগুলোতে অভিযান চালানোর অনুমতি চেয়ে খালীফার কাছে পত্র দেন।[৮০] 'উসমান (রা.), সাহাবায়ে কিরামের সাথে পরামর্শ করে তাঁকে অনুমতি প্রদান করেন। সিরিয়ার শাসনকর্তা মু'আবিয়া ইবনু আবি সুফইয়ান (রা.) সাইপ্রাস দ্বীপে অভিযান চালানোর পূর্বে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি চেয়ে পত্র দেন। 'উসমান (রা.) মাজলিসে শূরার সদস্যদের সাথে পরামর্শ করে গভর্ণরকে অনুমতি প্রদান করেন।[৮১]

'উসমান (রা.)-এর সেনাপতিরা বিভিন্ন অঞ্চলে অভিযান প্রেরণের ক্ষেত্রে খালীফার পাশাপাশি অন্যান্য সেনাপতি ও গভর্ণরদের সাথেও পরামর্শ করতেন। 'উসমান (রা.) কুরআন একত্র করার বিষয়ে সাহাবায়ে কিরামের সাথে পরামর্শ করেছিলেন। তেমনিভাবে হরমুযানকে হত্যার অপরাধে 'উবাইদুল্লাহ ইবনু 'উমারকে কী শাস্তি দেওয়া যায়- এ বিষয়ে সাহাবায়ে কিরামের পরামর্শ নেওয়া হয়েছিল। এছাড়া ফিতনার উৎপাটন ও বিচার কাজসহ নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে 'উসমান (রা.) শূরা সদস্যদের পরামর্শ গ্রহণ করতেন।

---

৭৭. আল-ইদারাতুল 'আসকারিয়্যাহ ফিদ দাউলাতিল ইসলামিয়্যাহ, ১:২৭৭; উদ্ধৃত আস-সাল্লাবী, 'উসমান ইবনু 'আফফানঃ শাখসিয়্যাতুহু ওয়া 'আসরুহু, ৮৯।
৭৮. প্রাগুক্ত, ১:২৭৭।
৭৯. ফুতূহু মিসর, ৮৩।
৮০. প্রাগুক্ত, ১৮৩।
৮১. আল-ইদারাতুল 'আসকারিয়্যাহ, ১৭৮।

পাঁচ. ন্যায়বিচার ও সমতা :

ন্যায়বিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। রাষ্ট্রের জনসাধারণের উদ্দেশে 'উসমান (রা.) নিম্নলিখিত ফরমান জারি করেন:

أن ائتمروا بالمعروف، وتناهوا عن المنكر، ولا يذل المؤمن نفسه، فإني مع الضعيف على القوي ما دام مظلوما إن شاء الله

তোমরা সৎকাজের আদেশ দেবে, অসৎ কাজ হতে বারণ করবে; কোন মু'মিন যেন নিজেকে লাঞ্ছিত না করে; নিশ্চয় আমি ক্ষমতাবানের বিরুদ্ধে মাযলুম, অসহায় ও দুর্বলের পক্ষে থাকব, ইনশাআল্লাহ।[৮২]

তিনি সর্বোচ্চ মানের ন্যায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আল-ওয়ালীদ ইবনু 'উকবা কুফার শাসক ছিলেন; বৈপিত্রেয় ভাই হওয়া সত্ত্বেও তিনি তার ওপর মদ্যপানের শাস্তি প্রয়োগ করতে পিছপা হননি। এই অপরাধে তাকে কুফার শাসনকর্তার পদ থেকে অপসারণ করেন। আল-ওয়ালীদকে অপসারণের পর 'উসমান (রা.), সা'ঈদ ইবনুল 'আস-কে কুফার শাসনকর্তা নিয়োগ করেছিলেন। পরবর্তীতে স্থানীয় জনসাধারণের বিরোধিতার কারণে নিজ সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে তাদের পরামর্শ অনুযায়ী আবূ মূসা আল-আশ'আরীকে কুফার শাসক নিয়োগ করেন। বর্ণিত আছে যে, 'উসমান (রা.) একবার ক্রোধান্বিত হয়ে তাঁর এক খাদেমের কান এত জোরে টেনে ধরেছিলেন সে ব্যথা পেয়েছিল। কৃতকর্মের চিন্তায় 'উসমান (রা.) সেই রাতে ঘুমাতে পারেননি, পরের দিন তিনি খাদেমকে নির্দেশ দেন, সে যেন খালীফার কান টেনে ধরে। খাদেম প্রথমে রাজি না হলেও 'উসমান (রা.)-এর পীড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত তাঁর কান টানতে বাধ্য হয়েছিল।[৮৩]

ছয়. স্বাধীনতা:

'উসমান (রা.)-এর শাসনকালে জনগণ পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করত। ইসলামী শারী'আহ-এর আওতায় জনগণের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেওয়া হত। আধুনিক যুগে বিভিন্ন দেশের সংবিধানের যেসব বিষয়ে জনগণকে স্বাধীনতা দেওয়া আছে খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগেও জনসাধারণ তা ভোগ করত। বস্তুত ইসলাম মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে আল্লাহর দাসত্বের ছায়ায় প্রকৃত স্বাধীনতা প্রদান করেছে যা অন্য কোন জীবনবিধান দিতে পারেনি। ধর্মীয় স্বাধীনতা, চলাচলের স্বাধীনতা, সম্পদ অর্জন ও ভোগের স্বাধীনতা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতাসহ অন্যান্য স্বাধীনতা বিদ্যমান ছিল।

---

৮২. আত্-তাবারী, ৪:৩৯৭।
৮৩. হামদ মুহাম্মদ আস-সামাদ, নিযামুল হুকম ফী 'আহদিল খুলাফাইর রাশিদীন, ১৪৯।

সাত: আত্মসমালোচনা ও জওয়াবদিহি:

'উসমান (রা.) নিজে আত্মসমালোচনা বা ইহতিসাব করতেন এবং সরকারী কাজে নিয়োজিত অন্যদেরকে এ ব্যাপারে নির্দেশ দিতেন। পাশাপাশি তিনি জওয়াবদিহির অনুভূতি ধারণ করে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতেন। জনসাধারণের কাছে তিনি নিজে জওয়াবদিহি করতেন এবং জনগণকেও এর আওতায় আনতেন। এ সংক্রান্ত কয়েকটি নমুনা নিম্নে পেশ করা হল:

১. 'উমার (রা.)-এর ন্যায় 'উসমান (রা.)ও হাজ্জ সমাপনান্তে গভর্ণরদের সাথে সম্মেলনে মিলিত হতেন। প্রদেশসমূহে পত্র মারফত জনগণকে জানিয়ে দেওয়া হয়, খালীফা বা কোন শাসকের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকলে হাজ্জ সম্মেলনে যেন তা উত্থাপন করা হয়।[৮৪]

২. একবার মুহাম্মাদ ইবনু জা'ফর ইবনু আবি তালিব উসফুর রাঙা কাপড় পরিধান করলে 'উসমান (রা.) তাঁকে ভর্ৎসনা করেন। আবূ হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: একবার উসমান (রা.) হাজ্জের উদ্দেশ্যে মাক্কা রওয়ানা হন। মুহাম্মাদ ইবনু জা'ফর ইবনু আবি তালিবও তাঁর সাথে রওয়ানা করার কথা ছিল। কিন্তু পথিমধ্যে তাঁর তাঁবুতে তার স্ত্রী এসে পড়লে তাঁর যাত্রা বিলম্ব হয়। স্বামী-স্ত্রী রাতযাপন করলেন। সকালে দেখা গেল মুহাম্মাদের গায়ে উসফুর রাঙা কাপড় আর সুগন্ধির চিহ্ন। তিনি মালাল নামক স্থানে কাফিলার অন্য হজ্জযাত্রীদের সাথে মিলিত হলেন। 'উসমান (রা.) তাঁকে দেখে অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, 'তুমি উসফুর রাঙা হলুদ কাপড় পরিধান করেছ অথচ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা নিষেধ করেছেন।'[৮৫]

৩. ইদ্দত পালনকালে যেসব মহিলা হাজ্জ ও 'উমরা করতে চাইত তাদেরকে তিনি ফিরিয়ে দিতেন। ইমাম 'আবদুর রায্যাক মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আবূ বাকর (রা.) ও 'উসমান (রা.) জুহফা ও যুলহুলাইফা[৮৬] হতে ইদ্দতপালনকারী মহিলাদেরকে ফিরিয়ে দিতেন।[৮৭]

৪. কবুতর জবাইয়ের নির্দেশ: 'উসমান (রা.)-এর আমলে কিছু লোক বিলাসিতার উপকরণ ব্যবহার করতে শুরু করে। তিনি যখন শুনতে পেলেন লোকেরা কবুতর উড়িয়ে ভাগ্য গণনা করছে তখন তিনি তা বন্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ইমাম আল-

---

৮৪. আত-তাবারী, ৪:৩৯৭।
৮৫. আল-মুসনাদ, নং-৫১৭।
৮৬. যুহফা ও যুলহুলাইফা দু'টি মীকাতের নাম।
৮৭. মুসান্নিফ আবদুর রাজ্জাক, ১২০৭১।

বুখারী, আল-হাসান হতে বর্ণনা করেছেন যে, 'উসমান (রা.) তাঁর ভাষণে কুকুর হত্যা করা এবং কবুতর জবাই করার নির্দেশ দিতেন।[৮৮]

৫. পাশাখেলায় নিষেধাজ্ঞা: 'উসমান (রা.) পাশা খেলতে নিষেধ করতেন। যাদের বাড়িতে এ খেলার উপকরণ আছে তা ভেঙ্গে ফেলার বা পুড়ে ফেলার নির্দেশ দিতেন। আল-বাইহাকী, যাবীদ ইবনুস সালত হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, 'উসমান (রা.) মিম্বারে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন, 'হে জনগণ, তোমরা পাশা খেলা থেকে বিরত থাক। আমি শুনেছি কারো কারো কাছে পাশা খেলার উপরকরণ রয়েছে। যাদের কাছে আছে তারা যেন তা ভেঙ্গে ফেলে।' মিম্বারে দাঁড়িয়ে 'উসমান (রা.) আরেকবার বলেছিলেন, 'আমি তোমাদেরকে ইতোঃপূর্বে পাশা খেলার উপকরণ ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিলাম। আমি জানতে পেরেছি তোমাদের অনেকে তা বিনষ্ট করোনি। আমার ইচ্ছে হয় লাকড়ি জ্বালিয়ে আমি তোমাদের ঘরে গিয়ে ওগুলো জ্বালিয়ে দিই।'[৮৯]

৬. দুষ্টপ্রকৃতির মানুষকে মাদীনা থেকে বের করে দেয়া: সালিম ইবনু আবদিল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'দুষ্টপ্রকৃতির লোক কিংবা যারা অস্ত্র নিয়ে ঘুরে বেড়াতো 'উসমান (রা.) তাদেরকে মাদীনা থেকে বের করে দিতেন।'[৯০]

৭. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চাচার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনকারীকে শাস্তি প্রদান: 'উসমান (রা.)-এর শাসনকালে এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চাচা আল-'আব্বাস ইবনু আবদিল মুত্তালিবকে হেয় জ্ঞান করে তাঁর সাথে বচসায় লিপ্ত হয়েছিল। 'উসমান (রা.) তাকে শাস্তি দিয়েছিলেন। তার এই কাজের যৌক্তিকতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে 'উসমান (রা.) বলেছিলেন,

أيفخم رسول الله (ص) عمه وأرخص في الاستخفاف به؟ لقد خالف رسول الله من فعل ذلك ومن رضي به منه

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর চাচাকে সম্মান করেছেন, আর আমি তাকে হেয় জ্ঞান করার অনুমতি দেব? যে এই কাজ করবে [অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চাচাকে হেয় জ্ঞান করতে দেখে নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করবে] সে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বিরোধিতা করবে।[৯১]

---

৮৮. আল-আদাবুল মুফরাদ, বাবু যাবহিল হামাম, ১৩০৭; আত-তাবারী, ৪:৩৯৮; ইবনুল আসীর, ২:৪৫২; ইবনু কাসীর, ৭:২১৩।
৮৯. আস-সুনানুল কুবরা, কিতাবুশ শাহাদাত, ১০:২১৫।
৯০. আত্-তাবারী, তারীখ, ৫:৪১৬।
৯১. আত-তাবারী, ৪:৪০০।

৮. মদ্যপানে নিষেধাজ্ঞা: আন্-নাসাঈ ও আল-বাইহাকী তাঁদের সুনানে বর্ণনা করেছেন যে, উসমান (রা.) বলেছেন, তোমরা মদপান হতে বিরত থেকো; কারণ এটি সকল দুষ্কর্মের মূল। পূর্ববর্তী কোন এক জাতির একজন আবেদ (বেশি ইবাদাতকারী) ব্যক্তি মদ্যপানের কারণে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। এক ভ্রষ্টা নারী ঐ ব্যক্তির প্রণয়াসক্ত হয়ে তাঁর কাছে নিজের দাসীকে প্রেরণ করল। দাসীটি গিয়ে আবেদ লোকটিকে বলল, আমার মুনিবা আপনাকে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য ডেকেছেন। লোকটি দাসীটির সাথে গেল। দাসীটি তাঁকে নিয়ে একটি ঘরে প্রবেশ করল। যখনই তারা একটি দরজা অতিক্রম করছিল তখনই মেয়েটি সেটি বন্ধ করে দিচ্ছিল। এভাবে তারা মহিলাটির কাছে পৌঁছল। তার কাছে একটি সুদর্শন বালক ও এক কলসি মদ ছিল। সে বলল, আমি তোমাকে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য ডাকিনি। তোমাকে তিনটি কাজের কোন একটি করতে হবে- হয় আমার সাথে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করবে, অথবা এক পেয়ালা মদ পান করবে কিংবা এই বালককে হত্যা করবে। আবেদ লোকটি বলল, আমাকে বরং এক গ্লাস মদ খেতে দাও। মহিলাটি তাকে এক গ্লাস মদ দিল। তারপর লোকটি আরো মদ চাইতে লাগল; মহিলাটি গ্লাসের পর গ্লাস মদ খাইয়ে লোকটিকে নেশায় বুঁদ করে ফেলল। শেষ পর্যন্ত লোকটি মহিলার সাথে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করল এবং বালকটিকে হত্যা করল। অতএব তোমরা মদ্যপান থেকে বিরত থাকবে। আল্লাহর কসম ঈমান ও মাদকাসক্তি কখনো একত্রে অবস্থান করতে পারে না; একটি অপরটিকে তাড়িয়ে দেয়।'[৯২]

৯. উসমান (রা.)-এর কতিপয় ভাষণ ও প্রজ্ঞাপূর্ণ বাণী:

ক. আখিরাতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ সম্পর্কে উসমান (রা.)-এর ভাষণ: আল-হাসান আল-বাসরী বলেন, একবার উসমান (রা.) ভাষণ দিতে গিয়ে বললেন, 'হে লোকসকল, আল্লাহকে ভয় কর; কারণ তাকওয়া হল গাণীমতস্বরূপ। মানুষের মাঝে সবচাইতে বুদ্ধিমান হল ঐ ব্যক্তি যে নিজের নফ্‌সকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের জন্য আমল করে আর কবরের অন্ধকার দূর করার জন্য আল্লাহর নূর হতে আলো সংগ্রহ করে। বান্দাহর এই ভয় করা উচিত যে, আল্লাহ তাকে হাশরের ময়দান অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করবেন অথচ সে দৃষ্টিবান ছিল। প্রজ্ঞাময় সংক্ষিপ্ত বাণী প্রজ্ঞাবানের জন্য যথেষ্ট। বধির দূরের স্থান হতে আহবান করে। জেনে রেখো যার সাথে আল্লাহ্ রয়েছেন সে কাউকেই ভয় পায় না আর যার বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র অবস্থান সে কার কাছে সাহায্য আশা করতে পারে?'[৯৩]

উসমান (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

---

৯২. সুনানুন নাসাঈ, কিতাবুল আশরিবাহ।
৯৩. সহীহুত তাউছীক ফী সীরাতি ওয়া হায়াতি যিন-নূরাইন, ১০৭।

إن الجماء لتقص من القرناء يوم القيامة

কিয়ামত দিবসে শিংওয়ালাদের কাছ থেকে শিংবিহীনদেরকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।[৯৪]

খ. সচ্চরিত্রের উপদেশ:

উসমান (রা.) বলেন, আমরা সফরে ও ইকামাতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহচর্য লাভ করেছি; আমরা দেখেছি তিনি রোগীর সেবা করতেন, মৃতদের জানাযার ব্যবস্থা করতেন, আমাদের সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতেন, কম-বেশি দান করে আমাদেরকে সান্ত্বনা দিতেন।

গ. বহুল প্রচলিত বাণীসমূহ

উসমান (রা.)-এর নিম্নোক্ত বাণীসমূহ পাঠকমহলে ব্যাপকভাবে সমাদৃত:

إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن

আল্লাহ তা'আলা সুলতানের মাধ্যমে এমন কিছু নিয়ন্ত্রণ করেন যা কুরআনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করেন না।[৯৫]

هم الدنيا ظلمة في القلب، وهمُّ الآخرة نور في القلب

দুনিয়ার চিন্তা অন্তরের আঁধার আর আখিরাতের চিন্তা অন্তরের আলো।[৯৬]

يكفيك من الحاسد أنه يغتم وقت سرورك

তোমার আনন্দের সময় হিংসুক মনোকষ্ট পায়, এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট।[৯৭]

জীবন সায়াহ্নে 'উসমান (রা.) যখন বিদ্রোহী দ্বারা অবরুদ্ধ ছিলেন তখন বলেছিলেন,

أستغفر الله إن كنتُ ظَلمتُ، وقد عفوتُ إن كنتُ ظُلمتُ

আমি যদি কারো ওপর যুল্‌ম করে থাকি তবে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। আর কেউ যদি আমার ওপর যুল্‌ম করে থাকে তবে তাকে আমি ক্ষমা করে দিলাম।[৯৮]

إن لكل شيئ آفة، ولكل نعمة عاهة، وإنّ آفة هذا الدين وعاهة هذه النعمة عيابون صغانون، يرونكم ما تحبون، ويسرون ما تكرهون، طغام مثال النعام

---

৯৪. মুসনাদ আহমাদ, নং ৫২০।
৯৫. আল-কামিল ফিল লুগাতি ওয়াল আদাব, ১:১৫৭।
৯৬. আল-ইসতি'দাদ লিইয়াওমিল মা'আদ, ৯।
৯৭. আল-মায়দানী, মাজমা'উল আমসাল, ২:৪৫৩।
৯৮. তারীখু খলীফা ইবনু খাইয়াত, ১৭১।

প্রতিটি বস্তুর বিপদ আছে, প্রতিটি নিয়ামতের খুঁত আছে; এই দীনের বিপদ আর এই নিয়ামতের খুঁত হল পরনিন্দুকরা, তোমাদের সামনে প্রশংসা করে ও পেছনে নিন্দা করে। তোমরা যা পছন্দ কর তা তোমাদের সামনে প্রকাশ করে, তোমরা যা অপছন্দ কর তা গোপন রাখে, এরা উটপাখির মত ইতর।[৯৯]

ما من عامل يعمل عملا إلا كساه الله رداء عمله

কোন আমলকারী যে আমলই করে আল্লাহ সেই আমলের চাদর তাকে পরিধান করান।[১০০]

إن المؤمن في خمسة أنواع من الخوف "أحدها" من قبل الله تعالى أن يأخذ منه الإيمان، و"الثاني" من قبل الحفظة أن يكتبوا عليه ما يتفضح به يوم القيامة، و"الثالث" من قبل الشيطان أن يبطل عمله، و"الرابع" من قبل ملك الموت أن يأخذ في غفلة بغتة، و"الخامس" من قبل الدنيا أن يغتر بها وتشغله عن الآخرة

মু'মিনের পাঁচ প্রকারের ভয় রয়েছে: (১) আল্লাহ্‌র দিক থেকে– তিনি তার ঈমান নিয়ে নিতে পারেন, (২) সংরক্ষক ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে– তারা এমন কিছু লিখে ফেলতে পারেন যা কিয়ামাত দিবসে তার পাপ উন্মোচন করবে, (৩) শাইতানের দিক থেকে ভয়– সে তার আমল নষ্ট করে দিতে পারে, (৪) মৃত্যুর ফেরেশতার পক্ষ থেকে ভয়– তিনি তাকে অসতর্ক মুহূর্তে আচানক পাকড়াও করতে পারেন এবং (৫) দুনিয়ার দিক থেকে ভয়– এটি তাকে ধোঁকায় ফেলে আখিরাত-বিমুখ করে ফেলতে পারে।[১০১]

وجدت حلاوة العبادة في أربعة أشياء: "أولها" في أداء فرائض الله، و"الثاني" في اجتناب محارم الله، و"الثالث" في الأمر بالمعروف ابتغاء ثواب الله، و"الرابع" في النهي عن المنكر اتقاء غضب الله.

চারটি বিষয়ে আমি ইবাদাতের স্বাদ পেয়েছি: (১) আল্লাহ্‌ নির্ধারিত ফারয আদায়ে, (২) আল্লাহ নির্দেশিত হারাম কাজ-বস্তু হতে বিরত থাকতে গিয়ে, (৩) আল্লাহ্‌ প্রদত্ত সাওয়াব প্রাপ্তির আশায় সৎকাজের আদেশ দিতে গিয়ে এবং (৪) আল্লাহ্‌র ক্রোধ থেকে বাঁচার জন্য অসৎ কাজ হতে নিষেধ করতে গিয়ে (আমি ইবাদাতের স্বাদ আস্বাদন করতে পেরেছি)।[১০২]

---

৯৯. আল-মায়দানী, মাজমা'.., ২০:৪৫৩।
১০০. ইমাম আহমদ, আয-যুহদ, ১৮৫।
১০১. ফারাইদুল কালাম লিল খুলাফাইল কিরাম, ২৭৮।
১০২. প্রাগুক্ত।

তৃতীয় অধ্যায়

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা

প্রথম পরিচ্ছেদ

কেন্দ্রীয় সরকারব্যবস্থা

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আমলে ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানা এত বেশি বর্ধিত হয় যে কেবল রাজধানী মাদীনা হতে তা নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। ফলে ইসলামী রাষ্ট্রকে বিভিন্ন প্রদেশে ভাগ করে প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিয়োগ করতে হয়। এই ব্যবস্থা খুলাফা রাশিদূনের আমলে আরো সম্প্রসারিত হয়। তবে কেন্দ্র তথা খিলাফাতের রাজধানী মাদীনায় অবস্থান করে রাষ্ট্রপ্রধান বা খালীফা সমগ্র ইসলামী ভূখণ্ড নিয়ন্ত্রণ করতেন। কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যমণি খালীফা হলেও তিনি একাই স্বেচ্ছাচারিতা প্রয়োগে রাষ্ট্র পরিচালনা করতেন, এমন নয়। একটি বিধিবদ্ধ ও সুসংহত ব্যবস্থার অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত হত। নিম্নে তৃতীয় খালীফা 'উসমান (রা.)-এর আমলের কেন্দ্রীয় সরকারের গঠনপ্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের গঠন

এক. খালীফা[১]: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মাদীনা রাষ্ট্রের অনন্য বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, জনগণের ধর্মীয় ও পার্থিব উভয় প্রকারের প্রয়োজন

---

১. আরবী খালীফা শব্দের অর্থ প্রতিনিধি। খালীফাগণ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতিনিধি হিসেবে পার্থিব ও ধর্মীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনার পূর্ণ কর্তৃত্ব নিয়ে রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব পালন করতেন। কেউ কেউ মনে করেন খালীফাগণ আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে পৃথিবীতে তাঁরই বিধান প্রয়োগ করেন, তাই তাঁদেরকে খালীফা বলা হয়। এই মতের সমর্থনে কুরআনের আয়াত উল্লেখ করা হয়: إِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيْفَةً 'আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করছি [আলকুরআন ২:৩০]। وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ فِيْ الأَرْضِ 'তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছেন [আলকুরআন ৬:১৬৫]। তবে অধিকাংশ তাত্ত্বিক 'আলিম মনে করেন; মানুষকে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি বলা যায় না। আবূ বাক্‌র (রা.)-কে একবার খালীফাতুল্লাহ্ বা আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি বলে সম্বোধন করা হয়েছিল, তখন তিনি বলেছিলেন, 'আমি আল্লাহ্‌র খালীফা নই, আমি বরং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খালীফা।' তাছাড়া অনুপস্থিত ব্যক্তির পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব করা হয়। আল্লাহ্ তো অনুপস্থিত নন [ইবনু খালদূন, আল-মুকাদ্দিমা ১৬৬]। অতএব ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধানকে এজন্যই খালীফা বলা হত কারণ তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতিনিধি হিসেবে পার্থিব ও ধর্মীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনায় রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব পালন করতেন।

খালীফাকে ইমামও বলা হত। সালাতের ইমামের আনুগত্য ও অনুসরণ যেমন অত্যাবশ্যক, তেমনিভাবে রাষ্ট্রপ্রধানের আনুগত্যও অপরিহার্য। তাই খালীফাকে ইমাম বলা হত। তবে খিলাফাতের দায়িত্বকে আল-ইমামাহ আল-কুবরা বা বড় ইমামতি বলা হয়।

আবূ বাকর (রা.)-কে খালীফাতু রাসূলিল্লাহ [অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতিনিধি] বলা হত। আক্ষরিক অর্থে 'উমার (রা.) ছিলেন আবূ বাক্‌র (রা.)-এর প্রতিনিধি বা খালীফা [প্রত্যেক রাষ্ট্রপ্রধান পূর্ববর্তী রাষ্ট্রপ্রধানের খালীফা বা প্রতিনিধি]। সেক্ষেত্রে তাঁকে খালীফাতু খালীফাতি রাসূলিল্লাহ বলে সম্বোধন করার প্রয়োজন দেখা যায়। এভাবে পরবর্তী খালীফাগণকে সম্বোধনের জন্য আরো বেশি শব্দের প্রয়োজন হত। অনেকটা আকস্মিকভাবে এই সমস্যার সমাধান হয়। দ্বিতীয় খালীফা 'উমার (রা.) ও সাহাবী আল-মুগীরা ইবনু শু'বা (রা.)-এর আলাপচারিতায় একদিন 'আমীরুল মু'মিনীন' শব্দযুগল উদ্ভাবিত হয়। পরবর্তীতে সকল খালীফাকে এই অভিধায় সম্বোধন করা হয়। [হাসান ইবরাহীম হাসান, তারীখুল ইসলাম (বৈরুত: দারুল জীল ১৯৯১), ১:৩৫৮।]

পূরণ। তিনি সালাতে যেমন ইমামতি করতেন তেমনি যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলিম সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিতেন। আবার বিচারক হিসেবে যেমনি দায়িত্ব পালন করতেন তেমনি রাষ্ট্রীয় সম্পদ আহরণ ও বিতরণের দায়িত্ব পালন করতেন। মোদ্দাকথা, মানুষের ধর্মীয় ও পার্থিব জীবনের সকল ক্ষেত্রে নেতৃত্ব ও নির্দেশনা দিতেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মৃত্যুর পর তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে খালীফাগণ সেই দায়িত্ব পালন করেন। এজন্য ইসলামী রাষ্ট্রের কর্ণধারদেরকে খালীফা বলা হত অর্থাৎ তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতিনিধি হিসেবে তাঁর কর্মপন্থার অনুসরণে পার্থিব ও ধর্মীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতেন। দীন কায়েমের অংশ হিসেবে খালীফাগণ কেন্দ্র তথা মাদীনার প্রধান মাসজিদে সালাতে ইমামতি করতেন, শুক্রবারে সালাতুল জুম'আ'র পূর্বে পার্থিব ও ধর্মীয় বিষয়ে জনগণের উদ্দেশে দিকনির্দেশনামূলক বক্তৃতা দিতেন। প্রতি বছর আমীরুল হাজ্জ হিসেবে হাজ্জ কাফিলার নেতৃত্ব দিতেন। 'উসমান (রা.) তাঁর খিলাফাতের ১২ বছরে মোট দশবার আমীরুল হাজ্জ-এর দায়িত্ব পালন করেন। প্রথম বছর অর্থাৎ হিজরী চব্বিশ সনে রু'আফ (নাকের রক্তক্ষরণ) রোগে আক্রান্ত হওয়ায় হাজ্জ আদায় করতে পারেননি। এই বছর 'আবদুর রহমান ইবনু 'আউফ (রা.) আমীরুল হাজ্জ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। হিজরী পঁয়ত্রিশ সনে 'উসমান (রা.) হাজ্জে যেতে পারেননি। কারণ তিনি বিদ্রোহীদের দ্বারা অবরুদ্ধ ছিলেন। এই বছর খালীফার নির্দেশে 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রা.) আমীরুল হাজ্জের দায়িত্ব পালন করেন।[২]

খালীফাগণ বিভিন্ন প্রদেশে গভর্ণর নিয়োগ করতেন। রাষ্ট্রীয় কোষাগারের তত্ত্বাবধান করতেন। আবার প্রধান বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন। জনসাধারণের অভাব-অভিযোগ সুরাহা করতেন। অর্থাৎ তারা ছিলেন রাষ্ট্রের নির্বাহী প্রধান। খালীফা হিসেবে 'উসমান (রা.)-ও উপর্যুক্ত দায়িত্বগুলো পালন করতেন।

দুই. মাজলিসে শূরা:

খিলাফাত ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল শূরা বা পরামর্শভিত্তিক রাষ্ট্র পরিচালনা। পরামর্শের মাধ্যমে জনগণ রাষ্ট্রপরিচালনায় অংশীদার হতে পারত। সমকালীন পৃথিবীতে এর নজির পাওয়া যায় না। ইসলামী খিলাফাতের পাশাপাশি সেকালে দু'টো বড় সাম্রাজ্য ছিল: একটি হল রোমান সাম্রাজ্য, আরেকটি পারস্য সাম্রাজ্য। দু'টোই ছিল রাজতান্ত্রিক।

পরামর্শ গ্রহণের মূলনীতি আলকুরআনেই বিধৃত হয়েছে; আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

---

২. আয-যাহাবী, ১০৪; ইবনু সা'দ, ৩:৬৩-৬৪।

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ

আল্লাহ্র দয়ায় তুমি তাদের প্রতি কোমল-হৃদয় হয়েছিলে; যদি রূঢ় ও কঠোরচিত্ত হতে তবে তারা তোমার আশপাশ হতে সরে পড়ত। সুতরাং তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর, এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ কর। অতঃপর তুমি কোন সংকল্প করলে আল্লাহর উপর নির্ভর করবে; যারা নির্ভর করে আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন। [আলকুরআন ৩:১৫৯।]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوْا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُوْرَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ

যারা তাদের প্রতিপালকের আহ্বানে সাড়া দেয়, সালাত কায়েম করে, নিজেদের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের কর্ম সম্পাদন করে এবং আমি তাদেরকে যে রিয্ক দিয়েছি তা হতে ব্যয় করে। [আলকুরআন ৪২: ৩৮।]

আলকুরআনের উপর্যুক্ত নির্দেশনার আলোকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পরামর্শ করতেন। তবে একটি বিষয় পরিষ্কার করা দরকার, তা হল সকল নাগরিকের পরামর্শ গ্রহণ করা হত না এবং তা যেমন অসম্ভব ছিল তেমনি ছিল অপ্রয়োজনীয়। আবার সবসময় সবার পরামর্শ গ্রহণ করার প্রয়োজন হত না। দৈনন্দিন কার্যাদির ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবূ বাক্র (রা.)সহ কয়েকজন বিশিষ্ট সাহাবীর পরামর্শ গ্রহণ করতেন। আবার সর্বসাধারণের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন বিষয় হলে তিনি বিস্তৃত পরিসরে পরামর্শ করতেন। যেমন আমরা দেখতে পাই উহুদ যুদ্ধে কাফিরদের প্রতিরোধের ব্যাপারে তিনি বিস্তৃত পরিসরে পরামর্শ গ্রহণ করেছিলেন।[৩]

পরামর্শ গ্রহণের এই ধারাবাহিকতা খুলাফা রাশিদূনের যুগেও চালু ছিল। 'উসমান (রা.)-এর আমলে মাজলিসে শূরার সদস্য ছিলেন মাদীনায় অবস্থানরত বিশিষ্ট সাহাবীগণ। দৈনন্দিন কর্ম পরিচালনায় তিনি 'আলী (রা.), 'আবদুর রহমান ইবনু 'আউফ (রা.)সহ বিশিষ্ট সাহাবীদের পরামর্শ গ্রহণ করতেন। আবার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিস্তৃত

---

৩. ইবনুল আসীর, ২:৩৯।

পরিসরে পরামর্শ গ্রহণ করতেন। একটি উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে: হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা.) কুরআন তিলাওয়াতে বিভিন্নতা লক্ষ্য করে উম্মাহ্র বিভক্তি ও কুরআন-বিকৃতি রোধে খালীফাকে ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করেন। এ বিষয়েও 'উসমান (রা.) মাদীনায় অবস্থানরত সাহাবায়ে কিরামের ব্যাপকভিত্তিক পরামর্শ গ্রহণ করেন।[৪]

তিন. উযীর:

আরবী وزير (ওয়াযীর) শব্দটি وزر (বোঝা) শব্দ হতে উদ্ভূত। উযীর বা মন্ত্রী রাষ্ট্রের বোঝা বহন করে বলে তাকে উযীর বলা হয় কিংবা শব্দটি وَزر হতে উদ্ভূত হতে পারে যার অর্থ হল আশ্রয়; কারণ বিভিন্ন বিষয়ে উযীরের মতামত ও কৌশলের আশ্রয় নেওয়া হয়।

সেকালে পারস্য ও রোমে উযীর পদের প্রচলন ছিল। আরবরা এই শব্দের সাথে পরিচিত ছিল। তাছাড়া আলকুরআনেও উযীর শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে; রিসালাতের দায়িত্ব পালনে আপন ভাইকে সাহায্যকারী হিসেবে প্রেরণের অনুরোধ জানিয়ে মূসা (আ.)-এর আবেদন আলকুরআনের ভাষায় নিম্নরূপে এসেছে:

وَاجْعَل لِّي وَزِيْرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُوْنَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِيْ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِيْ

> আমার জন্য বানিয়ে দিন একজন সাহায্যকারী (উযীর) আমার স্বজনদের মধ্য হতে; আমার ভ্রাতা হারূনকে; তার দ্বারা আমার শক্তি সুদৃঢ় করুন ও তাকে আমার কর্মে অংশীদার করুন [আলকুরআন ২০:২৯-৩২]।

উযীর শব্দটি আরবদের নিকট পরিচিত হলেও খুলাফা রাশিদূনের আমলে এই পদবির ধারক কোন কর্মকর্তা ছিলেন না। তবে খালীফাগণ বিশ্বস্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের দ্বারা উযীরের কাজ সম্পাদন করতেন। ফলে উযীরের পদবীধারী ব্যক্তি না থাকলেও উযীরের কাজ সম্পাদিত হত। কেউ কেউ আবূ বাকর (রা.)-কে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উযীর বলে অভিহিত করতেন। তেমনিভাবে 'উমার (রা.), আবূ বাক্র (রা.)-এর উযীর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। আলী (রা.)-ও 'উসমান (রা.)-এর পদবিবিহীন উযীরের দায়িত্ব পালন করতেন।

চার. কাতিব (সচিব):

কাতিব বা সচিব খালীফার দৈনন্দিন কর্ম সম্পাদনে অন্যতম সহযোগী হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন। কাতিবের প্রধান কাজ ছিল খালীফার নির্দেশ ও ডিক্টেশন অনুসারে বিভিন্ন ফরমান, আদেশ বা নিয়োগপত্র লিখে প্রদেশসমূহে প্রেরণ। সেই যুগে

---

৪. প্রাগুক্ত, ২:৪০০।

অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন লোকের সংখ্যা খুব বেশি ছিল না। কাতিবের প্রধান যোগ্যতা ছিল লেখালেখির দক্ষতা ও বিশ্বস্ততা। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সময় কাতিবের অতিরিক্ত দায়িত্ব ছিল আলকুরআন লিপিবদ্ধ করা; এজন্য তাঁর আমলে অনেকে কাতিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কয়েকজন কাতিবের নাম: 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.), 'উসমান ইবনু 'আফ্ফান (রা.), 'আলী ইবনু 'আবী তালিব (রা.), যায়িদ ইবনু সাবিত (রা.), মু'আবিয়া ইবনু আবী সুফইয়ান (রা.), আল-মুগীরা ইবনু শু'বা (রা.)।[৫]

আবূ বাক্র (রা.) খালীফা হওয়ার পর 'উসমান (রা.)-এর ওপর কাতিবের দায়িত্ব অর্পণ করেন। 'উমার (রা.)-এর কাতিব ছিলেন যায়িদ ইবনু সাবিত (রা.) ও 'আবদুল্লাহ ইবনুল আরকাম (রা.)। আর 'উসমান (রা.)-এর কাতিব ছিলেন মারওয়ান ইবনুল হাকাম।

'উসমান (রা.)-এর আমলে কেন্দ্রীয় সরকারের গঠন সম্পর্কে আলোকপাত করা হল। লক্ষ্যণীয় বিষয় হল খুলাফা রাশিদূন ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য কোন দেহরক্ষী নিয়োগ করতেন না। তাঁদের বাসভবন ও দপ্তরের প্রবেশমুখে কোন দ্বাররক্ষক বা দারোয়ান থাকত না। খালীফাদের কাছে জনগণের অবাধ প্রবেশাধিকার ছিল; যে কোন অভাব-অভিযোগ ও দাবি-দাওয়া নিয়ে তারা নির্বিঘ্নে তাঁর কাছে যেতে পারতেন।

রাজধানী মাদীনা খিলাফাতের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ছিল; তাই এখানে কোন সেনানিবাস ছিল না। তবে গুরুত্বপূর্ণ অভিযানের সময় 'উসমান (রা.) মাদীনা হতে সেনাদল প্রেরণ করতেন। যেমন, হিজরী সাতাশ সনে আফ্রিকা অভিযানের সময় মাদীনা হতে সেনাদল প্রেরণ করা হয়।

পাঁচ. দিওয়ান:

ফার্সী শব্দ দিওয়ান (دیوان)-এর অর্থ হল হিসাবের খাতা বা রেকর্ড রেজিস্টার। পরিভাষায় শব্দটি দফ্তর বা অফিস অর্থে ব্যবহৃত হয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সময় ইসলামী রাষ্ট্রের স্বতন্ত্র কোন দফতর বা অফিস ছিল না। সাহাবায়ে কিরাম আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে জিহাদে অংশগ্রহণ করতেন। বিজয়ী হয়ে কোন গানীমাত অর্জন করলে তা শারী'আহ নির্ধারিত নিয়মানুযায়ী তাৎক্ষণিকভাবে মুজাহিদদের মাঝে বণ্টন করা হত। কখনো রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে কোন সম্পদ আসলে তিনি তা মাসজিদে জমা করতেন এবং কালবিলম্ব

৫. আল-জিহশিয়ারী, কিতাবুল উযারা ওয়াল কুত্তাব, ১২-১৪।

না করে বণ্টন করে দিতেন। জিহাদের জন্য সেনাবাহিনী গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে মাসজিদে ভাষণ দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবায়ে কিরামকে উদ্বুদ্ধ করতেন। বিচার-ফায়সালার কাজও মাসজিদে সম্পাদিত হত। অর্থাৎ সবধরনের রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু ছিল মাসজিদ।

আবূ বাক্‌র (রা.)-এর আমলেও অনুরূপ ব্যবস্থা বহাল ছিল। দ্বিতীয় খালীফা 'উমার (রা.)-এর আমলে বিজয়াভিযানের আধিক্যের কারণে দারুল খিলাফাহ বা মাদীনায় বিপুল সম্পদের সমাগম ঘটে। এগুলোর সংরক্ষণ ও বিলিবণ্টনের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য অফিস স্থাপন ও হিসাব-খাতা সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তখন 'উমার (রা.) সাহাবায়ে কিরামের পরামর্শক্রমে দিওয়ান প্রতিষ্ঠা করেন। রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমাকৃত সম্পদ হতে নাগরিকদের ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা চালু হয় এবং তার আনুপুঙ্খ হিসাব রেকর্ড করে রাখা হত। রাষ্ট্রীয় কোষাগার হতে জনগণকে ভাতা প্রদানের যে ব্যবস্থা 'উমার (রা.) চালু করেছিলেন তা 'উসমান (রা.) শুধু অব্যাহতই রাখেননি, বরং তিনি ভাতার পরিমাণ বৃদ্ধি করেন।

'উমার (রা.) *দিওয়ানুল জুন্দ* নামে আরেকটি দফ্‌তর চালু করেছিলেন। এই অফিসে সৈনিকদের নাম ও তাদেরকে প্রদত্ত ভাতার রেকর্ড রাখা হত। 'উসমান (রা.)-এর আমলে এই দিওয়ানের কার্যক্রমও অব্যাহত ছিল।[৬]

৬. হাসান ইবরাহীম হাসান,৩৬২-৬৫।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
প্রদেশ[৭] ও প্রাদেশিক গভর্ণর[৮]

খুলাফায়ে রাশিদূনের আমলে ইসলামী রাষ্ট্রের বিস্তৃতি অনেক ব্যাপক ছিল। ফলে পুরো ইসলামী রাষ্ট্রটিকে অনেকগুলো প্রদেশে বিভক্ত করতে হয়েছিল। প্রতিটি প্রদেশ একজন ওয়ালী বা গভর্ণরের অধীনে শাসিত হত। কোন কোন সময় এক প্রদেশ ভেঙ্গে একাধিক প্রদেশ করা হত, আবার কখনো বা কোন প্রদেশের মর্যাদা বিলুপ্ত করে সেটিকে অন্য প্রদেশের সাথে একীভূত করা হত। প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থার প্রধানত তিনটি অঙ্গ ছিলঃ ১) বিচার বিভাগ, যা সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল। খালীফা নিজেই প্রদেশসমূহের কাজী বা বিচারক নিয়োগ করতেন। কখনো বা গভর্ণর প্রাদেশিক বিচারক নিয়োগ দিতেন। মাঝে মাঝে গভর্ণরকে বিচারকের দায়িত্বও পালন করতে হত। ২) প্রশাসন বিভাগ, রাজ্য পরিচালনার সামগ্রিক দায়িত্ব ছিল এই বিভাগের ওপর। ওয়ালী বা গভর্ণর হলেন প্রদেশ প্রধান, তিনি সেনাবাহিনী প্রধান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করতেন। ওয়ালীর সেনাপতিত্বে প্রতি প্রদেশে পৃথক সেনাবাহিনী ছিল। তারা সংশ্লিষ্ট প্রদেশের সন্নিহিত অঞ্চলে অভিযান পরিচালনা করতেন। তবে বিশেষ প্রয়োজনে পার্শ্ববর্তী প্রদেশের সেনাবাহিনীর সাহায্য গ্রহণ করা হত। প্রাদেশিক রাজধানীর কেন্দ্রীয় মাসজিদে সালাতের ইমামতি করা ছিল গভর্ণরের অন্যতম দায়িত্ব। ৩) বাইতুল মাল বা রাজস্ব বিভাগ, প্রাদেশিক গভর্ণর সাধারণত রাজস্ব বিভাগ বা বাইতুল মালের তত্ত্বাবধান করতেন। তবে কখনো কখনো খালীফাগণ দ্বৈত ব্যবস্থা চালু রাখতেন; 'উসমান (রা.), সা'দ ইবনু আবি ওয়াক্কাসকে কূফার গভর্ণর নিয়োগ করলেও বাইতুল মালের দায়িত্ব তাঁর হাতে অর্পণ করেননি। কূফার বাইতুল মালের প্রধান ছিলেন 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রা.)। নিম্নে প্রদেশ ও প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের বিবরণ দেওয়া হলোঃ

এক. মাক্কা আল-মুকার্রমাঃ

দ্বিতীয় খালীফা 'উমার (রা.)-এর শাহাদাতের সময় মাক্কার গভর্ণর ছিলেন খালিদ ইবনুল 'আস ইবনু হিশাম ইবনিল মুগীরা আল-মাখযূমী (রা.)। তৃতীয় খালীফা 'উসমান (রা.) তাঁকে কিছুদিন মাক্কার গভর্ণর পদে বহাল রাখেন। তারপর তাঁকে সরিয়ে দেয়া হয়।

---

৭. আরবী বিলায়াহ-এর অর্থ প্রদেশ, রাজ্য, অঙ্গরাষ্ট্র ইত্যাদি।

৮. খুলাফা রাশিদূনের আমলে প্রাদেশিক শাসনকর্তাকে 'আমিল বলা হত, যার শাব্দিক অর্থ হল কর্মী বা কর্মচারী। কখনো বা ওয়ালী শব্দটি প্রয়োগ করা হত, যার অর্থ শাসনকর্তা, শাসক, গভর্ণর ইত্যাদি। পাঠকের বোধগম্যতার সুবিধার্থে 'আমিল বা ওয়ালী-এর প্রতিশব্দ হিসেবে আমরা 'গভর্ণর' শব্দটি ব্যবহার করেছি।

অবশ্য অপসারণের কোন কারণ জানা যায় না। খালিদ ইবনুল 'আসের কীর্তি বা অবদান সম্পর্কেও বিশেষ কিছু জানা যায় না। সীমান্তবর্তী বিভিন্ন প্রদেশের গভর্ণরগণ রাজ্যবিজয়ের মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্রের সম্প্রসারণে কৃতিত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন। কিন্তু মাক্কা, ইসলামী রাষ্ট্রের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত হওয়ায় এর গভর্ণরের রাজ্যবিজয়ের সুযোগ ছিল না। চরিতকারগণ রাজ্যবিজয়ের বিষয়ে সবিশেষ গুরুত্ব দিতেন। অন্যান্য কীর্তির বিষয়ে তাঁরা খুব একটা সচেতন ছিলেন না। সম্ভবত এ কারণেই মাক্কার গভর্ণর খালিদ ইবনুল আসের কৃতিত্ব সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না।

খালিদকে অপসারণের পর 'আলী ইবনু রাবী'আহ ইবনি আবদিল 'উয্যাকে মাক্কার গভর্ণর পদে নিয়োগ করা হয়। তবে তাঁর দায়িত্বপালনও দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। এরপর আরো কয়েকজন গভর্ণর নিয়োগের তথ্য পাওয়া যায় যাদের কার্যকাল নির্ণয় করা খুবই কঠিন। 'উসমান (রা.)-এর শাহাদাতের সময় 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর আল-হাদরামী মাক্কার গভর্ণর ছিলেন। তৃতীয় খালীফার শাসনামলের শেষদিকে বিভিন্ন প্রদেশে বিশৃঙ্খলা ও অস্থিরতা দেখা দিলেও মাক্কায় এর কোন প্রভাব পড়েনি। প্রাচীন এই জনপদে শান্তি-শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা বজায় ছিল।[৯]

দুই. আল-মাদীনাতুল মুনাওয়ারাঃ

মাদীনাতুল মুনাওয়ারা ছিল খিলাফাতের রাজধানী। খালীফার বাসভবন ও খিলাফাতের সদর দপ্তর ছিল এই শহরে। নানা দেশের প্রতিনিধিরা খালীফার সাথে সাক্ষাতের জন্য এই শহরেই গমনাগমন করতেন। শীর্ষস্থানীয় সাহাবীগণ এই শহরে অবস্থান করতেন। খালীফা হিসেবে 'উসমান (রা.) সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধান করতেন; এমনকি তিনি দ্রব্যমূল্য সম্পর্কেও খোঁজখবর রাখতেন।[১০] হাজ্জ পালনের জন্য মাক্কায় গমন করলে 'উসমান (রা.) বিশিষ্ট কোন সাহাবীর ওপর দায়িত্ব অর্পণ করতেন। বেশির ভাগ সময় যায়িদ ইবনু সাবিত (রা.)-এর ওপর দায়িত্ব অর্পণ করা হত।

মাদীনায় রাজস্ব অফিস (দিওয়ানুল খারাজ) ও রাষ্ট্রীয় ভাতা বিতরণের দফ্তর (দিওয়ানুল আ'তায়াত) অবস্থিত ছিল। পুরো খিলাফাতকালে এই শহর শান্ত ও স্থিতিশীল ছিল। তবে 'উসমান (রা.)-এর আমলের শেষদিকে বহিরাগত বিদ্রোহীরা শহরে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে যা শেষ পর্যন্ত খালীফাকে হত্যা করার মাধ্যমে সমাপ্ত হয়।

---

৯. আবদুল 'আজীজ আল-'উমরী, আল-বিলায়াহ 'আলাল বুলদান ফী 'আসরিল খুলাফাইর রাশিদীন, ১:১৬৬-৬৭, আস-সাল্লাবী হতে ২৪৬।

১০. তারীখুল মাদীনাহ, ৩:৯৬১-৬২।

তিন. আল-বাহরাইন ও আল-ইয়ামামাহ[১১]:

'উমার (রা.)-এর শাহাদাতের সময় বাহরাইনের গভর্ণর ছিলেন 'উসমান ইবনু আবিল 'আস আস-সাকাফী। 'উসমান (রা.)-এর খিলাফাতের প্রথম কয়েক বছরও তিনি ওই পদে বহাল ছিলেন। হিজরী সাতাশ সনে তিনি বাহরাইন হতে বিশাল এক বাহিনী নিয়ে বাসরার বাহিনীর সাথে যুক্ত হয়ে বিজয়াভিযানে অংশগ্রহণ করেন। বাসরা ও বাহরাইনের এই সংহতি পরবর্তীতে আরো বৃদ্ধি পায়, এক পর্যায়ে বাহরাইনের স্বতন্ত্র প্রদেশের মর্যাদা বিলুপ্ত করা হয় এবং এটি বাসরা প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত একটি অঞ্চলে পরিণত হয়। পরবর্তীতে বাসরার গভর্ণর 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমিরকে বাহরাইনের শাসনকর্তা নিয়োগ দিতে দেখা যায়। 'উসমান (রা.)-এর আমলে যাঁরা বাহরাইন শাসন করেছেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন মারওয়ান ইবনুল হাকাম ও 'আবদুল্লাহ ইবনু সাওয়ার আল-'আবদী। শেষোক্ত শাসক খালীফার মৃত্যুকালে বাহরাইন শাসন করছিলেন। তৃতীয় খালীফার আমলে পূর্ব-পারস্যে বিজয়াভিযান পরিচালনায় বাহরাইনের সেনাবাহিনী তাদের সেনাপতি 'উসমান ইবনু আবিল 'আসের নেতৃত্বে বিরাট ভূমিকা পালন করেছিলেন।[১২]

ইয়ামামাহ: 'উমার (রা.)-এর আমলে ইয়ামামার বড় অংশ বাহরাইনের সাথে সংযুক্ত ছিল, অপর অংশ ওমান-এর সাথে সংযুক্ত ছিল। বাহরাইনের গভর্ণর ইয়ামামায় শাসনকর্তা প্রেরণ করতেন। তবে 'উসমান (রা.)-এর আমলে ইয়ামামার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়; বিভিন্ন সূত্রের তথ্য পর্যালোচনায় মনে হয় তৃতীয় খালীফা নিজেই ইয়ামামায় শাসক নিয়োগ দিতেন।[১৩]

চার. আল-ইয়ামান ও হাদরামাউত:

'উমার (রা.)-এর শাহাদাতের সময় ইয়ামানের গভর্ণর ছিলেন ইয়া'লা ইবনু মুনইয়াহ। খালীফার নির্দেশ পেয়ে তিনি মাদীনার পথে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে তিনি তৃতীয় খালীফা 'উসমান (রা.)-এর পত্র পান, যাতে 'উমার (রা.)-এর শাহাদাত ও 'উসমান (রা.)-এর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার সংবাদ ছিল। ঐ পত্রবলেই ইয়া'লাকে সান'আ শহরের শাসক নিয়োগ করা হয়। তিনি 'উসমান (রা.)-এর শাহাদাত পর্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।[১৪] তবে ইয়ামানের আল-জুন্দ শহরের শাসক ছিলেন 'আবদুল্লাহ ইবনু রাবী'আহ।

---

১১. কুয়েত ব্যতীত অন্য উপসাগরীয় রাষ্ট্রগুলো ভৌগলিকভাবে বাহরাইনের অন্তর্গত ছিল। বর্তমান সৌদি আরবের পূর্বাংশের কিছু অংশও বাহরাইনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইয়ামামাহ ছিল নাজদের একটি অংশ।

১২. আল-বিলায়াহ 'আলাল বুলদান, ১:১৭০।

১৩. প্রাগুক্ত।

১৪. আত-তাবারী, ৪:৪৩৪।

ইয়ামানের অন্যান্য শহরেও খালীফা প্রশাসক নিয়োগ দিতেন বলে অনুমিত হয়, তবে উপর্যুক্ত দু'জন ব্যতীত অন্যদের নাম নির্ভরযোগ্য উৎসগুলোতে পাওয়া যায় না। খালীফা নির্বাচিত হওয়ার অব্যবহিত পরে 'উসমান (রা.) সকল প্রাদেশিক শাসকদের উদ্দেশ্যে যে সাধারণ ফরমান জারি করেছিলেন সেটি ছাড়া ইয়ামানের শাসকের কাছে প্রেরিত অন্য কোন পত্রের বিবরণ আমরা ইতিহাস গ্রন্থগুলোতে পাই না। তেমনিভাবে 'উসমান (রা.)-এর আমলে ইয়ামানের পরিস্থিতি সম্পর্কে খুব একটা তথ্য পাওয়া যায় না। তবে প্রাথমিক উৎসসমূহ হতে আমরা জানতে পারি যে, 'উমার (রা.)-এর আমলে বিপুল সংখ্যক ইয়ামানবাসী ইরাক ও মিসরের নববিজিত শহরগুলোতে হিজরাত করেছিলেন। হিজরাতের এই ধারা 'উসমান (রা.)-এর আমলেও অব্যাহত ছিল। এটি খুবই স্বাভাবিক যে, বিজিত শহরগুলোতে অবস্থানরত ইয়ামান বংশোদ্ভূতদের সাথে মূল ইয়ামানের অধিবাসীদের যোগাযোগ হত। ইয়ামানের একদল ইয়াহুদী 'উসমান (রা.)-এর আমলের শেষদিকে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিতে নেপথ্য ভূমিকা পালন করেছে। ঐ ষড়যন্ত্রকারী ইয়াহুদীদের মূল হোতা ছিল 'আবদুল্লাহ ইবনু সাবা। 'উসমান (রা.)-এর শাহাদাতের পর ইয়া'লা ইবনু মুনইয়াহ ও 'আবদুল্লাহ ইবনু রাবী'আহসহ ইয়ামানের কয়েকজন শাসক পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ভূমিকা পালনের জন্য নিজেদের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে হিজাযে চলে আসেন।[১৫]

পাঁচ. সিরিয়া (শাম):

খালীফা হিসেবে 'উসমান (রা.)-এর অভিষেকের সময় সিরিয়ার বড় অংশের (দামিশ্ক ও জর্দান) শাসক ছিলেন মু'আবিয়া ইবনু আবি সুফইয়ান (রা.) (সিরিয়ার কিছু অংশ তাঁর কর্তৃত্বের বাইরে ছিল)। তৃতীয় খালীফা 'উসমান (রা.)- তাঁকে স্বপদে বহাল রাখেন। কয়েক বছর যেতে না যেতেই মু'আবিয়া (রা.) সমগ্র সিরিয়ার[১৬] শাসকে পরিণত হন। বিভিন্ন রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ঘটনাবলি তাঁর এই অর্জনের পথে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে। দ্বিতীয় খালীফা 'উমার (রা.)-এর আমলে মু'আবিয়া প্রথমে শুধু দামিশ্কের শাসক ছিলেন। তাঁর ভাই ইয়াযীদ ছিলেন জর্দানের শাসক; তিনি মারা গেলে 'উমার (রা.) জর্দান অঞ্চল মু'আবিয়া (রা.)-এর অধীনে ন্যস্ত করেন। হিমস ও কিন্নাস্রিন অঞ্চলের শাসক ছিলেন 'উমাইর ইবনু সা'দ আল-আনসারী; মারাত্মক অসুস্থ ও শয্যাশায়ী

---

১৫. প্রাগুক্ত।

১৬. গভর্ণর মু'আবিয়ার অধীনস্থ সিরিয়া ও বর্তমান সিরিয়া এক নয়; বর্তমান সিরিয়া, জর্দান, লেবানন, ফিলিস্তিন ও ইসরাইল-এই পাঁচটি রাষ্ট্রের মিলিত ভূখণ্ড সেকালে সিরিয়ার অন্তর্ভুক্ত ছিল। মু'আবিয়া (রা.) ছিলেন এই বিশাল ভূখণ্ডের শাসক।

হয়ে তিনি খালীফা 'উসমান (রা.)-এর কাছে দায়িত্ব হতে অব্যাহতি চান; 'উসমান (রা.) তাঁর আবেদন মঞ্জুর করেন এবং হিমস ও কিন্নাস্‌রিন মু'আবিয়ার অধীনে ন্যস্ত করেন। 'আলকামাহ ইবনু মিহরায ছিলেন ফিলিস্তিনের শাসনকর্তা। তাঁর মৃত্যু হলে খালীফা তদস্থলে নতুন কোন শাসক নিয়োগ না দিয়ে ফিলিস্তিনও মু'আবিয়ার অধীনে ন্যস্ত করেন। এভাবে দু'বছরের মাঝে মু'আবিয়া সমগ্র সিরিয়ার (দামিশ্‌ক, হিমস, কিন্নাস্‌রিন, ফিলিস্তিন ও জর্দান) একমাত্র শাসকে পরিণত হন।[১৭] 'উসমান (রা.)-এর শাহাদাত পর্যন্ত তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তৃতীয় খালীফার আমলে তিনি ছিলেন সবচেয়ে বড় প্রদেশের সর্বাধিক প্রতাপশালী গভর্ণর।

মু'আবিয়া (রা.)-এর শাসনাধীনে সিরিয়া ছিল ঘটনাবহুল একটি প্রদেশ। এটি রোমান সাম্রাজ্যের সীমান্তবর্তী ছিল। রোমানরা অবশ্য সিরিয়ায় কোন অভিযান পরিচালনা করেনি। তবে মু'আবিয়া (রা.) রোমান অঞ্চলে অনেকগুলো অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। সিরিয়া হতেই তিনি সাইপ্রাসে অভিযান পরিচালনা করেছিলেন, যার বিবরণ বিজয়াভিযান অধ্যায়ে দেওয়া হবে।

তৃতীয় খালীফার আমলের শেষদিকে বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠলে মু'আবিয়া (রা.) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। 'উসমান (রা.) পরামর্শের জন্য যে গভর্ণরদেরকে মাদীনায় ডেকেছিলেন মু'আবিয়া (রা.) ছিলেন তাঁদের অন্যতম। গভর্ণরদের সম্মেলনে তিনি বিদ্রোহ দমনের লক্ষ্যে বাস্তবানুগ পরামর্শ দিয়েছিলেন।

ছয়. মিশর:

'উমার (রা.)-এর 'আমলে মিসরের গভর্ণর ছিলেন 'আমর ইবনুল 'আস (রা.)। 'উসমান (রা.)-ও কিছুদিন তাঁকে স্বপদে বহাল রাখেন। কোন কোন অঞ্চলে 'আবদুল্লাহ ইবনু সা'দ ইবনু আবি সারহ গভর্ণর আমরকে রাজস্ব আদায়ে সহায়তা করতেন। 'আবদুল্লাহ ছিলেন 'আমর ইবনুল 'আসের দীর্ঘ অভিযানের সাথী। 'আমর ফিলিস্তিন হতে শুরু করে মিসর পর্যন্ত যে দীর্ঘ বিজয়াভিযান পরিচালনা করেন তাতে 'আবদুল্লাহ ইবনু সা'দ ছিলেন তাঁর যোগ্য সহযোদ্ধা।[১৮] 'উমার (রা.), 'আবদুল্লাহ ইবনু সা'দকে আপার ইজিপ্টের কিছু অংশের শাসক নিযুক্ত করেছিলেন। এই ব্যবস্থা 'উসমান (রা.)-এর আমলের শুরুর দিকেও বহাল ছিলো। কিছুদিন পর মিসরের কতিপয় অধিবাসী শাসক হিসেবে 'আমরের কঠোরতার ব্যাপারে 'উসমান (রা.)-এর কাছে অনুযোগ করে; তাছাড়া

---

১৭. আত-তাবারী, ৪: ২৮৯; ইবনুল আসীর, ২:৪০৪।
১৮. আয-যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১:৩৩।

'আমর (রা.)-এর আমলে রাজস্ব আয়ে ঘাটতি দেখা দেয়। তাই 'উসমান (রা.) গভর্ণর আমরের কর্তৃত্ব খর্ব করে তাকে শুধু সালাতে ইমামতির দায়িত্ব দেন এবং 'আবদুল্লাহ ইবনু সা'দকে প্রতিরক্ষা ও রাজস্ব বিভাগের প্রধান হিসেবে নিয়োগ দেন। শীঘ্রই এই নিয়োগের সুফল পাওয়া যায়; 'আবদুল্লাহ ইবনু সা'দ দায়িত্ব গ্রহণের পর মিসরের রাজস্ব আয় বেড়ে যায়। তবে কিছুদিনের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গিগত কারণে 'আমর ও 'আবদুল্লাহ্‌র মাঝে মনোমালিন্য হয়। তখন আমর ইবনুল 'আস (রা.) মাদীনায় এসে খালীফাকে বিষয়টি অবহিত করেন এবং 'আবদুল্লাহ ইবনু সা'দকে অপসারণের অনুরোধ করেন। 'উসমান (রা.) এই বলে 'আমর (রা.)-এর অনুরোধ উপেক্ষা করেন যে, 'আবদুল্লাহ ইবনু সা'দকে পূর্ববর্তী খালীফা 'উমার (রা.) নিয়োগ দিয়েছিলেন। তাছাড়া এমন কোন নৈতিক পদস্খলনের ঘটনা ঘটেনি যে, তাকে অপসারণ করতে হবে। 'আমর আবারো অনুরোধ করলেন, খালীফাও যথারীতি প্রত্যাখ্যান করলেন। 'আমর তাঁর দাবিতে অটল, খালীফাও তাঁর সিদ্ধান্তে অটল। শেষ পর্যন্ত 'উসমান (রা.) মনে করলেন 'আমরকে সরিয়ে 'আবদুল্লাহ ইবনু সা'দকে মিসরের গভর্ণর পদে নিয়োগ করাই যথার্থ। কার্যত তিনি তাই করলেন; মিসরের গভর্ণর পদে পদচ্যুত 'আমর ইবনুল 'আসের স্থলাভিষিক্ত হলেন 'আবদুল্লাহ ইবনু সা'দ ইবনু আবি সারহ্‌।

ইতোমধ্যে মিসরে বিরাট দুর্যোগ সৃষ্টি হয়ে গেল; রোমানরা আলেকজান্দ্রিয়া দখল করে ব্যাপকহারে মুসলিম নিধন করেছে। রোমানদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য 'আমর ইবনুল 'আসের চেয়ে অভিজ্ঞ ও দক্ষ কেউ ছিল না। তাই খালীফা 'আমরকে পুনরায় মিসরে প্রেরণ করলেন, তবে এবার গভর্ণর হিসেবে নয়, বরং সেনাপতি হিসেবে। ব্যক্তিগত প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তির চিন্তা ঝেড়ে ফেলে ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানা সুরক্ষিত করার স্বার্থে 'আমর এই গুরুদায়িত্ব পালন করলেন এবং রোমান বাহিনীকে পরাজিত করে আলেকজান্দ্রিয়া পুনর্দখল করলেন। এই বিষয়ে রাজ্যবিজয় অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

যুদ্ধশেষে 'উসমান (রা.) মিসরে কর্তৃত্ব ব্যবস্থা চালু করতে মনস্থির করেন। তিনি 'আমর ইবনুল 'আসকে সেনাপতি ও 'আবদুল্লাহ ইবনু সা'দকে রাজস্ব বিভাগের প্রধান হিসেবে নিযুক্ত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু 'আমর আংশিক কর্তৃত্ব গ্রহণে রাজি হননি; ফলে 'আবদুল্লাহ ইবনু সা'দ মিসরের পূর্ণ গভর্ণর হিসেবে বহাল থাকেন (২৭ হিজরী)।[১৯]

তৃতীয় খালীফার শাসনকালের শুরুর দিকে মিসর শান্ত প্রদেশই ছিল। পরবর্তীতে

---

১৯. আত-তাবারী, ৪:২৫৩, ২৫৬, আয-যাহাবী, ৩:১০৬; ইবনুল আসীর, ২:৩৮৩; ইবনু কাসীর, ৭:১৫১, ১৭০; আল-বালাযুরী, ২১২, ২২৩।

ফিতনাবাজদের হোতা 'আবদুল্লাহ ইবনু সাবা মিসর হতে কিছু সমর্থক যোগাড় করতে সক্ষম হয়। মিসরীয় বিদ্রোহীরাও 'উসমান (রা.) হত্যায় সরাসরি জড়িত ছিল।

সাত. বাসরা:

দ্বিতীয় খালীফা 'উমার (রা.)-এর আমলেই বাসরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শহরে পরিণত হয়। আরবের বিভিন্ন প্রান্ত হতে অনেক গোত্রের লোক বাসরায় হিজরাত করে। বাসরায় ছিল বিশাল সেনাবাহিনী, যার সদস্যরা ইসলামী রাষ্ট্রের প্রাচ্যমুখী সম্প্রসারণের অভিযানগুলোতে অংশগ্রহণ করতেন। বিভিন্ন বিজয়াভিযানে ধৃত বিপুল সংখ্যক বন্দীর আবাসস্থলও ছিল বাসরা। ফলে সত্যিকার অর্থে বাসরা একটি বহুজাতিক আন্তর্জাতিক নগরীতে পরিণত হয়েছিল।

এই ধরনের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশে গভর্ণর নিয়োগের ক্ষেত্রে খুবই সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। 'উমার (রা.) এই বিষয়টি উপলব্ধি করে আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা.)-কে বাসরার গভর্ণর নিয়োগ করেছিলেন, এবং পরবর্তী খালীফাকে তিনি ওয়াসীয়াত করেছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পর বাসরার গভর্ণরকে যেন কমপক্ষে চার বছর স্বপদে বহাল রাখা হয়।[২০]

গভর্ণর হিসেবে আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা.) বিশেষ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। 'উমার (রা.)-এর আমলে তিনি খিলাফাতের প্রাচ্যমুখী সম্প্রসারণে বিপুল অবদান রাখেন। তিনি পারস্যের বিভিন্ন অঞ্চল জয় করেন এবং বিজিত অঞ্চলে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেন। বাসরার অবকাঠামোগত উন্নয়নেও আবূ মূসার অবদান রয়েছে। নগরবাসীর সুপেয় পানির প্রয়োজন মেটাতে তিনি নালা কেটে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করেন। তবে এই কাজ সম্পন্ন হওয়ার আগেই তিনি অপসারিত হন। 'উসমান (রা.)-এর অধীনে ছয় বছর কাজ করার পর তাঁকে অপসারণ করা হয়। হিজরী ঊনত্রিশ সনে বাসরার গভর্ণরের পদ হতে আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা.)-কে প্রত্যাহার করে তদস্থলে 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমির ইবনি কুরাইযকে নিয়োগ করা হয়।[২১]

আবূ মূসা আল-আশ'আরীর অপসারণের কারণ সম্পর্কে যা জানা যায় তা হল: হিজরী ছাব্বিশ সনে আবূ মূসা (রা.) আশ'আরী (রা.) ঈদাজ ও কুর্দ এলাকার বিদ্রোহ দমনের জন্য সেনাবাহিনী প্রস্তুত করেন এবং পদব্রজে জিহাদ করার ব্যাপারে সৈনিকদেরকে উদ্বুদ্ধ করেন। বাহনবিহীন একদল সৈনিক তাঁর বক্তব্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে পদব্রজে রওয়ানা হওয়ার জন্য প্রস্তুত হল। আরেকদল সিদ্ধান্ত নিল যে তারা গভর্ণরের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করবে; নিজের বক্তব্যের আলোকে তিনি যদি পদব্রজে রওয়ানা করেন তবে

---

২০. আয-যাহাবী, সিয়ার.., ২:৩৯১।
২১. আত-তাবারী, ৪:২৬৪।

তারা তাঁর অনুগামী হবে, অন্যথায় নয়। দেখা গেল গভর্ণর আবূ মূসা (রা.) তাঁর রসদপত্র ৪০টি গাধার পিঠে চড়িয়ে রওয়ানা করছেন। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী বক্র মানসিকতার লোকগুলো গভর্ণরের পথরোধ করে তাঁর কাছ থেকে বাহন দাবি করতে থাকে। তিনি কোনমতে ওদেরকে সন্তুষ্ট করে জিহাদে রওয়ানা হলেন। ওদিকে গায়লান ইবনু খারাশাহ আদ-দাব্বি এর নেতৃত্বে একদল বাসরাবাসী খালীফার কাছে গিয়ে আবূ মূসার অপসারণ দাবি করল। বস্তুত আবূ মূসা আশ'আরী (রা.)-এর কথা ও কাজে অমিল ছিল না। বাহন না থাকার অজুহাতে কেউ যেন জিহাদ-বিমুখ না হয় সেজন্য তিনি পদব্রজে জিহাদের মর্যাদা সম্পর্কে বক্তব্য রেখেছিলেন। তার অর্থ এটা নয় যে, বাহনে চড়ে জিহাদে অংশগ্রহণ করা যাবে না। কিন্তু বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীরা তাঁর বক্তব্যের অপব্যাখ্যা করে খালীফার কাছে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করল। জনগণের অপছন্দের শাসককে 'উসমান (রা.) বহাল রাখতে চাইলেন না। তিনি জানতে চান তাদের কোন পছন্দ আছে কিনা। তারা বলে, আবূ মূসার পরিবর্তে যে কাউকে তারা মেনে নিতে রাজি; তবে একজন কুরাইশী হলে ভালো হয়। তখন 'উসমান (রা.) বাসরার গভর্ণর হিসেবে 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমির ইবনু কুরাইযকে নিয়োগ প্রদান করেন।[২২] অপসারণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে কতিপয় ঐতিহাসিক আবূ মূসা (রা.)এর ব্যাপারে কুৎসা রটনা করতে সচেষ্ট হয়েছেন। কিন্তু নিরপেক্ষ পর্যালোচনায় দেখা যায়, আবূ মূসা (রা.) অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে খালীফার সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছিলেন। নতুন গভর্ণরের নিযুক্তির সংবাদ পেয়ে তিনি মিম্বারে আরোহণ করে বাসরাবাসীর উদ্দেশ্যে নিম্নরূপ ভাষণ দিলেন:

> قد جاءكم غلام كريم العمات والخالات والجدات في قريش يفيض عليكم المال فيضا
>
> কুরাইশ বংশীয় সম্ভ্রান্ত এক তরুণ শাসক তোমাদের কাছে এসেছেন যিনি তোমাদেরকে দানে ভরিয়ে দেবেন।[২৩]

বাসরায় উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে 'উসমান (রা.)-এর সিদ্ধান্ত অত্যন্ত কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছিল। তিনি আবূ মূসা (রা.)-কে বিব্রতকর পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার করেছেন। পাশাপাশি গভর্ণর হিসেবে বাসরাবাসীকে উপহার দিয়েছেন ২৫ বছরের এক টগবগে যুবক। ঐ সময় বাসরা এমন সংকটময় পরিস্থিতির মুখে পতিত হয়েছিল যে খালীফাকে প্রশাসনিক সংস্কার ও পুনর্গঠনের কিছু উদ্যোগ নিতে হয়েছিল। বাহরাইন ও উমানে 'উসমান ইবনু আবিল 'আসের নেতৃত্বাধীনে যে সেনাবাহিনী ছিল তাও 'আবদুল্লাহ

---

২২. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমির ইবনু কুরাইয ছিলেন 'উসমান (রা.)-এর মামাতো ভাই। মাত্র ২৫ বছর বয়সে তিনি গভর্ণর নিযুক্ত হন। [আত-তাবারী, ৪:২৬৪-২৬৬; ইবনুল আসীর, ২:৩৯১; আয-যাহাবী, ৩:১০৯; ইবনু কাসীর, ৭:১৫৪।]

২৩. আত-তাবারী, ৪:২৬৬।

ইবনু 'আমিরের হাতে ন্যস্ত করা হয়।[২৪] ফলে চ্যালেঞ্জ মুকাবিলায় গভর্ণর আরো শক্তি অর্জন করেন।

বাহরাইন ও ওমানের সেনাবাহিনী বাসরার সেনাবাহিনীর সাথে সংযুক্ত হওয়ায় ইবনু 'আমিরের প্রভাব-প্রতিপত্তি বেড়ে যায়, যার প্রভাব দেখা যায় বিজয়াভিযানসমূহে। ইবনু 'আমিরের শাসনকালে বাসরা অন্যতম প্রধান ইসলামী শহরে পরিণত হয়। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বাসরা পানে হিজরাতের হারও বেড়ে যায়। শহরটির অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডও সম্প্রসারিত হয়।

এই সময় বাসরার গুরুত্ব অনেক বেড়ে যায়। ইসলামী রাষ্টের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশে পরিণত হয় এটি। এখান থেকে বিভিন্ন অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করা হত। ইবনু 'আমির বিভিন্ন অঞ্চলে শাসক নিয়োগ দিতেন; যেমন, ওমান, বাহরাইন, সিজিস্তান, খুরাসান ও আহওয়ায। এ সময় বাসরার রাজস্ব আয়ও ব্যাপকহারে বর্ধিত হয়। সুপেয় পানির জন্য নালা খননসহ বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজ সম্পাদিত হয় এই সময়ে। ইবনু 'আমিরের শাসনামলে বাসরার অধীনস্থ ফার্স হতে আরবী অক্ষর খোদিত মুদ্রা উৎকীর্ণ হয়।

আট. কূফা:

'উমার (রা.)-এর শাহাদাতের সময় কূফার গভর্ণর ছিলেন আল-মুগীরা ইবনু শু'বা (রা.)। কিন্তু 'উমার (রা.) তাঁর পরবর্তী খালীফাকে ওয়াসীয়াত করেছিলেন যে, কূফার গভর্ণর পদে যেন সা'দ ইবনু আবি ওয়াক্কাসকে নিয়োগ দেয়া হয়। কারণ সা'দ ছিলেন কূফার পত্তনকারী এবং অবিশ্বস্ততা বা অসদাচরণ তাঁর অপসারণের কারণ ছিল না।[২৫] 'উসমান (রা.) খালীফা হওয়ার অব্যবহিত পরেই পূর্ববতী খালীফার ওয়াসীয়াত মুতাবিক সা'দ ইবনু আবি ওয়াক্কাসকে কূফার গভর্ণর পদে নিয়োগ দিলেন। ঐ সময় আল-মুগীরা ইবনু শু'বা (রা.) মাদীনায় ছিলেন। তাঁর পরিবর্তে সা'দ (রা.) কূফায় এসে গভর্ণরের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।[২৬] তবে খালীফা কূফায় দ্বৈত শাসন প্রয়োগ করলেন। সা'দ

---

২৪. আত-তাবারী, ৪:২৬৬; ইবনুল আসীর, ২:৩৯১।

২৫. أوصى الخليفة من بعدي أن يستعمل سعد بن أبي وقاص، فإني لم أعزله عن سوء، وقد خشيت أن يلحقه من ذلك 'পরবর্তী খালীফাকে আমি ওয়াসীয়াত করছি তিনি যেন সা'দ ইবনু আবি ওয়াক্কাসকে গভর্ণর পদে নিয়োগ দেন; কারণ কোন মন্দ আচরণের কারণে আমি তাকে অপসারণ করিনি। আমার আশঙ্কা অপসারণের কারণে সে মনোকষ্ট পেয়েছে [আত-তাবারী, ৪:২৪৪; আয-যাহাবী, ৩:২৪৬]। এ প্রসঙ্গে সাহীহুল বুখারীর বর্ণনা নিম্নরূপ: فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة 'সা'দ যদি ইমারাহ (খিলাফাত) লাভ করে তো ভাল, অন্যথায়, তোমাদের যেই খালীফা হোক না কেন, সে যেন তাঁর (সা'দের) সাহায্য নেয়; কারণ আমি তাকে অক্ষমতা বা অবিশ্বস্ততার কারণে অপসারণ করিনি [সাহীহুল বুখারী, কিতাবুল মানাকিব, ২:২৬৭]।'

২৬. এই বিষয়ে পরস্পর বিপরীত আরো দু'টো বর্ণনা পাওয়া যায়; আল-ওয়াকিদী বলেন, 'উমার (রা.) গভর্ণরদের ব্যাপারে দু'টো ওয়াসীআত করেছিলেন: (১) তাঁর গভর্ণরদেরকে যেন এক বছর বহাল

(রা.)-কে সালাতে ইমামতির পাশাপাশি সেনাবাহিনীর প্রধান নিযুক্ত করলেন। আর বাইতুল মাল তথা রাজস্ব বিভাগের প্রধান হিসেবে নিয়োগ দিলেন 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রা.)-কে।[২৭] ইতোপূর্বে যেমনটি উল্লেখিত হয়েছে 'উমার (রা.)-এর আমলে সা'দ (রা.) কূফা শহরের পত্তন করেছিলেন। এই নগরের অধিবাসীদের মনোভাব, সেনাবাহিনী ও সীমান্ত পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁর চেয়ে অভিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ আর কেউ ছিল না। অতএব তাঁর নিয়োগ যথার্থই ছিল।

কূফার গভর্ণর হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে সা'দ (রা.) অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তিনি প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে– বিশেষত সীমান্ত এলাকায় প্রশাসনিক সফরে গমন করতেন। এই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে আমরা দেখতে পাই তিনি ২৫ হিজরীতে 'রায়' সীমান্ত পরিদর্শন করেন।[২৮] প্রদেশের আওতাধীন বিভিন্ন অঞ্চলে তিনি শাসক নিয়োগ করতেন, যেমনটি আমরা দেখতে পাই হামাযানের ক্ষেত্রে, তিনি সেখানে শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন।

কূফায় গভর্ণর সা'দ (রা.)-এর কার্যকাল দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। রাজস্ব প্রধান ইবনু মাস'উদ (রা.)-এর সাথে মতবিরোধের প্রেক্ষিতে মাত্র দেড় বছর পর (২৫ হিজরী) সা'দ (রা.) অপসারিত হন। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, গভর্ণর সা'দ (রা.) বাইতুল মাল হতে কিছু অর্থ কর্জ করেছিলেন। নির্ধারিত সময় পার হয়ে গেলেও তিনি ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হন; ইবনু মাস'উদ (রা.) তাঁর কাছে কৈফিয়ত তলব করেন। এই সময় দু'জনের মাঝে বচসা হয়, যা উপস্থিত জনতা প্রত্যক্ষ করে। প্রকাশ্য দিবালোকে ও জনসমক্ষে তর্কাতর্কির এই ঘটনায় গভর্ণর ও রাজস্বপ্রধান দু'জনেরই মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়। বিষয়টি খালীফার কাছে উপস্থাপিত হলে তিনি সা'দ (রা.)-কে অপসারণ করেন এবং ইবনু মাস'উদ (রা.)-কে স্বপদে বহাল রাখেন।[২৯]

রাখা হয়, (২) সা'দ (রা.)-কে যেন কূফায় পুনর্বহাল করা হয়। 'উসমান (রা.) দু'টো ওয়াসীয়াতই পালন করেছিলেন। প্রথম ওয়াসীয়াত অনুযায়ী তিনি আল-মুগীরা সহ 'উমার (রা.)-এর সকল গভর্ণরকে কমপক্ষে এক বছর স্বপদে বহাল রাখেন। দ্বিতীয় ওয়াসীআত অনুসারে সা'দ (রা.)-কে কূফার গভর্ণর পদে নিয়োগ দেন। তবে এটি করা হয়েছিল আল-মুগীরাকে এক বছর বহাল রাখার পর তথা ২৫ হিজরীর প্রারম্ভে [আত-তাবারী ৪:২৪৪]। দ্বিতীয় বর্ণনা হল এই যে, মৃত্যুর পূর্বেই 'উমার (রা.), আল-মুগীরা (রা.)-কে অপসারণ করেন এবং তদস্থলে সা'দ (রা.)-কে নিয়োগ করেন। তবে এই নির্দেশ কার্যকরের পূর্বে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। ২৩ হিজরীতে হাজ্জ শেষে সাদ (রা.), 'উমার (রা.)-এর সাথে মাদীনায় ফিরে আসেন। কূফার উদ্দেশ্যে সা'দ (রা.) রওয়ানা করার পূর্বেই 'উমার (রা.) ছুরিকাহত হন। তখন 'উমার (রা.) তাঁকে পরামর্শ পরিষদে অন্তর্ভুক্ত করেন এবং ওয়াসীয়াত করেন সা'দ (রা.) খালীফা হিসেবে নির্বাচিত না হলে তাকে যেন গভর্ণর হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। [আল-বালাযুরী, ৩২৬।]

২৭. আত-তাবারী ৪:২৪৪।

২৮. আল-বালাযুরী, ৩১৯।

২৯. আত-তাবারী, ৪:২৫১-৫২; ইবনুল আসীর ২:৩৭৮-৭৯।

বচসার ঘটনা হলেও এতে শিক্ষণীয় অনেক কিছু জানার আছে। এই ঘটনায় সা'দ (রা.)-এর সততার পরিচয় পাওয়া যায়; কূফার গভর্ণর হলেও দুর্নীতির মাধ্যমে তিনি বিত্তবৈভবের মালিক হননি। তিনি এতটাই সৎ ছিলেন যে একটি বড় প্রদেশের শাসক হওয়া সত্ত্বেও অর্থসংকটে পড়েছিলেন। অন্যদিকে ইবনু মাস'ঊদ (রা.) রাষ্ট্রীয় সম্পদ রক্ষা ও এর সর্বোচ্চ ব্যবহারে কৃতসংকল্প ছিলেন। গভর্ণর ঋণ প্রত্যর্পণে অস্বীকৃতি জানাননি। কিন্তু নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হওয়ায় ইবনু মাস'ঊদ (রা.) তাঁর কাছে কৈফিয়ত তলব করে। সা'দ (রা.)-কে অপসারণের পর আল-ওয়ালীদ ইবনু 'উকবা ইবনি আবি মু'আইতকে কূফার গভর্ণর পদে নিয়োগ দেয়া হয়। তিনি আবূ বাকর (রা.)-এর আমলে বাহিনী প্রধান হিসেবে জর্দানে অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। 'উমার (রা.) তাঁকে 'আরব আল-জাযীরা'য় সরকারী কাজে নিযুক্ত করেছিলেন।[৩০]

'উমার (রা.)-এর আমলের শেষদিকে এবং 'উসমান (রা.)-এর আমলের শুরুর দিকে আল-ওয়ালীদ কূফার সেনাবাহিনীর অন্যতম সেনাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর নেতৃত্বে বেশ কয়েকটি অভিযান সফলভাবে পরিচালিত হয়। কূফার সেনাবাহিনী, জনগণের হাল-হাকিকতসহ অন্যান্য বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল। এজন্য তাঁকে কূফার গভর্ণর পদে নিয়োগ দেওয়া হয় বলে অনুমিত হয়। তবে কতিপয় ঐতিহাসিক এ নিয়োগের প্রসঙ্গ টেনে 'উসমান (রা.)-এর অন্যায্য সমালোচনা করেছেন। তাঁরা খালীফার বিরুদ্ধে স্বজনপ্রীতির অভিযোগ এনেছেন; কারণ আল-ওয়ালীদ তাঁর বৈপিত্রেয় ভাই ছিলেন। বাস্তব অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, কূফার মত একটি বড় ও বহুজাতিক প্রদেশে 'উসমান (রা.) একজন অভিজ্ঞ ও বিশ্বস্ত শাসক নিয়োগ দিয়েছিলেন। আল-ওয়ালীদের শাসনের শুরুর দিকে ইবনু মাস'ঊদ (রা.) কূফার রাজস্ব প্রধান ছিলেন। পরবর্তীতে রাষ্ট্র পরিচালনা সংক্রান্ত কোন এক বিষয়ে উভয়ের মাঝে মতভেদ হলে 'উসমান (রা.) রাজস্ব বিভাগকে শাসন বিভাগের সাথে একীভূত করার চিন্তা করেন। কার্যত তাই করলেন; 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রা.)-কে সরিয়ে দিয়ে রাজস্ব বিভাগ আল-ওয়ালীদের হাতে ন্যস্ত করলেন।

আল-ওয়ালীদ প্রজারঞ্জক ও জনদরদী শাসক ছিলেন; তাঁর বাড়ির দ্বার সর্বদা জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকত।[৩১] জনগণ যে কোন সময় যে কোন সমস্যা সমাধানে আল-ওয়ালীদের সহযোগিতা লাভ করতেন। হঠাৎ একটি ঘটনা ঘটে গেল। কূফার একদল যুবক ইবনুল হায়সামান আল-খুযা'ঈ নামক এক ব্যক্তিকে হত্যা করল। আল-ওয়ালীদ অত্যন্ত কঠোর হস্তে প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন। তিনি হত্যাকারীদের ওপর হদ কায়েম করলেন অর্থাৎ কিসাস হিসাবে হত্যাকারীদের ওপর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর

---

৩০. আত-তাবারী, ৪:২৫২; ইবনুল আসীর ২:৩৭৯।
৩১. প্রাগুক্ত।

করলেন। এতে শাস্তিপ্রাপ্তদের অভিভাবক ও আত্মীয়স্বজন আল-ওয়ালীদের ওপর যারপরনেই ক্ষুব্ধ হল। তারা সুযোগের অপেক্ষা করতে লাগল। এক পর্যায়ে তারা আল-ওয়ালীদের বিরুদ্ধে মদ্যপানের অভিযোগ আনতে সক্ষম হল। বিষয়টি খালীফার কাছে পৌঁছলে তিনি আল-ওয়ালীদের ওপর মদ্যপানের হদ প্রয়োগ করলেন এবং তাঁকে গভর্ণরের পদ হতে অপসারণ করলেন। নতুন গভর্ণর নিয়োগ দিয়ে তিনি কূফাবাসীকে নিম্নরূপ পত্র দিলেন:

> سلام أما بعد، فإني استعملت عليكم الوليد بن عقبة حتى تولت منعته، واتقامت طريقته، وكان من صالحي أهله وأوصيته بكم ولم أوصكم به، فلما بدا لكم خيره وكف عنه شره، وغلبتكم علانيته طعنتم به في سريرته والله أعلم بكم وبه وقد بعثت عليكم سعيد بن العاص أميرا
>
> সালাম, অতঃপর, আমি তোমাদের শাসক হিসেবে আল-ওয়ালীদ ইবনু 'উকবাকে নিয়োগ করেছিলাম। সে দাপটের সাথে শাসন করছিল, তার কর্মনীতি সুদৃঢ় হয়েছিল, আর সে ছিল সৎকর্মশীল। আমি তোমাদের সাথে ভাল আচরণ করতে তাকে উপদেশ দিয়েছিলাম; কিন্তু তার ব্যাপারে তোমাদেরকে কোন উপদেশ দিইনি। যখন তার কল্যাণধারা সুস্পষ্ট হল, তোমাদের সাথে অসদাচরণ করা থেকে সে বিরত রইল আর বাহ্যিক সদাচরণ দিয়ে সে যখন তোমাদেরকে পরাভূত করল তখনই তোমরা গোপন বিষয়ে তাকে অভিযুক্ত করলে, তোমাদের অভিযোগ ও তার নির্দোষিতার বিষয়ে আল্লাহই ভাল জানেন। আমি এখন তোমাদের আমীর হিসেবে সা'ঈদ ইবনুল 'আসকে প্রেরণ করছি।[৩২]

বস্তুতঃ 'উসমান (রা.)-এর আমলে এবং পরবর্তী সময়ে কূফা একটি সমস্যাসংকুল জনপদ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল। কূফার একদল মানুষের অভ্যাসই ছিল গভর্ণরের বিরুদ্ধে অনাস্থা জ্ঞাপন করা। এই বদ চর্চার সূচনা হয় আল-ওয়ালীদের বিরুদ্ধে আনাস্থা জ্ঞাপনের মাধ্যমে। কিন্তু কূফার সিংহভাগ জনগণ দোষারোপ ও অভিযোগ উত্থাপনের এই প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত ছিলেন না। এরা জনদরদী গভর্ণর আল-ওয়ালীদের অপসারণে ক্ষুব্ধ হন। কিন্তু এরা উচ্চকণ্ঠ না হওয়ায় বিশৃঙ্খলাকারীদেরই জয় হল। 'উসমান (রা.)-এর পত্রে যেমনটি পাওয়া যায়, আল-ওয়ালীদকে প্রত্যাহার করে তিনি সা'ঈদ ইবনুল 'আসকে কূফার গভর্ণর হিসেবে নিয়োগ প্রদান করেন। এটি ছিল হিজরী ৩০ সনের

৩২. আত-তাবারী, ৪:২৭৮; ইবনুল আসীর, ২:৩৯৫।

ঘটনা। সা'ঈদ মাদীনা হতে কূফার পথে রওয়ানা করলেন। তাঁর সাথে আল-আশতার নাখা'ঈসহ অভিযোগকারী দলটি ছিল। শহরে পৌঁছে তিনি কেন্দ্রীয় মাসজিদের মিম্বারে ওঠে কূফাবাসীর উদ্দেশে ভাষণ দিলেন:

والله لقد بعثت إليكم وإني لكاره، ولكني لم أجد بدا إذ أمرت أن أأتمر، ألا أن الفتنة قد أطلعت خطمها وعينيها، والله لأضربنّ وجهها حتى أقمعها أو تعييني، وإني الرائد نفسي اليوم.

আল্লাহর কসম! আমাকে তোমাদের কাছে পাঠানো হয়েছে, অথচ আমি (এই দায়িত্ব গ্রহণে) অনিচ্ছুক ছিলাম; কিন্তু আমি আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালনের আদেশ অমান্য করতে পারিনি। সাবধান! ফিতনার শুঁড় ও চোখ গজিয়েছে; আল্লাহর শপথ! আমি তার (ফিতনার) মুখে আঘাত করে তা দমন করব কিংবা সে আমাকে অক্ষম করে দেবে। আজ আমিই আমার গাইড।[৩৩]

এই ভাষণ পাঠে প্রতীয়মান হয় নবনিযুক্ত গভর্ণর সা'ঈদ ফিতনার উৎপত্তি ও উৎস সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিলেন। তিনি ফিতনা নির্মূলে কৃতসংকল্প ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। সা'ঈদ সুচারুরূপে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড সম্পাদন করতে লাগলেন। কূফার অন্তর্গত বিভিন্ন অঞ্চলে শাসক নিয়োগ ও শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখাসহ অন্যান্য কার্যাদি তিনি সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন করছিলেন। খিলাফাতের প্রাচ্যমুখী সম্প্রসারণে তিনি বেশ কিছু সফল অভিযানও পরিচালনা করেছিলেন। ৩৩ হিজরীতে নতুন করে ফিতনার আগুন জ্বলে ওঠল। আল-আশতার নাখা'ঈ ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা নতুন করে ষড়যন্ত্র শুরু করল। এবার তার পক্ষে কিছু সাধারণ মানুষ যোগাড় করতে সক্ষম হল। কূফার শাসকদের জন্য এটি নতুন বিষয় নয়, ইতোপূর্বে সা'দ ইবনু আবি ওয়াক্কাস (রা.) ও আল-ওয়ালীদের বিরুদ্ধেও কূফাবাসী অভিযোগ করেছিল। শাসকের বিরুদ্ধে অনাস্থা জ্ঞাপন ছিল একটি উপলক্ষ মাত্র। ষড়যন্ত্রকারীদের মূল লক্ষ্য ছিল খালীফার অপসারণ, যার ভিত্তি তৈরির জন্য তারা একের পর এক অভিযোগ আনছিল। এবারেও তারা গভর্ণর সা'ঈদ ইবনুল 'আসের বিরুদ্ধে অনাস্থা পেশ করল। তাঁর পরিবর্তে আবূ মূসা আল-আশ'আরীকে নিয়োগের দাবি জানাল। আবূ মূসার সাথে তাদের বিশেষ কোন সম্পর্ক বা যোগাযোগ ছিল এমন নয়। বরং তারা চেয়েছিল খালীফা তাদের দাবি পূরণ করেন কিনা। দাবি পূরণ না করলেই তারা খালীফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করত। 'উসমান (রা.) বিষয়টি বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি চাননি তাদের কোন দাবি অপূর্ণ থাকুক। তিনি এই দাবিও মেনে নিলেন এবং সা'ঈদ

৩৩. আত-তাবারী, ৪:২৭৯।

ইবনুল 'আসকে অপসারণ করে অভিযোগকারীদের পছন্দের প্রার্থী আবূ মূসা আল-আশ'আরীকে কূফার গভর্ণর পদে নিয়োগ করলেন। তিনি লিখলেন:

> بسم الله الرحمن الرحيم: أما بعد فقد أمرت عليكم من اخترتم وأعفيتكم من سعيد، ووالله لأفرشنكم عرضي ولأبذلن لكم صبري ولأستصلحنكم بجهدي! فلا تدعوا شيئا أحببتموه، لا يعصى الله فيه إلا سألتموه، ولا شيئا كرهتموه لا يعصى الله فيه إلا استعفيتم منه، أنزل فيه عندما أحببتم، حتى لا يكون لكم عليّ حجة.

'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম: তোমাদের পছন্দনীয় ব্যক্তিকে আমি তোমাদের আমীর নিয়োগ দিয়েছি, আর সা'ঈদকে অব্যাহতি দিয়েছি। আল্লাহর কসম! তোমাদের জন্য আমি আমার সম্মান বিছিয়ে দেব, আমার ধৈর্য বিলিয়ে দেব এবং সাধ্যানুযায়ী তোমাদের কল্যাণ কামনা করব। আল্লাহর অবাধ্যতা নেই এমন পছন্দনীয় বিষয় আমার কাছে দাবি কর, আমি তোমাদের দাবি পূরণ করব। তেমনিভাবে তোমাদের অপছন্দের বিষয় আমাকে জানাও, আমি তা সরিয়ে নেব, তোমাদের পছন্দের কাছে আমি নেমে আসব, যাতে আমার বিরুদ্ধে তোমাদের কোন হুজ্জাত না থাকে।'[৩৪]

আবূ মূসা আল-আশ'আরী কূফায় পৌঁছে জনমণ্ডলীর উদ্দেশে ভাষণ দিলেন:

> أيها الناس! لا تنفروا في مثل هذا ولا تعودوا لمثله، ألزموا جماعتكم والطاعة، وإياكم والعجلة! اصبروا، فكأنكم بأمير.

'হে জনমণ্ডলী, তোমরা পুনর্বার এভাবে বের হয়ো না, অনুরূপ কাজ (আমীরের বিরুদ্ধে অনাস্থা জ্ঞাপন) পুনরায় করো না। ঐক্য ও আনুগত্য আঁকড়ে ধরো। তাড়াহুড়া করো না। তোমরা ধৈর্যধারণ করো। তোমাদের তো (পছন্দনীয়) আমীর রয়েছে।'

গভর্ণরের ভাষণের পর কূফাবাসী বলল, 'ঠিক আছে, আসুন! আপনার ইমামতিতে সালাত আদায় করি।' আবূ মূসা বললেন, 'না, আগে তোমরা 'উসমান (রা.)-এর আনুগত্যের ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দাও।' জনগণ খালীফার আনুগত্যের ব্যাপারে প্রতিশ্রুতির ঘোষণা দিলে আবূ মূসা সালাত আদায় করলেন।[৩৫]

আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা.) 'উসমানের শাহাদাত পর্যন্ত কূফার গভর্ণর

---

৩৪. প্রাগুক্ত, ৪:৩৩২।
৩৫. প্রাগুক্ত।

ছিলেন। এভাবে আমরা দেখতে পাই 'উসমান (রা.)-এর শাসনামলে কূফায় পাঁচজন গভর্ণর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন: আল-মুগীরা ইবনু শু'বা, সা'দ ইবনু আবি ওয়াক্কাস, আল-ওয়ালীদ ইবনু 'উকবা, সা'ঈদ ইবনুল 'আস ও আবূ মূসা আশ'আরী। প্রত্যেক গভর্ণর ইসলামী রাষ্ট্রের সম্প্রসারণে ভূমিকা পালন করেন। জনগণের সুযোগ-সুবিধার প্রতি তাদের দৃষ্টি ছিল। কিন্তু কারো প্রতি কূফাবাসী সন্তুষ্ট ছিলো না। তারা একের পর এক শাসক পরিবর্তনের দাবি জানাতো। কিন্তু কোন শাসক তাদের পছন্দের ছিল না। শাসক পরিবর্তন ফিতনাবাজদের মূল লক্ষ্য ছিল না। তাদের মূল টার্গেট ছিল খালীফার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করা। ওদের দুরভিসন্ধি বুঝতে পেরে 'উসমান (রা.) তাদেরকে সে সুযোগ দেননি। কিন্তু তবুও শেষ রক্ষা হয়নি; বিদ্রোহীরা শেষ পর্যন্ত 'উসমান (রা.)-কে হত্যা করে। এই হত্যাকাণ্ডে কূফার এক দল বিদ্রোহীর সক্রিয় ভূমিকা ছিল।

নয়. আর্মেনিয়া:

'উসমান (রা.)-এর আমলে নববিজিত অঞ্চলগুলোর অন্যতম হল আর্মেনিয়া। খালীফার নির্দেশে সিরিয়ার গভর্ণর মু'আবিয়া সেনাপতি হাবীব ইবনু মাসলামা আল-ফিহ্রীর নেতৃত্বে আট হাজার সৈন্যের একটি দল আর্মেনিয়ায় প্রেরণ করেন। হাবীব আর্মেনিয়ার অনেকগুলো অঞ্চল জয় করেন। তারপর রোমানদেরকে আর্মেনিয়াবাসীর সমর্থনে এগিয়ে আসতে দেখে খালীফার কাছে অতিরিক্ত ফৌজ চাইলেন। কূফা থেকে সালমান ইবনু রাবী'আহ-এর নেতৃত্বে ৬ হাজার সদস্যের একটি বাহিনী আর্মেনিয়ায় পৌছল। কূফা ও সিরিয়া ব্রিগেডের যৌথবাহিনী খাযার রাজ্যের অনেকাংশ জয় করলেন। পরবর্তীতে খাযার রাজ তিন লক্ষ সৈনিকের এক বাহিনী নিয়ে এগিয়ে এলে দশ হাজার সৈন্যের মুসলিম বাহিনী সালমান ইবনু রাবী'আহ-এর নেতৃত্বে মরণপণ লড়াইয়ে অবতীর্ণ হন। যুদ্ধে সালমান শহীদ হন এবং মুসলিম বাহিনী চরমভাবে বিপর্যস্ত হয়।

কিছুদিন পর 'উসমান (রা.), সেনাপতি হাবীবকে আবার আর্মেনিয়ায় প্রেরণ করেন; তিনি কিছু এলাকা জয় করেন এবং স্থানীয়দের সাথে অনেকগুলো চুক্তি করেন। আল-জাযীরা অঞ্চল সম্পর্কে সেনাপতি হাবীব একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তাই 'উসমান (রা.) তাঁকে জাযীরা এলাকায় বিশেষ দায়িত্বসহ প্রেরণ করেন। আজারবাইজানের শাসক ছিলেন হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান। 'উসমান (রা.) তাঁকে আর্মেনিয়ারও শাসক নিযুক্ত করেন। তিনি খাযার অঞ্চলে অভিযান চালিয়ে কিছু এলাকা জয় করেন। এক বছর পর হুযাইফাকে প্রত্যাহার করে আল-মুগীরা ইবনু শু'বাকে আর্মেনিয়া ও আজারবাইজানের গভর্ণর নিযুক্ত করা হয়। 'উসমান (রা.)-এর শাহাদাতের সময় আল-মুগীরা স্বপদে বহাল ছিলেন। আর্মেনিয়া 'উসমান (রা.)-এর আমলে বিজিত জনপদ; পূর্বে এটি ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। এই অঞ্চলে অভিযান চালাতে গিয়ে মুসলিম বাহিনীকে চরম মূল্য দিতে হয়।

এই পরিচ্ছেদের আলোচনায় দেখা যায় 'উসমান (রা.)-এর আমলে আরব উপদ্বীপের প্রদেশগুলো সম্পূর্ণ শান্ত ও স্থিতিশীল ছিল। মাক্কা, মাদীনা, বাহরাইন, 'ওমান ও ইয়ামানে অস্থিরতার কোন লক্ষণ ছিল না। বাসরাও তুলনামূলকভাবে শান্ত ছিল। অশান্তি, বিশৃঙ্খলা ও বিদ্রোহের কেন্দ্র ছিল কূফা, পরবর্তীতে যা মিসরে ছড়িয়ে পড়ে এবং 'উসমান হত্যার মত মর্মন্তুদ ও হৃদয়বিদারক ঘটনার মাধ্যমে যার সাময়িক পরিসমাপ্তি ঘটে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার আগে একটি সারণির মাধ্যমে 'উসমান (রা.)-এর প্রাদেশিক গভর্ণর ও আঞ্চলিক শাসকদের তালিকা প্রদান করা হলো:

প্রদেশ/ অঞ্চল	গভর্ণর/শাসনকর্তা ['উমার (রা.)-এর আমল]	গভর্ণর/শাসনকর্তা ['উসমান (রা.)-এর আমল]
মাক্কা	খালিদ ইবনুল 'আস	'আবদুল্লাহ আল-হাদরামী
আত-তায়িফ	সুফইয়ান ইবনু 'আবদিল্লাহ আস-সাকাফী	আল-কাসিম ইবনু রাবী'আ আস-সাকাফী
সান'আ	ইয়া'লা ইবনু মুনাব্বিহ	ইয়া'লা ইবনু মুনাব্বিহ
বাসরা	আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা.)	১. আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা.) (২৪-৩০ হিজরী) ২. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমির ইবনু কুরাইয (৩০-৩৫ হিজরী)
কূফা	আল-মুগীরা ইবনু শু'বা (রা.)	১. সা'দ ইবনু আবি ওয়াক্কাস (রা.) (২৪-২৫ হিজরী) ২. আল-ওয়ালীদ ইবনু 'উকবা (২৫-৩০ হিজরী) ৩. সা'ঈদ ইবনুল 'আস (৩০-৩৪) ৪. আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা.) (৩৪-৩৫ হিজরী)
মিসর	'আমর ইবনুল আস (রা.)	১. 'আমর ইবনুল আস (রা.) (২৪-২৭ হিজরী) ২. 'আবদুল্লাহ্ ইবনু সা'দ ইবনু আবি সারহ্ ২৭-৩৫ হিজরী)
আল-বাহরাইন	'উসমান ইবনু আবিল 'আস	'আবদুল্লাহ ইবনু কায়স আল-ফাযারী
সিরিয়া	মু'আবিয়া ইবনু আবি সুফইয়ান	মু'আবিয়া ইবনু আবি সুফইয়ান
হিমস	'উমাইর ইবনু সা'দ	'আবদুর রহমান ইবনু খালিদ ইবনিল ওয়ালীদ
জর্দান		আল-আ'ওয়ার ইবনু সুফইয়ান (মু'আবিয়ার অধীন)
ফিলিস্তিন		'আলকামাহ ইবনু হাকীম (মু'আবিয়ার অধীন)
কিন্নাস্‌রিন		হাবীব ইবনু মাসলামা (মু'আবিয়ার অধীন)
কারকীসিয়া		জারীর ইবনু আবদিল্লাহ
আজারবাইজান		আল-আশ'আস ইবনু কায়স
হালাওয়ান		'উতবা ইবনুন নাহাস
হামাযান		আন-নাসীর
ইস্পাহান		আস-সাইব ইবনুল আকরা'
মাসাবযান		হাবীশ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের ক্ষমতা, কার্যপরিধি, দায়িত্ব ও কর্তব্য

এক. গভর্ণরদের নিয়ন্ত্রণে 'উসমান (রা.)-এর নীতি:

হিজরী চব্বিশ সনের প্রারম্ভে 'উসমান (রা.) খালীফা নির্বাচিত হন। খালীফা হওয়ার পর তিনি 'উমার (রা.) কর্তৃক নিযুক্ত গভর্ণরদেরকে বরখাস্ত করেননি। বরং দ্বিতীয় খালীফার ওয়াসীয়াতের আলোকে তাঁদেরকে কমপক্ষে এক বছর স্বপদে বহাল রাখেন। তারপর পরিস্থিতির বিবেচনায় তিনি বিভিন্ন প্রদেশে নতুন গভর্ণর নিয়োগ দেন। প্রদেশের সীমানা নির্ধারণেও তিনি পরিস্থিতির দাবি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পার্শ্ববর্তী কিছু প্রদেশের সংযুক্তির ফলে তাঁর আমলে সিরিয়ার সীমানা বর্ধিত হয়। তেমনিভাবে তিনি বাহরাইনকে বাসরার সাথে সংযুক্ত করেন। এইসব সিদ্ধান্তের নেপথ্যে একমাত্র নিয়ামক ছিল শাসনকাজের সুবিধা।

প্রাদেশিক শাসনকর্তাদেরকে তিনি সীমাহীন ক্ষমতা চর্চার সুযোগ দেননি। বরং সময়ে সময়ে পত্র প্রেরণ ও ফরমান জারির মাধ্যমে তাঁদেরকে তিনি নিয়ন্ত্রণ করতেন। এক্ষেত্রে মাদীনায় অবস্থানরত সাহাবীগণের সাথে পরামর্শের ভিত্তিতে তিনি কাজ করতেন। আদল ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা এবং জনকল্যাণে কাজ করতে তিনি বারংবার তাকিদ দিতেন। এই প্রসঙ্গে গভর্ণরদের উদ্দেশে প্রেরিত তাঁর প্রথম পত্রটি উল্লেখ করা প্রয়োজন:

أما بعد فإن الله أمر الأئمة أن يكونوا رعاة، ولم يتقدم إليهم أن يكونوا جباة، وإن صدر هذه الأمة خلقوا رعاة، لم يخلقوا جباة، وليوشكن أئمتكم أن يصيروا جباة ولا يكونوا رعاة، فإذا عادوا كذلك انقطع الحياء والأمانة والوفاء. ألا وإن أعدل السيرة أن تنظروا في أمور المسلمين فيما عليهم فتعطوهم ما لهم، وتأخذوهم بما عليهم، ثم تثنّوا بالذمة، فتعطوهم الذي لهم، وتأخذوهم بالذي عليهم، ثم العدو الذي تنتابون، فاستفتحوا عليهم بالوفاء

নিশ্চয় আল্লাহ শাসকদেরকে তত্ত্বাবধায়ক হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। কর আদায়কারী বলে শাসকদেরকে আল্লাহ অগ্রাধিকার দেননি। এই উম্মাহ-এর অগ্রবর্তীদেরকে আল্লাহ দায়িত্বশীল হিসেবে সৃষ্টি করেছেন, কর আদায়কারী হিসেবে সৃষ্টি করেননি। আমার আশঙ্কা তোমাদের শাসকরা তত্ত্বাবধায়ক হওয়ার বদলে যেন কর আদায়কারী না হয়ে পড়ে। তারা যদি কর আদায়কারী হয়ে পড়ে তবে লজ্জাশীলতা, আমানতদারী ও বিশ্বস্ততার অবসান হবে।

> সাবধান! তোমরা মুসলিমদের ব্যাপারে মনোযোগী হবে, তাদেরকে তাদের প্রাপ্য প্রদান করবে এবং রাষ্ট্রের প্রাপ্য তাদের কাছ থেকে আদায় করবে। অতঃপর তোমরা জিম্মীদের ব্যাপারে মনোযোগী হবে, তাদের প্রাপ্য তাদেরকে প্রদান করবে আর রাষ্ট্রের পাওনা তাদের কাছ থেকে আদায় করবে। অতঃপর আমি শত্রুদের ব্যাপারে বলছি যাদের ওপর তোমরা আঘাত হেনে থাক, তাদের ভূমি তোমরা উন্মোচন করবে বিশ্বস্ততার সাথে।[৩৬]

'উসমান (রা.) এই পত্রে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বাতলে দিয়েছেন: মুসলিমদের প্রাপ্য প্রদান করা, রাষ্ট্রের প্রাপ্য তাদের কাছ থেকে আদায় করা, জিম্মীদের হক প্রদান করা, রাষ্ট্রের প্রাপ্য তাদের কাছ থেকে আদায় করা, সব মানুষের সাথে এমনকি শত্রুর সাথে ন্যায়নীতি ও ইনসাফের সাথে আচরণ করা। এটি ছিল সাধারণ নির্দেশনা। এছাড়া বিভিন্ন পরিস্থিতিতে নবউদ্ভূত সমস্যার সমাধানেও তিনি গভর্ণরদের নির্দেশনা দিতেন। কুরআন পাঠে বিভিন্নতা সৃষ্টি হলে তিনি একদল সাহাবীর ওপর দায়িত্ব অর্পণ করে কুরআন সংকলন করেন এবং সংকলিত কুরআনের কপি প্রদেশসমূহে প্রেরণ করেন। পাশাপাশি গভর্ণরদের এই নির্দেশ দেন তারা যেন কুরআনের অন্যান্য কপিগুলো জ্বালিয়ে দেন। কুরআনের বিশুদ্ধতা সংরক্ষণের জন্যই সাহাবায়ে কিরামের পরামর্শে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। নতুন নতুন অঞ্চলে ইসলামের দাওয়াত সম্প্রসারণ ও রাজ্য বিজয়ের জন্য 'উসমান (রা.) সেনাপতিদের মাঝে প্রতিযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি করতেন। তিনি বাসরার গভর্ণর 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমির ও কূফার গভর্ণর সা'ঈদ ইবনুল 'আসকে লিখলেন: 'তোমাদের মধ্যে যে সর্বাগ্রে খুরাসান জয় করবে সে ওই অঞ্চলের শাসক হবে।' এই প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে ইবনু 'আমির খুরাসান জয় করেন। অপরদিকে সা'ঈদ তাবারিস্তান জয় করেন।[৩৭]

'উসমান (রা.) মাঝে মাঝে গভর্ণরদের ওপর এমন শর্তারোপ করতেন যে, তা শাসিতদের জন্য কল্যাণকর বলে বিবেচিত হত। এ ব্যাপারে একটি উদাহরণ দেয়া যায়: সিরিয়ার গভর্ণর মু'আবিয়া (রা.) দ্বিতীয় খালীফা 'উমার (রা.)-এর কাছে বারংবার সমুদ্র অভিযানের অনুমতি প্রার্থনা করেন। কিন্তু ঝুঁকির কথা চিন্তা করে 'উমার (রা.) সমুদ্রাভিযানের অনুমতি দেননি। 'উসমান (রা.)-এর কাছেও মু'আবিয়া (রা.) নৌযুদ্ধের অনুমতি চান। আরবদের সমুদ্রাভিযানের কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না। ফলে নৌযুদ্ধে অংশগ্রহণে আগ্রহী যোদ্ধা পাওয়ার সম্ভাবনা কম ছিল। অপরদিকে গভর্ণর মু'আবিয়া বারংবার অনুমতি চাইছেন। 'উসমান (রা.) এমন এক ব্যবস্থা নিলেন যাতে গভর্ণরকে নৌযুদ্ধের অনুমতি দেওয়ার পাশাপাশি জনগণের উৎসাহের আয়োজনও করলেন: 'তুমি যদি সস্ত্রীক সমুদ্রারোহন কর তবে তোমাকে অনুমতি দেওয়া হবে, অন্যথায় নয়।'

---

৩৬. আত-তাবারী, ৪:২৪৪-৪৫।
৩৭. তারীখুল ইয়া'কূবী, ২:১৬৬।

মু'আবিয়া সস্ত্রীক সমুদ্রাভিযানে বের হলেন। গভর্ণরকে সপরিবারে সমুদ্রাভিযানে বের হতে দেখে সাধারণ জনগণও সোৎসাহে অভূতপূর্ব এই অভিযানে অংশগ্রহণ করল।

দুই. প্রাদেশিক শাসকদের কার্যকলাপ তদারকি:

কতিপয় প্রাচ্যবিদ 'উসমান (রা.)-কে দুর্বলচিত্তের শাসক হিসেবে চিত্রিত করতে সচেষ্ট হয়েছেন। তাঁদের মতে খালীফার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে গভর্ণরগণ নিজ নিজ প্রদেশে স্বেচ্ছাচারিতা চালাতেন। প্রাচ্যবিদদের এই অভিযোগ একেবারেই অমূলক। 'উসমান (রা.) উদারচিত্তের শাসক ছিলেন, তবে তিনি মোটেই দুর্বলচিত্ত ছিলেন না। গভর্ণরদেরকে তিনি কখনো যথেচ্ছা স্বাধীনতা দেননি। প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ ও তদারকির জন্য তিনি বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। কোন কোন ক্ষেত্রে অভিযোগ তদন্ত করে দোষী প্রমাণিত হওয়ায় কোন কোন গভর্ণরকে তিনি শাস্তি দিয়েছেন এবং দায়িত্ব থেকে অব্যহতি দিয়েছেন। প্রাদেশিক শাসকদের কার্যকলাপ তদারক করার জন্য তিনি যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন তার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হল:

ক. হাজ্জ সম্মিলন:

হাজ্জ আদায়ের পর গভর্ণরদের সাথে বৈঠকের রেওয়াজ দ্বিতীয় খালীফা 'উমার (রা.) চালু করেছিলেন। 'উসমান (রা.) এই প্রথা বহাল রেখেছিলেন। তিনি প্রাদেশিক শাসনকর্তাদেরকে ফি বছর হাজ্জ আদায়ের নির্দেশ দিয়েছিলেন। হাজ্জ সমাপনান্তে তিনি গভর্ণরদের সাথে বার্ষিক সম্মেলনে মিলিত হতেন। সর্বসাধারণের এই অনুমতি ছিল যে, তারা গভর্ণরের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকলে তা খালীফার কাছে পেশ করতে পারবে। 'উসমান (রা.) অভিযোগগুলোর তাৎক্ষণিক প্রতিকার করতেন।[৩৮]

খ. বিভিন্ন অঞ্চল হতে রাজধানীতে আগত নাগরিকের সাথে সাক্ষাৎ:

দারুল খিলাফাহ বা খিলাফাতের রাজধানী ছিল মাদীনা। এই শহরে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কবর অবস্থিত। তাছাড়া উম্মাহ্র কর্ণধার সাহাবায়ে কিরামের নিবাসও ছিল মাদীনায়। ফলে ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রান্ত হতে নাগরিকগণ যিয়ারতের উদ্দেশ্যে বা জ্ঞান চর্চার জন্য রাজধানীতে গমনাগমন করতেন। খালীফা আগত নাগরিকদের কাছ থেকে প্রদেশগুলোর হাল-হাকিকত সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতেন। তাছাড়া নাগরিকদেরও খালীফার কাছে গমনের অবাধ প্রবেশাধিকার ছিল; তারা প্রদেশের অবস্থা সম্পর্কে খালীফাকে অবহিত করতেন। কোন শাসনকর্তার ব্যাপারে অভিযোগ থাকলে তা নিঃসঙ্কোচে ব্যক্ত করতেন। অভিযোগের সত্যাসত্য যাচাই করে খালীফা পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন।

---

৩৮. আত-তাবারী, ৪:৩৯৭।

গ. নাগরিকের পত্র:

বিভিন্ন প্রদেশ হতে নাগরিকরা এককভাবে বা সমষ্টিগতভাবে খালীফার কাছে পত্র লিখতেন। 'উসমান (রা.)-এর আমলে কূফা, মিসর ও সিরিয়াবাসীর কাছ থেকে মাদীনায় পত্র প্রেরণের কথা ইতিহাসে জানা যায়। 'উসমান (রা.) পত্রগুলো গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন।

ঘ. সফর:

'উসমান (রা.) মাঝে মাঝে সরকারী সফরে বিভিন্ন প্রদেশে যেতেন এবং স্বচক্ষে জনগণের অবস্থা দেখতেন। বিশেষ করে প্রতি বছর হাজ্জের সফরে যেতেন, স্বচক্ষে মাক্কাবাসীর অবস্থা অবলোকন করতেন। এই সময় গভর্ণরদের বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হত। পাশাপাশি বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আগত হাজীগণ খালীফার সাথে সাক্ষাৎ করতেন। এঁদের কাছ থেকেও 'উসমান (রা.) প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে রিপোর্ট পেতেন।

ঙ. বিভিন্ন প্রদেশে তত্ত্বানুসন্ধান দল প্রেরণ:

'উসমান (রা.) মাঝে মাঝে নানা প্রদেশে তত্ত্বানুসন্ধান দল প্রেরণ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, তিনি 'আম্মার ইবনু ইয়াসির (রা.)-কে মিসরে, মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামা (রা.)-কে কূফায়, উসামা ইবনু যায়িদ (রা.)-কে বাসরায় এবং 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.)-কে সিরিয়ায় প্রেরণ করেছিলেন। তাছাড়া আরো অনেক দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে তিনি অন্যান্য প্রদেশে পাঠিয়েছেন। এই প্রতিনিধিরা প্রদেশগুলোর অবস্থা সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করে খালীফার কাছে প্রতিবেদন পেশ করতেন। খালীফা পরিস্থিতির আলোকে পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন।

চ. গভর্ণরদেরকে রাজধানীতে তলব:

প্রতি বছর হাজ্জ মৌসুমে খালীফার সভাপতিত্বে গভর্ণরদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হত। তাছাড়া সারা বছরই খালীফা ও গভর্ণরদের মাঝে পত্র বিনিময় হত। মাঝে মাঝে এমন পরিস্থিতি উদ্ভব হত যে খালীফা জরুরী ভিত্তিতে প্রাদেশিক শাসনকর্তাদেরকে রাজধানীতে তলব করতেন। 'উসমান (রা.) একবার বাসরা, কূফা, সিরিয়া ও মিসরের গভর্ণরদেরকে মাদীনায় ডেকেছিলেন এবং বিশিষ্ট সাহাবীগণকে সাথে নিয়ে তাদের সাথে পরামর্শ বৈঠক করেছিলেন। তখন দিকে দিকে ফিতনার আগুন উদগিরিত হচ্ছিল। গভর্ণররা সুবিবেচনাপ্রসূত পরামর্শ দিয়েছিলেন।

ছ. প্রতিনিধি প্রেরণে গভর্ণরদের নির্দেশ:

খুলাফা রাশিদূন প্রাদেশিক শাসনকর্তাদেরকে নির্দেশ দিতেন তাঁরা যেন রাজধানীতে প্রতিনিধিদল প্রেরণ করেন। এঁদের কাছ থেকে খালীফাগণ বিভিন্ন প্রদেশের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে তথ্য লাভ করতেন। 'উসমান (রা.) অনেক প্রতিনিধি দলকে

মাদীনায় স্বাগত জানিয়েছেন, তাঁদের আবেদন-অভিযোগ শুনেছেন এবং প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

উপর্যুক্ত উপায় অবলম্বনে 'উসমান (রা.) প্রাদেশিক শাসনকর্তাদেরকে তত্ত্বাবধান করতেন। যখনই কোন গভর্ণরের শৈথিল্য বা ত্রুটি তাঁর নজরে আসত তিনি কালবিলম্ব না করে তাকে সাবধান করতেন। ক্ষেত্রবিশেষে কঠোর পদক্ষেপও গ্রহণ করতেন। এক্ষেত্রে ঐ গভর্ণর সম্পর্কে তাঁর সুধারণা বা আত্মীয়তার সম্পর্ক প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াতে পারত না। উদাহরণস্বরূপ আল-ওয়ালীদ ইবনু 'উকবার কথা বলা যায়; কূফার এই শাসক 'উসমান (রা.)-এর আত্মীয় ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে সাক্ষীরা এই সাক্ষ্য দিল যে তিনি মদ পান করেছেন। তখন 'উসমান (রা.) আত্মীয়তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে আল-ওয়ালীদের ওপর মদ্যপানের হদ্ কায়েম করলেন। পরবর্তীতে তাঁকে কূফার গভর্ণরের পদ হতে অপসারণ করেন। নতুন গভর্ণর নিয়োগ দিলে তিনি প্রদেশবাসীকে পত্র দিতেন যাতে গভর্ণরকে সহযোগিতার জন্য উপদেশ থাকত। তেমনিভাবে গভর্ণরকেও উপদেশ দিতেন তিনি যেন জনকল্যাণে কাজ করেন। গভর্ণর নিয়োগ ব্যতীত অন্য সময়েও তিনি প্রদেশবাসীকে লিখতেন। একটি নমুনা উপস্থাপন করা হচ্ছে:

أما بعد: فإني آخذ العمال بموافاتي في كل موسم، وقد سلطت الأمة منذ وليت على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا يرفع عليّ شيئ، ولا على أحد من عمالي إلا أعطيته، وليس لي ولا لعيالي حق قبل الرعية إلا متروك لهم، فيا من ضرب سرا وشتم سرا... من ادعى من ذلك، فليواف الموسم فيأخذ بحقه حيث كان مني أو من عمالي... أو تصدقوا فإن الله يجزى المتصدقين.

হামদ ও সালাতের পর, প্রতি বছর মৌসুমী সাক্ষাতের সময় আমি গভর্ণরদের জিজ্ঞাসাবাদ করে থাকি; যেদিন দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছি সেদিন থেকে আমি উম্মাহকে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ হতে বারণ করেছি। আমার ও আমার গভর্ণরদের কাছে কোন দাবি উত্থাপন করা হলে তা পূরণ করা হয়েছে। প্রজাদের অধিকার আদায়ের জন্য আমার ও আমার পরিবারের অধিকার বর্জিত। মাদীনাবাসী আমার কাছে অভিযোগ পেশ করেছে যে, কিছু লোক নিন্দা করছে, আর কিছু লোক অপপ্রচার চালাচ্ছে যারা গোপনে নিন্দা করছে বা গোপনে অপপ্রচার করছে তাদেরকে বলছি, কারো কোন দাবি থাকলে সে যেন (হাজ্জ) মৌসুমে তা আমার বা আমার গভর্ণরের কাছ থেকে যথাযথভাবে আদায় করে নেয়। অবশ্য কেউ চাইলে সাদাকাহ করে দিতে পারে; আল্লাহ নিশ্চয় সাদাকাহকারীদেরকে ভালোবাসেন।

'উসমান (রা.)-এর এই চিঠি জনগণের মাঝে প্রচারিত হলে তারা কেঁদে ওঠল আর খালীফার জন্য দু'আ করল।[৩৯]

তিন. গভর্ণরদের দায়িত্ব ও কর্তব্য:

দায়িত্ব পালনের সাথে কর্তৃত্বের সম্পর্ক রয়েছে। খালীফা কর্তৃক প্রদত্ত কর্তৃত্ব বলে গভর্ণরগণ দায়িত্ব পালন করতেন। সাধারণত প্রদেশ শাসনের ক্ষেত্রে গভর্ণরদের পূর্ণ কর্তৃত্ব (الإمارة العامة) দেওয়া হত; তবে কখনো কখনো 'উসমান (রা.) আংশিক বা বিশেষ কর্তৃত্বের (الإمارة الخاصة) অধিকারী গভর্ণর নিয়োগ দিতেন। পূর্ণ কর্তৃত্বের অধিকারী গভর্ণরকে মৌলিকভাবে চারটি দায়িত্ব পালন করতে হত: ১) প্রাদেশিক রাজধানীর কেন্দ্রীয় মাসজিদে সালাতে ইমামতি; ২) প্রাদেশিক সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে সীমান্ত সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ; ৩) প্রদেশের প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা হিসেবে কোষাগারের আয়-ব্যয় তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ; ৪) কাজী বা বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন।

আংশিক কর্তৃত্বের অধিকারী (الإمارة الخاصة) গভর্ণরগণ ঠিক ততটুকু ক্ষমতাপ্রাপ্ত হতেন যতটুকু ক্ষমতাসহ তাঁদেরকে নিয়োগ দেওয়া হত। 'উমার (রা.), 'আমর ইবনুল 'আস (রা.)-কে পূর্ণ কর্তৃত্বসহ মিসরের গভর্ণর হিসেবে নিয়োগ করেছিলেন। পরবর্তীতে 'উমার (রা.) আপার ইজিপ্টের রাজস্ব প্রধান হিসেবে 'আবদুল্লাহ ইবনু সা'দ ইবনি আবি সারহকে নিয়োগ দেন। ফলে 'আমর (রা.)-এর কর্তৃত্ব সংকুচিত হয়ে পড়ে। ক'দিন পর মিসরে বিচারক নিয়োগ দেওয়া হয়। ফলে গভর্ণর আমর (রা.)-এর দায়িত্ব আরো কমে যায়। 'উসমান (রা.) সা'দ ইবনু আবি ওয়াক্কাস (রা.)-কে কূফার গভর্ণর হিসেবে নিয়োগ দেন। কিন্তু 'আবদুল্লাহ্ ইবনু মাস'উদ (রা.)-কে রাজস্ব বিভাগের প্রধান হিসেবে নিয়োগ দেন। ফলে প্রথম থেকেই সা'দ (রা.) আংশিক কর্তৃত্বের অধিকারী গভর্ণর হিসেবে নিযুক্ত হন। বিপরীত উদাহরণও পাওয়া যায়, অর্থাৎ আংশিক দায়িত্বপ্রাপ্ত গভর্ণরের পূর্ণ দায়িত্বপ্রাপ্তির উদাহরণও পাওয়া যায়- আল-ওয়ালীদকে আংশিক কর্তৃত্বসহ কূফার গভর্ণর করা হয়। কারণ ইবনু মাসউদ (রা.) রাজস্বপ্রধান ছিলেন। পরবর্তীতে তাঁকে রাজস্ব বিভাগ থেকে সরিয়ে আল-ওয়ালীদকে পূর্ণ কর্তৃত্ব ও দায়িত্বসহ গভর্ণর করা হয়।[৪০]

আলকুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে শাসকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিধৃত হয়েছে:

الَّذِيْنَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوْا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ
وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْأُمُوْرِ •

---

৩৯. আত-তাবারী, ৪:৩৪২।
৪০. হাসান ইবরাহীম হাসান, ৩৭২-৭৩।

> আমি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে, এবং সৎকার্যের নির্দেশ দেবে ও অসৎকার্য হতে নিষেধ করবে; আর সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহর ইখতিয়ারে। [আলকুরআন ২২:৪১]

আলকুরআনে মুসলিম শাসকদের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে নির্দেশনা সম্বলিত আরো আয়াত রয়েছে। এসব আয়াত ও আস-সুন্নাহর নির্দেশনার আলোকে গভর্ণরগণ নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করতেন।

ক. ইকামাতে দীন:

ইকামাতে দীন বা দীন প্রতিষ্ঠা ছিল মুসলিম শাসকদের সর্বপ্রধান কর্তব্য। আল্লাহ্ আ'আলা বলেন,

> شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَا وَصَّى بِهِ نُوْحًا والَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسَى وَعِيْسَى أَنْ أَقِيمُوْا الّدِيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ.

> তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন দীন যার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি নূহকে, আর যা আমি ওহী করেছি তোমাকে এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও 'ঈসাকে, এই বলে যে, তোমরা দীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং তাতে মতভেদ করো না। [আলকুরআন ৪২:১৩।]

আলকুরআনের নির্দেশানুসারে দীন কায়েম করতে গিয়ে গভর্ণরগণ নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করতেন।

১. দীনের প্রচার ও প্রসার:

দীন প্রতিষ্ঠার প্রারম্ভিক কাজ হল দীনের প্রচার ও প্রসারে দাওয়াতী কার্যক্রম জোরদার করা। এটি ছিল অন্যতম বুনিয়াদি কাজ, যা খালীফা ও তাঁর গভর্ণরগণ আঞ্জাম দিতেন। দীনী দাওয়াত সম্প্রসারণের একটি প্রভাবক উপায় ছিল রাজ্যবিজয়। কোন অঞ্চলে প্রথমেই হামলা করা হত না, বরং ওই অঞ্চলের বাসিন্দাদেরকে দীন কবুলের জন্য উদাত্ত আহবান জানানো হত। সেই আহবানে সাড়া দিলে সবার মাঝে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক সৃষ্টি হত। দীনের দাওয়াত কবুল না করলেও জিযইয়া দিতে রাজি হলে সামরিক অভিযান চালানো হত না। দীনের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করলে আল্লাহর বান্দাদেরকে মানুষের দাসত্বের নিগড় থেকে মুক্ত করার জন্য অভিযান পরিচালিত হত। বিজিত অঞ্চলে নবদীক্ষিত মুসলিমদের দীন শিক্ষা দেওয়ার জন্য মু'আল্লিম (প্রশিক্ষক) ও মুবাল্লিগ (প্রচারক) নিয়োজিত থাকতেন। এঁরা জনগণকে ইসলামের বিশুদ্ধ 'আকীদা, ইবাদাত ও মু'আমালাত পদ্ধতি শিক্ষা দিতেন।

২. সালাত কায়েম করা:

নবদীক্ষিত মুসলিমকে সর্বাগ্রে সালাত আদায় পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া হত। সালাত আদায়ের জন্য প্রতি শহরে প্রয়োজনীয় সংখ্যক মাসজিদ নির্মিত হয়েছিল। দারুল

খিলাফাহ বা রাজধানী মাদীনার মাসজিদে খালীফা নিজে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে ইমামতি করতেন। তিনি জুমু'আ ও 'ঈদের সালাতে খুতবা দিতেন ও ইমামতি করতেন। প্রাদেশিক শহরের কেন্দ্রীয় মাসজিদে গভর্ণরের ইমামতিতে সালাত আদায় করা হত। এভাবে সালাত আদায়ের মাধ্যমে একটি পবিত্র সমাজ গড়ে ওঠেছিল। সালাত ত্যাগকারীদেরকে সদুপদেশ দিয়ে সঠিক পথে আনার চেষ্টা করা হত। এই প্রক্রিয়া ব্যর্থ হলে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হত।

৩. দীনের মূলনীতি সংরক্ষণ:

যেসব মূলনীতির ওপর এই দীনের সৌধ প্রতিষ্ঠিত খুলাফা রাশিদূন ও তাঁদের গভর্ণরগণ সর্বদা সেগুলো সংরক্ষণ ও সমুন্নত রাখতে সচেষ্ট থাকতেন। সহীহ আকীদা-বিশ্বাসের প্রচার ও শির্‌ক-বিদ'আত প্রতিরোধে তাঁরা সদা তৎপর থাকতেন। দীন ও তাঁর রাসূলের মর্যাদা সংরক্ষণের ব্যাপারে তাঁরা ছিলেন নিরাপোষ। যেমনটি আমরা দেখেছি ভণ্ড নাবীদের বিরুদ্ধে আবূ বাকর (রা.) পরিচালিত অভিযানে। এই দীনের বিশুদ্ধতার মূল উৎস হল কুরআন। এই গ্রন্থ পাঠে যখন মতভেদ শুরু হল 'উসমান (রা.) এঁর বিশুদ্ধতা রক্ষার্থে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন। ফলে বিকৃতি হতে রক্ষা পেল আলকুরআন। সাবী সম্প্রদায় কিছু উদ্ভট চিন্তাধারা প্রচার করত। এদের প্রতিরোধে 'উসমান (রা.)-এর গভর্ণরগণ কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

৪. মাসজিদ নির্মাণ:

হিজরাতের পথে কুবায় পৌঁছে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইসলামের ইতিহাসের প্রথম মাসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। ইয়াসরিবে পৌঁছেও তিনি সর্বপ্রথম যে কাজ করেন তা হল মাসজিদ নির্মাণ। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অনুসরণে খালীফা ও গভর্ণরগণ অনুরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন। 'উমার (রা.)-এর আমলে ফুসতাত ও কূফা নগরী প্রতিষ্ঠিত হলে সেখানে সর্বাগ্রে মাসজিদ নির্মাণ করা হয়। বিজিত অঞ্চলে শাসকগণ মাসজিদ নির্মাণ করতেন। শহরগুলোর সকল মাসজিদ হয়ত গভর্ণর নির্মাণ করতেন না। কিন্তু প্রধান মাসজিদ গভর্ণর নির্মাণ করতেন। রাষ্ট্রীয় খরচ ব্যতীত কেবল জনগণের স্বেচ্ছাশ্রম এবং দানেও অনেক মাসজিদ নির্মিত হয়েছে।

৫. যাকাত আদায়:

যাকাত আদায় করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক ইবাদাত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাত আদায় করতেন। খুলাফা রাশিদূনের আমলেও রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাত আদায় করা হত। প্রদেশগুলোতে গভর্ণরগণ রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাত আদায়ের ব্যবস্থা করতেন এবং আলকুরআনের নির্দেশ অনুসারে তা বিলি-বণ্টন করতেন।

৬. হাজ্জ কার্যক্রম সহজীকরণ:

খুলাফা রাশিদূনের আমলে হাজ্জ যাত্রীদের সহায়তা করা রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল। গভর্ণরগণ হাজীদের চলাচলের রাস্তার নিরাপত্তা বিধান করতেন। হাজ্জযাত্রীরা দল বেঁধে মাক্কায় গমন করতেন। প্রাদেশিক শাসকগণ হাজ্জ কাফিলার আমীর নিয়োগ করতেন। হাজ্জে রওয়ানার পূর্বে গভর্ণরের অনুমতি নেওয়ার প্রথা ছিল। হাজ্জের সফর সহজ ও আরামপ্রদ করার জন্য গভর্ণররা আরো কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন। 'উসমান (রা.)-এর আমলে বাসরার গভর্ণর ছিলেন 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমির। তিনি বাসরা থেকে মাক্কা যাওয়ার পথে বিভিন্ন স্থানে হাজ্জযাত্রীদের জন্য সুপেয় পানির ব্যবস্থা করেছিলেন। ফাকীহ্গণ পরবর্তীতে মত প্রকাশ করেছেন যে, হাজ্জ ব্যবস্থাপনা সহজীকরণ শাসকদের অন্যতম দায়িত্ব।

৭. শার'ঈ হদ প্রয়োগ করা:

মানব সমাজের শান্তি, স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা বিধানের জন্য আলকুরআনে কিছু গুরুতর অপরাধের শাস্তির বিধান রয়েছে। এই শাস্তি প্রয়োগের দায়িত্ব রাষ্ট্রের। খুলাফা রাশিদূন আলকুরআনে নির্দেশিত হদ প্রযোজ্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করতেন। প্রাদেশিক গভর্ণররা নিজ নিজ প্রদেশে অনুরূপ দায়িত্ব পালন করতেন। এক্ষেত্রে শার'ঈ বিধান সমুন্নত রাখার চেতনা ব্যতীত অন্য কোন বিবেচনা প্রাধান্য পেত না। কূফার গভর্ণর আল-ওয়ালীদ, খালীফা 'উসমান (রা.)-এর বৈপিত্রেয় ভাই ছিলেন। মদ্যপানের অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়া হলে তিনি তাঁর ওপর হদ প্রয়োগ করেন।

খ. জনগণের জান-মাল ও সম্মানের নিরাপত্তা বিধান:

জনগণের জান-মাল ও ইজ্জত-আব্রুর হিফাযাত করতেন গভর্ণরগণ। এই লক্ষ্যে দ্বিমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হত: ক) আলকুরআন ও আস-সুন্নাহ'র নির্দেশনার আলোকে মানুষের অধিকার ও মর্যাদার বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা হত; এবং খ) প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হত। স্বর্ণযুগের মুসলিমগণ পারস্পরিক অধিকার সম্পর্কে এত বেশি সচেতন ছিলেন তাঁরা অপরের অধিকারে হস্তক্ষেপ করতেন না। অপর ভাইয়ের জান-মাল ও ইজ্জত-আব্রুর হিফাযাতকে নিজের দায়িত্ব মনে করতেন। মানুষের অধিকার হরণকারী বা নিরাপত্তা বিঘ্নকারী কোন অপরাধ সংঘটিত হলে দোষী ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হত, যা মানুষের জান-মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করত। দৈহিক ও আর্থিক নিরাপত্তার পাশাপাশি ইজ্জত-আব্রুর নিরাপত্তাও বিধান করা হত। পারস্পরিক সম্মানবোধ বৃদ্ধির জন্য উদ্বুদ্ধকরণের পাশাপাশি অপবাদ বা অনুরূপ মানহানিকর কার্যকলাপের জন্য শাস্তি প্রয়োগ করা হত।

ইসলামী রাষ্ট্রে নিরাপত্তার বিষয়টি ছিল ব্যাপক। শুধু মানুষের হাত থেকে

মানুষের সম্মান রক্ষা করা হত এমন নয়; বরং ক্ষতিকর জন্তু-জানোয়ার ও কীট-পতঙ্গের হাত থেকে মানুষের নিরাপত্তা বিধানের চেষ্টাও করা হত। বালাযুরী লিখেছেন, 'নাসীবীনের শাসক মু'আবিয়াকে লিখলেন, তার সাথে থাকা একদল মুসলিম বিচ্ছু দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। মু'আবিয়া তাঁকে জননিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিচ্ছু নিধনের নির্দেশ দেন।'[৪১]

গ. আল-জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহ:

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাষ্ট্র ও ধর্মের বিভাজন সে যুগে ছিল না। গভর্ণরগণ প্রদেশের প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন, পাশাপাশি তাঁরা মাসজিদে সালাতের ইমামতি করতেন। শুধু তাই নয়, প্রদেশের প্রধান সেনাপতি হিসেবেও তাঁরাই দায়িত্ব পালন করতেন। জিহাদের ময়দানে তাঁদের নেতৃত্বে সেনাবাহিনী পরিচালিত হত। বিজয়াভিযানগুলো প্রাদেশিক গভর্ণরদের নেতৃত্বে পরিচালিত হতো। পরবর্তী আলোচনায় দেখা যাবে, সিরিয়ার গভর্ণর মু'আবিয়া সস্ত্রীক সাইপ্রাস অভিযানে অংশগ্রহণ করেন; মিসরের গভর্ণর আবুদল্লাহ ইবনু সা'দ ইবনু আবি সারাহ'র প্রত্যক্ষ সেনাপতিত্বে মুসলিম বাহিনী উত্তর আফ্রিকা জয় করেন; বাসরার গভর্ণর 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমির পারস্যে বহু সেনা অভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছেন। এভাবে দেখা যায়, জিহাদের ব্যবস্থাপনাগত দায়িত্ব শুধু নয়, বরং জিহাদের ময়দানে প্রত্যক্ষ উপস্থিতির মাধ্যমে গভর্ণরগণ ইসলামের প্রচার ও ইসলামী রাষ্ট্রের সম্প্রসারণে ভূমিকা পালন করেছেন। জিহাদের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে গভর্ণরগণ নিম্নলিখিত দায়িত্বসমূহ পালন করতেন:

১. স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী প্রেরণ:

ইসলামী রাষ্ট্রের কিছু কিছু প্রদেশ অমুসলিম রাজ্যের সীমান্ত সংলগ্ন ছিল না; যেমন- মাক্কা, ইয়ামান, বাহরাইন, ওমান ইত্যাদি। এসব অঞ্চল হতে সরাসরি অভিযান পরিচালনার সুযোগ ছিল না। গভর্ণরগণ তাঁদের প্রদেশের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে সীমান্তবর্তী প্রদেশগুলোতে প্রেরণ করতেন। যাতে স্বেচ্ছাসেবকরা জিহাদে অংশগ্রহণ করতে পারে। জিহাদে অংশগ্রহনেচ্ছু মুজাহিদদের বস্তুগত সহায়তা দেওয়া হত প্রদেশের পক্ষ থেকে।

২. শত্রুদের হামলা হতে সীমান্তের সুরক্ষা:

সীমান্তবর্তী প্রদেশগুলো প্রায়শ শত্রুর আক্রমণের শিকার হত, গভর্ণরগণ সীমান্ত বর্ধিতকরণের পাশাপাশি সীমান্ত সুরক্ষার পদক্ষেপও গ্রহণ করতেন। সিরিয়ার শাসক মু'আবিয়া রোমানদের হামলা হতে সীমান্ত রক্ষার জন্য ব্যতিব্যস্ত ছিলেন। বাসরার শাসকও সীমান্ত সুরক্ষায় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।

---

৪১. আল-বালাযুরী, ১৮৩।

৩. বসতিস্থাপনের জন্য জায়গীর প্রদান:

জনশূন্য এলাকাগুলো আবাদের জন্য আগ্রহীদেরকে জায়গীর প্রদানের ব্যবস্থা করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন 'উসমান।[৪২] গভর্ণরগণ তাঁর নির্দেশে ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন।

৪. শত্রুদের খবরাখবর অনুসন্ধান:

গোয়েন্দা বিভাগ নামে স্বতন্ত্র কোন বিভাগ ছিল না সেকালে। তবে গভর্ণরের অধীনে কিছু গোয়েন্দা কাজ করতেন। এঁদের অনেকে শত্রুদের গতিবিধি ও যুদ্ধপ্রস্তুতির ওপর নজরদারি করতেন।

৫. অশ্বশালা পরিচালনা:

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়সাল্লাম)-এর সময়েই অশ্বপালন ও অশ্বারোহন চর্চার ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়। 'উমার (রা.) সকল প্রদেশে অশ্বশালা প্রতিষ্ঠা করেন। 'উসমানও পূর্ববর্তী খালীফার পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। প্রতি প্রদেশেই অশ্বশালা ছিল। এসব খামারে পালিত অশ্ব যুদ্ধের ময়দানে বিরাট ভূমিকা পালন করত।

৬. তরুণদের প্রশিক্ষণ প্রদান:

এটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পদক্ষেপ। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে যেন জিহাদের চেতনা জাগরুক থাকে সেই লক্ষ্যে তরুণদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হত। এই কর্মসূচির দু'টো অংশ ছিল: মানসিক প্রস্তুতি ও দৈহিক প্রস্তুতি। জিহাদের গুরুত্ব ও মুজাহিদের মর্যাদার বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচির মাধ্যমে তরুণদেরকে জিহাদের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত করা হত। পাশাপাশি শরীর চর্চা, ব্যায়াম, তীর চালনা প্রশিক্ষণ ইত্যাদির মাধ্যমে তাদেরকে দৈহিকভাবে জিহাদের জন্য প্রস্তুত করা হত।

৭. সেনাবাহিনীর জন্য পৃথক দফতর স্থাপন:

ইসলামের প্রাথমিক যুগে সেনাবাহিনী পরিচালনার জন্য পৃথক দফতর ছিল না। তাৎক্ষণিকভাবে আগ্রহী যোদ্ধাদের অন্তর্ভুক্ত করে সেনাবাহিনী গঠন করা হত। দ্বিতীয় খালীফা 'উমার (রা.) সর্বপ্রথম প্রতিরক্ষা বিভাগ স্থাপন করেন, কেন্দ্রে খালীফা ও প্রদেশে গভর্ণর এর তত্ত্বাবধান করতেন। 'উসমান (রা.)-এর আমলেও এই ব্যবস্থা চালু ছিল। এই দফতরের কার্যপরিধির আওতায় ছিল সৈনিক সংগ্রহ, সামরিক বাহিনীর সদস্যদের প্রশিক্ষণ ইত্যাদি।

৮. চুক্তি বাস্তবায়ন:

মুসলিম শাসকরা বিভিন্ন শাসকদের সাথে চুক্তি করতেন। শুধু তাই নয়, ইসলামী

---

৪২. আল-বিলায়াহ 'আলাল বুলদান, ২:৭৩।

বিজয়াভিযানের পদ্ধতিই ছিল এই যে, মুসলিম বাহিনী প্রথমে সামরিক অভিযান না চালিয়ে শত্রু পক্ষকে সন্ধি করার আহবান জানাতো। বিপক্ষ দল এই আহবানে সাড়া দিলে কোন অভিযান পরিচালনার প্রয়োজন হত না। খালীফার পক্ষ থেকে প্রাদেশিক গভর্ণরগণ চুক্তি স্বাক্ষর করতেন। তাঁরাই চুক্তি বাস্তবায়ন ও পালনের ব্যাপারে দায়িত্বশীল ছিলেন।

ঘ. জনগণের রুটি-রুজির বন্দোবস্ত করা:

খুলাফা রাশিদূনের আর্থিক ব্যবস্থাপনা পুঁজিবাদী বা সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না। বরং একটি সমন্বিত ও মধ্যপন্থি আর্থিক ব্যবস্থাপনা প্রচলিত ছিল সে সময়। সম্পদের ওপর ব্যক্তির মালিকানা স্বীকৃত ছিল। জনগণ নিজস্ব মালিকানায় কৃষিকাজ, শিল্পকারখানা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করতেন। তবে বাইতুল মাল হতেও বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষকে ভাতা দেওয়া হত। 'উমার (রা.)-এর আমলে এই ব্যবস্থাপনা চালু হয়। পরবর্তীতে উন্নয়ন ও সংস্কার সাধনের মাধ্যমে এটি চালু রাখা হয়। কেন্দ্রে খালীফা ও প্রদেশে গভর্ণর জনগণের মাঝে রেশন বিতরণের কার্যক্রম তদারক করতেন। গভর্ণরগণ বাজার অনুসন্ধান করতেন এবং দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি রোধে পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন। শুধু তাই নয় বিজিত অঞ্চলে বাড়িঘর বন্টনও প্রাদেশিক শাসনকর্তারা তত্ত্বাবধান করতেন।

ঙ. প্রশাসক ও কর্মচারী নিয়োগ:

'উসমান (রা.)-এর আমলে রাজ্য বিজয়ের কারণে প্রদেশগুলোর সীমানা বেড়ে গিয়েছিলো। বিশেষত মিসর, সিরিয়া ও বাসরা প্রদেশের আওতায় অনেক বিশাল এলাকা অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। প্রাদেশিক রাজধানী শহরের বাইরেও অনেক শহর ও অঞ্চল রাজ্যগুলোর অধীনে শাসিত হত। খালীফা প্রাদেশিক গভর্ণর ও গুরুত্বপূর্ণ কর্মচারী নিয়োগ দিতেন। প্রদেশের অন্তর্গত বিভিন্ন শহর ও এলাকার প্রশাসক নিয়োগ দিতেন গভর্ণরগণ। তাছাড়া ছোটখাট বিভিন্ন পদে কর্মচারী নিয়োগের দায়িত্বও ছিলো প্রাদেশিক শাসনকর্তার।

চ. জিম্মীদের হিফাযাত:

ইসলামী রাষ্ট্রের নিরাপত্তাপ্রাপ্ত জিম্মীদের জান-মাল ও ইজ্জত-আব্রুর হিফাযাত করা মুসলিম শাসকদের অন্যতম দায়িত্ব ছিল।

ছ. আহলুর রায়-এর সাথে পরামর্শ করা:

উম্মাহ-এর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শের ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ছিল রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সুন্নাহ। খুলাফা রাশিদূনও শীর্ষস্থানীয় সাহাবায়ে কিরামের পরামর্শে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। খালীফার অনুসরণে প্রাদেশিক গভর্ণরগণ স্থানীয় পর্যায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সাথে পরামর্শের ভিত্তিতে জরুরী বিষয়গুলোতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন।

জ. অবকাঠামোগত উন্নয়ন:

রাস্তাঘাট, পুল নির্মাণ ও সংস্কারসহ অবকাঠামোগত উন্নয়নে গভর্ণরগণ দৃষ্টি দিতেন। 'উসমান (রা.)-এর আমলে আমরা দেখেছি বাসরার গভর্ণর 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমির প্রাদেশিক রাজধানীর জনগণের দুর্দশা লাঘবের লক্ষ্যে সুপেয় পানি সরবরাহের জন্য নালা খনন করেছিলেন। শুধু তাই নয়, হাজ্জযাত্রীদের সুবিধার্থে তিনি বাসরা হতে মাক্কা যাওয়ার পথে বিভিন্ন মানযিলে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করেছিলেন।

ঝ. প্রদেশবাসীর সামাজিক অবস্থা বিবেচনা:

জনগণের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে গভর্ণরগণ তাঁদের সামাজিক মর্যাদার দিকটি বিবেচনা করতেন। রাষ্ট্রের সবার অধিকার সমান ছিল। তবে প্রাথমিক যুগের মুসলিম বা প্রথমেই যারা শহরটি জয় করেছেন, অনেক বেশি মর্যাদা ও সম্মান তাঁদের প্রাপ্য ছিল। 'উসমান (রা.) এদিকে খেয়াল রাখতেন এবং প্রাদেশিক গভর্ণররাও তা বাস্তবায়ন করতেন। কূফায় বিপুল সংখ্যক মাওয়ালী ও বেদুইন গোত্রের বসবাস ছিল। তাঁদের দাপটে মর্যাদাবান ও ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামী ব্যক্তিবর্গ কোণঠাসা হয়ে পড়েছিলেন। তখন গভর্ণর খালীফাকে বিষয়টি জানালে তিনি জবাবে লিখলেন:

> أما بعد، ففضِّلْ أهل السابقة والقدمة ممن فتح الله عليه تلك البلاد، وليكن من نزلها بسببهم تبعا لهم، إلا أن يكونوا تثاقلوا عن الحق وتركوا القيام به وقام به هؤلاء، واحفظ لكلٍ منزلته، واعطهم جميعا بقسطهم من الحق، فإن المعرفة بالناس بها يصاب العدل.

> সর্বাগ্রে যাঁদের হাতে শহরটি বিজিত হয়েছে তাঁদেরকে প্রাধান্য দাও। তাঁদের হাত ধরে যারা শহরে পদার্পণ করেছে তারা প্রথমোক্তদের অনুগামী হবে। মর্যাদাবানরা যদি সত্য প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালনে অক্ষম হয় এবং অনুসারীরা যদি তা করতে সক্ষম হয় তবে ভিন্ন কথা। প্রত্যেকের মান-মর্যাদা হিফাযাত করবে। সকলকে ন্যায্য অধিকার দেবে। জেনে রাখো, মানুষের সামাজিক অবস্থানের জ্ঞান ইনসাফ প্রতিষ্ঠায় সহায়ক।

ঞ. গভর্ণরের অফিস টাইম:

বর্তমান সময়ের মত কোন নির্দিষ্ট অফিস সময় ছিল না সেকালের অফিস প্রধানদের। আল-ওয়ালীদ সম্পর্কে আত-তাবারী লিখেছেন, তাঁর ঘরে কোন দোর ছিল না। তাঁর দরজা ২৪ ঘন্টা জনগণের জন্য উন্মুক্ত ছিল।' এতে বুঝা যায় জনগণ বিনা বাধায় গভর্ণরের কাছে যেতে পারতেন এবং তাঁদের অভাব-অভিযোগ পেশ করতে পারতেন।

চার. গভর্ণরদের অধিকার:

কাউকে কোন পদে বসিয়ে দিয়ে যদি দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয় এবং কোন অধিকার না দেওয়া হয় তবে তার পক্ষে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হবে না। খুলাফা রাশিদূনের আমলে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি প্রাদেশিক শাসনকর্তারা কিছু অধিকার ভোগ করতেন। এ অধিকারগুলো তাঁদেরকে দেওয়া না হলে তাঁদের পক্ষে সুচারুরূপে দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হত না। 'উসমান (রা.)-এর আমলে গভর্ণরগণ যে অধিকার ভোগ করতেন তার বিবরণ দেওয়া হল:

ক. আনুগত্য:

শাসকদের প্রথম অধিকার হল জনগণের আনুগত্য। আনুগত্যবিহীন একটি রাজ্য নৈরাজ্যে পূর্ণ। আল্লাহ তা'আলা তাই মুমিনদেরকে শাসকদের আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيْعُوْا اللهَ وَأَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ وَأُولِى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَّأَحْسَنُ تَأْوِيْلاً۔

'হে মু'মিনগণ যদি তোমরা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস কর তবে তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর, আনুগত্য কর রাসূলের এবং তাদের যারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী; কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটলে তা উপস্থাপিত কর আল্লাহ ও রাসূলের নিকট। এটিই উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর। [আলকুরআন ৪:৫৯]

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের পর শাসক বা নেতার আনুগত্য করতে হবে। তবে পার্থক্য হল এই যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য নিরঙ্কুশ, পক্ষান্তরে শাসকের আনুগত্য হল শর্তযুক্ত; আর তা হল শারী'আহ বিরোধী কোন আদেশ মেনে নেওয়া যাবে না, আনুগত্য হবে কেবল সৎকর্মে ঃ

لا طاعة في المعصية، إنما الطاعة في المعروف

'পাপাচারে কোন আনুগত্য নেই, আনুগত্য হবে কেবল ভাল কাজে।'[৪৩]

খ. শাসকের কল্যাণ কামনা করা ও সুপরামর্শ দেওয়া:

শাসকদের আরেকটি অধিকার এই যে, জনগণ তাঁদের কল্যাণ কামনা করবে এবং তাঁদেরকে সদুপদেশ দেবে। হাদীসের নির্দেশনা অনুসারে প্রত্যেক মু'মিনের কর্তব্য হল অপর ভাইয়ের জন্য কল্যাণ কামনা করা। শাসকগণ যেহেতু রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে থাকেন সেহেতু তাঁদের কল্যাণকামীর সংখ্যা বেশি হওয়া উচিত। 'উসমান (রা.) প্রায়শঃ

৪৩. সাহীহুল বুখারী, কিতাবুল আহকাম।

গভর্ণর ও জনগণের উদ্দেশ্যে প্রেরিত পত্রে উভয় পক্ষকে আহ্বান জানাতেন তারা যেন পরস্পরের কল্যাণ কামনা করে।

গ. এলাকার অবস্থা অবহিতকরণ:

প্রজাদের দায়িত্ব হল কোন বিষয়ে শাসককে অন্ধকারে না রাখা। কোন সরকারী কর্মচারীর আচরণ যদি সঙ্গত না হয় তবে শাসককে জানানো উচিত যাতে তিনি সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। তাছাড়া শত্রুর গতিবিধি বা জনগণের কোন অংশের অবাধ্যতার সংবাদ থাকলে তা কালবিলম্ব না করে শাসককে জানানো উচিত। এতে করে শাসনকর্তার পক্ষে জনকল্যাণে পদক্ষেপ গ্রহণ করা সহজ হবে।

ঘ. গভর্ণরের অবস্থান ও পদক্ষেপ সমর্থন করা:

প্রাদেশিক শাসনকর্তা জনকল্যাণে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করলে খালীফা তাকে সমর্থন করতেন। কারণ এটি ছিল তার অধিকার। তেমনিভাবে জনগণেরও দায়িত্ব হল গভর্ণরের অবস্থানকে সুসংহত করা। 'উসমান (রা.) প্রায়শঃ গভর্ণরদের পদক্ষেপ সমর্থন করতেন। তবে এর অর্থ এই নয় যে, তিনি গভর্ণরের ভালমন্দ সব কাজই সমর্থন করতেন। খালীফা নিজে মূল্যায়ন করতেন, কখনো কখনো বিশেষ কমিটি গঠন করে তাদের মাধ্যমে গভর্ণরের কর্মকাণ্ড মূল্যায়ন করতেন। প্রাদেশিক শাসকবৃন্দ সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করলে খালীফা তাদেরকে অকুণ্ঠ সমর্থন করতেন। এটি তাদের প্রাপ্যও ছিল। তবে এর অর্থ এই নয় যে তিনি কোন শাসকের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ শুনতেন না। কোন গভর্ণরের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হলে এবং এর সত্যতা পাওয়া গেলে তিনি ওই শাসকের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন।

ঙ. অপসারণের পর সম্মান করা:

রাষ্ট্র পরিচালনার অংশ হিসেবে মাঝে মাঝে গভর্ণর পরিবর্তন করার প্রয়োজন হত, কখনো কখনো অপসারণ করা হত। কিন্তু তাই বলে তার মর্যাদাহানি করা হত না। খালীফা এই দিকে বিশেষ নজর রাখতেন। অপসারিত শাসকরা যেন সসম্মানে দিনযাপন করতে পারেন সেদিকে খালীফা সুদৃষ্টি রাখতেন। আবূ মূসা আশ'আরী (রা.)-কে 'উসমান দ্বিতীয়বার গভর্ণর হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন। অন্যদিকে অপসারণের পরও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে তিনি 'আমর ইবনুল 'আসের পরামর্শ গ্রহণ করেছেন।

চ. গভর্ণরদের বেতন:

প্রাদেশিক গভর্ণরগণ রাষ্ট্রীয় কোষাগার হতে বেতন গ্রহণ করতেন। রাষ্ট্রীয় কাজে সার্বক্ষণিক ব্যস্ততার কারণে অন্য কোন উপায়ে তারা উপার্জন করতে পারতেন না। সরকারী কর্মচারীদের বেতন দেয়ার রেওয়াজ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চালু করেছিলেন। খালীফাগণও এটি চালু রাখেন। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের অধীনে কর্মরত সকল সরকারী কর্মচারীই রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে বেতন পেতেন। 'উসমান

(রা.)-এর আমলে বিভিন্ন অঞ্চলে বিজয়াভিযান সম্প্রসারিত হওয়ায় রাষ্ট্রীয় কোষাগারের আয় বৃদ্ধি পায়। ফলে তাঁর আমলে সরকারী কর্মচারীর বেতন বৃদ্ধি পেয়েছিল বলে অনুমিত হয়। নির্দিষ্ট বেতনের অতিরিক্ত হিসেবে 'উসমান (রা.) বিশেষ কাজ সম্পাদনের জন্য কোন কোন শাসনকর্তাকে বিশেষ উদ্দীপক ভাতা প্রদান করতেন। যেমন তিনি মিসরের শাসনকর্তা 'আবদুল্লাহ ইবনু সা'দ ইবনু আবি সারাহকে আফ্রিকার গানীমতের এক পঞ্চমাংশের পঞ্চমাংশ প্রদানের ঘোষণা দিয়েছিলেন:

إن فتح الله عليك غدا أفريقية فلك ما أفاء الله على المسلمين خمس الخمس من الغنيمة نفلا

> আগামীকাল আল্লাহ যদি তোমার হাতে আফ্রিকা জয়ের তাওফীক দেন তবে গানীমতের এক-পঞ্চমাংশের পঞ্চমাংশ তোমাকে (তোমার পাওনার) অতিরিক্ত হিসেবে দেওয়া হবে।[৪৪]

ইসলামের শাসনতান্ত্রিক মূলনীতির অন্যতম হল শাসকসহ সরকারের সকল কর্মচারীকে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে বেতন দেয়া যাতে তারা পরমুখাপেক্ষী না হয় এবং ব্যক্তিগত উপার্জনের ব্যস্ততায় যেন রাষ্ট্রীয় কাজ বাধাগ্রস্ত না হয়।

---

৪৪. আত-তাবারী, ৪:২৫৩।

চতুর্থ অধ্যায়

সমর ব্যবস্থাপনা ও রাজ্য বিজয়

খালীফা 'উমার (রা.)-এর মৃত্যুতে ইসলামের শত্রুরা– বিশেষত রোমান ও পারসিকরা উল্লসিত হল। তারা মনে করল 'উমার (রা.)-এর মত কঠোর শাসকের তিরোধানে তাঁদের সামনে হৃত সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারের সুযোগ এসেছে। পারস্য সম্রাট ইয়াজদগির্দ নতুন রাজধানী ফারগানায় বসে রাজ্য পুনরুদ্ধারের হিসাব কষলেন। রোমানরা আগেই সিরিয়া ছেড়ে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্ট্যান্টিনোপলে (ইস্তাম্বুল) জমা হয়। সেখানে বসে তারা হৃত সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারের কৌশল সন্ধান করতে শুরু করে। অন্যদিকে রোম সাম্রাজ্যের আফ্রিকান অংশ 'উমার (রা.)-এর আমলেই সংকুচিত হয়ে পড়েছিল। মিসরে অবস্থানরত রোমান সৈনিকরা আলেকজান্দ্রিয়ায় সমবেত হয়েছিল। এই শহরে অনেকগুলো মিনজানিক সজ্জিত দুর্গ ছিল। রোমানরা আলেকজান্দ্রিয়া হতে পাল্টা আঘাত হেনে তাদের হৃত সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারের পরিকল্পনা আঁটল। পরিকল্পনার অংশ হিসেবে তারা তিনশ' যুদ্ধজাহাজ সম্বলিত নৌবহর সংযুক্ত করে বিশাল এক যৌথ বাহিনী প্রস্তুত করল।

শত্রুদের ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে ইসলামী সাম্রাজ্যের হিফাযত ও সম্প্রসারণের জন্য 'উসমান (রা.) নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করলেন:

পারসিক ও রোমান বিদ্রোহীদের দমন ও বিজিত অঞ্চলসমূহে শান্তি-শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা,
মানবতাকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে আল্লাহ্‌র দাসত্বের আওতায় আনার জন্য জিহাদ অব্যাহত রাখা,
ইসলামী সাম্রাজ্যের সীমানা হিফাযতের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ,
নৌবাহিনী প্রতিষ্ঠা।

'উসমান (রা.)-এর আমলে সেনানিবাস ও অস্ত্রাগার ছিল বড় বড় প্রদেশের রাজধানীগুলোতে। ইরাকের সেনানিবাস ছিল কূফা ও বাসরায়। সিরিয়ার সেনানিবাস ছিল দামিশ্‌কে আর মিসরের সেনানিবাস ছিল ফুসতাতে। এই সেনানিবাসগুলো ইসলামী সাম্রাজ্যের সীমানা সংরক্ষণ, রাজ্য সম্প্রসারণ ও দীনের প্রসারে ভূমিকা পালন করত।

প্রথম পরিচ্ছেদ
সমর ব্যবস্থাপনা

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আমলে স্থায়ী (স্ট্যান্ডিং) সেনাবাহিনী ছিল না; রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে তিনি জিহাদে অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানাতেন। মুহূর্তেই স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠিত হত। প্রাথমিক যুগে ইসলামী রাষ্ট্রের আর্থিক অবস্থা এতটা নাজুক ছিল যে সৈনিকদের বাহন ও রসদ যোগানোর সামর্থও ছিল না। প্রতিরক্ষার কাজে সাহাবায়ে কিরাম জানের পাশাপাশি মালও কুরবানী করতেন; নিজেদের খরচেই তাঁরা বাহন ও অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করতেন।

প্রাথমিক যুগে সৈনিকদেরকে বেতন দেওয়া হত না। যুদ্ধে জয়ী হলে অংশগ্রহণকারী যোদ্ধারা শারী'আহ্‌র বিধান অনুযায়ী গানীমাতের অংশ লাভ করতেন। বিজয়ী হতে না পারলে তাঁরা পার্থিব কোন প্রতিদান পেতেন না। অবশ্য রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নবুওয়াতী পাঠশালায় প্রশিক্ষিত সাহাবায়ে কিরাম পার্থিব প্রাপ্তির আশায় জিহাদে অংশগ্রহণ করতেন না। আল্লাহ্‌র রাহে জানমাল কুরবানীর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনই ছিল তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য। এতে যদি কোন পার্থিব প্রাপ্তিযোগ ঘটে সেটি অতিরিক্ত পাওনা।

প্রথম খালীফা আবূ বাক্‌র (রা.)-এর আমলেও স্থায়ী সেনাবাহিনী গঠিত হয়নি। খুলাফা রাশিদুনের আমলে সেনাবাহিনীকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানের কৃতিত্ব 'উমার (রা.)-এর। তাঁর আমলে প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা 'উসমান (রা.)-এর আমলেও অব্যাহত ছিল। এই পরিচ্ছেদে 'উসমান (রা.)-এর আমলের সেনাসংগঠন ও সমর ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আলোকপাত করা হচ্ছে।

এক. সেনাবাহিনী:

সৈনিকদের তালিকা সংরক্ষণ ও তাঁদেরকে প্রদত্ত বেতনের সঠিক হিসাব রাখার জন্য 'উমার (রা.) সর্বপ্রথম 'দিওয়ানুল জুন্‌দ' বা সেনাদপ্তর প্রতিষ্ঠা করেন। দ্বিতীয় খালীফার আমলেই মিসর ও ইরাকের মত বড় বড় রাজ্য বিজিত হয়। মিসরে ফুসতাত নগরী এবং ইরাকে বাসরা ও কূফার মত বহুজাতিক শহর প্রতিষ্ঠা করা হয়। ফলে ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানা এত বেশি বিস্তৃত হয় যে, কেন্দ্র তথা মাদীনা হতে সীমান্তবর্তী এলাকায় বাহিনী প্রেরণ কঠিন হয়ে পড়ে। তাই মিসর, বাসরা, কূফা ও দামিশ্‌কসহ বড় বড় শহরে সেনাবাহিনী গঠনের পাশাপাশি সেনানিবাস স্থাপন করা হয়। 'উমার (রা.)-এর আমলের শুরুর দিকে সৈনিকদের জন্য বেতন নির্ধারিত ছিল না। সেই যুগটা ছিল প্রাচুর্যের আমদানীর যুগ। ফলে পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে অনেক সৈনিক কৃষি ও ব্যবসাসহ অন্যান্য

উপার্জনমূলক বৃত্তির প্রতি ঝুঁকে পড়েন। বিষয়টি 'উমার (রা.)-এর দৃষ্টি এড়ায়নি; তিনি মনে করলেন এভাবে চলতে থাকলে সেনাসুলভ মনোভাবের ঘাটতির পাশাপাশি সৈনিক সংকটও দেখা দেবে। তাই তিনি সৈনিকদের বেতনের ব্যবস্থা করলেন, যা তাঁরা গানীমাতের অতিরিক্ত হিসেবে পেতেন। 'উমার (রা.) প্রবর্তিত এই ব্যবস্থা 'উসমান (রা.)-এর আমলেও অব্যাহত ছিল।[১]

দুর্গ ও সেনানিবাস স্থাপনের কৃতিত্বও 'উমার (রা.)-এর; ফলে দীর্ঘ যাত্রাপথে সৈনিকদের বিশ্রামের স্থায়ী ব্যবস্থা হয়। ইতোপূর্বে তাঁরা খর্জুরপত্রে নির্মিত তাঁবুতে বিশ্রাম নিতেন। সীমান্ত সুরক্ষার জন্য দুর্গও নির্মিত হয়। 'উমার (রা.) কর্তৃক প্রবর্তিত এই ব্যবস্থাদি 'উসমান (রা.)-এর আমলে বৃদ্ধি পায়।

অস্ত্রশস্ত্রঃ সেই আমলে সেনাবাহিনীর সদস্যরা প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত ছিলঃ পদাতিক ও অশ্বারোহী বাহিনী। উল্লেখযোগ্য অস্ত্রের মধ্যে ছিল বর্ম, তরবারি, বর্শা ও তীর। জাহিলী যুগ থেকেই এই অস্ত্রশস্ত্র আরবে প্রচলিত ছিল। তীরন্দাজি ছিল এমন এক বিদ্যা যাতে আরবরা খুব দক্ষ ছিল। তাঁরা এতটা পাকা তীরন্দাজ ছিল যে হরিণের এক চোখ লক্ষ্য করে তীর ছুড়লে তা অন্য চোখে পড়ত না। মুসলিম সেনাপতিরা তীরন্দাজির প্রশিক্ষণ দিতেন; কারণ তাঁরা জানতেন এটি আরবদের শ্রেষ্ঠ অস্ত্র। শত্রুরা, বিশেষত রোমানরা এ ব্যাপারে একেবারেই অদক্ষ ছিল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলতেন, ارموا واركبوا 'তোমরা তীরন্দাজি ও অশ্বারোহনের প্রশিক্ষণ নাও।' আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ 'তোমরা তাদের মুকাবিলায় যথাসাধ্য শক্তি সঞ্চয় কর.. [আলকুরআন ৮:৬০]। মিম্বারে দাঁড়িয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলতেন, এখানে 'শক্তি'-এর অর্থ হল তীরন্দাজি।

সে যুগে উপর্যুক্ত অস্ত্রশস্ত্রের পাশাপাশি আরেকটি অস্ত্রের প্রয়োগ দেখা গেছে, এটির নাম মিনজানিক। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তায়েফ অভিযানে 'মিনজানিক' ব্যবহার করেছিলেন। এর মাধ্যমে দূর হতে দুর্গে পাথর ছোঁড়া যায়। 'দাব্বাবাহ' নামে আরেকটি অস্ত্রের প্রচলন ছিল সেকালে। ট্যাংক জাতীয় এই যানে চড়ে যোদ্ধারা শত্রুর দুর্গের কাছাকাছি পৌঁছে আক্রমণ শানাতে পারতেন। চারদিক আবৃত থাকায় শত্রুর আঘাত সরাসরি যোদ্ধাদের গায়ে লাগত না। দাব্র নামে আরেকটি সাঁজোয়া যান রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ব্যবহার করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। এটিও অনেকটা দাব্বাবাহ-এর মত।[২] 'উসমান (রা.)-এর যুগেও এই যুদ্ধাস্ত্রসমূহ (মিনজানিক, দাব্বাবাহ ও দাব্র) ব্যবহৃত হয়েছিল। বিশেষত, মধ্য এশিয়ার বিজয়াভিযানে ব্যাপকহারে মিনজানিক ব্যবহারের বর্ণনা পাওয়া গেছে।

---

১. হাসান ইব্রাহীম হাসান, ৩৮৯।
২. প্রাগুক্ত, ৩৯০।

যুদ্ধকৌশল ও মুসলিমদের বিজয়ের রহস্য: আগেই উল্লেখ করা হয়েছে সেনাবাহিনী প্রধানত দু'ভাগে বিভক্ত ছিল: অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী। পদাতিক বাহিনী পাশাপাশি সারিতে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াত, বর্শাধারীরা থাকতেন সামনে, এরা শত্রুদের অশ্বারোহী বাহিনীর আক্রমণ ঠেকিয়ে দিতেন। সাধারণত অশ্বারোহীরা পদাতিকদের দু'পাশে সারিবদ্ধভাবে অবস্থান গ্রহণ করত। অশ্বারোহীরা ইস্পাতে তৈরি ও ঈগলের পালকে সজ্জিত শিরস্ত্রাণ এবং বর্ম পরিধান করত; অন্যদিকে পদাতিক সৈনিকরা পরিধান করত আজানুলম্বিত কাবা, পায়জামা ও জুতা। মুসলিম যোদ্ধাদের প্রেরণার উৎস ছিল আলকুরআন। যুদ্ধযাত্রায় ও লড়াইয়ের ময়দানে তাঁরা এই মহাগ্রন্থের আয়াত তিলাওয়াত করতেন। কালেভদ্রে নারীরা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতেন; সংরক্ষিত তাঁবুতে অবস্থান করে তাঁরা যুদ্ধাহত সৈনিকদের শুশ্রূষা করতেন।

সেনাপতিরা সৈনিকদের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতেন। বিজিত ভূখণ্ডের জনসাধারণের সাথে দুর্ব্যবহার করা হলে বা তাদের ওপর নির্যাতন চালানো হলে তা কঠোর হস্তে দমন করা হত। মদ্যপান নিষিদ্ধ হওয়ায় বিজয়োন্মত্ত সৈনিকদের নিয়ন্ত্রণ করা অনেকটা সহজ হয়ে যায়। পরিবার-বিচ্ছিন্ন সৈনিকরা চার মাসের বেশি এক নাগাড়ে যুদ্ধে লিপ্ত থাকতেন না।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজে যুদ্ধের ময়দানে নেতৃত্ব দিতেন। খুলাফা রাশিদূনের সময় রাষ্ট্রের বিস্তৃতির কারণে দূর সীমান্তে গিয়ে সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ নেতৃত্ব প্রদান খালীফাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাঁরা প্রাদেশিক গভর্ণরদেরকে ঐ প্রদেশের বাহিনী প্রধানের দায়িত্বে নিয়োগ দিতেন। প্রাদেশিক গভর্ণর প্রায়শ বাহিনী-প্রধান হিসেবে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে নেতৃত্ব দিতেন; যেমন, 'উসমান (রা.)-এর আমলে মিসরের গভর্ণর 'আবদুল্লাহ ইবনু সা'দের প্রত্যক্ষ সেনাপতিত্বে আফ্রিকা বিজিত হয়। বাসরার গভর্ণর 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমিরের প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে খুরাসান বিজিত হয়। কখনো বা প্রাদেশিক গভর্ণরগণ কোন বীর সেনানীর নেতৃত্বে বাহিনী প্রেরণ করতেন। যেমন, বাসরার গভর্ণর 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমির, আল-আহনাফ ইবনু কায়সকে খুরাসানের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণ করেন।[৩]

জাহিলী যুগে আরব যোদ্ধারা 'আক্রমণ ও পলায়ন' কৌশল অবলম্বন করত। তারা আচানক শত্রুবাহিনীর ওপর হামলা চালাত, আবার নিজেদের কোন দুর্বলতা দেখতে পেলে পালিয়ে আসত, শক্তি অর্জন করে ফের আক্রমণ চালাত। বিশৃঙ্খল এ পদ্ধতিকে কার্ ও ফার্ (الكر والفر) পদ্ধতি বলে।

মুসলিম সেনাপতিরা উপলব্ধি করলেন সুশৃঙ্খল বাহিনীর বিরুদ্ধে এই ধরনের সনাতন ও সেকেলে পদ্ধতিতে আক্রমণ করে বিজয় অর্জন করা যাবে না। তাই তাঁরা

---

৩. প্রাগুক্ত, ৩৯০-৯১।

সারিবদ্ধভাবে সুশৃঙ্খল উপায়ে আক্রমণ শানার পদ্ধতি প্রবর্তন করলেন। এর প্রেরণা অবশ্য তাঁরা আলকুরআনেই পেয়েছিলেন:

إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ.

যারা আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করে সারিবদ্ধভাবে সুদৃঢ় প্রাচীরের মত, আল্লাহ্ তাদেরকে ভালবাসেন [আলকুরআন ৬১:৪]।

এই আয়াতের প্রেরণায় মুসলিমরা সালাতের ন্যায় সারিবদ্ধ হয়ে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হতেন, সুশৃঙ্খল সারি হতে এক কদম সামনে বা পেছনে যাওয়ার অধিকার কারো ছিল না। পরবর্তীতে পারস্যবাসী হতে মুসলিমরা আরেকটি পদ্ধতি আয়ত্ব করে। এই পদ্ধতিতে সেনাবাহিনীকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হত। প্রধান সেনাপতির নেতৃত্বে প্রধান অংশ অবস্থান নিত মধ্যভাগে, এটিকে 'কালবুল জাইশ' বলা হত; ডানদিকের অংশটিকে বলা হত 'মায়মানাহ', বামদিকের অংশকে বলা হত 'মায়সারাহ', সামনে থাকত চৌকষ অশ্বারোহীর একটি দল যাকে 'মুকাদ্দিমা' বলা হত। সেনাদলের পেছনে 'সাকাতুল জাইশ' নামে একটি দল থাকত। এই পদ্ধতি আরব বাহিনীতে চালু হওয়ার পর ধীরে ধীরে 'কাতার' পদ্ধতি পরিত্যক্ত হয়। 'উসমান (রা.)-এর আমলে অবশ্য দু'টি পদ্ধতিই প্রচলিত ছিল।

মুসলিমরা কেবল তাঁদের অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধকৌশলের জন্য জয়লাভ করত এমন নয়। কারণ তাঁদের অস্ত্র শত্রুদের চাইতে অধিক মারাত্মক ছিল না। বিশেষত, রোমান ও পারসিকরা আরো কার্যকর অস্ত্রে সজ্জিত হত। মুসলিমদের বিজয়ের মূল কারণ ছিল তাঁরা পার্থিব লাভালাভের জন্য যুদ্ধে অংশ নিতেন না; তাঁরা বরং আল্লাহ্‌র দীনকে বিজয়ী করার মাধ্যমে পরকালীন সাফল্য অর্জন ও মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করতেন। এ কারণে তাঁরা মৃত্যুকে হাতের মুঠোয় নিয়ে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হতেন। এছাড়া অন্য কোন উপায়ে প্রাথমিক যুগের মুসলিমদের জয়যাত্রার ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না।

দুই. নৌবাহিনী:

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও প্রথম দু'খালীফার আমলে ইসলামী রাষ্ট্রে কোন নৌবাহিনী ছিল না। হিজাযের আরবরা সমুদ্রারোহনে অনভ্যস্ত ছিল। তবুও 'উমার (রা.)-এর আমলে বাহরাইনের গভর্ণর আল-'আলা ইবনুল হাদরামী খালীফার অনুমতি ব্যতিরেকে বার হাজার সৈনিক নিয়ে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে পারস্যভূমিতে অভিযান পরিচালনা করেন। তিনি বিজয়ী বেশে গানীমাতসহ বাসরায় প্রত্যাবর্তন করেন। 'উমার (রা.) সমুদ্রারোহন পছন্দ করতেন না। তদুপরি বিনা অনুমতিতে অভিযান পরিচালনার কারণে তিনি ক্ষুদ্ধ হন এবং আল-'আলাকে অপসারণ করেন।[৪]

---

৪. হাসান ইবরাহীম হাসান, ৩৯৩।

সিরিয়া বিজয়ের পর মুসলিমরা রোমান নৌবহর দেখতে পেল, তারাও নৌবাহিনী গড়তে আগ্রহী হল। গভর্ণর মু'আবিয়া (রা.), খালীফা 'উমার (রা.)-এর কাছে অনুমতি চেয়ে পত্র লিখেন। 'উমার (রা.) খোঁজখবর নিয়ে সাগরের ভয়াবহতা সম্পর্কে জানতে পেরে মু'আবিয়াকে কড়া করে নিষেধ করে দিলেন এবং এ ব্যাপারে পুনরায় অনুরোধ না করার নির্দেশ দেন।

'উসমান (রা.) খালীফা হওয়ার পর মু'আবিয়া (রা.) আবারো নৌবাহিনী গঠন করার অনুমতি প্রার্থনা করেন। খালীফা তাঁকে এই শর্তে অনুমতি দিলেন যে, জনগণকে যেন ইচ্ছার বিরুদ্ধে নৌবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত না করা হয়। 'আবদুল্লাহ ইবনু কায়স আল-জাসীকে প্রধান করে মু'আবিয়া (রা.) মুসলিমদের প্রথম নৌবাহিনী গঠন করেন। হিজরী ২৭ সনে এই বাহিনী সমুদ্রপথে অভিযান চালিয়ে সাইপ্রাস বিজয় করেন। হিজরী ২৮ সনে মিসর ও সিরিয়ার যৌথ নৌবাহিনী *যাতুস সাওয়ারী* যুদ্ধে রোমানদেরকে পরাজিত করে। সিরিয় নৌবাহিনীর অধিনায়ক 'আবদুল্লাহ ইবনু কায়স আল-জাসী শাহাদাতের পূর্বে রোমান জলসীমান্তে ৫০ বার অভিযান পরিচালনা করেন। এই অভিযানগুলোতে তিনি তাঁর কোন সহযোদ্ধা হারাননি।

আলকুরআনের নির্দেশনার আলোকে স্বর্ণযুগের মুসলিমরা সাধ্যানুযায়ী প্রস্তুতি নিয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতেন। শত্রুদের সমশক্তিসম্পন্ন না হয়েও তারা বেশিরভাগ যুদ্ধে জয়লাভ করেছেন। আখিরাতের সাফল্যের লক্ষ্যে জীবনবাজি রেখে লড়াই করতেন বলে আল্লাহ্‌র সাহায্য সর্বদা তাঁদের সঙ্গী হয়েছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রাচ্যের বিজয়সমূহ

এক. কূফা ব্রিগেডের বিজয়: আজারবাইজান (২৫ হিজরী)[৫]:

ইসলামী সেনাবাহিনীর কূফা ব্রিগেডে চল্লিশ হাজার যোদ্ধা ছিল। প্রতি বছর দশ হাজার সৈনিক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করত। এভাবে প্রতি চার বছরে প্রত্যেক যোদ্ধা একবার করে যুদ্ধে অংশ নিত। 'উসমান (রা.) খালীফা হওয়ার পর আল-ওয়ালীদ ইবনু 'উকবাকে কূফার শাসনকর্তা নিয়োগ করা হলে তিনি আজারবাইজানের শাসনকর্তা 'উতবা ইবনু ফারকাদকে পদচ্যুত করেন। এই সুযোগে আজারীরা বিদ্রোহ করে এবং 'উমার (রা.)-এর আমলে তাঁরা হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা.)-এর সাথে যে সন্ধিচুক্তি[৬] করেছিল তা ভঙ্গ করে। 'উসমান (রা.) কূফার শাসনকর্তাকে বিদ্রোহ দমনের নির্দেশ দেন। আল-ওয়ালীদ সেনাপতি সালমান ইবনু রাবী'আহ আল-বাহিলীকে একদল সৈনিকসহ অগ্রবাহিনী হিসেবে প্রেরণ করেন। অব্যবহিত পরে তিনিও একটি বড় সেনাদলসহ রওয়ানা হন। মুসলিমদের যুদ্ধযাত্রা দেখে আজারবাইজানের বিদ্রোহীরা হুযাইফা'র শর্তে আনুগত্য স্বীকার করল, আল-ওয়ালীদ তাদের আনুগত্য গ্রহণ করলেন এবং চারদিকে ক্ষুদ্র বাহিনী প্রেরণ করলেন। 'আবদুল্লাহ ইবনু শুবাইল আল-আহমাসী চার হাজার সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে মুকান, বাবর ও তাইলাসান জয় করেন। তারপর সালমান আল-বাহিলী বারো হাজার সৈনিক নিয়ে আর্মেনিয়া জয় করেন। এই যুদ্ধে প্রচুর গানীমতের সম্পদ অর্জিত হয়। বিজয় শেষে আল-ওয়ালীদ কূফায় ফিরে আসেন।[৭]

পরবর্তীতে আজারীরা বার কয়েক বিদ্রোহ করে। বাধ্য হয়ে আজারবাইজানের শাসক আশ'আস ইবনু কায়স কূফার শাসক আল-ওয়ালীদকে পত্র লিখেন। আল-ওয়ালীদ একদল সৈনিক দিয়ে আশ'আস-এর শক্তি বৃদ্ধি করেন। পুনর্গঠিত বাহিনী নিয়ে আশ'আস

---

৫. আজারবাইজানের বিদ্রোহ দমন কোন সনে হয়েছিল- এ বিষয়ে পূর্বসূরি ঐতিহাসিকদের মাঝে মতভেদ আছে; আত-তাবারীর অনুসরণে অনেক ঐতিহাসিক লিখেছেন ২৪ হিজরীতে কূফার গভর্ণর আল-ওয়ালীদ ইবনু 'উকবা-এর নির্দেশে ঐ অভিযান পরিচালিত হয়েছিল [আত-তাবারী, ৪:২৪৬; ইবন কাসীর, ৭:১৫০]। তবে ঐতিহাসিক বাস্তবতার নিরিখে এটি সমর্থনযোগ্য নয়। কারণ আত-তাবারীসহ অন্যান্য ঐতিহাসিকগণ এই বিষয়ে একমত যে, ২৪ হিজরীতে কূফার গভর্ণর হিসেবে সা'দ ইবনু আবি ওয়াক্কাস নিযুক্ত ছিলেন। সেই হিসেবে ইবনুল আসীর ও আল-বালাযুরী-এর এই তথ্য অধিক সমর্থনযোগ্য যে, আজারবাইজানের বিদ্রোহ দমনে আল-ওয়ালীদের নেতৃত্বে ২৫ হিজরীতে অভিযান পরিচালিত হয়েছিল [ইবনুল আসীর, ২:৩৭৯; আল-বালাযুরী, ৩২৭]।

৬. ২২ হিজরীতে হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা.) আজারবাইজান জয় করে বার্ষিক ৮ লক্ষ দিরহাম কর আদায়ের শর্তে তাদের সাথে চুক্তি করেন [আত-তাবারী, ৪:২৪৭]।

৭. আত-তাবারী, ৪:২৪৬।

বিদ্রোহীদের পশ্চাদ্ধাবন করেন; তারা প্রথম চুক্তির শর্তে পুনরায় সন্ধির প্রস্তাব দেয়, আশ'আস তা মেনে নিলেও পুনর্বিদ্রোহের আশঙ্কায় একদল বেতনভুক আরবকে সরকারী দফতরে নিয়োগ দেন এবং তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত সম্প্রসারণের নির্দেশ দেন। সা'ঈদ ইবনুল 'আস কূফার শাসক নিযুক্ত হলে আজারীরা আবার বিদ্রোহ করে। তখন তিনি জারীর ইবনু 'আবদিল্লাহ আল-বাজালীকে প্রেরণ করেন। তিনি বিদ্রোহীদের সর্দারকে হত্যা করেন। পরবর্তীতে বিপুল সংখ্যক আজারী ইসলাম গ্রহণ করলে ওই অঞ্চলে বিদ্রোহ প্রশমিত হয়।[৮]

দুই. রোমানদের হামলা প্রতিরোধে কূফাবাসীদের অংশগ্রহণ:

আল-ওয়ালীদ ইবনু 'উকবা আজারবাইজানের অভিযান শেষ করে মূসেলে ফিরে এলে খালীফার পক্ষ থেকে প্রেরিত নিম্নোক্ত পত্র তার হস্তগত হয়:

أما بعد، فإن معاوية بن أبي سفيان كتب إليّ يخبرني أن الروم قد أجلبت على المسلمين بجموع عظيمة، وقد رأيت أن يمدهم إخوانهم من أهل الكوفة، فإذا أتاك كتابي هذا، فابعث رجلا ممن ترضى نجدته وبأسه وشجاعته وإسلامه في ثمانية آلاف أو تسعة آلاف أو عشرة آلاف إليهم من المكان الذي يأتيك فيه رسولي والسلام

অতঃপর, মু'আবিয়া ইবনু আবি সুফইয়ান আমার কাছে এই মর্মে পত্র দিয়েছে যে, রোমানরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিশাল সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করেছে; আমার মনে হয় কূফাবাসীদের উচিত সিরিয় সেনাবাহিনীকে সাহায্য করা। তোমার কাছে আমার পত্র পৌছলে তুমি এমন একজন সেনাপতি বাছাই করবে যার সাহসিকতা ও ধার্মিকতার[৯] ব্যাপারে তুমি সন্তুষ্ট এবং তাঁর সাথে আট, নয় বা দশ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী সিরিয়দের সাহায্যে প্রেরণ করবে। যেখানে আমার দূত তোমার সাথে সাক্ষাৎ করবে সেখান থেকেই তুমি সৈন্য প্রেরণ করবে। ওয়াস্‌সালাম।[১০]

এই চিঠি পেয়ে আল-ওয়ালীদ সৈন্যদের উদ্দেশে ভাষণ দিলেন। আল্লাহ্‌র হামদ ও সাঁনা করার পর তিনি বললেন:

'হে সমাবেশ! এই দিকে আল্লাহ তোমাদের পরীক্ষা নিয়েছেন আর তোমরা সেই

---

৮. আল-বালাযুরী, ৩২৭-২৮।
৯. খুলাফা রাশিদূনের আমলে শুধু সাহসিকতার জন্য সেনাপতি নিযুক্ত করা হত না; বরং নীতি-নৈতিকতা, ধর্মীয়জ্ঞান ও তাকওয়া-পরহেযগারীও সেনাপতির অপরিহার্য গুণ হিসেবে বিবেচিত হত।
১০. আত-তাবারী, ৫:২৪৭।

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছ। তিনি তোমাদের হৃত সাম্রাজ্য ফিরিয়ে দিয়েছেন[১১], নতুন নতুন অঞ্চল তোমাদের করায়ত্ত করে দিয়েছেন, তোমরা সুস্থ অবস্থায় যুদ্ধলব্ধ সম্পদ ও সাওয়াবের অধিকারী হয়ে প্রত্যাবর্তন করেছ। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য। আমার কাছে আমীরুল মু'মিনীন এই পত্র দিয়েছেন যে আমি যেন তোমাদের মধ্য থেকে বাছাই করে আট থেকে দশ হাজার সৈন্যের একটি দল গঠন করি; যাতে তোমরা তোমাদের সিরিয় ভাইদেরকে সাহায্য করতে পার। কারণ তারা রোমানদের আক্রমণের মুখে পড়েছে। আর এতে রয়েছে মহান প্রতিদান ও সুস্পষ্ট মর্যাদা। কাজেই তোমরা সালমান ইবনু রাবী'আহ আল-বাহিলী-এর নেতৃত্বে এই আহবানে সাড়া দেয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ কর।'[১২]

সৈনিকরা তাদের সেনাপতির আহবানে সাড়া দিল; তিনদিন অতিক্রান্ত হওয়ার আগে আট হাজার কূফাবাসী সালমান ইবনু রাবী'আহ আল-বাহিলীর নেতৃত্বে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করল। ওদিকে সিরিয় বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন হাবীব ইবনু মাসলামা ইবনু খালিদ আল-ফিহরী। যৌথবাহিনী শত্রু এলাকায় তীব্র হামলা করে রোমানদেরকে পর্যুদস্ত করে ফেলল। যুদ্ধ শেষে কূফা ও সিরিয়ার বাহিনী বিপুল গানীমতসহ ফিরে এল।

তিন. সা'ঈদ ইবনুল 'আস-এর তাবারিস্তান অভিযান (৩০ হিজরী):

হিজরী ত্রিশ সনে কূফার গভর্ণর সা'ঈদ ইবনুল 'আস কূফা হতে খুরাসান বিজয়ের উদ্দেশে রওয়ানা করলেন; তাঁর সাথে অনেক সাহাবী ছিলেন: হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা.), আল-হাসান (রা.), আল-হুসাইন (রা.), 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রা.), 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.)[১৩], 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর ইবনিল আস (রা.), 'আবদুল্লাহ ইবনুয্ যুবাইর (রা.)-সহ অনেকে। অন্যদিকে বাসরার গভর্ণর 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমিরও খুরাসান[১৪] জয়ের লক্ষ্যে বাসরা হতে রওয়ানা করলেন। বাসরার যোদ্ধারা কূফাবাসীদের ছেড়ে এগিয়ে গেল, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমির আগেই আবরাশহর গিয়ে পৌঁছলেন। এই

---

১১. স্বর্ণযুগের মুসলিম সেনাপতি ও সাধারণ সৈনিকগণ যুদ্ধজয়কে কেবল নিজেদের বীরত্ব ও কর্মকুশলতার ফলাফল বলে গণ্য করতেন না। বরং তাঁরা মনে করতেন আল্লাহ্‌র অশেষ মেহেরবানী ও দয়ায় তাদের বিজয় অর্জিত হয়েছে।

১২. আত-তাবারী, ৪:২৪৭।

১৩. তাফসীর, হাদীস ও ফিক্‌হের ময়দানে নেতৃত্বদানকারী সাহাবায়ে কিরাম তীব্র আগ্রহ ও শাহাদাতের জযবা নিয়ে প্রত্যক্ষ জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তেন, এই ঘটনা তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

১৪. আল-বালাযুরী লিখেছেন, সা'ঈদ ইবনুল 'আস ও 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমির দু'জনই খুরাসান অভিযানে বের হওয়ার কারণ হল এই যে, তূস-এর শাসনকর্তা পৃথকভাবে এঁদের দু'জনকেই খুরাসানে আক্রমণ করার জন্য আহ্বান জানান। এই ডাকে সাড়া দিয়ে সা'ঈদ কূফা হতে এবং ইবনু 'আমির বাসরা হতে খুরাসানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেন। দু'গভর্ণর যে একই লক্ষ্যে রওয়ানা হয়েছেন তা তাঁদের জানা ছিল না। ইবন 'আমিরের বাহিনী খুরাসানের পথে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে জানতে পেরে সা'ঈদ পথ পরিবর্তন করে তাবারিস্তানের পথ ধরেন [৩৩৪]।

খবর পেয়ে সা'ঈদ ভিন্ন পথে রওয়ানা করলেন, তিনি কূমিসে পৌঁছলেন। এটি অবশ্য আগেই চুক্তিবদ্ধ ছিল; নাহাওয়ান্দ বিজয়ের পর হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান কূমিসবাসীদের সাথে সন্ধি করেছিলেন। অতঃপর সা'ঈদ ইবনুল 'আস জুরজানে আসলে স্থানীয়রা বার্ষিক দু'লক্ষ দিরহাম প্রদানের শর্তে সন্ধিচুক্তি করল। তারপর তিনি তামিসা-এ পৌঁছলেন; এটি ছিল তাবারিস্তানের অন্তর্গত ও জুরজানের সীমান্তে অবস্থিত সাগরের তীরবর্তী একটি শহর। মুসলিম বাহিনী ও স্থানীয়দের মাঝে এমন ভীষণ যুদ্ধ বেধে গেল যে মুসলিমদেরকে সালাতুল খাওফ বা ভয়কালীন নামায আদায় করতে হল। তুমুল যুদ্ধের পর মুসলিম বাহিনী শত্রুদেরকে পরাভূত করতে সক্ষম হল। বিজয়ী বেশে কূফায় প্রত্যাবর্তনের পূর্বে সা'ঈদ রূইয়ান, দানাবান্দ, তাবারিস্তানের সমভূমি ও নামিয়া মরুভূমি জয় করেন।[১৫]

জুরজানবাসী সা'ঈদের সাথে চুক্তি করলেও তারা তা পালন করত না। কোন বছর তারা এক লাখ দিরহাম কর প্রদান করত। আবার কোন বছর দু'লাখ দিরহাম আদায় করত। সা'ঈদের পর কেউ জুরজানে অভিযানও পরিচালনা করেনি। এক পর্যায়ে তারা কর প্রদান বন্ধ করে দেয় এবং মুসলিমদের সাথে শত্রুতামূলক আচরণ শুরু করে। জুরজানবাসীর ভয়ে কোন মুসলিম কূমিসের পথ ধরে নির্ভয়ে খুরাসানে যেতে পারত না। কুতাইবা ইবনু মুসলিম খুরাসানের গভর্ণর নিযুক্ত হওয়ার পর জুরজানবাসীকে পদানত করে কূমিসের রাস্তার নিরাপত্তা বিধান করেন।[১৬]

চার. পারস্য সম্রাট ইয়াযদগির্দ-এর পলায়ন ও হত্যাকাণ্ড:

'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমির বাসরায় ফিরে এলেন। অতঃপর তিনি ফার্স অভিমুখে রওয়ানা করে সেটি দখল করেন। মুসলিম বাহিনীর অগ্রগামিতার খবর পেয়ে ছিন্নবিচ্ছিন্ন পারস্যের সম্রাট ইয়াযদগির্দ আর্দাশীরে পালিয়ে গেলেন। এটি ৩০ হিজরী সনের ঘটনা। সম্রাটকে পশ্চাদ্ধাবন করার জন্য ইবনু 'আমির, মাজাশি' ইবনু মাস'ঊদ আস-সুলামীকে প্রেরণ করলেন। তিনি কিসরাকে তাড়িয়ে কারমানে নিয়ে গেলেন। ইয়াযদগির্দ খুরাসানে পালিয়ে গেলেন আর মাজাশি' সেনাবাহিনী নিয়ে সায়ারজানে ছাউনী ফেললেন।[১৭]

পারস্য সম্রাট ইয়াযদাগির্দ নিহত (৩১ হিজরী): পারস্য সম্রাট ইয়াযদগির্দ নিহত হওয়ার ব্যাপারে দু'ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়: একটি ইবনু ইসহাক বর্ণনা করেছেন, অন্যটি বর্ণনা করেছেন ইবনু জারীর আত-তাবারী।

ইবনু ইসহাক বলেন, ইয়াযদগির্দ একটি ক্ষুদ্র বাহিনী নিয়ে কারমান থেকে মার্ভে পালিয়ে গেলেন। তথাকার জনৈক বাসিন্দার কাছ থেকে সম্রাট কিছু সাহায্য চাইলেন। স্থানীয়রা

---

১৫. আত-তাবারী, ৪:২৬৯-৭০; ইবনুল আসীর, ২:৩৯৮-৯৯; ইবনু কাসীর, ৭:১৫৪-৫৫; আল-বালাযুরী, ৩৩৪-৩৫; আয-যাহাবী, ৩:১১।
১৬. আত-তাবারী, ৪:২৭১; ইবনুল আসীর, ২:৩৯৯।
১৭. আত-তাবারী, ৪:২৯৩।

নিজেদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার ভয়ে সম্রাটকে আশ্রয় দিল না, শুধু তাই নয় তারা সম্রাটের বিরুদ্ধে তুর্কীদের সাহায্য চাইল। তুর্কী সৈন্যরা ইয়াযদগির্দের ক্ষুদ্র বাহিনীকে হত্যা করলে সম্রাট পালিয়ে গিয়ে মারগাব[১৮] নদীর তীরে এক ব্যক্তির ঘরে আশ্রয় নিলেন। লোকটি তাঁকে আশ্রয় দিলেও রাতের বেলা বিশ্বাসঘাতকতা করে তাঁকে হত্যা করল।[১৯]

আত-তাবারী অন্য একটি বর্ণনার সূত্রে উল্লেখ করেছেন যে, মুসলিম বাহিনী আসার আগেই ইয়াযদগির্দ কারমান ছেড়ে তাবাসাইন ও কুহিস্তানের পথ ধরে মার্ভের কাছাকাছি পৌঁছেন। তাঁর সাথে চার হাজার সৈন্য ছিল। তিনি আরবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য খুরাসান থেকে একদল সৈন্য সংগ্রহ করার পরিকল্পনা আঁটছিলেন। পথিমধ্যে তাঁর সাথে দু'জন সেনাপতির দেখা হয়; একজনের নাম বারায, অন্যজনের নাম সানজান। দু'জনে তাঁর আনুগত্য মেনে নিলে তিনি মার্ভে অবস্থান করলেন। সম্রাট বারাযকে কাছে টেনে নিলে অপর সেনাপতি সানজান বিদ্বিষ্ট হয়ে পড়ল। ওদিকে বারায, সানজানের বিরুদ্ধে সম্রাটের মন বিষিয়ে তুলল। পুরো বিষয়টি সানজানের কাছে ধরা পড়লে সে বারায ও সম্রাটের যৌথ সেনাবাহিনীর চেয়ে বড় একটি বাহিনী প্রস্তুত করে। তারপর সানজান সম্রাটের প্রাসাদ অভিমুখে রওয়ানা হয়। বিরাট বাহিনী দেখে বারায সম্রাটকে ফেলে পালিয়ে গেল, অন্যদিকে ভীতসন্ত্রস্ত সম্রাট বেশ পরিবর্তন করে প্রাসাদ থেকে বের হয়ে পড়লেন। কিছুদুর গিয়ে ইয়াযদগির্দ ক্লান্তশ্রান্ত হয়ে একটি ঘরে আশ্রয় নিলেন। গৃহকর্তা আশ্রয়প্রার্থীর বেশভুষা দেখে তাঁকে সম্ভ্রান্ত মনে করে আদর-আপ্যায়ন করলেন। পরে ইয়াযদগির্দের মণিমুক্তার লোভে লোকটি ঘুমন্ত অবস্থায় তাঁকে হত্যা করে এবং পাশের নদীতে লাশ নিক্ষেপ করে।[২০]

বর্ণনা দু'টোতে এত বেশি বৈশাদৃশ্য আছে যে সামঞ্জস্য বিধান অসম্ভব। তবে ঘটনার সারবস্তু হিসেবে বলা যায়, বিপর্যস্ত পারস্য সম্রাটের সামনে পৃথিবী সংকুচিত হয়ে পড়েছিল। মুসলিম বাহিনী তাঁকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় তাড়িয়ে নিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত হতভাগ্য সম্রাট বেশভুষা পরিবর্তন করেও আত্মরক্ষা করতে ব্যর্থ হন। বিশ্বাসঘাতক আশ্রয়দাতার হাতে তিনি নিহত হন।

ইয়াযদগির্দ বিশ বছর রাজ্য শাসন করেন; চার বছর স্বস্তিতে, বাকি ষোল বছর মুসলিমদের ভয়ে এক দেশ থেকে অন্য দেশে পালিয়ে বেড়িয়েছেন। তিনিই ছিলেন পারস্যের সর্বশেষ কিসরা। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، والذي نفسي بيده لتنفقنّ كنوزهما في سبيل الله

এই কায়সার মারা গেলে এরপর আর কায়সার আসবে না, এই কিসরা মারা গেলে

১৮. মারগাব: মার্ভের একটি নদী।
১৯. আত-তাবারী, ৪:২৯৫।
২০. প্রাগুক্ত, ৪:২৯৭।

এরপর আর কিসরা আসবে না। যার হাতে আমার প্রাণ সেই সত্তার শপথ! তাঁদের ধনভাণ্ডার আল্লাহর পথে ব্যয়িত হবে।[২১]

নিহত হওয়ার পর ইয়াযদগির্দের প্রতি খৃস্টানদের সহানুভূতি: পারস্য সম্রাট ইয়াযদগির্দ নিহত হওয়ার খবর মার্ভের আর্চবিশপ ইলিয়ার কাছে পৌঁছলে তিনি তাঁর চতুষ্পার্শ্বের খৃস্টানদের জমায়েত করে বললেন: পারস্য সম্রাট নিহত হয়েছেন। ইনি শাহরিয়ার ইবনু কিসরার পুত্র। আর শাহরিয়ার ছিলেন শীরীন-এর সন্তান যিনি খৃস্টবাদে বিশ্বাসী ছিলেন এবং নানাভাবে তোমাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন। এই সম্রাটের রক্তে খৃস্টানদের রক্ত প্রবাহিত, তাছাড়া তাঁর দাদা খৃস্টানদেরকে সহযোগিতা করেছেন, কয়েকটি গীর্জাও নির্মাণ করে দিয়েছেন। এঁর পূর্বপুরুষরা যেভাবে আমাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন তার প্রতিদানে আমাদের উচিত এঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা। আমি এঁর জন্য একটি শবাধার তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছি যাতে তাঁকে সসম্মানে সমাহিত করতে পারি।' বিশপের এই প্রস্তাবের সাথে মার্ভের খৃস্টানরা একমত পোষণ করে। আর্চবিশপ মার্ভের খৃস্টানদের উদ্যানে পাথরের তৈরি একটি শবাধার প্রস্তুত করলেন। অতঃপর একদল লোক নিয়ে নদী থেকে সম্রাটের শবদেহ উদ্ধার করে একটি কফিনে করে নিয়ে সসম্মানে দাফনের ব্যবস্থা করলেন।[২২]

পাঁচ. হিজরী উনত্রিশ সনে 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমিরের বিজয়াভিযান:

ক. ফার্স ও ইস্তাখ্‌রের[২৩] বিদ্রোহ দমন: বাসরার গভর্ণর হিসেবে 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমিরের নিযুক্তির সময় (২৯ হিজরী) ফার্সের শাসক ছিলেন 'উবাইদুল্লাহ ইবনু মা'মার। ২৯ হিজরীতে ফার্সবাসী তাদের শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং ইস্তাখ্‌রের নগর তোরণের কাছে সংঘটিত ভয়াবহ এক যুদ্ধে মুসলিমরা পরাজিত ও সেনাপতি 'উবাইদুল্লাহ নিহত হন। মুসলিম বাহিনীর বিপর্যয়ের খবর পেয়ে গভর্ণর ইবনু 'আমির বাসরা হতে সেনাদল সমভিব্যহারে ফার্স অভিমুখে রওয়ানা হন। মুসলিম বাহিনীর রাইট উইং বা ডান অংশের দায়িত্বে ছিলেন আবূ বারযাহ আল-আসলামী, লেফ্‌ট উইং বা বাম অংশের দায়িত্বে ছিলেন মা'কিল ইবনু ইয়াসার আল-মুযানী, অশ্বারোহী দলের প্রধান ছিলেন 'ইমরান ইবনুল হুসাইন আল-খুযা'ঈ এবং পদাতিক বাহিনীর প্রধান ছিলেন খালিদ ইবনুল মু'আম্মার (প্রথম তিনজন সাহাবী ছিলেন)। দু'বাহিনী ইস্তাখ্‌রে মুখোমুখি হয়; প্রচণ্ড যুদ্ধের পর ফার্সের সেনাদল পরাজিত হয়।[২৪]

খ. দারাবজির্দ ও জূর বিজয়: ইবনু 'আমির শক্তি প্রয়োগে ইস্তাখ্‌র জয়ের পর আরেক বিদ্রোহী শহর দারাবজির্দ পদানত করেন। অতঃপর জূর বা আরদাশীর খুর্‌রা-এর

---

২১. সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ফিতান, নং ২৯১৮, ২৯১৯।
২২. আত-তাবারী, ৪:৩০৪।
২৩. ফার্স ও ইস্তাখ্‌র উমার (রা.)-এর আমলে বিজিত হয়েছিল।
২৪. ইবনুল আসীর, ২:৩৯২; আত-তাবারী, ৪:২৬৫; আল-বালাযুরী, ৩৮৯-৯০।

দিকে অগ্রসর হতে না হতেই ইস্তাখ্‌রবাসীর বিদ্রোহের খবর পান। তবে পেছনে না ফিরে তিনি সম্মুখে তথা জূর অভিমুখে এগিয়ে যান। ইবনু 'আমিরের আগমনের পূর্বেই মুসলিমরা জূর জয়ের চেষ্টায় নিরত ছিলেন। সাহায্যকারী বাহিনীর সহায়তায় সহজেই জূর জয় করা সম্ভব হয়।

বর্ণনাকারীরা আমাদেরকে জূর বিজয়ের এক চমকপ্রদ কাহিনী জানাচ্ছেন: এক রাতে জনৈক মুসলিম সৈনিক সালাতে নিমগ্ন ছিলেন; তাঁর পাশে রুটি ও গোশ্‌তভর্তি একটি থলে ছিল। হঠাৎ একটি কুকুর এসে থলেটি টানতে টানতে গোপন এক সুড়ঙ্গপথে শহরে প্রবেশ করল। মুসলিমরা সেই গোপন পথে আক্রমণ চালিয়ে জূর দখল করেন।[২৫]

গ. ইস্তাখ্‌র পুনর্বিজয়: আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমির জূর অভিমুখে রওয়ানা করার সাথে সাথে ইস্তাখ্‌রবাসীর বিদ্রোহের খবর পেয়েছিলেন; কিন্তু জূর বিজয় সম্পন্ন করার জন্য তিনি পেছনে ফিরে তাকাননি। বারংবার বিদ্রোহের কারণে ইবনু 'আমির ত্যক্তবিরক্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাই এবার তিনি প্রচণ্ড আক্রমণ হানেন; বসতবাড়ির বিপুল ক্ষতি ও ব্যাপক রক্তক্ষয়ের পর ইস্তাখ্‌রের বিদ্রোহ দমন করা হয়।[২৬]

ঘ. প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস: বিদ্রোহ দমনের পর ইবনু 'আমির খালীফাকে পুরো বিষয়টি অবহিত করলেন। বারংবার বিদ্রোহের কারণ হিসেবে 'উসমান (রা.)-এর কাছে ফার্সের বিস্তৃতি চিহ্নিত হল। তাই তিনি ইবনু 'আমিরকে নির্দেশ দিলেন ফার্সকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করে পাঁচ জন শাসক নিয়োগ করতে। খালীফার নির্দেশানুসারে ইবনু 'আমির ফার্সকে পাঁচ অংশে ভাগ করে শাসক নিয়োগ দিলেন; তাঁরা হলেন হারিম ইবনু হাইয়ান আল-ইয়াশকুরী, হারিম ইবনু হাইয়ান আল-'আবদী, আল-খির্‌রিত ইবনু রাশিদ, আল-মিনজাব ইবনু রাশিদ ও আত-তারজুমান আল-হুজাইমী।[২৭]

ছয়. ৩১ ও ৩২ হিজরীতে[২৮] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমিরের বিজয়সমূহ:

ক. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমিরের খুরাসান[২৯] বিজয়: 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমির ফার্স জয় করার পর বাসরায় ফিরে গেলেন। পথিমধ্যে তিনি শারীক ইবনুল আ'ওয়ার আল-

---

২৫. ইবনুল আসীর, ২:৩৯২; আর-বালাযুরী, ৩৮৯।
২৬. ইবনুল আসীর, ২:৩৯৩; আয-যাহাবী, ৩:১১০।
২৭. ইবনুল আসীর, ২:২৯২-৯৩; আয-যাহাবী, ৩:১১০।
২৮. এই উপ-শিরোনামের আওতায় আমরা দেখতে পাব ৩১ ও ৩২ হিজরীতে ইবন 'আমিরের নেতৃত্বে খুরাসান, কারমান ও তুখারিস্তানের বিস্তীর্ণ এলাকা বিজিত হয়; ইবনুল আসীরের বর্ণনামতে সব এলাকা ৩১ হিজরীতে বিজিত হয়েছিল। আবার আত-তাবারী'র মতে খুরাসান ৩১ হিজরীতে ও তুখারিস্তান ৩২ হিজরীতে বিজিত হয়েছিল। তবে আমাদের কাছে মনে হয়েছে এটি একটি ধারাবাহিক ও অখণ্ড অভিযান ছিল যা এক নাগাড়ে দু'বছর অব্যাহত ছিল। কোন্ এলাকা ৩১ হিজরীতে এবং কোন্ এলাকা ৩২ হিজরীতে বিজিত হয়েছিল তা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। তাই ৩১ ও ৩২ হিজরীর বিজয়াভিযানগুলো একই উপ-শিরোনামের আওতায় আলোচনা করা হচ্ছে।
২৯. 'ক' উপ-শিরোনামের আওতায় উল্লেখিত স্থানগুলো সেকালে খুরাসানের আওতাভুক্ত ছিল। বৃহত্তর খুরাসান বর্তমানে ইরান, আফগানিস্তান, উজবেকিস্তান ও তুর্কমেনিস্তানব্যাপী বিস্তৃত।

হারিসীকে ইস্তাখ্‌র-এর শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। বাসরায় থিতু হওয়ার আগেই ইবনু 'আমিরকে আবার অভিযানে বের হতে হল। আল-আহনাফ ইবনু কায়স নামে বানূ তামীমের জনৈক সেনাপতি ইবনু 'আমিরকে উৎসাহ দিয়ে বললেন, 'আপনার শত্রু পলায়নপর, সে আপনার ভয়ে ভীত, আল্লাহর যমিন প্রশস্ত; অতএব আপনি বেরিয়ে পড়ুন, আল্লাহ আপনাকে সাহায্য করবেন এবং তাঁর দীনকে বিজয়ী করবেন।' একথায় অনুপ্রাণিত হয়ে ইবনু 'আমির আবার অভিযানের প্রস্তুতি নিলেন। বাসরার শাসনভার যিয়াদের হাতে অর্পণ করে তিনি প্রথমে সাইয়িরজান পৌঁছলেন; সেখান থেকে মুজাশি' ইবনু মাস'উদ আস-সুলামীকে কারমানের উদ্দেশে প্রেরণ করলেন। এই এলাকার অধিবাসীরা ইতোপূর্বে সম্পাদিত চুক্তি ভঙ্গ করেছিল। অন্যদিকে আর-রাবী' ইবনু যিয়াদকে সিজিস্তানে প্রেরণ করেন। তারপর ইবনু 'আমির রাবার-এর পথ ধরে তাবাসাইন[৩০] পৌঁছে তাদের সাথে সম্পাদিত পুরাতন চুক্তিটি বহাল রাখলেন। এরপর ইবনু 'আমির আবরাশাহ্‌র[৩১] অভিযানে বের হন। যাবার পথে তিনি সহজেই খাবীস ও খুওয়াস্‌ত অতিক্রম করেন। কিন্তু নিশাপুর (আবরাশাহ্‌র)-এর পথে কুহিস্তান অতিক্রম করার সময় তিনি হায়াতালা[৩২]-এর কঠিন প্রতিরোধের সম্মুখীন হন। সেনাপতি আল-আহনাফ ইবনু কায়স তাদের দর্প চূর্ণ করে নিশাপুরের রাস্তার নিরাপত্তা বিধান করেন। তারপর ক্ষুদ্র সেনাদল প্রেরণ করে তিনি রাসতাক যাম, বাখার্‌য ও জুওয়াইন দখল করেন।

এখান থেকে ইবনু 'আমির, আল-আসওয়াদ ইবনু কুলসূম আল-'আদাবীকে[৩৩] বাইহাকের[৩৪] উদ্দেশে প্রেরণ করেন। নগরপ্রাচীরের এক ছিদ্রপথ দিয়ে তিনি দলবলসহ শহরে প্রবেশ করেই স্থানীয়দের প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হন। যুদ্ধে আল-আসওয়াদ নিহত হলে তার অনুজ আদহাম ইবনু কুলসূম মুসলিম বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং বিজয় সম্পন্ন করেন। নিশাপুর বিজয়ের পূর্বে ইবনু 'আমিরের সেনাপতিত্বে বুশ্‌ত, আশবান্দ, রুখ, যাওয়াহ, খুওয়াফ, আসফারাইন[৩৫] ও আরগিয়ান বিজিত হয়।

---

৩০. খুরাসানের প্রবেশদ্বার হিসেবে পরিচিত ছিল দু'টি দুর্গ: একটির নাম তাবাস, অন্যটির নাম কুরাইন, একত্রে বলা হত তাবাসাইন। 'উমার (রা.)-এর আমলে দুর্গ দু'টি আবূ মূসা আল-আশ'আরীর হাতে প্রথমবারের মত বিজিত হয়েছিল। [আল-বালাযুরী, ৪০৩।]

৩১. এটিই নিশাপুর শহর; আরবীতে নাইসাবূর বলা হয়।

৩২. কেউ কেউ বলেন, এরা ছিল তুর্কীদের দুর্ধর্ষ একটি উপদল। আবার কেউ বলেন, এরা ছিল ফার্সের অধিবাসী, সমকামিতার অপরাধে পারস্য সম্রাট ফাইরোজ এদেরকে হারাতে নির্বাসিত করেছিলেন। কুহিস্তানের অধিবাসীদের সাথে মিলে এরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল [আর-বালাযুরী, ৪০৩]।

৩৩. আল-আসওয়াদ ইবন কুলসূম দরবেশ শ্রেণীর মানুষ ছিলেন। এতদ্‌সত্ত্বেও তিনি দীনকে বিজয়ী করার জন্য সশস্ত্র লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন [আল-বালাযুরী, ৪০৪]।

৩৪. নিশাপুর হতে ১৬ ফার্লং দূরত্বে অবস্থিত একটি শহর। রত্নগর্ভা বাইহাক অনেক 'আলিম, মুহাদ্দিস ও ফকীহের জন্মভূমি; ইমাম আবূ বাকর আহমাদ ইবনুল হুসাইন আল-বাইহাকী এই শহরের সন্তান।

৩৫. শহরটির নামের ভিন্নপাঠ আছে। ইবনুল আসীর লিখেছেন 'আসফারাইন' (اسفراين), ওদিকে আল-বালাযুরী লিখেছেন, 'আসবারাইন' (أسبرائن)। এটি অবশ্য সচরাচর দেখা যায় যে, ফারসী 'ফ (ف)' বর্ণ আরব লেখকরা 'ব (ب)' দ্বারা পরিবর্তন করে থাকেন।

অবশেষে 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমির নিশাপুরের উপকণ্ঠে এসে শহর অবরোধ করলেন। শহরটি চারভাগে বিভক্ত ছিল; প্রতি ভাগে একজন করে শাসক ছিল। এক চতুর্থাংশের শাসক, ইবনু 'আমিরের কাছ থেকে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা পেয়ে মুসলিমদেরকে শহরে প্রবেশ করতে দিলেন। আচানক শত্রু বাহিনী দেখে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে নিশাপুরের প্রধান শাসক সন্ধির প্রস্তাব দিলেন। নিশাপুর হতে বার্ষিক দশ লক্ষ দিরহাম কর প্রদান করা হবে-এই শর্তে চুক্তি সম্পাদিত হল।[৩৬] কায়স ইবনুল হায়সাম নিশাপুরের শাসক নিযুক্ত হলেন।

অতঃপর ইবনু 'আমিরের নির্দেশে উমাইন ইবনু আহমার আল-ইয়াশকুরী চতুষ্পার্শ্বের কয়েকটি শহর-হুমরান[৩৭], নাসা ও আবীওয়ার্দ[৩৮]- সন্ধিচুক্তির মাধ্যমে (যুদ্ধ না করেই) জয় করেন। এরপর 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমির 'আবদুল্লাহ ইবনু খাযিমকে সারখ্সের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। মুসলিমদের অগ্রযাত্রায় শহরবাসীর প্রতিরোধ চেষ্টা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি; সারাখ্স-শাসক যাযওয়াই সন্ধিচুক্তির প্রস্তাব দিলে 'আবদুল্লাহ ইবনু খাযিম তা মেনে নেন। এখান থেকে ইয়াযীদ ইবনু সালিমকে সারাখ্সের উপকণ্ঠে প্রেরণ করা হয়; তিনি অল্পায়াসে কায়ফ ও বীনা দখল করেন।

তূসের শাসক কানাযতাক-এর আমন্ত্রণে 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমির খুরাসান অভিযানে বের হয়েছিলেন। তিনি এসে বার্ষিক ছয় লক্ষ দিরহাম প্রদানের শর্তে সন্ধি করলেন। তারপর আউস ইবনু সা'লাবাকে হারাতের উদ্দেশে প্রেরণ করা হয়। মুসলিম বাহিনীর আগমনের খবর পেয়ে হারাত-শাসক স্বেচ্ছায় চুক্তি করলেন, এই সন্ধিতে বাযাগীশ ও বূশান্জও অন্তর্ভুক্ত ছিল। তবে তাগূন ও বাগূন নামক গ্রাম দু'টিকে বশ্যতা স্বীকারে শক্তি প্রয়োগ করতে হয়। ইবনু 'আমির ও হারাত শাসকের মাঝে সম্পাদিত চুক্তির ভাষ্য ছিল নিম্নরূপ:

> هذا ما أمر به عبد الله بن عامر عظيم هراة وبوشنج وباذغيس أمره بتقوى الله ومناصحة المسلمين وإصلاح ما تحت يديه من الأرضين وصالحه عن هراة سهلها وجبلها على أن يؤدى من الجزية ما صالحه عليه وأن يقسم ذلك على الأرضين عدلا بينهم فمن منع ما عليه فلا عهد له ولا ذمة. (وكتب ربيع بن نهشل وختم ابن عامر

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম! এটি হারাত, বূশান্জ ও বাযাগীস-এর শাসকের

---

৩৬. আত-তাবারীর এক বর্ণনায় দেখা যায় নিশাপুরের অর্ধেক যুদ্ধের মাধ্যমে বাকী অর্ধেক সন্ধিচুক্তির মাধ্যমে জয় করা হয়।

৩৭. আত-তাবারী লিখেছেন হুমরান [৪:৩০২]; ভিন্নপাঠে হুমরানদিয [আল-বালাযুরী, ৪০৪]।

৩৮. স্থানটির নাম আবীওয়ার্দ লিখেছেন ইবনুল আসীর [২:৪০৯] ও আল-বালাযুরী [৪০৪]; ভিন্নপাঠে বীওয়ার্দ [আত-তাবারী, ৪:৩০২]।

প্রতি 'আব্দুল্লাহ্ ইবনু 'আমিরের নির্দেশনামা- তিনি হারাতের শাসককে আল্লাহ্-ভীতি, মুসলিমদের কল্যাণ-কামনা ও তার আওতাধীন ভূমি সংস্কারের নির্দেশ দিচ্ছেন। হারাতের সমভূমি ও পাহাড়ী এলাকার জন্য এই চুক্তি প্রযোজ্য হবে এই শর্তে যে; চুক্তি মুতাবিক জিযইয়া প্রদান করতে হবে এবং তা ন্যায্যতার ভিত্তিতে বন্টন করতে হবে। কেউ যদি তার ওপর আরোপিত কর আদায়ে অসম্মত হয় তবে তার জন্য কোন নিরাপত্তা-প্রতিশ্রুতি নেই [খোশনবীশ: রাবী' ইবনু নাহ্শাল, সীল: ইবনু 'আমির]।[৩৯]

তারপর 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমির, হাতিম ইবনু আন-নু'মান আল-বাহিলীকে মার্ভে এবং আল-আহনাফ ইবনু কায়সকে তুখারিস্তানের উদ্দেশে প্রেরণ করেন। হাতিম বিনাযুদ্ধে মার্ভ জয় করেন; সিন্জ নামক গ্রামটি দখলে অবশ্য সামান্য শক্তি প্রয়োগ করতে হয়। ওদিকে তুখারিস্তান যাওয়ার পথে আল-আহনাফ সাওয়ানজির্দ[৪০] নামে একটি জিলা ৩ লক্ষ দিরহাম কর প্রদানের শর্তে জয় করেন।

খ. মার্ভারূয বিজয়: 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমির তাঁর সেনাপতি আল-আহনাফ ইবনু কায়সকে মার্ভরূয অভিমুখে প্রেরণ করেন। আল-আহনাফ শহর অবরোধ করে রাখেন। শহরবাসী দুর্গ থেকে বের হয়ে মুসলিমদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। কিন্তু পরাজিত হয়ে পুনরায় দুর্গে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। মার্ভবাসীর অনুরোধে সেই দিনের জন্য যুদ্ধ স্থগিত রেখে আল-আহনাফ শিবিরে ফিরে যান। পরদিন প্রত্যুষে মার্ভের গভর্ণর তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র মাহাক মারফত আরব বাহিনীর অধিনায়ক আল-আহনাফের নিকট সন্ধির প্রস্তাব সম্বলিত একটি চিঠি প্রেরণ করেন। পত্রে নিম্নোক্ত শর্তাবলীর উল্লেখ ছিল: ক) মার্ভ থেকে বার্ষিক ষাট হাজার দিরহাম কর প্রদান করা হবে; খ) পারস্য সম্রাট কিসরা কর্তৃক দখলকৃত ভূমিতে গভর্ণরের অধিকার মেনে নিতে হবে; গ) গভর্ণর ও তাঁর পরিবারের কাছ থেকে কর আদায় করা যাবে না এবং ঘ) মার্ভের নেতৃত্ব তাঁর পরিবারের হাতেই বহাল রাখতে হবে।

আল-আহনাফ চিঠির বিষয়বস্তুর ব্যাপারে নেতৃস্থানীয় সৈনিকদের সাথে পরামর্শ করে ইতিবাচক জবাব দিলেন। তবে একটি অতিরিক্ত শর্ত যুক্ত করলেন যে মার্ভবাসীকে মুসলিমদের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। তদুপরি তিনি তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানালেন; তারা যদি ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তারা মর্যাদায় আসীন হবে এবং মুসলিমদের ভাই বলে পরিগণিত হবে।

মুহাররম মাসের প্রথম দিবসে সম্পাদিত এই চুক্তিনামা লেখেন বানূ সা'লাবা-এর আযাদকৃত দাস কায়সান। সাক্ষী ছিলেন মু'আবিয়া ইবনু জায' আস-সা'দী, হামযা ইবনুল হিরমাস, হুমাইদ ইবনুল খিয়ার, 'আয়াজ ইবনু ওয়ারকা' আল-উসাইদী প্রমুখ।[৪১]

---

৩৯. আল-বালাযুরী, ৪০৫।
৪০. এটিকে রাসতাক আল-আহনাফও বলা হত [বালাযুরী ৪০৬]।
৪১. আত-তাবারী, ৪:৩১০।

গ. তুখারিস্তান, জূযজান, তালকান ও ফারিয়াব বিজয়ঃ মার্ভ বিজয়ের পর আল-আহনাফ চার হাজার সৈনিক সমভিব্যবহারে তুখারিস্তান অভিমুখে রওয়ানা করেন। মুসলিম বাহিনীর অগ্রগামিতার খবর পেয়ে তুখারিস্তান, জূযজান, তালকান ও ফারিয়াব-এর প্রায় ত্রিশ হাজার সৈন্য তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়। বিপুল সংখ্যক শত্রু সৈন্য দেখে মুসলিমদের মাঝে যুদ্ধের ব্যাপারে মতভেদ দেখা দেয়। কিন্তু সেনাপতি আল-আহনাফ ছিলেন অবিচল। তিনি অত্যন্ত কার্যকর একটি কৌশলের আশ্রয় নেন; মারগাব নদী[৪২] ও পাহাড়ের মাঝখানের সরু পথ ধরে তিনি এগিয়ে যান। ফলে একসঙ্গে বিপুল সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করা থেকে তিনি নিস্তার লাভ করেন। এই সময় মার্ভবাসী সাহায্যে এগিয়ে এলেও আল-আহনাফ এই বলে তাদের সাহায্য গ্রহণে বিরত থাকেন যে তিনি মুশরিকদের সাহায্য নেবেন না। প্রচণ্ড যুদ্ধের পর মুসলিম বাহিনী জয়লাভ করে। পলায়নপর শত্রুবাহিনীকে পশ্চাদ্ধাবন করার জন্য আল-আকরা' ইবনু হাবিসকে পাঠানো হয়; তিনি বীরবিক্রমে হামলা চালিয়ে শত্রু বাহিনীকে তছনছ করে দেন।

ঘ. বাল্‌খবাসীদের সাথে আল-আহনাফের সন্ধিঃ আল-আহনাফ মার্ভ থেকে বাল্‌খ অভিমুখে রওয়ানা করলেন; বাল্‌খবাসী যুদ্ধ করতে অনিচ্ছুক ছিল। তারা বার্ষিক চার লক্ষ দিরহামের বিনিময়ে সন্ধির প্রস্তাব দিলে আল-আহনাফ তা মেনে নিলেন। চাচাতো ভাই উসাইদ ইবনুল মুতাশাম্মিসকে[৪৩] বাল্‌খের শাসক হিসেবে নিয়োগ করে আল-আহনাফ খাওয়ারিয্‌ম-এর পথ ধরলেন। কিন্তু শীতের মৌসুম এসে পড়ায় তিনি কোন অভিযান পরিচালনা না করে বাল্‌খে ফিরে এলেন। তখন বাল্‌খে নববর্ষের উৎসব চলছিল। বাল্‌খবাসীরা শাসনকর্তা উসাইদকে স্বর্ণ-রৌপ্যের পাত্র ও অজস্র মুদ্রা উপহার দিল।[৪৪] আল-আহনাফ বাল্‌খে এলে উসাইদ স্থানীয়দের উপহারের বিষয়টি তাকে জানালেন। তিনি সকল উপহার সামগ্রী ইবনু 'আমিরের কাছে নিয়ে যান। ইবনু 'আমির বললেন, 'আবু বাহর! ওগুলো তুমি নিয়ে নাও।' আল-আহনাফ জবাব দিলেন, 'ওগুলোতে আমার কোন প্রয়োজন নেই।'[৪৫]

ঙ. খুরাসানে কারেনের পরাজয়ঃ 'আবদুল্লাহ্ ইবনু 'আমির যুদ্ধজয়ের পর বাসরায় ফিরে গেলেন। যাওয়ার পূর্বে তিনি কায়স ইবনুল হায়সামকে খুরাসানের শাসনকর্তা নিয়োগ করলেন। ওদিকে ৭০ হাজার যোদ্ধা নিয়ে তুর্কী যুদ্ধবাজ কারেন এগিয়ে এল। তুর্কীদের মুকাবিলায় 'আবদুল্লাহ ইবনু খাযিম আস-সুলামী চার হাজার যোদ্ধা নিয়ে এগিয়ে

---

৪২. নদীর বিবরণ, আল-বালাযুরী ৪০৬।
৪৩. ভিন্নমতে, আল-আহনাফ বাল্‌খের শাসক হিসেবে বিশ্‌র ইবনু মুতাশাম্মিসকে নিয়োগ দিয়েছিলেন [আত-তাবারী, ৪:৩১৪]।
৪৪. আত-তাবারী, ৪:৩১৩।
৪৫. ইবনু 'আমিরের খুরাসান জয়ের বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, আত-তাবারী, ৪:৩০০-৩০২, ৩০৯-৩১৪; ইবনুল আসীর, ২:৪০৮-৪১১; আল-বালাযুরী, ৪০৩-৪০৮।

গেলেন। এঁদের মধ্য হতে ছয়শ' সৈনিককে অগ্রবর্তী দল হিসেবে পাঠালেন। শত্রুসৈন্যের কাছে পৌঁছলে ইবনু খাযিম সৈন্যদেরকে বললেন, 'সবাই যেন বর্শাগ্রে কাপড়ের টুকরা বেঁধে তাতে তেল বা চর্বি মেখে আগুন জ্বালিয়ে নেয়।' তারপর রাতের বেলায় কারেন বাহিনীর ওপর হামলা চালানো হয়। ৭০ হাজার যোদ্ধার কারেন বাহিনী চারদিকে আগুন দেখে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পালাতে থাকে। তুর্কী দলপতি কারেনসহ বহু সৈন্য নিহত হয়। ইবনু খাযিম, ইবনু 'আমিরের কাছে যুদ্ধজয়ের সংবাদ প্রেরণ করলে তিনি পূর্ববর্তী শাসককে প্রত্যাহার করে ইবনু খাযিমকে খুরাসানের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন।[৪৬]

চ. কারমান বিজয়: আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'আবদুল্লাহ্ ইবনু 'আমির খুরাসান অভিযানে বের হওয়ার প্রাক্কালে মুজাশি' ইবনু মাস'উদ আস-সুলামীকে কারমানে প্রেরণ করবেন। গভর্ণরের নির্দেশানুসারে সেনাপতি মুজাশি' সমগ্র কারমান জয় করেন। প্রথমে তিনি সন্ধির মাধ্যমে বীমান্দ[৪৭] দখল করেন। এই শহরে মুজাশি''র প্রাসাদ নামে একটি প্রাসাদ আছে। তারপর মুজাশি' বারুখারা জয় করে সীরজান[৪৮] (বা শীরজান)-এ এসে পৌঁছেন। দুর্গে আশ্রয় নেওয়া নগরবাসীকে কিছুদিন অবরোধ করে মুজাশি' শহরটি দখল করেন। পরবর্তীতে এই শহরের অনেক অধিবাসীকে নির্বাসন দেওয়া হয়। এরপর তিনি জীরাফ্ত জয় করে কারমানের গ্রামাঞ্চল করায়ত্ত করেন। ওদিকে হুরমুযান নামক এলাকায় কারমান শহর হতে নির্বাসিত যুদ্ধবাজরা লড়াইয়ের জন্য একত্রিত হয়। মুজাশি' প্রবল বিক্রমে তাদেরকে তাড়িয়ে দেন। ফলে অনেকে সাগর পাড়ি দিয়ে মাকরান ও সিজিস্তানে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। কারমানের বিভিন্ন অঞ্চলে আরবদের নামে জায়গীর বরাদ্দ দেওয়া হয়; আরব জায়গীরদারগণ নালা খনন ও সেচ সম্প্রসারণের মাধ্যমে অনাবাদি জমি আবাদ করেন এবং ফকীহগণের দৃষ্টিতে তাদের ভূমি 'উশরী জমি হিসেবে বিবেচিত হয়।[৪৯]

ছ. সিজিস্তান[৫০] ও কাবুল বিজয়: 'আবদুল্লাহ্ ইবনু 'আমির খুরাসান জয়ের উদ্দেশে রওয়ানা করার প্রাক্কালে কারমান হতে আর-রাবী' ইবনু যিয়াদ আল-হারিসীকে সিজিস্তানের উদ্দেশে প্রেরণ করেছিলেন। আর-রাবী' প্রথমে ফাহরাজে অবতরণ করেন, তারপর প্রায় ৭৫ ফার্লং পথ অতিক্রম করে তিনি যালিক-এ পৌঁছেন। এটি সিজিস্তান হতে পাঁচ ফার্লং দূরে অবস্থিত একটি দুর্গ। উৎসবের দিন আক্রমণ শানিয়ে তিনি ঐ দুর্গের অধিপতিকে পাকড়াও করেন এবং কারমানের শর্তে চুক্তি করতে বাধ্য করেন। অতঃপর

---

৪৬. আত-তাবারী, ৪:৩১৫।
৪৭. ভিন্নপাঠে হামীদ [ইবনুল আসীর, ২:৪১১]।
৪৮. এটিই কারমান শহর। আবূ মূসা আল-আশ'আরী'র নির্দেশ আর-রাবী' ইবন যিয়াদ শহরটি জয় করেছিলেন; কিন্তু শহরবাসী বিদ্রোহ করলে ইবন 'আমির বিদ্রোহ প্রশমনের জন্য মুজাশী'কে প্রেরণ করেন। [ইবনুল আসীর ২:৪১২; আল-বালাযুরী ৩৯১।]
৪৯. কারমান বিজয়ের বিস্তারিত বিবরণ জানতে দেখুন আল-বালাযুরী, ৩৯২; ইবনুল আসীর, ২:৪১২।
৫০. 'ছ' উপ-শিরোনামের আওতায় উল্লেখিত স্থানগুলো সিজিস্তানের অন্তর্ভুক্ত।

ইবনু যিয়াদ (যালিক থেকে পাঁচ মাইল দূরত্বে অবস্থিত) কারকূইয়া নামক একটি জনপদ চুক্তির মাধ্যমে জয় করেন। তারপর তিনি হায়সূনে অবতরণ করেন, এই এলাকার অধিবাসীরা বিনাযুদ্ধে পরাজয় মেনে নেয়। এরপর যারান্‌জ যাওয়ার পথে হিন্দমিন্দ অতিক্রম করে নূক উপত্যকা পাড়ি দিয়ে তিনি রুস্ত (যুস্ত)-এ পৌঁছান। এখানে ইবনু যিয়াদ স্থানীয়দের পক্ষ থেকে তীব্র প্রতিরোধের সম্মুখীন হন। উভয় পক্ষে বিপুল সংখ্যক যোদ্ধা হতাহতের পর মুসলিমরা জয়ী হয়। এরপর নাশিরূয ও শারওয়ায নামক দু'টি গ্রাম জয় করে আর-রাবী' যারান্‌জ-এ উপনীত হন। এই শহরের শাসক আবারভীয সামান্য প্রতিরোধের পর রণেভঙ্গ দেন। তারপর তিনি সানারূয নামক উপত্যকা অতিক্রম করে একটি গ্রামে পৌঁছান। এখানে পারস্যবীর রুস্তমের আস্তাবল ছিল। তীব্র লড়াইয়ের পর মুসলিমরা বিজয়ী হলেও ইবনু যিয়াদ সামনে অগ্রসর না হয়ে যারান্‌জ-এ ফিরে আসেন। সিজিস্তানে আড়াই বছর শাসন করে তিনি ইবনু 'আমিরের কাছে ফিরে যান। তাঁর সচিব ছিলেন বিশিষ্ট তাবি'ঈ আল-হাসান আল-বাসরী। এই এলাকা ত্যাগের পূর্বে বানূল হারিস ইবনু কা'ব-এর এক লোককে প্রতিনিধি করে রেখে যান। কিন্তু স্থানীয়রা বিদ্রোহ করে তাঁকে বের করে দেয়।

আর-রাবী' ইবনু যিয়াদ ফিরে যাওয়ার পর 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমির সিজিস্তানের শাসক হিসেবে আবদুর রহমান ইবনু সামুরাকে নিয়োগ দেন। নতুন শাসক ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানা বর্ধনে চেষ্টা অব্যাহত রাখেন। প্রথমে তিনি যারান্‌জ-এর বিদ্রোহ দমন করেন। তারপর ভারত সীমান্তে যারান্‌জ ও কাশ-এর মধ্যবর্তী এলাকা জয় করেন। অতঃপর রুখ্‌খাজ জয় করে দাউন[৫১]-এর বাসিন্দাদেরকে যুয্‌ পাহাড়ে অবরোধ করেন। সামান্য প্রতিরোধের পর স্থানীয়রা সন্ধি করে। ঐ পাহাড়ে যুয নামে একটি স্বর্ণমূর্তি ছিল, যার দু'চোখ ছিল ইয়াকুত পাথরের। 'আবদুর রহমান মূর্তিটির হাত কেটে চোখ বের করে নিলেন। কিন্তু স্বর্ণ ও জহরত না নিয়ে শহরের শাসকের কাছে সেগুলো ফেরত দিয়ে বললেন, 'এগুলোতে আমার কাজ নেই, আমি শুধু তোমাকে দেখাতে চেয়েছিলাম যে, মূর্তিটি ক্ষতি বা উপকার করতে পারে না।' তারপর তিনি বুশ্‌ত, কাবুল ও যাবুলিস্তান (বা গজনী) জয় করেন। তারপর বিজয়াভিযান দীর্ঘ না করে তিনি যারান্‌জ-এ ফিরে আসেন। 'উসমান (রা.)-এর খিলাফাতের শেষদিকে বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে তিনি উমাইর ইবনু আহমার আল-ইয়াশকুরীকে প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করে যারান্‌জ ত্যাগ করেন।[৫২]

ইবনু 'আমিরের 'উমরাহ আশ-শুক্র পালন: ৩১ ও ৩২ হিজরীতে বাসরার গভর্ণর 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমির ও তাঁর অধীনস্থ সেনাপতিগণ মধ্য এশিয়ার বিশাল ভূখণ্ড জয়

---

৫১. ইবনুল আসীর, ২:৪১৩; দাউন-এর ভিন্নপাঠ হল দাওয়ার [আল-বালাযুরী, ৩৯৪]।
৫২. সিজিস্তান ও কাবুল বিজয়ের আদ্যোপান্ত জানতে দেখুন, ইবনুল আসীর, ২:৪১২-১৩; আল-বালাযুরী, ৩৯২-৯৫।

করেন। অনুরূপ বিজয়ের কৃতিত্ব খুব কম গভর্ণরের ভাগ্যে জুটেছে। বিজয়াভিযানের সমাপ্তিতে লোকজন ইবনু 'আমিরকে বলল: 'আল্লাহ্ আপনাকে বিপুল বিজয় দান করেছেন: আপনি ফার্স, কারমান, সিজিস্তান ও সমগ্র খুরাসান জয় করেছেন!' ইবনু 'আমির বললেন, 'আল্লাহর শুকরিয়াস্বরূপ আমি এখান থেকে ইহ্রাম বেঁধে 'উমরাহ্ পালন করব।' তারপর ইবনু 'আমির নিশাপুর থেকে ইহ্রাম বেঁধে মাক্কায় গিয়ে 'উমরাহ্ পালন করেন।[৫৩]

সাত. ৩২ হিজরীতে বালানজার-এর যুদ্ধে বিপর্যয়:

কূফার গভর্ণর সা'ঈদ ইবনুল আসের অধীনে সেনাপতি আবদুর রহ্মান ইবনু রাবী'আহ আল-বাবে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি বালান্জারে অভিযান পরিচালনার সংকল্প করলেন। বিষয়টি জানতে পেরে 'উসমান (রা.) সা'ঈদ ইবনুল আসকে লিখেন, 'তুমি সালমান ইবনু রাবী'আহকে তাঁর ভাই আবদুর রহমান ইবনু রাবী'আহ-এর সহায়তার জন্য আল-বাবে প্রেরণ কর।' আবদুর রহমান ইবনু রাবী'আহ আল-বাবে ছিলেন, তাঁকে সাবধান করে খালীফা লিখলেন, 'বদহজমে প্রজাদের অনেকে দুর্বল হয়ে পড়েছে; অতএব তুমি অভিযান সংক্ষেপ কর, মুসলিমদেরকে দুর্যোগে ঠেলে দিও না। কারণ আমার ভয় হয় তারা বিপদে পড়বে।' খালীফার এই সতর্কবাণী আবদুর রহমানকে লক্ষ্যচ্যুত করতে পারল না। তিনি বালানজার থেকে ফিরে আসলেন না। 'উসমান (রা.)-এর খিলাফাতের নবম বছরে আবদুর রহমান ইবনু রাবী'আহ বালানজারে পৌঁছে শহর অবরুদ্ধ করে মিনজানিক দাগিয়ে পাথর ছুঁড়তে লাগলেন। অবরুদ্ধ শহরবাসীর কেউ মিনজানিকের তোড়ে কাছে ঘেঁষতে পারছিল না। তারপর একদিন বালান্জারবাসীর সহায়তায় তুর্কীরা এগিয়ে এল, যৌথ বাহিনী প্রচণ্ড আক্রমণ শানাল, আবদুর রহমান ইবনু রাবী'আহ পরাজিত ও নিহত হলেন। তাঁকে বালানজারের উপকণ্ঠে দাফন করা হয়। পরাজিত মুসলিম বাহিনী ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। সালমান ইবনু রাবী'আহ একদলকে আশ্রয় দিয়ে আল-বাবের পথে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিলেন। আরেকদল খাযার-এর পথ ধরে জীলান ও জুরজানের পথে বেরিয়ে গেলেন। এঁদের সাথে সালমান ফার্সী ও আবূ হুরাইরা (রা.) ছিলেন। এই যুদ্ধের পূর্বে তুর্কীদের ধারণা ছিল মুসলিমদের মৃত্যু হয় না।[৫৪]

আট. প্রাচ্যের অন্যান্য বিজয়:

উপর্যুক্ত বিজয়ের পাশাপাশি 'উসমান (রা.)-এর আমলে প্রাচ্যে আরও কিছু বিজয় সম্পন্ন হয়, নিম্নে যার বিবরণ সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলো:

ক. রায় পুনর্বিজয় (২৪ হিজরী): 'উমার (রা.)-এর আমলে হুযাইফা ইবনুল

---

৫৩. আত-তাবারী, ৪:৩১৪।
৫৪. আত-তাবারী, ৪:৩০৪-০৬; ইবনুল আসীর, ২:৪১৪-১৫।

ইয়ামান (রা.) রায় জয় করেছিলেন। পরবর্তীতে ঐ অঞ্চলে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়লে ২৪ হিজরীতে আবূ মূসা আল-আশ'আরী রায় পুনর্জয় করেন।[৫৫]

খ. সাবুর বিজয় (২৫ হিজরী): ২৫ হিজরীতে 'উসমান ইবনু আবিল 'আস সন্ধির মাধ্যমে সাবুর জয় করেন।[৫৬]

গ. দ্বিতীয় ইস্তাখ্‌র বিজয় (২৭ হিজরী): ২৭ হিজরীতে 'উসমান ইবনু আবিল 'আস দ্বিতীয় বারের মত ইস্তাখ্‌র বিজয় করেন।[৫৭]

ঘ. প্রথম ফার্স বিজয় (২৮ হিজরী): ২৮ হিজরীতে হিশাম ইবনু 'আমিরের নেতৃত্বে প্রথমবারের মত ফার্স বিজিত হয়।[৫৮]

ঙ. হুযাইফা ইবনুল ইয়ামানের নেতৃত্বে আল-বাব অভিযান (৩০ হিজরী): ৩০ হিজরীতে হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান রায় হতে আল-বাবে গমন করেন। তথায় তিনি 'আবদুর রহমান ইবনু রাবী'আহ্‌কে সহায়তা করেন। এখানেই তিনি কুরআন তিলাওয়াতে ভিন্নতা লক্ষ্য করেন এবং মাদীনায় গিয়ে বিষয়টি খালীফাকে অবহিত করেন।[৫৯]

চ. দুই মার্ভ পুনর্বিজয় (৩৩ হিজরী): ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল-আহনাফ ইবনু কায়স ৩১/৩২ হিজরীতে মার্ভ জয় করেন। অত্যল্পকালের মাঝে মার্ভবাসী বিদ্রোহ করলে বাসরার গভর্ণর ইবনু 'আমির আবার আল-আহনাফকে মার্ভে প্রেরণ করেন। ৩৩ হিজরীতে তিনি দুই মার্ভ পুনর্জয় করেন: মার্ভ শাহিজান সন্ধির মাধ্যমে এবং মার্ভরূয শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে।[৬০]

ছ. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমিরের সুর্‌রাক জয়: আবূ মূসা আল-আশ'আরী সুর্‌রাক জয় করেছিলেন। কিন্তু অল্প দিনের মাথায় সুর্‌রাকের শাসক বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তখন হারিসা ইবনু বাদর আল-গুদানীকে বিদ্রোহ দমনে বিশাল বাহিনীসহ প্রেরণ করা হয়। তবে তিনি সফলতা লাভ করেননি। পরবর্তীতে 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমির সুর্‌রাক জয় করেন।[৬১]

জ. ভারত সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান: 'উসমান (রা.) বাসরার গভর্ণর 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমিরকে ভারত সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানের নির্দেশ দেন। তিনি হুকাইম ইবনু জাবালা আল-'আবদীকে সিন্ধুতে প্রেরণ করেন। হুকাইম ভারত সম্পর্কে সরেজমিনে তথ্য সংগ্রহ

---

৫৫. ইবনু কাসীর, ৭:১৫০।
৫৬. আত-তাবারী, ৪:২৫০; ইবনুল আসীর, ২:৩৮১; ইবনু কাসীর, ৭:১৫১; আয-যাহাবী, ৩:১০৫; আল-বালাযুরী, ৩৮৮।
৫৭. আত-তাবারী, ৪:২৫৭; ইবন কাসীর, ৭:১৫২।
৫৮. আত-তাবারী, ৪:২৬৩।
৫৯. ইবনুল আসীর, ২:৩৯৯।
৬০. প্রাগুক্ত, ৪:৩১৭।
৬১. আল-বালাযুরী, ৩৭৯।

করে খালীফাকে অবহিত করে বলেন, 'ভারতে পানি কম, ফলমুল নিম্নমানের, ওই অঞ্চলের চোরগুলো অনেক সাহসী, (প্রেরিত) সৈনিক সংখ্যা কম হলে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে আর বেশি হলে ক্ষুধায় মারা যাবে।' খালীফা বললেন, 'তুমি কি অভিজ্ঞতা থেকে বলছো না বুলি আওড়াচ্ছো?' তিনি জবাব দিলেন, 'না, বরং অভিজ্ঞতা থেকে বলছি।' এরপর খালীফা আর ভারতে কোন বাহিনী প্রেরণ করেননি।[৬২]

'উসমান (রা.)-এর আমলে সম্পাদিত প্রাচ্য বিজয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপস্থাপিত হল। এই বর্ণনায় যুদ্ধকৌশল নির্ণয় ও সেনাপতি নির্বাচনে 'উসমান (রা.)-এর দূরদর্শিতার প্রমাণ মেলে। অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে তিনি ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানা সংরক্ষণ করেন, অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন করে রাষ্ট্রের সীমানা সম্প্রসারণ করেন। কোন কোন প্রাচ্যবিদ 'উসমান (রা.)-কে দুর্বল শাসক হিসেবে চিহ্নিত করার ব্যর্থ প্রয়াস চালিয়েছেন।
একজন দুর্বল শাসকের পক্ষে এত বিশাল রাষ্ট্রের সাম্রাজ্যের সীমানা সংরক্ষণ ও রাজ্য সম্প্রসারণ সম্ভব হত না।

প্রাচ্যের রাজ্য জয়ের বিবরণ প্রদানের পর সিরিয়া ও মিসর সীমান্তে খিলাফাতের সীমানা সম্প্রসারণের বিবরণ উল্লেখ করা হবে।

---

৬২. আল-বালাযুরী, ৪৩২।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
সিরিয়ায় বিজয়াভিযান

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও প্রথম দু'খালীফার আমলে ইসলামী খিলাফাতের কোন নৌবাহিনী ছিল না। মুসলিম সেনাবাহিনী কোন নৌযুদ্ধেও অবতীর্ণ হয়নি। 'উসমান (রা.)-এর আমলে খিলাফাতের পশ্চিমমুখী সম্প্রসারণের স্বার্থে নৌবাহিনী গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অভিজ্ঞদের সাথে পরামর্শক্রমে খালীফা নৌবাহিনী গঠনের অনুমতি দেন। নবগঠিত বাহিনী যুদ্ধে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে। খিলাফাতের ইতিহাসে সর্বপ্রথম নৌবাহিনী গঠনের কৃতিত্ব মু'আবিয়া-এর এবং সাইপ্রাস অভিযানে প্রথমবারের মত মুসলিমরা নৌবাহিনী ব্যবহার করে।

এক. সাইপ্রাস অভিযান

ক. সিরিয়ার শাসনকর্তা মু'আবিয়ার (রা.) নৌযুদ্ধের অনুমতি প্রার্থনা: দ্বিতীয় খালীফা 'উমার (রা.)-এর আমলে মু'আবিয়া (রা.) সিরিয়ার শাসনকর্তা ছিলেন। সিরিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল রোমান সাম্রাজ্যের সীমান্তবর্তী ছিল। এই নৈকট্যের সুবিধা নিয়ে তিনি রোমান সাম্রাজ্যে অভিযান পরিচালনার স্বার্থে নৌযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। তিনি 'উমার (রা.)-কে লিখেন, 'আলেপ্পোর (সিরিয়ার একটি অঞ্চল) কোন কোন গ্রাম হতে রোমানদের কুকুরের চিৎকার ও মোরগের বাক শোনা যায় (আপনি আমাকে রোমান সীমানায় অভিযান পরিচালনার জন্য নৌবাহিনী গঠনের অনুমতি দিন)।' মু'আবিয়া (রা.)-এর বারংবার অনুরোধে 'উমার (রা.) এ বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান করলেন। মিসরের শাসক 'আমর ইবনুল 'আস (রা.)-কে তিনি লিখলেন, 'সমুদ্র ও সমুদ্রারোহী সম্পর্কে আমাকে জানাও, আমার মন ওদিকে ঝুঁকছে।' জবাবে 'আমর (রা.) লিখলেন, 'সাগর একটি মহাসৃষ্টি, খুব কম মানুষই এতে আরোহণ করে, সাগরের নিচে পানি আর ওপরে আকাশ, এছাড়া আর কিছুই নেই। সাগর যখন স্থির থাকে তখন হৃদয় বিদীর্ণ করে, আর যখন প্রকম্পিত হয় তখন বুদ্ধি বেঁকে যায়, সাগরে ইয়াকীন কমে যায় আর শোবা-সন্দেহ বেড়ে যায়, সাগরারোহীরা কাষ্ঠখণ্ডোপরি কীটের ন্যায়; হেলে পড়লে ডুবে যায় আর মুক্তি পেলে পেরেশান ও হয়রান হয়ে পড়ে।' 'আমর (রা.) হতে সমুদ্র সম্পর্কে অবহিত হয়ে 'উমার (রা.) মু'আবিয়াকে লিখলেন, 'না, তোমাকে সমুদ্রাভিযানের অনুমতি দেওয়া হলো না। আল্লাহর শপথ, আমি কখনো কোন মুসলিমকে সাগরে অভিযানে পাঠাব না। আল্লাহর শপথ, রোমের সমস্ত সম্পদের চাইতে একজন মুসলিম আমার কাছে অনেক

প্রিয়। তুমি এ ব্যাপারে আমাকে আর অনুরোধ করবে না। আমি এ বিষয়ে আর অগ্রসর হব না।'[৬৩]

রোমান সাম্রাজ্যের সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্য সম্পর্কে মু'আবিয়া (রা.) ওয়াকিফহাল ছিলেন। তাই তিনি তাঁর পরিকল্পনা হতে রোমান সাম্রাজ্যে অভিযানের বিষয়টি বাদ দিতে পারলেন না। 'উসমান (রা.) খালীফা নির্বাচিত হলে মু'আবিয়া (রা.) আবারো সমুদ্রাভিযানের অনুমতি প্রার্থনা করেন। এ বিষয়ে উমার (রা.)-এর সিদ্ধান্ত 'উসমান (রা.)-এর জানা ছিল। তাই তিনি প্রথমবার অনুমতি দেননি। কিন্তু মু'আবিয়া বারংবার পত্র লিখে সমুদ্রাভিযানের ব্যাপারে খালীফার মনকে প্রসন্ন করতে সক্ষম হন এবং শেষাবধি খালীফা 'উসমান (রা.) সাইপ্রাসে (যা রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল) অভিযান পরিচালনার শর্তসাপেক্ষে অনুমতি প্রদান করেন:

فإن ركبت البحر ومعك امرأتك فاركبه مأذونا لك وإلا فلا.

তুমি যদি সাগরারোহন করতেই চাও তবে সস্ত্রীক আরোহন কর, অন্যথায় নয়।[৬৪]

খ. সাইপ্রাস[৬৫] যুদ্ধ: মুসলিমদের জন্য সম্পূর্ণ নতুন এ অভিযানের জন্য মু'আবিয়া (রা.) সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। কিছু নৌযান প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র ও রসদসহ প্রস্তুত করা হয়। অভিযান শুরু করার জন্য আকা বন্দর বাছাই করা হয়। সামুদ্রিক জিহাদে অংশগ্রহণের জন্য নৌবাহিনীর সদস্যরা প্রস্তুতি সম্পন্ন করেন। মু'আবিয়া (রা.)-এর সাথে তাঁর স্ত্রী ফাখিতা বিনতু কারাযা অভিযানে অংশগ্রহণ করেন আর বিশিষ্ট সাহাবী 'উবাদাহ ইবনু সামিত (রা.)-এর সাথে তাঁর স্ত্রী উম্মু হারাম বিনতু মিলহান (রা.) এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।[৬৬]

---

৬৩. আত-তাবারী, ৪:২৫৮-৫৯; ইবনুল আসীর, ২:৩৮৮।

৬৪. আল-বালাযুরী, ১৫৩।

৬৫. ইবনু কাসীর সাইপ্রাসের নিম্নরূপ বিবরণ দিয়েছেন: সিরিয়ার পশ্চিম দিকে সাগরস্থিত একটি দেশ; সম্পূর্ণ পৃথক, দামিশক-সংলগ্ন তীরের দিকে সাইপ্রাসের সরু ভূ-খণ্ড প্রলম্বিত হয়েছে। এটির পশ্চিমাংশ সবচেয়ে প্রশস্ত। প্রাচুর্যে ভরা এই দ্বীপে প্রচুর ফল উৎপন্ন হয়। দেশটি খনিজ সম্পদে ঋদ্ধ। [ইবনু কাসীর, ৭: ১৫৩] বালাযুরী লিখেছেন, এটির আয়তন হল ৮০ বর্গ ফার্লং [আল-বালাযুরী, ১৫৩।]

৬৬. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দু'আ কবুল হওয়ার একটি নযির হল উম্মু হারাম বিনতু মিলহানের সাইপ্রাস যুদ্ধে অংশগ্রহণ ও শাহাদাতবরণ। আনাস (রা.)-এর খালা ও 'উবাদা ইবনু সামিত (রা.)-এর পত্নি উম্মু হারামের বাসায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কালেভদ্রে যেতেন এবং পানাহার করতেন। একদিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর বাসায় গিয়ে পানাহার করে ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুম থেকে জেগে তিনি হেসে ওঠলেন। উম্মু হারাম বললেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আপনি কেন হাসলেন? তিনি বললেন, 'স্বপ্নে আমি আমার উম্মাতের একদল যোদ্ধাকে দেখলাম, সিংহাসনে উপবিষ্ট রাজার ন্যায় তারা সাগর পাড়ি দিচ্ছে।' উম্মু হারাম (রা.) বললেন, 'আপনি দু'আ করুন, আমিও যেন সেই দলের অন্তর্ভুক্ত হই।' রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর জন্য দু'আ করে আবার ঘুমিয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর ঘুম থেকে জেগে আবার হেসে ওঠলেন। উম্মু হারাম (রা.) আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কেন হাসলেন?' রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 'স্বপ্নে আমি আমার উম্মাতের একদল যোদ্ধাকে দেখলাম, সিংহাসনে উপবিষ্ট রাজার ন্যায় তারা সাগর পাড়ি

২৮ হিজরীতে[৬৭] শীত মৌসুমের অবসানের পর কিছু নৌযান সমভিব্যহারে মুসলিম বাহিনী 'আকা বন্দর হতে সাইপ্রাসের উদ্দেশে রওয়ানা করলেন। রোমান দ্বীপটিতে পৌঁছার পর বাহিনীর সদস্যদের সাথে উম্মু হারাম (রা.)-ও তীরে অবতরণ করলেন। তিনি যখন বাহনে আরোহণ করতে গেলেন জন্তুটি তাকে ফেলে দিল এবং তাঁর ঘাড় ভেঙ্গে গেল। ঘটনাস্থলেই তিনি প্রাণ হারালেন। ঐ দ্বীপে উম্মু হারাম (রা.)-এর কবরটি দীন প্রচারে মুসলিমদের ত্যাগের স্মারক হিসেবে আজো বিদ্যমান। পরবর্তীতে ঐ স্থানটি নেককার রমণীর কবর হিসেবে পরিচিত হয়।[৬৮]

এ অভিযানে বেশ কয়েকজন সাহাবী অংশগ্রহণ করেন: আবূ আইউব খালিদ ইবনু যায়িদ আল-আনসারী (রা.), আবুদ্ দারদা (রা.), আবূ যার আল-গিফারী (রা.), 'উবাদাহ ইবনুস সামিত (রা.), তদীয় স্ত্রী উম্মু হারাম বিনতু মিলহান (রা.), ওয়াসিলা ইবনুল আসকা', 'আবদুল্লাহ ইবনু বিশর আল-মাযিনী, শাদ্দাদ ইবনু আওস ইবনু সাবিত, আল-মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ, কা'ব-আল-হিবর ইবনু মাতি', জুবাইর ইবনু নুফাইর আল-হাদরামী (রা.), ফুদালাহ ইবনু 'উবাইদ আল-আনসারী (রা.), 'উমাইর ইবনু সা'দ ইবনু 'উবাইদ আল-আনসারী প্রমুখ।[৬৯] সেনাপতি ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে পরামর্শক্রমে মু'আবিয়া (রা.) সরাসরি আক্রমণ না করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি দূত মারফত সাইপ্রাসবাসীদের জানালেন: (১) আমরা এখানে যুদ্ধ করতে আসিনি। (২) আমরা এসেছি আল্লাহর মনোনীত দীন ইসলামের সুমহান আদর্শের দিকে আহ্বান জানানোর জন্য। (৩) ইসলামী সাম্রাজ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ সিরিয়ার সীমান্তের নিরাপত্তার জন্যও এ অভিযান পরিচালনার প্রয়োজন হয়েছে। কারণ রোমানরা সাইপ্রাসকে ঘাঁটি বানিয়ে সিরিয়া সীমান্তে অব্যাহতভাবে হামলা চালাচ্ছে। এসব অভিযানের জন্য তারা সাইপ্রাস থেকে সৈন্যও সংগ্রহ করে। তোমরা আত্মসমর্পণ করলে আমরা কোন অভিযান পরিচালনা করব না।'

মুসলিমদের এই আহ্বানে সাইপ্রাসবাসী সাড়া দিল না। তারা রোমান সহায়তার প্রতীক্ষায় ছিল, তাদের ধারণা ছিল রোমানরা তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে এবং মুসলিমদেরকে দ্বীপ থেকে বিতাড়িত করবে।

দিচ্ছে। তোমাকে ঐ দলের সামনের কাতারে দেখতে পেলাম।' উম্মু হারাম (রা.), মু'আবিয়া (রা.)-এর সাথে সাইপ্রাসের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং নৌযান থেকে নামার পর বাহনের পিঠে আরোহন করার সময় পড়ে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেন। [সহীহুল বুখারী, নং ২৮৭৭] অন্যান্য সকল ঐতিহাসিকের বিপরীতে ইবনু কাসীর লিখেছেন, উম্মু হারাম সাইপ্রাস হতে ফেরার পথে মারা যান [ইবন কাসীর ৭:১৫৩]।

৬৭. কোন কোন চরিতকার বলেন, সাইপ্রাস যুদ্ধ ২৭ হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিল। আবূ মি'শারের মতে এটি ৩৩ হিজরীর ঘটনা। তবে বিশুদ্ধ মতে সাইপ্রাস অভিযান ২৮ হিজরীতে পরিচালিত হয়েছিল। সাইপ্রিয়টরা বিদ্রোহ করলে ৩৩ হিজরীতে আরেকটি অভিযান পরিচালিত হয়েছিল। ইবনুল আসীর, ২: ৩৮৮।

৬৮. ইবনু কাসীর, ৭:১৫৯।

৬৯. আল-বারাযুরী, ১৫৪; আত-তাবারী, ৪: ২৫৮; ইবনুল আসীর, ২:৩৮৮।

গ. আত্মসমর্পণ ও সন্ধির আবেদন: সাইপ্রাসবাসীর কাছ থেকে ইতিবাচক সাড়া না আসায় মুসলিম বাহিনী দ্বীপটির রাজধানী অবরোধ করল। কয়েক ঘন্টার মধ্যেই দ্বীপবাসী আত্মসমর্পণ করে সন্ধির প্রস্তাব দিল। মুসলিম বাহিনী সন্ধি প্রস্তাব মেনে নিল। সাইপ্রাসবাসীর শর্ত ছিল তাদেরকে যেন রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সম্পৃক্ত না করা হয়; কারণ রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সামর্থ তাদের ছিল না। মুসলিম বাহিনী এই শর্ত মেনে নেয়। মুসলিমদের শর্তগুলোও দ্বীপবাসী মেনে নেয়:[৭০]

দ্বীপবাসী অস্ত্রধারণ করলে মুসলিমরা তাদেরকে নিরাপত্তা দেবে না;
রোমানদের তৎপরতা সম্পর্কে মুসলিমদেরকে অবহিত করতে হবে;
ফি বছর দ্বীপবাসী ৭০০০ দীনার মুসলিমদেরকে প্রদান করবে;
শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় মুসলিম বাহিনীকে সাইপ্রাসের ভূমি ব্যবহার করতে দিতে হবে;
রোমানরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলে দ্বীপবাসী তাদেরকে সাহায্য করতে পারবে না এবং মুসলিম বাহিনী সম্পর্কিত কোন তথ্যও সরবরাহ করতে পারবে না।

সন্ধিচুক্তির পর মুসলিম বাহিনী সিরিয়ায় ফিরে গেল। খিলাফাহ-এর ইতিহাসে প্রথম সমুদ্রাভিযান ও নৌযুদ্ধে মুসলিম বাহিনী সফলতা লাভ করল। এ অভিযান মুসলিমদের সাফল্য ও সক্ষমতার স্মারক হয়ে রইল। পরবর্তী প্রতিটি সমুদ্রাভিযান ও নৌযুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর সাফল্যের অনুপ্রেরণা হিসেবে এই অভিযান ভূমিকা পালন করেছে।

ঘ. সাইপ্রাসবাসীর প্রতারণা: চুক্তি পালনের শর্তে সাইপ্রাসবাসীদেরকে স্বশাসনের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। মু'আবিয়া (রা.) সেখানে কোন শাসনকর্তা নিয়োগ করেননি। ওদিকে মুসলিমরা চলে আসার পর রোমানরা দ্বীপবাসীকে ইসলামী খিলাফাতের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের জন্য উস্কানি দিতে লাগল। ৩২ হিজরীতে সাইপ্রাসবাসী চুক্তি শর্ত ভঙ্গ করে রোমান বাহিনীকে নৌযান সরবরাহ করে সহায়তা করল। তাদের এহেন আচরণে মু'আবিয়া (রা.) খুবই ক্ষুব্ধ হলেন। এবার তিনি সাঁড়াশি আক্রমণ চালালেন; একদিকে মু'আবিয়া (রা.) ও অন্যদিকে 'আবদুল্লাহ ইবনু সা'দ-এর নেতৃত্বে অভিযান পরিচালিত হয়। বিপুল সংখ্যক দ্বীপবাসী নিহত হল, অনেকে বন্দী হল। সাইপ্রাসের শাসনকর্তা আত্মসমর্পণ করে সন্ধি প্রার্থনা করলেন। পূর্ববর্তী চুক্তির শর্তের ভিত্তিতে মু'আবিয়া (রা.) প্রস্তাব মেনে নিলেন।[৭১] তবে এবার তিনি সতকর্তামূলক কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন: (১) সাইপ্রাসে ১২০০০ সদস্যের একটি বাহিনী মোতায়েন করলেন, এ বাহিনীতে বা'আলবাক্ক হতে অনেক সৈনিক যোগদান করেছিল। (২) একটি শহর ও মাসজিদ স্থাপন করলেন।[৭২]

---

৭০. আত-তাবারী, ৪:২৬২।
৭১. আল-বালাযুরী, ১৫৮।
৭২. প্রাগুক্ত।

মুসলিম বাহিনী অনুভব করল, সাইপ্রিয়টরা শান্তিপ্রিয় জনগোষ্ঠী, তাদের সামরিক সামর্থ্যও সীমিত। তবে রোমানরা জোর করে তাদেরকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে। মুসলিম বাহিনী তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করল এবং রোমানদের আক্রমণ-অত্যাচার হতে তাদেরকে রক্ষা করল।

সিরিয়ায় ফিরে গিয়ে মু'আবিয়া (রা.), উবাদাহ ইবনু সামিত (রা.)-কে গানীমতের সম্পদ বন্টনের দায়িত্ব দেন। তিনি আবুদ দারদা ও আবূ উমামাহ (রা.)-এর সহযোগিতায় শারী'আহসিদ্ধ উপায়ে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ ভাগ-বাটোয়ারা করেন।

দুই. হাবীব ইবনু মাসলামা আল-ফিহরী'র বিজয়াভিযান:

হাবীব ইবনু মাসলামা আল-ফিহরী ছিলেন মুসলিম বাহিনীর সিরিয়া ব্রিগেডের সেনাপতি। 'উসমান (রা.)-এর খিলাফাতকালে তাঁর সেনাপতিত্বে সিরিয়া সীমান্তে অনেকগুলো সফল অভিযান পরিচালিত হয়, যার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হল:

ক. কূফা ও সিরিয়া বাহিনীর যৌথ প্রতিরোধে রোমান আগ্রাসন প্রতিহত: ২৪ হিজরীতে রোমানরা সিরিয়া সীমান্তে মুসলিম এলাকায় অভিযান পরিচালনার জন্য এগিয়ে আসে। মু'আবিয়া (রা.) সেনাপতি হাবীব ইবনু মাসলামা আল-ফিহরীর নেতৃত্বে সিরিয়ার বাহিনীকে রোমানদের প্রতিরোধে প্রেরণ করেন। কিন্তু তাঁর কাছে মুসলিম সৈন্য সংখ্যা অপ্রতুল মনে হওয়ায় তিনি খালীফার কাছে অতিরিক্ত ফৌজ চেয়ে পত্র লিখেন। খালীফা কূফার সেনাপতি আল-ওয়ালীদকে সিরিয়া বাহিনীর সহায়তায় দ্রুত সৈন্য প্রেরণের নির্দেশ দেন। আল-ওয়ালীদ আট হাজার সৈনিক সমভিব্যহারে কূফার একটি দল সেনাপতি সালমান ইবনু রাবী'আহ আল-বাহিলীর নেতৃত্বে সিরিয়দের সহায়তার জন্য প্রেরণ করেন। হাবীব ও সালমানের নেতৃত্বাধীন সিরিয়া ও কূফার মুসলিম বাহিনী শত্রুদের পর্যুদস্ত করে রোমান ভূমিতে আক্রমণ হানে। যৌথ বাহিনী বিপুল বিজয় অর্জন করে; অভিযানে বহু দুর্গ বিজিত হয়, মুসলিম বাহিনী প্রচুর যুদ্ধলব্ধ সম্পদসহ প্রত্যাবর্তন করে।[৭৩]

খ. ২৫ হিজরীতে হাবীব ইবনু মাসলামার বিজয়াভিযান: ২৫ হিজরীতে খালীফা 'উসমান (রা.) সিরিয়ার গভর্ণর মু'আবিয়া (রা.)-কে নির্দেশ দেন তিনি যেন সেনাপতি হাবীব ইবনু মাসলামাকে আর্মেনিয়া অভিযানে প্রেরণ করেন। নির্দেশ মুতাবিক হাবীবকে আর্মেনিয়া অভিযানে প্রেরণ করা হয়। এই অভিযানের যেসব অঞ্চল বিজিত হয় তার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হল:

কালীকালা[৭৪]**:** সেনাপতি হাবীব সর্বপ্রথমে কালীকালা অবরোধ করেন, কিছুদিন পর স্থানীয়রা দেশত্যাগ বা জিযইয়ার বিনিময়ে নিরাপত্তা কামনা করে। তাদের আবেদন

---

৭৩. আত-তাবারী, ৪:২৪৭-৪৮; ইবন কাসীর, ৭:১৫০; ইবনুল আসীর, ২:৩৭৯-৮০।

৭৪. আর্মিনাকূস শহরের খৃস্টান বিশপের স্ত্রীর নাম ছিল কালী; তার নির্দেশে কালীকালা শহরটি নির্মিত হয়। শব্দটির অর্থ হল কালী-এর অনুগ্রহ। [ইবনুল আসীর, ২:৩৮০।]

মেনে নেওয়া হয় এবং চুক্তি মুতাবিক অনেককে রোমান এলাকায় বহিষ্কার করা হয়। কালীকালায় কয়েক মাস অবস্থান করে হাবীব প্রত্যাবর্তন করেন।[৭৫]

আর্মিনাকুস: সিরিয়া সীমান্তের একটি রোমান প্রদেশের নাম ছিল আর্মিনাকুস। এই প্রদেশের আওতায় অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ এলাকা ছিল, যেমন মালাতইয়া, সীওয়াস, কূনিয়া ইত্যাদি। এই প্রদেশের খৃস্টান প্রধানের নাম ছিল মাওরিয়ান। কালীকালা বিজয়ের পর মুসলিম সেনাপতি হাবীব ইবনু মাসলামা আল-ফিহরী শুনতে পেলেন যে, মাওরিয়ান ৮০,০০০ সৈন্যের এক রোমান বাহিনী সিরিয়া সীমান্তে প্রেরণ করছেন। সংবাদ পেয়ে হাবীব অতিরিক্ত ফৌজ চেয়ে মু'আবিয়ার কাছে পত্র লেখেন। মু'আবিয়া (রা.) খালীফার কাছে সাহায্যের আবেদন করলে তিনি কূফা হতে ছয় হাজার সৈন্যসহ সালমান ইবনু রাবী'আহ আল-বাহিলীকে প্রেরণ করেন। হাবীব রাতে আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিলেন। বিষয়টি তাঁর স্ত্রী উম্মু আবদিল্লাহ বিনতু ইয়াযিদ আল-কালবিয়্যা শুনে ফেললেন। স্বামীকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'রাতে আপনার ঠিকানা কোথায়?' হাবীব বললেন, 'মাওরিয়ানের তাঁবু।' সেই রাতে হাবীব অভিযানে বের হয়ে সামনে যাদেরকে পেলেন তাদেরকে হত্যা করে মাওরিয়ানের তাঁবুতে পৌঁছলেন। দেখলেন, তথায় পূর্ব থেকেই তাঁর স্ত্রী এসে উপস্থিত। তিনিই হলেন প্রথম আরব রমণী যার জন্য পর্দাঘেরা তাঁবু স্থাপন করা হয়। তাঁকে রেখে হাবীব মারা গেলে আদ-দাহহাক ইবনু কায়স তাঁকে বিয়ে করেন।

সীমান্তবর্তী বিভিন্ন অঞ্চল জয়: আর্মিনাকুসের রোমান বাহিনীকে পরাজয় উপহার দেওয়ার পর হাবীব কালীকালায় ফিরে এলেন। তারপর তিনি রওয়ানা করলেন, পথিমধ্যে তিনি মারবাল-এ অবতরণ করলে খালাত-এর খৃস্টান শাসক একটি চুক্তিপত্র নিয়ে উপস্থিত হলেন। পূর্ববর্তী মুসলিম সেনাপতি 'ইয়াজ ইবনু গান্‌ম এই নিরাপত্তাজ্ঞাপক পত্রটি তাদেরকে দিয়েছিলেন। পুরনো চুক্তিটি বহাল রাখলেন হাবীব। তারপর তিনি মুক্‌স অতিক্রম করে আজদিশাতে পৌঁছলেন। দাবীল নদীর তীরে অবতরণ করে তিনি গ্রামটি (আজদিশাত) ঘিরে ফেলেন। দুর্গে অবস্থান করে স্থানীয়রা প্রতিরোধ চালিয়ে যায়। এক পর্যায়ে হাবীব মিনজানিক দাগিয়ে পাথর ছুঁড়লে দুর্গবাসী সন্ধি প্রার্থনা করে। তাদের অনুরোধ মেনে নেওয়া হয়। তারপর হাবীব চারপাশের এলাকায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাহিনী প্রেরণ করেন। অতঃপর অশ্ব চালিয়ে তিনি 'যাত আল-লুজুম'-এ পৌঁছলেন। সেখান থেকে সিরাজতাইর ও বাগরাওয়ান্দে ক্ষুদ্র বাহিনী প্রেরণ করেন। দুই এলাকার শাসকই করের বিনিময়ে সন্ধি করেন। ওদিকে বুসফুর্‌রাজানের খৃস্টান শাসক স্বেচ্ছায় হাবীরের কাছে এসে তার শাসনাধীন সমগ্র এলাকার জন্য শান্তিচুক্তি করেন।

তারপর হাবীব সীসাজান এলে স্থানীয়দের প্রতিরোধের সম্মুখীন হন। বাধ্য হয়ে তিনি অস্ত্রধারণ করেন এবং তাদের দুর্গগুলো দখল করে জুরযানের দিকে এগিয়ে যান।

---

৭৫. ইবনুল আসীর, ২:৩৮০।

মুসলিম বাহিনীর অগ্রযাত্রা দেখে জুরযানের খৃস্টান শাসক সন্ধিচুক্তি করেন। তারপর হাবীব তিফলিসসহ আশেপাশের অনেকগুলো এলাকা ও দুর্গ জয় করে ফিরে যান।[৭৬]

তিন. সিরিয়া সীমান্তের অন্যান্য বিজয়ঃ

উপর্যুক্ত বিজয়াভিযানগুলো ছাড়াও সিরিয়া সীমান্তে আরো কিছু অভিযানের বিবরণ ইতিহাসের গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায়, নিম্নে সেগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপস্থাপন করা হলোঃ

মু'আবিয়ার (রা.) গাযওয়া সায়িফাঃ গ্রীষ্মকালকে আরবীতে *সায়ফ* বলে। প্রতি গ্রীষ্মে মু'আবিয়া (রা.) রোমান ভূখণ্ডে সামরিক অভিযান পরিচালনা করতেন। গ্রীষ্মকালীন অভিযান বলে এগুলোকে *গাযওয়া সায়িফা* বলা হয়।[৭৭] এসব অভিযানের মূল্য উদ্দেশ্য রাজ্যবিজয় ছিল না। এগুলোর মাধ্যমে মুসলিমদের শক্তি প্রদর্শনের পাশাপাশি শত্রুদেরকে আতঙ্কিত রেখে সীমানা সুরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা করা হত। নিম্নে মু'আবিয়া (রা.)-এর কয়েকটি গাযওয়া সায়িফা'র বিবরণ প্রদত্ত হল।

আম্মুরিয়া অভিযানঃ ২৫ হিজরীর গ্রীষ্মে মু'আবিয়া (রা.) রোমান ভূখণ্ডে অভিযান পরিচালনা করে আম্মুরিয়ায় পৌঁছেন। আন্তাকিয়া ও তারসূসের মধ্যবর্তী দুর্গগুলোকে তিনি খালি দেখতে পান। তথায় সিরিয়া ও জাযীরার কিছু বাসিন্দার বসতি স্থাপনের ব্যবস্থা করে তিনি ফিরে যান। পরবর্তী সায়িফায় (অর্থাৎ ২৬ হিজরীর গ্রীষ্মে) ইয়াজিদ ইবনুল হুর্‌র আল-'আবসী অভিযান চালিয়ে আন্তাকিয়া পর্যন্ত দুর্গগুলো ধ্বংস করেন।

কিন্নাসরিনঃ ২৭ হিজরীর গ্রীষ্মে মু'আবিয়া কিন্নাসরিনে অভিযান পরিচালনা করেন।[৭৮]

সুরায়াঃ ২৮ হিজরীর গ্রীষ্মে হাবীব রোমান ভূখণ্ডে সুরায়া নামক অঞ্চলে অভিযান পরিচালনা করেন।[৭৯]

প্রণালী অভিযানঃ ৩২ হিজরীর গ্রীষ্মে মু'আবিয়া কনস্ট্যান্টিনোপল প্রণালীতে অভিযান চালান। এই অভিযানে তাঁর সাথে তাঁর স্ত্রী ফাখিতা (বা 'আতিকা) বিনতু কারাযা অংশগ্রহণ করেছিলেন।[৮০]

আল-মারাহ্‌ দুর্গে অভিযানঃ ৩৩ হিজরীর গ্রীষ্মে মু'আবিয়া রোমান ভূখণ্ডে মালাইতালা ও আল-মারাহ্‌ দুর্গে অভিযান চালান।[৮১]

---

৭৬. প্রাগুক্ত।
৭৭. ইবনু কাসীর, ৭:১৫৭।
৭৮. আত-তাবারী, ৪:২৫৭; ইবনুল আসীর, ২:৩৮৭; ইবন কাসীর, ৭:১৫২।
৭৯. আত-তাবারী, ৪:২৬৩; ইবনুল আসীর, ২:৩৮৯।
৮০. আত-তাবারী, ৪:৩০৪; ইবনুল আসীর, ২:৪১৪; আয-যাহাবী, ৩: ১১৩।
৮১. আয-যাহাবী, ৩:১১৩; আত-তাবারী, ৪:৩১৭।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মিসর সীমান্তে বিজয়াভিযান

এক. আলেকজান্দ্রিয়ার বিদ্রোহ দমন (২৫ হিজরী):

দ্বিতীয় খালীফা 'উমার (রা.)-এর আমলে মিসরের রোমান রাজধানী আলেকজান্দ্রিয়া মুসলিমদের হস্তগত হয়। তবে মুসলিমরা ঐ শহরে বসবাসরত রোমানদেরকে বহিষ্কার করেননি। তাছাড়া বিপুল সংখ্যক মুসলিমও আলেকজান্দ্রিয়ায় হিজরাত করেননি। কেবল সীমান্ত পাহারার দায়িত্বে ছিল কিছু মুসলিম সৈনিক। ফলে শহরটিতে অনারব-অমুসলিম নাগরিকের আধিক্য ছিল। অপরদিকে 'উসমান (রা.) মিসরের শাসনকর্তার পদে পরিবর্তন আনেন: তিনি 'আমর ইবনুল 'আস (রা.)-এর পরিবর্তে 'আবদুল্লাহ ইবনু সা'দ ইবনু আবি সারহ-কে মিসরের শাসক নিয়োগ করেন। আলেকজান্দ্রিয়ায় বসবাসরত রোমানরা এটিকে মুসলিমদের দুর্বলতা হিসেবে চিহ্নিত করে রোমান সম্রাট কন্সট্যান্টাইনকে হৃত সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারে উস্কানি দিতে থাকে। এদের আবেদনে সাড়া দিয়ে রোমান সম্রাট সেনাপতি মানাভীলের নেতৃত্বে ৩০০ রণতরী সজ্জিত একটি বিরাট বাহিনী আলেকজান্দ্রিয়া পুনরুদ্ধারের মিশনে প্রেরণ করেন। আলেকজান্দ্রিয়ার খৃস্টান শাসক মুকাউকিস অবশ্য চুক্তি ভঙ্গ করেননি, মুসলিমদের বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি।[৮২]

রোমানদের প্রস্তুতির খবর পেয়ে মিসরের মুসলিমরা খালীফা 'উসমান (রা.)-কে পরিস্থিতি অবহিত করে পত্র দিল। তারা মনে করল আমর ইবনুল 'আস (রা.)-কে পুনরায় শাসক নিয়োগ করা দরকার; কারণ রোমানদের যুদ্ধকৌশল সম্পর্কে তিনি সবচেয়ে বেশি ওয়াকিফহাল। খালীফা তাদের অনুরোধে সম্মত হয়ে 'আমরকে পুনরায় মিসরে প্রেরণ করলেন। রোমান সেনাপতি মানাভীল আলেকজান্দ্রিয়ায় লুটপাটের মাধ্যমে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে নিম্ন মিসরের (Lower Egypt) দিকে রওয়ানা করল। মানাভীলকে পশ্চাদ্ধাবনের পরামর্শ দিলেন সহযোদ্ধারা; কিন্তু আমর (রা.)-এর মস্তিষ্কে ছিল ভিন্নচিন্তা; তিনি মানাভীলের লাগাম ছেড়ে দিলেন, তাকে ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর সুযোগ দিলেন। প্রকারান্তরে তিনি মিসরবাসীকে বিচারমূলক তুলনার সুযোগ দিলেন। মিসরবাসী যেন রোমান খৃস্টান ও মুসলিম শাসনের মাঝে তফাৎ উপলব্ধির প্রত্যক্ষ সুযোগ পায়, সে লক্ষ্যে 'আমর ইবনুল 'আস (রা.) মানাভীলকে একটু সুযোগ দিলেন।

মানাভীল বিনা বাধায় নিম্ন মিসরের দিকে এগিয়ে গেল; নাকয়ূস শহরে পৌঁছে

---

৮২. ইবনুল আসীর, ২:৩৭৮; আল-বালাযুরী, ২২১-২২২।

তার বাহিনী ব্যাপক লুটতরাজ ও ধ্বংসধজ্ঞ চালাল। ইতোমধ্যে 'আমর (রা.)-এর সেনাপতিত্বে মুসলিম বাহিনী এগিয়ে গেল, নগর প্রাচীরের বাইরে নীল নদের তীরে দু'বাহিনীর মাঝে প্রচণ্ড যুদ্ধ বেঁধে গেল। দূর হতে সেনাবাহিনী পরিচালনার পরিবর্তে 'আমর (রা.) এ যুদ্ধে নিজেই ময়দানে নেমে পড়েন। এক পর্যায়ে তার অশ্ব শরাহত হলে তিনি বাহন ছেড়ে দিয়ে পদাতিক বাহিনীতে ঢুকে পড়েন। তীব্র লড়াইয়ের পর রোমান বাহিনী পরাজিত হল, বিপুল সংখ্যক রোমান সৈনিক নিহত হল। অবশিষ্ট সৈনিক নিয়ে মানাভীল নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে আলেকজান্দ্রিয়া অভিমুখে রওয়ানা করল।

যুদ্ধ শেষে মুসলিমরা জরুরী কিছু সংস্কার কাজ সম্পন্ন করল। রোমানরা পলায়ন-পথে রাস্তাঘাট ও পুল-ব্রিজ ধ্বংস করে দিয়েছিল। মুসলিম বাহিনী বিধ্বস্ত অবকাঠামো জরুরী ভিত্তিতে সংস্কার করল। এই কাজে তারা মিসরীয়দের সমর্থন ও সহযোগিতা লাভ করল। স্থানীয়রা মুসলিম বাহিনীকে প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র ও রসদ সরবরাহ করল।

আলেকজান্দ্রিয়ায় পৌঁছে মুসলিম বাহিনী শহর অবরোধ করে মিনজানিক দিয়ে হামলা শুরু করল। কয়েকদিন প্রতিরোধের পর স্থানীয়রা নগরদ্বার খুলে দিতে বাধ্য হল। শহরের অভ্যন্তরে দু'বাহিনীর মাঝে তীব্র লড়াই চলল কয়েকদিন। মানাভীলসহ বহু সংখ্যক খৃস্টান সৈন্য নিহত হল, অনেকে পালিয়ে গেল। শহরের কেন্দ্রস্থলে পৌঁছে আর কোন প্রতিরোধ আসছে না দেখে 'আমর (রা.) যুদ্ধ থামাতে বললেন। যুদ্ধ বন্ধ হওয়ার স্থানে মুসলিমরা 'মাসজিদুর রাহমাহ' নামে একটি মাসজিদ নির্মাণ করল। 'আমর ইবনুল 'আস (রা.) অবকাঠামো পুনঃনির্মাণে মনোযোগ দিলেন। আলেকজান্দ্রিয়ায় শান্তি ফিরে এল; কপটিক খ্রস্টান বিশপ বেঞ্জামিন পলায়ন করেছিলেন; ফিরে এসে তিনি জানালেন, শহরের খৃস্টানরা চুক্তিভঙ্গ করেনি; অতএব তাদেরকে নিরাপত্তা দেয়া হয় এবং নিরাপদে ধর্মকর্ম পালনের সুযোগ দেওয়া হয়। চুক্তি মেনে চলার শর্তে 'আমর (রা.) তাদেরকে নিরাপত্তা প্রদান করলেন।

দলে দলে মিসরীয়রা এসে 'আমর (রা.)-এর কাছে অভিযোগ করল, রোমানরা তাদের গবাদিপশু থেকে শুরু করে সবকিছু লুট করেছে, তাদের লুণ্ঠিত সম্পদ যেন ফেরত দেওয়া হয়। 'আমর (রা.) এদের অনুরোধ রাখলেন, রোমানদের ফেলে যাওয়া সম্পদ প্রমাণসাপেক্ষে মিসরীয় মালিকদের কাছে ফেরত দিলেন। এটি মুসলিমদের পরম ঔদার্যের দৃষ্টান্ত; শত্রুদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি গানীমাতের সম্পদ হিসেবে পরিগণিত হয় এবং তা নিয়মানুসারে যোদ্ধাদের মাঝে বণ্টন করা হয়। মাযলুম মিসরীয়দের অনুরোধের প্রেক্ষিতে 'আমর (রা.) দখলদার রোমান বাহিনীর পরিত্যক্ত সম্পদ মালে-গানীমাত হিসেবে বণ্টন না করে প্রকৃত মালিকদের কাছে ফিরিয়ে দিলেন।.

'আমর (রা.) আলেকজান্দ্রিয়ার নগর প্রাচীর ভেঙ্গে ফেললেন। এতদসত্ত্বেও শহরে শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজ করল। প্রদেশের পূর্ব ও দক্ষিণ অংশ মুসলিমদের দখলে

ছিল। বারকাহ, যুওয়াইলাহ ও পশ্চিম ত্রিপলিসহ আলেকজান্দ্রিয়ার পশ্চিম অংশ জিযইয়াহ্ প্রদানের বিনিময়ে শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করেছিল। রোমানদের মেরুদণ্ড এমনভাবে ভেঙ্গে দেয়া হয়েছিল যে মিসরের উত্তর অংশ তাদের দখলে থাকলেও তারা কখনো পুনরাক্রমণের দুঃসাহস দেখাল না। মুসলিম বাহিনী তটরেখা বরাবর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখল।[৮৩]

দুই. নুবা (সুদান) বিজয়:

দ্বিতীয় খালীফা 'উমার (রা.)-এর অনুমতি সাপেক্ষে মিসর-শাসক 'আমর ইবনুল 'আস (রা.) নুবা নামক রাজ্যে অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। তবে এই অভিযানে মুসলিমরা সুবিধা করতে পারেননি। নুবা-এর কৃষ্ণাঙ্গ যোদ্ধাদের কাছ থেকে তারা তীব্র প্রতিরোধের সম্মুখীন হন। মুসলিমরা অভিনব এক যুদ্ধকৌশলের কাছে পরাস্ত হন। নুবার কালো যোদ্ধা তীর নিক্ষেপে খুবই দক্ষ ছিল। তারা মুসলিম মুজাহিদদের চোখ লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করতে থাকে। প্রথম যুদ্ধেই কমপক্ষে ১৫০ জন মুসলিম যোদ্ধা চোখ হারান। বাধ্য হয়ে 'আমর (রা.) নুবা-এর অধিবাসীদের সাথে সন্ধি করেন। পরবর্তীতে সন্ধির শর্তের ব্যাপারে মতভেদ সৃষ্টি হওয়ায় 'আমর (রা.) সন্ধি বাতিল করেন। তবে তিনি নতুন করে কোন অভিযান পরিচালনা করেননি।

মিসরের শাসক হিসেবে নিয়োগ লাভের পর 'আবদুল্লাহ ইবনু সা'দ ৩১ হিজরীতে আবার নুবা'য় অভিযান পরিচালনা করেন। এই যুদ্ধেও বিপুল সংখ্যক মুসলিম যোদ্ধা চোখ হারান।[৮৪] তীব্র লড়াইয়ের পর নুবা'র অধিবাসীরা সন্ধির প্রস্তাব দেয়। প্রস্তাব মেনে নিয়ে ইবনু সা'দ তাদের সাথে সন্ধি করেন যা ছয় শতাব্দী স্থায়ী ছিল। খিলাফাতের ইতিহাসে বিরল এই চুক্তিটি কর বা জিযইয়ার বিনিময়ে সম্পাদিত হয়নি। নুবা বা সুদান ছিল মরুময় এলাকা; সেখানে শস্য উৎপাদন হত না বললেই চলে। ফলে কর হিসেবে নগদ অর্থ বা শস্য প্রদান তাদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব ছিল। পক্ষান্তরে দারিদ্রের কারণে সেখানে দাস কেনাবেচা হত। অভিভাবকরা স্বেচ্ছায় নিজেদের সন্তান-সন্ততিকে বিক্রি করে দিত। মুসলিমদের সাথে সম্পাদিত চুক্তিতে এই বাস্তবতার প্রতিফলন ছিল। চুক্তির শর্ত ছিল এই: প্রতি বছর নুবাবাসী ৩০০ (বা ৪০০) দাস প্রদান করবে, বিনিময়ে মুসলিমরা (সমমূল্যের) গম ও যবসহ প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য সরবরাহ করবে। পাশাপাশি নুবা'র অধিবাসীদের স্বাধীনতা মেনে নেওয়া হয় এবং মুসলিমদের অবাধ যাতায়াত ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ স্বীকার করা হয়। এই চুক্তি নুবা'য় ইসলাম প্রচারের বিরাট সুযোগ এনে দেয়; মুসলিমদের সাহচর্যে বিপুল সংখ্যক নুবাবাসী ইসলাম গ্রহণ করেন।[৮৫]

---

৮৩. আত-তাবারী, ৪:২৫০; ইবনুল আসীর ২:৩৭৮; ইবন কাসীর, ৭:১৫১; আল-বালাযুরী, ২২১-২২; আয-যাহাবী, ৩:১০৫।
৮৪. নুবা'র যুদ্ধে চোখ হারানো মুসলিম যোদ্ধাদের একজন হলেন মু'আবিয়া ইবন হুদাইজ। [আয-যাহাবী, ৩:১১৩।]
৮৫. আল-বালাযুরী, ২৩৭-৩৮; আয-যাহাবী, ৩:১১৩।

তিন. আফ্রিকা[৮৬] বিজয় (২৭ হিজরী):

মিসর-গভর্ণর 'আমর ইবনুল 'আস (রা.) আফ্রিকা বিজয়ের সূচনা করেছিলেন; আলেকজান্দ্রিয়ার রোমান বিদ্রোহ দমনের পরই তিনি বারকাহ, যুওয়াইলাহ ও পশ্চিম ত্রিপলিসহ উত্তর আফ্রিকার কিছু অংশ বিজয় করেছিলেন। 'আবদুল্লাহ ইবনু সা'দ ইবনু আবি সারাহ মিসরের শাসনকর্তা নিযুক্ত হওয়ার পর আফ্রিকা সীমান্তে ক্ষুদ্র অশ্বারোহী বাহিনী প্রেরণ করতেন; ক্ষুদ্র অভিযানসমূহ সাফল্যের সাথে প্রত্যাবর্তন করত। প্রতিবারই গানীমাত অর্জিত হত এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এলাকা বিজিত হত।

আফ্রিকার মানবসম্পদ, প্রাকৃতিক সম্পদ, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাসহ বিভিন্ন বিষয়ে সবিস্তারে সংবাদ সংগ্রহের পর 'আবদুল্লাহ ইবনু সা'দ আফ্রিকায় বড় অভিযান পরিচালনার অনুমতি চেয়ে 'উসমান (রা.)-এর কাছে লিখলেন। খালীফা 'উসমান (রা.) নেতৃস্থানীয় সাহাবায়ে কিরামের সাথে পরামর্শ করলেন; দুয়েকজন ছাড়া বেশির ভাগ সাহাবী অভিযানের পক্ষে মত দিলেন। আফ্রিকা অভিযানের পক্ষে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর 'উসমান (রা.) জিহাদের অংশগ্রহণের জন্য উদাত্ত আহ্বান জানালেন। বিপুল সংখ্যক মুজাহিদ খালীফার ডাকে সাড়া দিলেন। অল্প সময়ের মাঝেই খিলাফাতের রাজধানী মাদীনাতেই বিশাল স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী প্রস্তুত হল। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মাঝে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দু'দৌহিত্র আল-হাসান ও আল-হুসাইন, মা'বাদ ইবনু 'আব্বাস ও মারওয়ান ইবনুল হাকাম ইবনু আবিল আস, আল-হারিস ইবনুল হাকাম, মিসওয়ার ইবনু মাখরামা, আবদুর রহমান ইবনু যায়িদ ইবনিল খাত্তাব, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.), 'আসিম ইবনু 'উমার, 'উবাইদুল্লাহ ইবনু 'উমার, আবদুর রহমান ইবনু আবি বাকর, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর ইবনিল 'আস, বুসর ইবনু আবি আরতাহ, আবূ যুওয়াইব খুওয়াইলিদ ইবনু খালিদ (কবি) ও ইবনু জাফর প্রমুখ সেনাবাহিনীতে যোগ দিলেন। বনূ মাহরা হতে ৬০০, বানূ গানাছ হতে ৭০০ ও বানূ মায়দা'আন হতে ৭০০ যোদ্ধা প্রস্তুত হলেন। 'উসমান নিজেও যুদ্ধ প্রস্তুতিতে অংশগ্রহণ করলেন; তিনি এক সহস্র উট দিলেন। রওয়ানা করার প্রাক্কালে খালীফা সৈনিকদের উদ্দেশ্যে উদ্দীপক ভাষণ দিলেন। আল-হারিছ ইবনুল হাকামকে সেনাপতি নিয়োগ করা হল, যাঁর নেতৃত্বে মাদীনার বাহিনী মিসরে গিয়ে 'আবদুল্লাহ ইবনু সা'দ-এর সেনাবাহিনীর সাথে যোগ দেবে।

মাদীনার বাহিনী মিসরীয় বাহিনীর সাথে যোগ দিল; যৌথ বাহিনী 'আবদুল্লাহ ইবনু সা'দ-এর নেতৃত্বে ফুসতাত হতে বের হয়ে মিসর ও লিবিয়া সীমানা ধরে এগিয়ে

---

৮৬. এখানে আফ্রিকা বলতে সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশকে বুঝানো হয়নি। সেকালে আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চল ও মধ্যাঞ্চল সম্পর্কে মুসলিমদের খুব একটা জানাশোনা ছিল না। এখানে আফ্রিকা বলতে লিবিয়া, তিউনিউসিয়াসহ সমগ্র উত্তর আফ্রিকাকে বুঝানো হচ্ছে।

গেল। ২০ সহস্র সৈনিক সমভিব্যহারে মুসলিম বাহিনী বারকাহ্-এ পৌছলে 'উকবা ইবনু নাফি' আল-ফিহরী তাদের সাথে যোগ দিলেন। তিনি আগে থেকেই এই অঞ্চলে অবস্থান করছিলেন।[৮৭] বারকাহ অঞ্চল মুসলিম বাহিনী নির্বিঘ্নে অতিক্রম করল।[৮৮]

'আবদুল্লাহ ইবনু সা'দ সেনাবাহিনীকে নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার পথে সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসেবে অগ্রবর্তী গোয়েন্দা বাহিনী প্রেরণ করলেন। এদের কাজ ছিল যাত্রাপথের কোথাও শত্রুবাহিনী লুকিয়ে থাকলে তার সংবাদ দেওয়া। এই পদক্ষেপের সুফল অতি দ্রুতই পাওয়া গেল। অগ্রবর্তী গোয়েন্দা দল ত্রিপলীর উপকূলে ভূমধ্যসাগরের তীরে কয়েকটি রোমান রণতরী দেখতে পেল। 'আবদুল্লাহ অতি দ্রুত একদল সৈনিক উপকূল পানে প্রেরণ করলেন, তারা শতাধিক রোমান সৈন্যকে আটক করল এবং অস্ত্রশস্ত্র ও রসদ সামগ্রীসহ বিপুল পরিমাণ গানীমাতের সম্পদ লাভ করলেন। আফ্রিকা অভিযানে গানীমাত লাভের এটিই প্রথম ঘটনা।[৮৯]

অগ্রবর্তী গোয়েন্দা বাহিনী কর্তৃক সরবরাহকৃত তথ্যের আলোকে পদক্ষেপ গ্রহণ করে 'আবদুল্লাহ ইবনু সা'দ এগিয়ে গেলেন। আফ্রিকার তৎকালীন রাজধানী সুবাইতালাহ[৯০] শহরে পৌছে শত্রু বাহিনীর দেখা মিলল। এক পক্ষে 'আবদুল্লাহ ইবনু সা'দ-এর নেতৃত্বাধীন মুসলিম বাহিনী, অপর পক্ষে আফ্রিকার রোমীয় শাসক জারজির[৯১] এর নেতৃত্বাধীন এক লক্ষ বিশ হাজার সৈন্যের রোমান বাহিনী। চূড়ান্ত যুদ্ধ শুরুর পূর্বে দু'সেনাপতির মাঝে কয়েক দফা পত্র ও দূত বিনিময় হয়; 'আবদুল্লাহ ইবনু সা'দ এই সুযোগে ইসলামের সুমহান দাওয়াত উপস্থাপন করলেন। তিনি জারজিরকে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নেওয়ার আহ্বান জানালেন। বিকল্প হিসেবে জিযইয়া আদায় করে ইসলামী খিলাফাত-এর কর্তৃত্বের অধীনে স্বধর্মে বহাল থাকার এবং স্বশাসন বজায় রাখার সুযোগ গ্রহণের আহ্বান জানালেন। জারজির ও তার বাহিনী দম্ভভরে এই দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করল, ফলে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পড়ল। কয়েকদিন ঘোরতর যুদ্ধ চলল। অমীমাংসিত এই যুদ্ধে নির্ণায়কের ভূমিকা পালন করলেন 'আবদুল্লাহ ইবনুয্ যুবাইর। স্বীয় বাহিনী নিয়ে তিনি মুসলিম বাহিনীর সাথে যোগদান করলে মুসলিমদের শক্তিবৃদ্ধি হয়;

---

৮৭. ইবনুল আসীর, ২:৩৮৩।

৮৮. বরাবরের মত বারকাহ ছিল সবচাইতে শান্ত ও নিরাপদ এলাকা; 'আমর ইবনুল 'আস (রা.)-এর সাথে চুক্তি করার পর থেকে বারকাহ-এর অধিবাসীরা কখনো বিদ্রোহ বা প্রতারণা করেনি। তারাই এতই বিশ্বস্ত ছিল যে তাদের কাছে কর আদায়কারী প্রেরণ করতে হত না; বরং ফি বছর সুবিধামত সময়ে মিসর শাসকের কাছে প্রতিনিধি পাঠিয়ে তারা কর আদায় করত। বারকাহবাসীর আচরণে মুগ্ধ 'আমর (রা.) প্রায়শ বলতেন: হিজাযে যদি আমার বাড়িঘর না থাকত তাহলে আমি বারকাহ্-এ স্থায়ীভাবে বসবাস করতাম। এর চেয়ে নির্জন ও নিরাপদ বাসস্থান আর হয় না। [আল-বালাযুরী, ২২৪।]

৮৯. আশ-শারফু ওয়াত-তাসামী বি হারকাতিল ফাতহিল ইসলামী, পৃ. ১৯১।

৯০. ইবনুল আসীর, ২:৩৮৩।

৯১. আফ্রিকা রোমানদের করদ রাজ্য ছিল। জারজির ছিলেন রোমান সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত আফ্রিকার শাসক। তাঁর শাসনাধীন এলাকা ত্রিপলি থেকে তানজা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। [ইবনুল আসীর, ২:৩৮৩।]

ইবনুয্ যুবাইর নিজেও চরম বীরত্ব ও কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন; তাঁর হাতেই রোমান শাসক জারজির প্রাণ হারান।[৯২]

রোমান শাসক জারজিরের পরিণতি দেখে উপকূলের অধিবাসীরা সন্ত্রস্ত হল, মুসলিম বাহিনীকে প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে তারা পারস্পরিক যোগাযোগ করল, কিন্তু কোনমতেই নিজেদের ভয় তাড়াতে পারল না। শেষমেষ তারা কর দেওয়ার বিনিময়ে মুসলিমদের সাথে সন্ধি করার প্রস্তাব দিল। 'আবদুল্লাহ ইবনু সা'দ তাদের প্রস্তাব মেনে নিলেন। বার্ষিক জিযইয়া হিসেবে তারা ৩০০ কিনতার স্বর্ণ (কোন কোন বর্ণনায় ১০০ কিনতার) স্বর্ণ দিল। তবে শর্ত ছিল মুসলিমরা তাদের এলাকা ছেড়ে চলে যাবে এবং চুক্তি ভঙ্গ না করলে পুনরায় হামলা করবে না; চুক্তির পূর্বে যা মুসলিমদের হস্তগত হয়েছে তা ফেরত দিতে হবে না, তবে চুক্তির পর যা মুসলিমরা নিয়েছে তা ফেরত দেবে। 'আবদুল্লাহ তাদের প্রস্তাব মেনে নিলেন এবং মিসরে ফিরে গেলেন। তিনি তিন বছর এক মাস আফ্রিকায় অবস্থান করেছিলেন।[৯৩]

ফেরার পথে ত্রিপলি পর্যন্ত তিনি পদব্রজে এলেন। ত্রিপলিতে যুদ্ধলব্ধ নৌযান প্রস্তুত ছিল। গানীমাতের সম্পদ তিনি নৌকায় তুললেন। শারী'আহ-এর বিধান অনুযায়ী যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক-পঞ্চমাংশের এক পঞ্চমাংশ 'আবদুল্লাহ ইবনু সা'দ নাফ্ল হিসেবে নিজে গ্রহণ করেন। বাকি চার ভাগ খালীফার কাছে প্রেরণ করলেন। তারপর সসৈন্যে মিসরে ফিরে গেলেন। গানীমাতের এক পঞ্চমাংশের এক পঞ্চমাংশ গ্রহণ করায় খালীফা ও তাঁর গভর্ণরের সমালোচনা করা হয়। 'উসমানের (রা.) নির্দেশে পরবর্তীতে 'আবদুল্লাহ্ ইবনু সা'দ এই সম্পদ বাইতুল মালে ফেরত দেন।

আফ্রিকায় দ্বিতীয় অভিযান: কোন কোন বর্ণনা মতে 'আবদুল্লাহ ইবনু সা'দ ৩৩ হিজরীতে আবার আফ্রিকা অভিযানে বের হয়েছিলেন। এই অভিযানে তিনি বিদ্রোহ দমন করেন, বিদ্রোহীদের মাঝে যারা ইসলাম গ্রহণ করেনি তাদেরকে জিযইয়া প্রদানে বাধ্য করেন।[৯৪] এই যুদ্ধের গানীমাতের এক পঞ্চমাংশের এক পঞ্চমাংশ মারওয়ান ইবনুল হাকাম কিনে নেন। অবশ্য খালীফা মূল্য গ্রহণ করেননি।[৯৫]

চার. যাতুস সাওয়ারী যুদ্ধ (৩১ হিজরী):

ইসলামের ইতিহাসে যাতুস সাওয়ারী যুদ্ধ অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। এটি প্রথম নৌযুদ্ধ– যাতে মুসলিমরা রোমানদেরকে পর্যুদস্ত করেছিল। আফ্রিকায় সাম্রাজ্য হারানোর পর রোমানরা ভূমধ্যসাগরের কিছু অংশের কর্তৃত্বও মুসলিমদের কাছে হারায়। রাদূস

---

৯২. ইবন কাসীর, ৭:১৫৮।
৯৩. আল-বালাযুরী, ২২৬-২৭; আত-তাবারী, ৪:২৫৩-৫৪; ইবনুল আসীর, ২:৩৮৩-৮৫; ইবন কাসীর, ৭:১৫১-৫২; আশ-শারফু ওয়াত-তাসামী বি হারকাতিল ফাতহিল ইসলামী, পৃ. ১৯৪।
৯৪. আত-তাবারী, ৪:৩১৭; ইবনুল আসীর, ২:৩৮৫, ৪১৮; ইবন কাসীর, ৭:১৬৫।
৯৫. ইবনুল আসীর, ২:৩৮৫।

থেকে বারকাহ পর্যন্ত দীর্ঘ উপকূলজুড়ে মুসলিমদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। রোমান সম্রাট কন্স্ট্যান্টাইন ইবনু হিরাক্ল-এর নিকট ব্যাপারটি ছিল অত্যন্ত পীড়াদায়ক। তিনি আফ্রিকার হৃত সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারে সংকল্পবদ্ধ হলেন। আলেকজান্দ্রিয়া ছিল রোমান মিসরের রাজধানী; এটি পুনরুদ্ধার করাও ছিল তাঁর নিকট অনেক গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া ভূমধ্যসাগর হতে মুসলিমদেরকে বিতাড়িত করতে না পারলে ভবিষ্যতে এই জলরাশির কর্তৃত্ব মুসলিমদের হাতে চলে যাবে। এইসব লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য রোমান সম্রাট ১০০০ যুদ্ধজাহাজ সমৃদ্ধ একটি নৌবহর প্রস্তুত করলেন।

রোমানদের প্রস্তুতির সংবাদ মুসলিমদের কাছে পৌঁছলে 'উসমান (রা.) আক্রমণকারী শত্রুর প্রতিরোধে পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিতে সংশ্লিষ্ট শাসকদেরকে নির্দেশ দিলেন। খালীফার আদেশ পেয়ে মু'আবিয়া (রা.) সিরিয়ার নৌযানগুলো বুসর ইবনু উরতা-এর নেতৃত্বে আলেকজান্দ্রিয়ায় পাঠিয়ে দিলেন। অন্যদিকে মিসরের নৌযানগুলো 'আবদুল্লাহ ইবনু সা'দ রণসাজে সজ্জিত করলেন। সিরিয়া ও মিসরের নৌবহরের সম্মিলিত নৌযান সংখ্যা ছিল দুইশ'। মিসর শাসনকর্তা 'আবদুল্লাহ ইবনু সা'দের নেতৃত্বে মুসলিম নৌবহর রওয়ানা করল। ইতোপূর্বে অনেকবার রোমানদেরকে পরাজিত করায় মুসলিম যোদ্ধাদের চিত্ত ছিল ভয়শূন্য। অন্যদিকে সম্রাট কনস্ট্যান্টাইনের নেতৃত্বে রোমানরা অগ্রসর হল। এই যুদ্ধটি ভূমধ্যসাগরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তবে এই বিশাল সাগরের কোন্ অংশে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল তা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। আত-তাবারী[৯৬], ইবনুল আসীর[৯৭]সহ অনেক ঐতিহাসিক যাতুস সাওয়ারী যুদ্ধের বিবরণ দিয়েছেন; কিন্তু সুনির্দিষ্ট স্থানের নাম উল্লেখ করেননি। তবে আধুনিক ঐতিহাসিকদের অনেকে মনে করেন আলেকজান্দ্রিয়ার সন্নিকটে ভূমধ্যসাগরে এই নৌযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল।

যুদ্ধের বিবরণঃ যাতুস সাওয়ারী যুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণকারী মালিক ইবনু আউস আল-হাদাসানের বর্ণনা মতে *তারীখুত তাবারীর* আলোকে এই যুদ্ধের বিবরণ উপস্থাপিত হচ্ছে। মালিক ইবনু আউস বলেন, আমরা এত বিশাল নৌবহর ইতোপূর্বে দেখিনি। বাতাস ছিল আমাদের প্রতিকূলে, অর্থাৎ রোমানদের অনুকূলে। আমরা কিছু সময় নোঙ্গর ফেললাম, তাদের জাহাজও আমাদের কাছে নোঙ্গর করা ছিল। বাতাস থেমে গেলে আমরা বললামঃ 'আমাদের ও তোমাদের মাঝে শান্তি বিরাজিত।' তারা বলল, 'এটা (শান্তি) তোমাদের ব্যাপার, তবে তোমাদের সাথে আমাদের বুঝাপড়া আছে।' আমরা বললাম, 'তোমরা রাজি থাকলে চলো সবাই তীরে নেমে পড়ি, সেখানেই লড়াই হবে।'

রোমানরা এক কণ্ঠে জবাব দিলঃ 'পানি! পানি! সাগরেই যুদ্ধ হবে।'[৯৮] রোমানরা নৌযুদ্ধে পারদর্শী ছিল। ভূমধ্যসাগরে তারা দীর্ঘদিন ধরে কর্তৃত্ব চালিয়ে এসেছে, এই

---

৯৬. আত-তাবারী, ৪:২৯০-৯।
৯৭. ইবনুল আসীর, ২: ৪০৪-০৫।
৯৮. আত-তাবারী, ৪:২৯০।

সাগর সম্পর্কে তাদের চেয়ে অভিজ্ঞ কেউ নেই। পক্ষান্তরে মুসলিমরা ইতোপূর্বে বড় ধরনের কোন নৌযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি। স্থলযুদ্ধে তারা অপ্রতিরোধ্য হলেও জলযুদ্ধে তারা একেবারেই আনকোরা। এসব বিবেচনা মাথায় রেখে রোমানরা তীরে নামতে অস্বীকার করল আর ভূমধ্যসাগরের বিশাল জলরাশিতে নৌযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে আগ্রহ প্রকাশ করল।

দু'বাহিনী সমুদ্রপৃষ্ঠে রাতটি কাটিয়ে দিল। দুই শিবিরের দুই ধরনের অবস্থা, রোমানরা সারারাত বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে আনন্দ করল। পক্ষান্তরে মুসলিমগণ সালাত, দু'আ ও যিক্‌রে রাত কাটিয়ে দিলেন। তাঁদের মুনাজাতের শব্দ ঢেউয়ের শব্দের সাথে মিশে এক অপার্থিব পরিবেশ সৃষ্টি করল। কনস্ট্যান্টাইন অতি প্রত্যুষে যুদ্ধ শুরু করতে চাইলেন। অন্যদিকে 'আবদুল্লাহ ইবনু সা'দ জামাআতের সাথে ফাজর সালাত আদায়ের পর শীর্ষ কমাণ্ডারদের সাথে পরামর্শ করলেন; আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে অত্যন্ত চমৎকার একটি কৌশল বেরিয়ে এল। মুসলিমগণ সিদ্ধান্ত নিলেন তারা সাগরকে স্থলভাগ বানিয়ে যুদ্ধ করবেন। অভূতপূর্ব অনুপম এক কৌশল: প্রথমে তারা নিজেদের নৌযানগুলো শত্রুর নৌযানের কাছাকাছি নিয়ে গেলেন। তারপর কমাণ্ডো বাহিনী সাগরে নেমে পড়লেন। অতঃপর শক্ত দড়ি দিয়ে মুসলিম বাহিনীর নৌযানের সাথে রোমান বাহিনীর নৌযানগুলো বেঁধে ফেলা হল। সাগরে ১২০০ নৌযান, প্রতি ১০ টি বা ২০ টি নৌযান একত্রে বাঁধা; সাগরে সৃষ্টি হল কয়েক টুকরা ভূখণ্ড। এভাবে অথৈ জলরাশিতে অবস্থান করেও স্থলযুদ্ধ পরিচালনার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হল। যুদ্ধজাহাজের চার কিনারায় সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে মুসলিমগণ প্রস্তুত হলেন। 'আবদুল্লাহ ইবনু সা'দ দিকনির্দেশনামূলক উজ্জীবনী বক্তৃতা দিলেন। তিনি যোদ্ধাদেরকে সূরাতুল আনফাল তিলাওয়াত করতে বললেন।[৯৯]

নৌযুদ্ধে সাফল্য লাভের ব্যাপারে রোমানরা অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী ছিল। ভূমধ্যসাগরে তারা দোর্দণ্ড প্রতাপে দীর্ঘদিন আধিপত্য বিস্তার করে আসছে, অন্যদিকে মুসলিমদের জন্য ছিল এটিই প্রথম নৌযুদ্ধ। আত্মবিশ্বাসী রোমানরা প্রথমে আক্রমণ চালাল। তারা মুসলিমদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস করে দিতে চাইল, অপর পক্ষে মুসলিমরাও তীব্র প্রতিরোধ চালিয়ে গেল। দু'পক্ষ কয়েকদিন ধরে লড়াই চালিয়ে গেল। বিপুল সংখ্যক যোদ্ধা হতাহত হল। বহু লাশ সাগরে ভেসে গেল। এত বেশি পরিমাণ রক্ত প্রবাহিত হল যে ভূমধ্যসাগরের নীল জলরাশি লাল হয়ে গেল। রোমানরা মুসলিমদেরকে নেতৃত্বশূন্য করার মানসে 'আবদুল্লাহ ইবনু সা'দ-এর রণতরী ডুবিয়ে দিতে চাইল। কাছাকাছি এক রোমান যুদ্ধ জাহাজ হতে মুসলিম সেনাপতির রণতরী লক্ষ্য করে শিকল ছুঁড়ে মারা হল। কিন্তু অকুতোভয় যোদ্ধা 'আলকামাহ ইবনু ইয়াযিদ আল-গাতিফী, সেনাপতি ও তাঁর নৌযান রক্ষা করলেন। তিনি রোমানদের নিক্ষিপ্ত শিকল পানে ঝাঁপ

---

৯৯. শাওকী আবূ খালীল, যাতুস সাওয়ারী, ৬৭।

দিলেন এবং তরবারীর আঘাতে তা টুকরা টুকরা করে ফেললেন। এতটা তীব্র লড়াইয়ের নযির ইতিহাসে কমই পাওয়া যায়। পাশ্চাত্যের কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে এটি ছিল রোমানদের জন্য দ্বিতীয় ইয়ারমূক। আত-তাবারীর ভাষায়:

إن الدم كان غالبا على الماء في هذه المعركة

এই যুদ্ধে পানির ওপরে রক্ত বিজয়ী হয়েছিল।[১০০]

নানা প্রতিকূলতা ও নৌযুদ্ধে অনভিজ্ঞতা সত্ত্বেও মুসলিমগণ স্থৈর্য ও সাহসিকতার সাথে লড়াই চালিয়ে গেলেন, ফলস্বরূপ বিজয়মাল্য শোভা পেল তাঁদের গলায়। একের পর এক রোমান নৌযান ডুবিয়ে দিতে সক্ষম হন মুসলিম বাহিনী। অসংখ্য রোমান মেরিন সেনার লাশ ভেসে ওঠল সাগরতীরে। সম্রাট কনস্ট্যান্টাইন নিজেও আহত হলেন। স্বীয় বাহিনীর দুরবস্থা দেখে তিনি কিছু অনুচর সহযোগে পালিয়ে সিসিলি দ্বীপে আশ্রয় নিলেন। রোমান সম্রাট আশ্রয় নেওয়ার পর দ্বীপটিতে প্রচণ্ড ঝড় শুরু হল। দ্বীপবাসী আশ্রিতদের কাছে জানতে চাইল কেন তারা পালিয়ে এসেছে। তারা প্রকৃত ঘটনা জানিয়ে দিলে সিসিলিবাসী বলল, 'আপনি খৃস্টবাদকে ধ্বংস করেছেন এবং এর অনুসারীদেরকে নিঃশেষ করেছেন, মুসলিমরা যদি এখানে আসে তবে কেউ তাদেরকে ঠেকাতে পারবে না।' মুসলিমদের হাতে পরাজিত খৃস্টান শাসককে আশ্রয় দিতে চাইল না সিসিলিবাসী; তারা কনস্ট্যান্টাইনকে হত্যা করল। অবশ্য তাঁর সহযোগীদেরকে তারা ছেড়ে দিল।[১০১]

যাতুস সাওয়ারী যুদ্ধের ফলাফল পর্যালোচনা করা দরকার। এই যুদ্ধের ফলাফল ছিল সুদূর প্রসারী:

ক. ভূমধ্যসাগরে রোমান কর্তৃত্বের অবসান: ইতিহাস-খ্যাত এই যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত দোর্দণ্ড প্রতাপে ভূমধ্যসাগর নিয়ন্ত্রণ করত রোমানরা। ভূমধ্যসাগরের দু'উপকূলব্যাপী প্রলম্বিত ভূভাগ রোমানদের শাসনাধীন ছিল। যাতুস সাওয়ারী যুদ্ধের পূর্বেই মিসর ও আফ্রিকা তাদের হাতছাড়া হয়। এই যুদ্ধের পর ভূভাগের পাশাপাশি জলভাগও তাদের নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়। সমগ্র ভূমধ্যসাগরে মুসলিম কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। কোন শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থে মুসলিম নৌবহর ব্যবহৃত হত না। এই নৌবহর মানুষকে মানুষের দাসত্ব হতে মুক্ত করে আল্লাহর গোলামীর আওতায় আনা ও অংশীবাদীদের প্রতাপ খর্ব করার কাজে নিয়োজিত ছিল।

খ. দ্বীপাঞ্চলে ইসলামের সম্প্রসারণ: ইতোপূর্বে যে অঞ্চলগুলোতে ইসলামের বিজয় কেতন উড্ডীন হয়েছিল সেগুলো ছিল স্থলভাগের এলাকা। ভূমধ্যসাগরে মুসলিম কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বিভিন্ন দ্বীপে ইসলামের দাওয়াত সম্প্রসারণের সুযোগ সৃষ্টি হয়। মুসলিম দা'ঈগণ এই সুযোগ গ্রহণ করলেন এবং দূর-দূরান্তের দ্বীপগুলোতে

---

১০০. আত-তাবারী, ৪:২৯০-৯১।
১০১. ইবনুল আসীর, ২:৪০৫।

ইসলামের সুমহান বাণী ও আদর্শ পৌঁছে দিলেন। সাইপ্রাস, ক্রীট, কোর্সিকা, সার্দিনিয়া, সিসিলিসহ ভূমধ্যসাগরীয় অন্যান্য দ্বীপ মুসলিম অধিকারে আসল এবং তথায় ইসলামের সুমহান দাওয়াত পৌঁছে গেল।

গ. নৌবিদ্যায় মুসলিমদের পারদর্শিতা অর্জনঃ আরব উপদ্বীপ তিন দিক দিয়ে সাগরবেষ্টিত ছিল। তাই প্রাচীনকালে সমুদ্রযাত্রা আরবদের কাছে অবিদিত ছিল না। তবে শক্তিশালী রাষ্ট্রব্যবস্থা না থাকায় আরবদের রাষ্ট্রীয় নৌবহর ছিল না এবং সংলগ্ন সাগরগুলোতে তাদের আধিপত্য ছিল না। দ্বিতীয় খালীফা 'উমার (রা.) সমুদ্রাভিযানের অনুমতি দেননি। তৃতীয় খালীফা 'উসমান (রা.) সর্বপ্রথম নৌ অভিযানের অনুমতি দেন। সিরিয়ার শাসনকর্তা মু'আবিয়া সর্বপ্রথম রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় নৌবহর গড়ে তোলেন। তিনি সাইপ্রাস অভিযানকালে নৌবহর ব্যবহার করেছিলেন বটে, তবে সে অভিযানে কোন নৌযুদ্ধ হয়নি। মুসলিমদের সর্বপ্রথম বৃহৎ নৌ অভিযান ছিল যাতুস সাওয়ারী যুদ্ধ। এই যুদ্ধে বিজয় লাভের পর রাষ্ট্রীয়ভাবে সামরিক নৌযান সংগ্রহ ও নৌবহর প্রতিষ্ঠার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয়। ভূমধ্যসাগর, লোহিত সাগর, আরব সাগর, ভারত মহাসাগরে মুসলিমদের আধিপত্য ধরে রাখার জন্য ব্যাপকহারে নৌবিদ্যা ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর চর্চা শুরু হয়। বাণিজ্যতরী ও যুদ্ধজাহাজ নির্মাণশিল্পের বিস্তার ঘটে। নৌযান সংক্রান্ত জ্ঞানবিজ্ঞানের সকল শাখায় মুসলিম নাবিকরা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন। মুসলিম নাবিক ও পরিব্রাজকদের রচিত সমুদ্রবিদ্যা সংক্রান্ত গ্রন্থগুলো দীর্ঘদিন নাবিকদের গাইড বই হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। আরব নৌবহরের এই আধিপত্য ষোড়শ শতকে ইউরোপীয়দের সমুদ্রাভিযানের পূর্ব পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। মুসলিমদের নৌবিদ্যায় শ্রেষ্ঠত্বের সূচনা হয়েছিল যাতুস সাওয়ারী যুদ্ধে বিজয়ের মাধ্যমে।

ঘ. বিজয়ের জন্য জাগতিক প্রস্তুতির পাশাপাশি আল্লাহর মদদের প্রয়োজনঃ যুদ্ধজয়ের জন্য শুধু জাগতিক প্রস্তুতি যথেষ্ট নয়। সামরিক প্রস্তুতির পাশাপাশি আত্মিক প্রস্তুতির প্রয়োজন। আল্লাহর সাহায্যই যে যুদ্ধজয়ের প্রধান নিয়ামক তা যাতুস সাওয়ারী যুদ্ধে প্রমাণিত হয়েছে। সৈন্য সংখ্যা এবং প্রস্তুতি, কোনদিকেই মুসলিমরা রোমানদের চেয়ে এগিয়ে ছিল না। মুসলিমদের কাছে যুদ্ধজাহাজ ছিল ২০০ টি। আর রোমানদের কাছে ছিল ১০০০ যুদ্ধজাহাজ, স্বভাবতই তাদের যোদ্ধা সংখ্যাও অনেক বেশি ছিল। জলযুদ্ধে রোমানদের ছিল শত শত বছরের অভিজ্ঞতা; আর এটি ছিল মুসলিমদের প্রথম নৌযুদ্ধ। তবু বিজয়মাল্য মুসলিমদের গলায় শোভা পেয়েছিল। কারণ, তারা সামরিক প্রস্তুতির পাশাপাশি মানসিক প্রস্তুতিও গ্রহণ করেছিলেন। যুদ্ধের পূর্ব রাতে বিজয়ের স্বপ্নে বিভোর রোমানরা বাদ্য বাজিয়ে রাত কাটিয়েছে। অন্যদিকে মুসলিমরা তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করে এবং আল্লাহর মদদ কামনায় প্রার্থনা করে রাত কাটিয়েছেন। ফলে তাঁরা মানসিক দিক দিয়ে অনেক মযবুত হয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে পেরেছেন। তাছাড়া বৈষয়িক কোন প্রাপ্তির আশায় মুসলিমরা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন না। শাহাদাতের মাধ্যমে আল্লাহর

সন্তুষ্টি অর্জন ও জান্নাত প্রাপ্তির আশায় তাঁরা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। প্রাণ হাতের মুঠোয় নিয়ে যাঁরা যুদ্ধে অবতীর্ণ হন তাঁদেরকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না। শাহাদাতের জযবা ও আল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্তির আশা না থাকলে ২০০ নৌযানের সমন্বয়ে গঠিত অনভিজ্ঞ একটি বাহিনী কিছুতেই ১০০০ নৌযানের সমন্বয়ে গঠিত অভিজ্ঞ ও শক্তিশালী বাহিনীর মুখোমুখি হত না।

আধুনিক মানচিত্রে 'উসমান (রা.)-এর আমলের মুসলিম বিশ্বঃ তৃতীয় খালীফা 'উসমান (রা.)-এর আমলের ইসলামী রাষ্ট্রের অবস্থান প্রদত্ত হলঃ [বইয়ের শেষে মানচিত্র সংযুক্ত।]

এশিয়াঃ এশিয়া মহাদেশের নিম্নোক্ত রাষ্ট্রগুলো 'উসমান (রা.)-এর আমলে ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলঃ

১. সৌদি আরব, ২. ইয়ামান, ৩. ওমান, ৪. কাতার, ৫. বাহরাইন, ৬. সংযুক্ত আরব আমিরাত, ৭. কুয়েত, ৮. ইরাক, ৯. ইরান, ১০. জর্দান, ১১. সিরিয়া, ১২. ইসরাইল, ১৩. ফিলিস্তিন, ১৪. লেবানন, ১৫. আর্মেনিয়া, ১৬. আজারবাইজান, ১৭. তুর্কমেনিস্তান, ১৮. তাজিকিস্তান, ১৯. উজবেকিস্তান, ২০. আফগানিস্তান (আংশিক) ২১. তুরস্ক (আংশিক), ২২. সাইপ্রাস।

আফ্রিকাঃ ১. মিসর, ২. লিবিয়া, ৩. তিউনিসিয়া, ৪. সুদান, ৫. আলজেরিয়া (আংশিক)।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

'উসমান (রা.)-এর আমলের বীর সেনানীরা

তৃতীয় খালীফা 'উসমান (রা.)-এর আমলে অর্জিত বিজয়ের বর্ণনা দেওয়ার পর বিজয় অভিযানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী কয়েকজন বীর সেনানীর কৃতিত্বের বিবরণ দেয়া হচ্ছে। পরবর্তী প্রজন্মসমূহের মুসলিম সন্তানের জন্য এইসব বীর সেনানীর বৃত্তান্তে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। তাঁদের যুদ্ধকৌশল, বীরত্ব, সাহসিকতা, দুনিয়াবিমুখতা ও সর্বোপরি আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল ছিল আদর্শস্থানীয় ও অনুসরণীয়। 'উসমান (রা.)-এর চরিতালোচনার ফাঁকে আমরা ঐসব বীর সেনানী সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করব।

এক. আল-আহনাফ ইবনু কায়সঃ

তাঁর পুরো নাম আবূ বাহর আল-আহনাফ ইবনু কায়স ইবনু মু'আবিয়া ইবনু হুসাইন ইবনু হাফস ইবনু 'উবাদাহ আত-তামীমী। তাঁর মায়ের নাম হাব্বাহ বিনত 'আমর ইবনু কুরত আল-বাহিলিয়্যা। তাঁর এক মামা আল-আখতাল ইবনু কুরত সাহসী বীর যোদ্ধা ছিলেন। আল-আহনাফ তাঁর মামাকে নিয়ে গৌরব বোধ করতেন: 'আমার মামার মত মামা কার আছে?' [১০২]

আল-আহনাফ নেতৃস্থানীয় তাবি'ঈ ছিলেন। তাঁর কাওমে তিনি আদর্শ নেতা ছিলেন। নানা স্তরের ও পদমর্যাদার মানুষের আস্থাভাজন ছিলেন তিনি। পাশাপাশি তিনি ছিলেন প্রাজ্ঞ, জ্ঞানী, সুবক্তা ও ধার্মিক। খালিদ ইবনু সাফওয়ান তাঁর সম্পর্কে বলেন, 'আল-আহনাফ মর্যাদা এড়িয়ে চলতেন, কিন্তু মর্যাদা তাঁর অনুসরণ করত।'[১০৩] বিজয়াভিযানে তাঁর অবদান ও কীর্তি সম্পর্কে ইতোপূর্বে আলোকপাত করা হয়েছে।

দুই. মুসলিম নৌবহরের প্রথম অধিনায়ক 'আবদুল্লাহ ইবনু কায়স আল-জাসীঃ দানশীলতায় যার পরিচয় মেলেঃ

ইতোপূর্বে সাইপ্রাস অভিযানের বিবরণের সময় উল্লেখ করা হয়েছে যে,

---

১০২. মাহমূদ খাত্তাব, কাদাতু ফাতহিস সিন্ধ ওয়া আফগানিস্তান, ২৮৫।
১০৩. তাহযীব ইবন 'আসাকির, ৭:১৩।

মু'আবিয়া (রা.)-ই ছিলেন প্রথম গভর্ণর যিনি নৌবাহিনী গঠন করেছিলেন। 'আবদুল্লাহ ইবনু কায়স আল-জাসীকে তিনি সেই নৌবাহিনীর প্রধান অধিনায়ক হিসেবে নিয়োগ করেছিলেন। তিনি শীতে ও গ্রীষ্মে পঞ্চাশাধিক নৌযুদ্ধে অবতীর্ণ হন। আল্লাহর অসীম রহমতে তাঁর বাহিনীর কেউ ঐ অভিযানসমূহে ডুবে মারা যাননি বা নিহতও হননি। তিনি আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করতেন আল্লাহ্ যেন তাঁর সৈনিকদের সুস্থ রাখেন এবং কাউকে আহত করার মাধ্যমে যেন তাঁকে পরীক্ষা না করেন। তিনি মনেপ্রাণে কামনা করতেন তিনি যেন একাই আঘাতপ্রাপ্ত হন, তাঁর বাহিনী সকল সদস্য যেন সুস্থ থাকে। শত্রুদের ব্যাপারে অনুসন্ধান চালানোর জন্য একদিন তিনি একটি নৌযান নিয়ে একাই বের হয়ে রোমীয় অঞ্চলের এক বন্দরে পৌঁছলেন। বন্দরে কিছু ভিক্ষুককে পেয়ে উদারহস্তে দান করলেন। জনৈকা রমণী তার কাছ থেকে দান নিয়ে গ্রামে ফিরে গিয়ে লোকজনকে বলল, 'তোমরা 'আবদুল্লাহ ইবনু কায়স-এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে?' তারা বলল, 'সে কোথায়?' মহিলাটি বলল, 'বন্দরে।' একথা শুনে লোকেরা তাকে ভর্ৎসনা করল। মহিলাটি বলল, 'আসল ব্যাপার হল, তোমরা তাকে পাকড়াও করতে অক্ষম।' একথা শুনে রোমানরা বন্দরে গিয়ে 'আবদুল্লাহ ইবনু কায়সকে আক্রমণ করল। তিনি একাই তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে শাহাদাতবরণ করলেন। তাঁর নৌকার মাঝি কোনমতে নিষ্কৃতি পেয়ে নৌযান নিয়ে তাঁর সাথীদের কাছে পৌঁছল। ঘটনাটি তাদের হৃদয়ে চরমভাবে নাড়া দিল। 'আবদুল্লাহ ইবনু কায়স-এর প্রতিনিধি ছিলেন সুফইয়ান ইবনু 'আউফ আল-আযদী; তিনি বের হয়ে শত্রুদের সাথে লড়াই করলেন। তিনি খুব বিরক্ত হয়ে তাঁর সাথীদেরকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করলেন এবং তাদেরকে বকাঝকা করলেন।

সেই রোমীয় রমণী যে 'আবদুল্লাহ ইবনু কায়স-এর বিরুদ্ধে উস্কানি দিয়েছিল তাকে পরবর্তীতে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল: 'তুমি কিভাবে তাকে চিনলে?' সে জবাব দিল: তিনি ছিলেন ব্যবসায়ীর বেশে, আমি যখন তার কাছে সাহায্য চাইলাম তখন তিনি দান করলেন বাদশাহ'র ন্যায় উদারহস্তে।[১০৪]

এভাবেই আল্লাহ তা'আলা 'আবদুল্লাহ ইবনু কায়স আল-জাসী'র দু'আ কবুল করলেন। তিনি একাই শত্রুভূমে সংবাদ সংগ্রহে অনুসন্ধানী তৎপরতা চালাতে যান। জনৈকা বুদ্ধিমতি রোমীয় রমণী তাঁর রাজকীয় ঔদার্য দেখে চিনতে পারলেন যে, উনি মুসলিম সেনাপতি। মুসলিম সেনাপতিরা এমনই ছিলেন, বেশভুষার পরিবর্তে চরিত্র-মাধুর্যই তাঁদের পরিচয় জ্ঞাপন করত। আর এভাবেই মুসলিম সেনাপতিরা আত্মত্যাগের নযরানা পেশ করতেন। এই সেনাপতির কর্মে আমরা তাই দেখতে পাচ্ছি। পরভূমে তিনি

---

১০৪. আত-তাবারী, ৪:২৬১; ইবনুল আসীর, ২:৩৮৯।

একাই অনুসন্ধান করতে গেলেন, এ দায়িত্ব সম্পাদনের ভার তাঁর সাথীদের ওপর অর্পণ করতে পারতেন। সম্পূর্ণ একাকী এই কাজে বের হওয়াতে নিরাপত্তার ঝুঁকি ছিল। এতদসত্ত্বেও তিনি একাই এই দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নিলেন। তারপর একজন ভিনদেশী নারীর সাথেও তিনি ইসলামী আচরণ প্রদর্শন করেন। অবশেষে শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হয়ে একাই লড়াই করে শাহাদাতবরণ করেন।

তিন. 'আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইরঃ

ইতোপূর্বে মুসলিমদের আফ্রিকা অভিযান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আমরা দেখেছি যে, 'আবদুল্লাহ ইবনু সা'দ ঐ অভিযানে তিন বছরের অধিক সময় অতিবাহিত করেন। যুদ্ধযাত্রা করার পর দীর্ঘদিন তিনি মাদীনা হতে যোগাযোগবিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিলেন। উদ্বিগ্ন খালীফা, 'আবদুল্লাহ ইবনু সা'দের বাহিনীর অনুসন্ধান ও সহায়তায় 'আবদুল্লাহ ইবনুয্ যুবাইরকে প্রেরণ করেন। ইবনুয যুবাইর যখন 'আবদুল্লাহ ইবনু সা'দ-এর সন্ধান পেলেন তখন তিনি সাবীতালায় জারজির-এর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত। এক লক্ষ বিশ হাজার আফ্রিকান সৈন্যের মুকাবিলায় মাত্র বিশ হাজার সৈন্য নিয়ে মুসলিম বাহিনী সুবিধা করতে পারছিল না। দিন গড়িয়ে যাচ্ছিল অথচ যুদ্ধের কোন ফলাফল নেই। এমন মুহূর্তে 'আবদুল্লাহ ইবনুয্ যুবাইর স্বীয় বাহিনীসহ মুসলিম বাহিনীতে যোগ দেন।

'আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা.) প্রতিদিন লড়াইয়ের গতিপ্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করছিলেন। তিনি খেয়াল করলেন, প্রতিদিন সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত যুদ্ধ চলে। যুহরের আযান হলে সৈনিকরা তাঁবুতে ফিরে যায়। একই ধরনের গতানুগতিক যুদ্ধ। একদিন তিনি মুসলিম সেনাপতি 'আবদুল্লাহ্ ইবনু সা'দকে দেখতে পেলেন না। খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারলেন, কৌশলগত কারণে তিনি যুদ্ধের ময়দানে অনুপস্থিত। কারণ শত্রু সেনাপতি জারজির ঘোষণা দিয়েছে, 'যে ব্যক্তি মুসলিম সেনাপতিকে হত্যা করতে পারবে তাকে এক লক্ষ দিরহাম এনাম দেব এবং আমার কন্যাকে তার সাথে বিয়ে দেব।' মুসলিম সেনাপতি 'আবদুল্লাহ ইবনু সা'দ তাই লড়াইয়ের ময়দানে অনুপস্থিত। তাঁর আশঙ্কা, এই মুহূর্তে তিনি আহত/নিহত হলে মুসলিম বাহিনীর মনোবল ভেঙ্গে যাবে। ইবনুয যুবাইর সেনাপতির তাঁবুতে গিয়ে বললেন, 'আপনি পাল্টা ঘোষণা দিন, যে ব্যক্তি জারজির-এর মাথা এনে দিতে পারবে তাকে এক লক্ষ দীনার দেওয়া হবে, আর তার সাথে আমার মেয়ের বিয়ে দেব এবং তাকে এতদঞ্চলের শাসক নিযুক্ত করব।' ঘোষণাটি প্রচারিত হলে জারজির যারপরনেই সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন।

তারপর 'আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর সেনাপতি 'আবদুল্লাহ্ ইবনু সা'দকে বললেন, 'এদের সাথে আমাদের যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে; এরা স্বভূমে আর আমরা পরবাসে। চারদিক

থেকে ওরা সরবরাহ পাচ্ছে, আর আমরা বিদেশ-বিভূঁইয়ে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রয়েছি। এমতাবস্থায় দীর্ঘদিন যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। আমার একটি পরিকল্পনা আছে, তা হল: কাল সকালে গতানুগতিকভাবে যুদ্ধ শুরু হবে, কিন্তু আমরা একদল সাহসী ও কুশলী যোদ্ধাকে তাঁবুতে রেখে যাব, যারা বিশ্রামে থাকবে। দ্বিপ্রহরে দু'দলের যোদ্ধারা তাঁবুতে ফিরে আসবে। আর তখনই বিশ্রামরত যোদ্ধারা শত্রুদের ওপর হামলা করবে, আশা করি আল্লাহ আমাদের সহায় হবেন এবং বিজয় দান করবেন।' সেনাপতি 'আবদুল্লাহ ইবনু সা'দ এই প্রস্তাবের ব্যাপারে কমাণ্ডারদের সাথে পরামর্শ করলেন, সবাই এই পরিকল্পনার সাথে একমত পোষণ করলেন। পরদিন প্রত্যুষে যথারীতি যুদ্ধ শুরু হল, তবে একদল যোদ্ধা তাঁবুতে থেকে গেলেন। তাঁদের ঘোড়ায় জিন লাগানো ছিল। দ্বিপ্রহরের দু'দলের সৈন্যরা বিশ্রামের জন্য তাঁবুতে চলে গেল। আর তখনই 'আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর বিশ্রামরত বীর যোদ্ধাদের নিয়ে শত্রু এলাকায় প্রবেশ করলেন। অলস ভঙ্গিতে থাকা শত্রু সৈন্যরা কিছু টের পেল না। এত অতর্কিতে মুসলিম যোদ্ধারা হামলা করল যে আফ্রিকানরা তরবারি হাতে নিতে পারল না। 'আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইরের হাতে জারজির নিহত হলেন, বিপুল সংখ্যক শত্রু সৈন্য নিহত হল, জারজিরের কন্যা বন্দি হল। তারপর সেনাপতি 'আবদুল্লাহ ইবনু সা'দ শহর অবরোধ করলেন এবং জয় করলেন।

এই যুদ্ধে 'আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইরের কর্মকুশলতা সম্পর্কে ঐতিহাসিক ইবনু কাসীর আরো বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। নিরবচ্ছিন্ন বর্ণনাসূত্রে তিনি বর্ণনা করেছেন যে, 'আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর বলেন, 'আমি দূর থেকে কায়সার জারজিরকে দেখতে পাচ্ছিলাম, তিনি তুর্কী ঘোড়ায় আরোহন করেছিলেন, দুই দাসী ময়ূর পালকের পাখা দিয়ে তাঁকে ছায়া দিচ্ছিল। তখন আমি 'আবদুল্লাহ ইবনু সা'দের কাছে গিয়ে বললাম, কয়েকজন জানবায সৈনিককে আমার সাথে প্রেরণ করুন, তারা আমার পৃষ্ঠ রক্ষা করবে। আর আমি কায়সারকে টার্গেট করব। তিনি একদল বীর নওজোয়ানকে আমার সাথে দিলেন। আমি তাদেরকে নিয়ে দ্রুতবেগে সারি ছেড়ে এগিয়ে গেলাম। তারা মনে করল আমি হয়ত কোন পত্র নিয়ে এসেছি। আমি যখন জারজিরের কাছে গেলাম তিনি বিপদ বুঝতে পারলেন। সম্রাট অশ্বোপরি আরোহী অবস্থায় পালাতে চাইলেন। কিন্তু আমি ত্বরিত তার কাছে গিয়ে বর্শা দিয়ে আঘাত করলাম, তারপর তরবারির আঘাতে তাঁর মস্তক ছিন্ন করে তা বর্শোপরি বিদ্ধ করে তাকবীর দিতে দিতে শিবিরে ফিরে এলাম। নিজেদের সম্রাটের এই পরিণতি দেখে বারবার সৈন্যরা মারাত্মকভাবে ভয় পেয়ে কাতা পাখির দলের ন্যায় দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পালিয়ে গেল। এই যুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য 'আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর খুবই খ্যাতি লাভ করেছিলেন।'[১০৫]

---

১০৫. ইবন কাসীর, ৭:১৫৮।

এই যুদ্ধে মুসলিমগণ এত বেশি গানীমাতের সম্পদ অর্জন করলেন যে ইতোপূর্বে তা কখনো অর্জিত হয়নি। অশ্বারোহী যোদ্ধার অংশ ছিল ৩০০০ দীনার, পদাতিক সৈন্যের অংশ ছিল ১০০০ দিনার। সাবীতালাহ শহর জয়ের পর 'আবদুল্লাহ ইবনু সা'দ সৈনিকদেরকে নানা প্রান্তে প্রেরণ করলেন, তারা কাফসা'য় পৌছে বিপুল গানীমাত লাভ করল এবং অনেককে বন্দী করল। আজাম নামে একটি দুর্গ ছিল, কয়েকদিন অবরোধের পর সেটিও জয় করলেন। 'আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইরের দায়িত্বে জারজির কন্যাকে অর্পণ করা হল আর বিজয়ের সুসংবাদসহ তাঁকে মাদীনায় প্রেরণ করা হয়।[১০৬]

আল্লাহ্‌র সাহায্য লাভের উজ্জ্বল নমুনা হল সাবীতালা যুদ্ধে মুসলিমদের বিজয়। মুসলিমরা শত্রুভূমে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় লড়াই করছিলেন। শত্রুসৈন্য সংখ্যা ছিল তাদের ছয় বা সাত গুণ। ঐতিহাসিকদের বর্ণনানুসারে এর চেয়ে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মুখোমুখি মুসলিমরা কখনো হয়নি। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা দুঃসাহসী বীর সেনানী 'আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইরের মাধ্যমে জারজিরকে বিনাশ করলেন। সম্রাটের মৃত্যুর পরও বারবাররা যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারত। কারণ তাদের সৈন্য সংখ্যা ছিল মুসলিমদের তুলনায় কয়েক গুণ বেশি। কিন্তু আল্লাহ তাদের মনে এমন ভয় ঢুকিয়ে দিলেন তারা দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ময়দান ছেড়ে পালিয়ে গেল। আল্লাহ্‌র কালিমাকে বুলন্দ করার মানসে তাঁরই ওপর তাওয়াক্কুল করে মুসলিমরা যখনই যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছে তখনই আল্লাহর সাহায্য তারা লাভ করেছে। ইতিহাসে এর অসংখ্য নযির রয়েছে।

চার. 'আবদুর রহমান ইবনু রাবী'আহ আল-বাহিলীঃ

'উসমান (রা.)-এর আমলে যেসব দিগ্বিজয়ী বীর ও অকুতোভয় সেনাপতি ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন করেন তাঁদের অন্যতম হলেন আবদুর রহমান ইবনু রাবী'আহ আল-বাহিলী। ইনি সাহাবী ছিলেন, তবে দেরি করে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর উপাধি ছিল যুন্‌নূর। সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রা.)-কে কাদেসিয়ায় প্রেরণের পর 'উমার (রা.), আবদুর রহমান ইবনু রাবী'আহ-কে বিচারক পদে নিয়োগ করেন। তাঁকে গানীমাতের সম্পদ বন্টনের দায়িত্বও দেয়া হয়। 'উমার (রা.)-এর আমলে বাবুল আবওয়াবের শাসক ছিলেন সুরাকা ইবনু 'আমর। তাঁর মৃত্যুর পর আবদুর রহমানকে বাবুল আবওয়াবের শাসক নিয়োগ করা হয়। খাযার ও ককেশাস জয়ের বিশেষ দায়িত্ব অর্পণ করা হয় তাঁর ওপর। শাসক ও সেনাপতি হিসেবে তিনি অত্যন্ত সফল ও উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। ফলে খালীফা ও গভর্ণরের পদে পরিবর্তন সত্ত্বেও তিনি দীর্ঘদিন তথা আমৃত্যু স্বপদে বহাল ছিলেন।

---

১০৬. ইবনুল আসীর, ২:৩৮৪।

একবার তিনি দলবলসহ বের হয়ে আল-বাব অতিক্রম করলেন। তখন বাদশাহ শাহরিয়ার বললেন: 'তুমি কি করতে চাও?' আবদুর রহমান বললেন, 'আমি বালনাজার ও তুর্কীদের ভূমিতে অভিযান পরিচালনা করব।' বাদশাহ বললেন, (তুর্কীরা এত দুর্ধর্ষ জাতি যে আমরা আগ বাড়িয়ে যুদ্ধ করতাম না) বরং আমরা এতে সন্তুষ্ট থাকতাম যে, তারা আল-বাবের পশ্চাতে এসে আমাদেরকে চ্যালেঞ্জ করলেই কেবল আমরা সাড়া দিতাম।' জবাবে আবদুর রহমান বললেন, 'কিন্তু আমরা এতে সন্তুষ্ট নই, বরং আমরা আগ বাড়িয়ে তাদের ভূখণ্ডে অভিযান পরিচালনা করব। আল্লাহর শপথ, আমাদের মাঝে এমন একদল আছেন যাদেরকে তাদের আমীর নির্দেশ দিলে চীনের সীমানা পর্যন্ত অভিযান চালাবে।' শাহরিয়ার বললেন, 'ওরা কারা?' তিনি জবাব দিলেন, 'এঁরা আমাদের রাসূলের সাহচর্য লাভে ধন্য হয়েছেন, এই দীনে তাঁরা প্রবেশ করেছেন ভিত্তি হিসেবে, জাহিলী যুগে তারা ছিলেন লজ্জাশীল ও দানশীল, তাদের লজ্জাশীলতা, দানশীলতা ও ঔদার্য ইসলাম গ্রহণের পর আরো বেড়ে যায়। ফলে নেতৃত্ব ও বিজয় তাদের নিত্যসঙ্গীতে পরিণত হয়।'[১০৭]

আবদুর রহমান ইবনু রাবী'আহ আল-বাহিলী 'উমার (রা.)-এর আমলে বালনাজারে অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। অজেয় তুর্কীরা এই যুদ্ধে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে; মুসলিম বাহিনীর পরাক্রম দেখে তারা বলাবলি করে, 'এরা (মুসলিমরা) আমাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার দুঃসাহস দেখিয়েছে তাদের সাথে ফেরেশতা আছে বলে। ফেরেশতারাই তাদেরকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচায়।' নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে তুর্কীরা পলায়ন করেছিল আর মুসলিমরা বিজয় ও গানীমাত লাভে ধন্য হয়েছিল। এই যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর কেউ শহীদ হননি।[১০৮]

সেনাপতি ও শাসক আবদুর রহমান ইবনু রাবী'আহ অত্যন্ত উন্নত নৈতিকতার অধিকারী ছিলেন। যুদ্ধ, সন্ধি ও শান্তির সময়ে তিনি অতি উন্নত মন-মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন এবং দয়ার্দ্র ও মানবিক আচরণ প্রদর্শন করেছেন। যুদ্ধের ময়দানে তিনি শত্রুদের সাথে ধোঁকা-প্রতারণা করতেন না এবং পেছন দিক থেকে হামলা করতেন না। পরাজিতদের সাথে তাঁর আচরণ ছিল অত্যন্ত মানবিক, যা আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা, শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও ইসলামের সম্প্রসারণে সহায়ক হয়েছে। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও আমানতদার। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা উল্লেখ করা যায়: মুসলিম অভিযানের পূর্বে আল-বাবের শাসক চীনের সম্রাটের নিকট একজন দূত প্রেরণ করেন। ঐ দূত ফিরে আসার আগে মুসলিম বাহিনী আল-বাব বিজয় করেন। দূত মহামূল্যবান উপঢৌকনসহ চীনের দরবার হতে আল-বাবে ফিরে আসেন। তিনি রাজপ্রাসাদে গিয়ে মুসলিম শাসক আবদুর

---

১০৭. ইবনুল আসীর, আল-কামিল, ২:৪১৪।
১০৮. আত-তাবারী, ৪:৩০৪।

রহমান ইবনু রাবী'আহ্-এর কাছে সাবেক শাসককে দেখতে পেলেন। আনীত উপঢৌকনের মধ্যে একটি মহামূল্যবান লাল নীলকান্তমণি ছিল। সাবেক শাসক মূল্যবান রত্নটি আবদুর রহমান ইবনু রাবী'আহ্-কে দিলেন। আবদুর রহমান ইবনু রাবী'আহ আল-বাহিলী একনজর চোখ বুলিয়ে তৎক্ষণাৎ সেটি তাঁকে ফিরিয়ে দিলেন। আল-বাবের পদচ্যুত শাসক যারপরনাই বিস্মিত হয়ে বললেন, 'এই নীলকান্তমণি এই সমগ্র দেশের চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান। স্রষ্টার শপথ! শাসক হিসেবে তোমরা আমার কাছে কিসরা'র চাইতে অনেক বেশি প্রিয়। আমি যদি তাদের অধীনে থাকতাম আর তাদের কাছে এই রত্নের খবর পৌঁছত তবে তারা এটি আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিত।' মুসলিম সেনাপতি ও শাসকগণ পার্থিব সম্পদ অর্জন ও প্রাপ্তির জন্য জানবাজি রেখে যুদ্ধ করতেন না। বস্তুগত প্রাপ্তি ও অর্জন ছিল তাঁদের কাছে একেবারেই তুচ্ছ। তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল মানুষের দাসত্ব থেকে মানবজাতিকে উদ্ধার করে এক আল্লাহর খাঁটি গোলামে রূপান্তর করা। আর তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে পরকালীন সাফল্য নিশ্চিত করা। আবদুর রহমান ইবনু রাবী'আহ বিশ্বাস করতেন এই মহামূল্যবান নীলকান্তমণি তাঁর ব্যক্তিগত সম্পদ নয়, তেমনিভাবে এটি মুসলিমদের যৌথ সম্পদ বা বাইতুল মালের অংশও নয়। অতএব নীলকান্তমণি ও মাটি তাঁর কাছে সমান। আবদুর রহমান ইবনু রাবী'আহ ছিলেন দয়ালু, দুনিয়াবিমুখ, দানশীল, মেহমাননাওয়ায ও পরহেযগার। জীবনের দীর্ঘ সময় সেনানায়ক ও প্রশাসক হিসেবে কাটিয়ে দিলেও তিনি কপর্দক পরিমাণ সম্পদেরও মালিক ছিলেন না।

৩২ হিজরীতে (৬৫২ খৃস্টাব্দে) বালনাজারে খাযারদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করতে গিয়ে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। এই যুদ্ধে দুই বাহিনীই মিনজানিক প্রয়োগ করেছিলেন।[১০৯]

পাঁচ. সালমান ইবনু রাবী'আহ্ আল-বাহিলীঃ

পূর্বোক্ত আবদুর রহমান ইবনু রাবী'আহ আল-বাহিলী'র ভাই ছিলেন সালমান। সালমান ইবনু রাবী'আহ আল-বাহিলী ছিলেন কূফার প্রথম কাযী (বিচারক)। 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) তাঁকে কাযী শুরাইহ-এর পূর্বে কূফা'র বিচারপতির পদে নিয়োগ দেন। এতে সালমান (রা.)-এর জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও গ্রহণযোগ্যতার প্রমাণ মেলে। কারণ কাযী পদে নিয়োগ পাওয়ার জন্য বিশেষ যোগ্যতার প্রয়োজন। তাছাড়া উমার (রা.)-এর শাসনামলে বিচারপতির দায়িত্ব পালন করা চাট্টিখানি কথা নয়। তদুপরি কূফা-এর মত

---

১০৯. প্রাগুক্ত।

ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ শহরে। সালমান-ইবনু রাবী'আহ ধর্মীয় বিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। তদুপরি তিনি ছিলেন ন্যায়পরায়ণ, দীনদার, ভারসাম্যপূর্ণ বিচারবুদ্ধি ও প্রভাবক ব্যক্তিত্বের অধিকারী। ফলে তিনি সাধারণ মানুষের পাশাপাশি 'উমার (রা.)-এর আস্থাভাজন ছিলেন। মাদায়েন ও আল-বাবের যুদ্ধে তিনি উপ-প্রধান সেনাপতি হিসেবে গানীমাতের সম্পদ বন্টনের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি সৎকর্মশীল ছিলেন, ইবাদত-বন্দেগীতে পাবন্দ ছিলেন; ফি বছর হাজ্জ আদায় করতেন। কম হাদীস বর্ণনা করলেও শীর্ষস্থানীয় তাবি'ঈগণ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। অত্যন্ত বিরল নৈতিক চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন একাধারে বদান্য, মেহমাননাওয়ায, বিচক্ষণ, আত্মসম্মাবোধসম্পন্ন, বিশ্বস্ত, সত্যবাদী ও সর্বজনের কল্যাণকামী। আর ছিলেন প্রচণ্ড রকমের দুনিয়াবিমুখ। বিচারক, সেনানায়ক ও প্রশাসক পদে দীর্ঘদিন কর্মরত থাকা সত্ত্বেও তিনি কপর্দকশূন্য অবস্থায় মারা যান।

তাঁর সামরিক নেতৃত্বের যোগ্যতা ছিল সর্বজনবিদিত। ইতোপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে যে, 'উসমান (রা.) কূফার শাসক আল-ওয়ালীদ ইবনু 'উকবাকে নির্দেশ দেন তিনি যেন একদল চৌকষ যোদ্ধাকে সিরিয়ায় প্রেরণ করেন। দলনেতা হিসেবে এমন একজনকে বাছাই করতে বলেন যার বীরত্ব, সাহসিকতা ও দীনদারীর মান সন্তোষজনক। আল-ওয়ালীদ কালবিলম্ব না করে একটি বাহিনী সিরিয়ায় প্রেরণ করেন এবং সালমান ইবনু রাবী'আহকে ওই বাহিনীর প্রধান নিয়োগ করেন। কারণ তিনি ছিলেন সাহসী, নির্ভীক, যুদ্ধকৌশলে অভিজ্ঞ। আর তাঁর ছিল নেতৃত্বের দীর্ঘ ইতিহাস ও ঐতিহ্য। যুদ্ধবিদ্যায় তিনি ছিলেন বিশেষভাবে পারদর্শী; ছিলেন দক্ষ তীরন্দাজ, কুশলী অশ্বারোহী। 'উমার (রা.)-এর আমলে তিনি রাষ্ট্রীয় অশ্বশালার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। 'উমার (রা.) রাষ্ট্রীয় খরচে অশ্ব পালন করতেন। বড় বড় শহরগুলোতে রাষ্ট্রীয় অশ্বশালা ছিল। কূফার অশ্বশালায় চার হাজার ঘোড়া ছিল। শত্রুরা ইসলামী সাম্রাজ্যের সীমানায় উঁকি দিলেই অশ্বারোহী মুসলিম বাহিনী শত্রুপানে ছুটতেন। সালমান কূফার অশ্বশালার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন।[১১০]

সাহসী এই যোদ্ধা অতি উঁচু মানের নৈতিক মানসম্পন্ন ছিলেন। তিনি প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে কোন শত্রুসৈন্যকে কখনো হত্যা করেননি। তিনি বলেন,

قتلت بسيفي هذا مائة مستلئم، كلهم يعبد غير الله، ما قتلت رجلا منهم صبرا.

আমি এই তরবারি দ্বারা একশত জন সশস্ত্র যোদ্ধাকে হত্যা করেছি, এরা সবাই গাইরুল্লাহর ইবাদাত করত। তবে প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে আমি কাউকে হত্যা করিনি।

---

১১০. ইবনুল আসীর, উসুদুল গাবাহ ফী মা'রিফাতিস সাহাবাহ, ২:৩২৭।

তিনি কোন আল্লাহদ্রোহী যোদ্ধাকে অতর্কিত হামলায় হত্যা করেননি। বরং যুদ্ধের ময়দানেও তাকে প্রথমে সাবধান করেছেন, তারপর শত্রুসৈন্যকে প্রতিরোধের সুযোগ দিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছেন। কখনো প্রতারণা- মূলকভাবে কাউকে হত্যা করেননি।[১১১]

'উসমান (রা.)-এর খিলাফাতকালে ইসলামী রাষ্ট্রের সেবাদানকারী এই বীর সেনানী ৩২ বা ৩৩ হিজরীতে শাহাদাত বরণ করেন।

ছয়. হাবীব ইবনু মাসলামা আল-ফিহ্‌রী:

হাবীব ইবনু মাসলামা আল-ফিহ্‌রী ইসলামের প্রারম্ভিক যুগের দ্বিগ্বিজয়ী সেনানায়কগণের অন্যতম। তাঁকে 'হাবীবুর রূম'ও বলা হয়, কারণ তিনি রোমান সীমান্তে অনেক অভিযান চালিয়েছেন।

কিশোর বয়স থেকে শুরু হয় তাঁর যোদ্ধাজীবন। আমৃত্যু তিনি বীর, সাহসী ও অকুতোভয় যোদ্ধা হিসেবে জীবন অতিবাহিত করেন। মাত্র বিশ বছর বয়সে তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে তাবুক অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। আবু বাকর (রা.)-এর আমলে বিভিন্ন অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। দ্বিতীয় খালীফা উমার (রা.) তাঁকে দু'টি বিষয়ের কোন একটি গ্রহণ করার সুযোগ দেন; অর্থভাণ্ডার বা অস্ত্রাগারের দায়িত্ব পালন। হাবীব অর্থভাণ্ডারের দায়িত্ব গ্রহণে অপারগতা প্রকাশ করে অস্ত্রাগার সংরক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এতে প্রমাণিত হয় সৈনিক জীবন তাঁর কাঙ্ক্ষিত ছিল। মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে তিনি ইয়ারমূকের যুদ্ধে একটি ব্যাটেলিয়নের নেতৃত্ব দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে বিপুল পরাক্রমের স্বাক্ষর রাখেন। 'উমার (রা.) তাঁকে জাযীরা'র শাসক ও সেনাপতি পদে নিযুক্ত করেন। তিনি আবূ 'উবাইদা ইবনুল জাররাহ-এর বাহিনীর সাথে দামিশকে প্রবেশ করেন। কিন্নাসরিন ও আলেপ্পো বিজয়াভিযানেও তিনি অংশ নেন। তারপর হাবীব ইবনু মাসলামা ও 'ইয়াজ ইবনু গান্‌মের যৌথ নেতৃত্বে এন্তাকিয়া ও জারজূমা বিজিত হয়।

প্রশাসক ও সেনাপতি হিসেবে 'উসমান (রা.)-এর আমলেও হাবীব ভূমিকা পালন করেন। তিনি অমিত সাহসী ও অকুতোভয় বীর ছিলেন। 'উসমান (রা.) তাঁকে মুরিয়ান অভিযানে প্রেরণ করেন। এই যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল ৬ হাজার, আর কাফিরদের সৈন্য ছিল ৭০ হাজার। যুদ্ধ আরম্ভের প্রাক্কালে হাবীব এক ভাষণে বললেন,

---

১১১. আল-ইস্তী'আব, ২:৬৩৩।

إن يصبروا وتصبروا فأنتم أولى بالله منهم، وإن يصبروا وتجزعوا فإن الله مع الصابرين.

যদি তোমরা ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতি মুকাবিলা কর আর শত্রুরাও ধৈর্য ধারণ করে তবে আল্লাহ তোমাদের অনুকূলে থাকবেন, আর তোমরা যদি ধৈর্যহারা হয়ে পড় এবং ওরা ধৈর্যধারণ করে তবে জেনে রাখ আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে থাকবেন।[১১২]

ঐ যুদ্ধে তিনি রাতের বেলায় শত্রুদের মুখোমুখি হন। হাবীবের দু'আ ছিল নিম্নরূপ:

اللهم جل لنا قمرها، واحبس عنا مطرها، واحقن دماء أصحابي، واكتبهم شهداء.

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের জন্য রাতের চাঁদকে আলোকিত করুন, বৃষ্টি থামিয়ে দিন, আমাদের সাথীদের রক্ত আটকে রাখুন আর শহীদদের তালিকায় তাঁদের নাম লিপিবদ্ধ করুন।

আল্লাহ তা'আলা হাবীবকে যোগ্য জীবনসঙ্গিনী দিয়েছিলেন; তিনি যখন রাতে অভিযান পরিচালনার কথা সহযোদ্ধাদের জানাচ্ছিলেন তখন তার স্ত্রী তা শুনে ফেলেন। তিনি বলেন, 'গন্তব্য কোথায়?' হাবীব বলেন, 'মুরিয়ানের চাঁদোয়া অথবা জান্নাত।' রাতের অভিযানে হাবীব শত্রুদেরকে কচুকাটা করে মুরিয়ানের শামিয়ানায় পৌঁছে দেখলেন তথায় তার স্ত্রী উপস্থিত!

মত প্রকাশ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে হাবীব পারদর্শী ছিলেন। বরং তিনি সহযোদ্ধাদের সাথে পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। প্রতিটি অভিযানের শুরুতে, অভিযান চলাকালে ও শেষে তিনি পরামর্শ সভার আয়োজন করতেন। মুরিয়ান অভিযানের সময় একদিন জনৈক সৈনিক বলল, 'হাবীব যদি আমার কথা শুনত তবে তাকে আমি এমন পথ বাতলে দিতে পারতাম যে তা গ্রহণ করলে আল্লাহ আমাদেরকে বিজয় দান করতেন।' সৈনিকের এই বক্তব্য শুনে হাবীব তার পরামর্শ নিলেন। তাকে বলা হল: 'তোমার পরামর্শ কি?' সৈনিকটি বলল: সেনাপতিকে বলুন, তিনি যেন অশ্বারোহী বাহিনী অগ্রে প্রেরণ করেন, পদাতিক বাহিনী পশ্চাতে গমন করবে। মধ্যরাতের আঁধারে অশ্বারোহী বাহিনী আচানক শত্রুশিবিরে হামলা চালাবে আর তুমুল যুদ্ধ শুরু হবে। ফাজরের সময় হাবীব বাকি সৈন্যসহ যুদ্ধস্থলে পৌঁছবে, এতে শত্রুরা মনে করবে আমাদের সাহায্যে অতিরিক্ত সৈন্য এসে পৌঁছেছে, ফলে তারা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পলায়ন করবে।' নাম না জানা ওই

১১২. তাহযীব ইবন আসাকির, ৪:৩৭।

সৈনিকের পরামর্শ অনুসারে বৃষ্টিস্নাত সেই রাতের আঁধারে অভিযান চালিয়ে মুসলিম বাহিনী মুরিয়ানের শত্রুবাহিনীকে পরাজিত করে।[১১৩]

হাবীব ইবনু মাসলামা আল-ফিহরী, 'উসমান (রা.)-এর আমলের শ্রেষ্ঠ সেনাপতিদের অন্যতম। ৪২ হিজরীতে ৫৪ বছর বয়সে তিনি মারা যান। সংক্ষিপ্ত জীবনে তিনি ব্যাপক অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছেন।

১১৩. প্রাগুক্ত।

পঞ্চম অধ্যায়

অর্থ ও বিচার ব্যবস্থা

প্রথম পরিচ্ছেদ

'উসমান (রা.)-কর্তৃক ঘোষিত আর্থিক নীতি

পূর্ববর্তী খালীফাদ্বয়ের আমলে প্রচলিত অর্থ ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক নীতিতে খুব একটা পরিবর্তন আনেননি 'উসমান (রা.)। তবে ধনসম্পদ উপার্জন ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে কিছুটা শিথিলতা আনয়ন করা হয়; 'উসমান (রা.) সম্পদ সঞ্চয়, প্রাসাদ নির্মাণ, ভূসম্পত্তি ক্রয়ের অনুমতি প্রদান করেন। ফলে 'উমার (রা.)-এর আমলের কঠোরতা হ্রাস পায়।

খালীফা হওয়ার পর 'উসমান (রা.) প্রাদেশিক গভর্ণর, ট্যাক্স কালেক্টর ও সাধারণ জনগণের উদ্দেশ্যে তিনটি পত্র প্রেরণ করেন। ওই পত্রগুলোর আলোকে তাঁর আমলে চর্চিত আর্থিক নীতি উল্লেখ করা হচ্ছে:

ক. পূর্বসূরিদের অনুসরণ: 'উসমান (রা.) খালীফা হিসেবে অভিষিক্ত হওয়ার সময় ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, তিনি আল্লাহর কিতাব, রাসূলের সুন্নাহ ও পূর্বসূরি দু'খালীফার কর্মপন্থা অবলম্বন করবেন। আর্থিক ব্যবস্থাপনায় তিনি এই ঘোষণা মেনে চলেন। 'উমার (রা.) প্রবর্তিত আর্থিক নীতি হতে তিনি বিচ্যুত হননি। তবে কোন কোন বিষয়ে ইজতিহাদ করেছেন। যাকাত সংগ্রহ ও বণ্টন, জিযইয়া সংগ্রহ ও বণ্টন এবং গানীমাতের মাল বণ্টনের ক্ষেত্রে তিনি কুরআন, সুন্নাহ ও পূর্বসূরি খালীফাদ্বয়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন।

আর্থিক ব্যবস্থাপনার সার্বিক বিষয়ে ইসলামী চেতনা সংরক্ষণের চেষ্টা করা হত; অপচয়-অপব্যয় প্রতিরোধ এবং হারাম উপার্জন বর্জনের সব ধরনের প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিল।

খ. সরকারী কালেক্টরদের বাড়াবাড়ি হতে জনসাধারণকে রক্ষা করা: 'উসমান (রা.)-এর অন্যতম বিঘোষিত নীতি ছিল যাকাত, 'উশর, 'আশূর ও জিযইয়া কালেক্টরদের যুল্‌ম ও বাড়াবাড়ি থেকে জনসাধারণকে রক্ষা করা। জনসাধারণের কাছ থেকে সরকারী পাওনা আদায় করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করা অবিদিত কোন বিষয় নয়; কিন্তু এ বিষয়ে তিনি যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করেছিলেন। খালীফা হওয়ার পর প্রথম যে ফরমান তিনি কালেক্টরদের উদ্দেশ্যে জারি করেন তাতে বাড়াবাড়ি ও যুল্‌মের ব্যাপারে কঠিনভাবে সতর্ক করেছেন। 'উসমান (রা.) তাদেরকে ট্যাক্স কালেক্টর হওয়ার পরিবর্তে দায়িত্বশীল হওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

গ. মুসলিমদের কাছ থেকে রাষ্ট্রের পাওনা ন্যায্যতার ভিত্তিতে আদায় করা: 'উসমান (রা.) রাজস্ব কর্মকর্তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন তারা যেন মুসলিম নাগরিকদের কাছ থেকে রাষ্ট্রের পাওনা ন্যায্যতার ভিত্তিতে আদায় করে। মুসলিম নাগরিক বলে রাষ্ট্রীয়

পাওনা থেকে অব্যাহতি পাওয়ার কোন সুযোগ ছিল না; আবার কর্মকর্তাদের পক্ষ থেকে যুল্ম করার কোন সুযোগ ছিল না। তাদের প্রতি এই নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল যে, যাকাত আদায়ের সময় জনগণের কাছ থেকে তারা যেন বেছে বেছে উৎকৃষ্ট সম্পদ ছিনিয়ে না নেয়।

ঘ. রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে মুসলিম নাগরিকদের পাওনা ন্যায্যতার ভিত্তিতে আদায় করা: নাগরিকের কাছ থেকে যেমন রাষ্ট্রের পাওনা ছিল তেমনি রাষ্ট্রের কাছে নাগরিকের পাওনা ছিল। ধনী মুসলিম নাগরিকরা যাকাত আদায় করতেন; আবার ওই সম্পদ দরিদ্র, ইয়াতিম ও মুসাফিরের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া হত। ব্যক্তি পর্যায়ে সরাসরি অর্থ প্রদানের পাশাপাশি রাষ্ট্রের আরো কিছু আর্থিক দায়দায়িত্ব ছিল যাতে সমষ্টিগতভাবে পুরো জনগোষ্ঠি উপকৃত হত; যেমন রাস্তাঘাট, সরাইখানা নির্মাণ ইত্যাদি। সব ধরনের রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের ক্ষেত্রে 'উসমান (রা.) নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন ন্যায্যতার ভিত্তিতে তা সম্পন্ন হয়। কোন নাগরিককে তার প্রাপ্য বুঝিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে যেন কম-বেশি না করা হয়। রাষ্ট্রীয় ব্যয় সম্পন্ন করতে হবে এমনভাবে যেন রাষ্ট্র বা নাগরিক কোন পক্ষই বেইনসাফীর শিকার না হয়।

ঙ. যিম্মীদের ওপর যুল্ম না করা, তাদের কাছ থেকে রাষ্ট্রীয় পাওনা ন্যায্যতার ভিত্তিতে আদায় করা, তাদের পাওনাও ইনসাফের সাথে প্রদান করা: আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে যিম্মীদের সাথেও ইনসাফপূর্ণ আচরণ করতে হবে; তারা চুক্তির ভিত্তিতে ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাস করে। তাদের দৈহিক ও আর্থিক নিরাপত্তা প্রদানের দায়িত্ব ইসলামী রাষ্ট্রের। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সবিশেষ তাকিদ দিয়েছেন। 'আবদুল্লাহ ইবনু আরকামকে (রা.) জিযইয়া আদায়ের দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করার সময় তিনি বলেছিলেন,

> من ظلم معاهدا أو كلفه فوق طاقته أو انتقصه، أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفسه فأنا حجيجه يوم القيامة
>
> কেউ যদি কোন চুক্তিবদ্ধ নাগরিকের ওপর যুল্ম করে, বা তার ওপর সাধ্যাতীত বোঝা চাপিয়ে দেয়, বা তার সম্মানহানি করে, বা তার সন্তুষ্টি ব্যতীত সম্পদ নেয়, তবে আমি কিয়ামাতের দিন তার (যিম্মীর) পক্ষে প্রমাণ নিয়ে দাঁড়াব।[১]

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আদর্শে উজ্জীবিত 'উমার (রা.) মৃত্যু শয্যায় জিম্মীদের ব্যাপারে ওয়াসিয়াত করতে ভুলে যাননি। পরবর্তী খালীফাকে উপদেশ দিয়ে তিনি বলেছিলেন,

---

১. আল-মুনতাখাব মিনাস সুন্নাহ, ২৬১

أوصى الخليفة من بعدي بأهل الذمة خيرا، أن يوفي لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم

আমার পরবর্তী খালীফাকে আমি এই ওয়াসীয়াত করছি যে তিনি যেন জিম্মীদের সাথে ভাল আচরণ করেন, তাদের সাথে কৃত চুক্তি পূরণ করেন, তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করেন এবং তাদের ওপর যেন সাধ্যাতীত বোঝা চাপানো না হয়।[২]

যিম্মীদের অধিকার রক্ষায় 'উসমান (রা.) ও খুবই সতর্ক সচেতন ছিলেন। খালীফা নির্বাচিত হওয়ার পর কালেক্টরদের উদ্দেশে প্রেরিত প্রথম পত্রে তিনি যিম্মীদের ওপর যুল্‌ম করার ব্যাপারে হুশিয়ারী উচ্চারণ করেন। তাঁর নির্দেশনায় নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত ছিল: যিম্মীদের ওপর সাধ্যাতীত বোঝা চাপানো যাবে না, উপার্জনবিহীন বৃদ্ধ যিম্মীর জিযইয়া মওকুফ করতে হবে এবং কোন যিম্মী মুসলিম হলে তার ওপর জিযইয়া আরোপ করা যাবে না।

যেসব যিম্মী খারাজী জমি চাষ করত তাদের কাছ থেকে খারাজ আদায় করা হত; খারাজ আদায়ের ব্যাপারে 'উসমান (রা.) এমন নির্দেশনা দেন যাতে সরকার ও চাষী কেউ ক্ষতিগ্রস্ত না হয়:

(১) জমি উর্বর না অনুর্বর তা যাচাই করা; দু'ধরনের জমিতে সমান খারাজ আরোপ করা যাবে না; (২) জমিতে কোন্ ধরনের ফসল হয় তা বিবেচনায় রাখা; (৩) সেচের প্রয়োজন হয় কিনা। বৃষ্টির পানিতে সিক্ত জমির খারাজ ও সেচের মাধ্যমে আবাদকৃত জমির খারাজ সমান হবে না।

উপর্যুক্ত বিষয়গুলো ছাড়া অন্য কোন শর্ত যদি নির্ধারিত থাকে তবে তাও মেনে চলতে হবে; এবং

খারাজ আদায়ের ক্ষেত্রে তা বিবেচনায় রাখতে হবে।

চ. ইয়াতিমের ওপর যুল্‌ম করা যাবে না: 'উসমান (রা.)-এর বিঘোষিত নীতিমালায় ছিল ইয়াতিমের প্রতি সদ্ব্যবহার করা এবং তার ওপর যুল্‌ম না করা। ইয়াতিমের সম্পদ তছরুফ করার ব্যাপারে আলকুরআনে কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে। তাই 'উসমান (রা.) এ বিষয়ে সবিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। রাষ্ট্রীয় আয়ের বিভিন্ন উৎসে ইয়াতিমের অধিকার ছিল, রাষ্ট্রীয় সম্পদ ব্যয়ের একটি খাত হল ইয়াতিম, তেমনিভাবে গানীমাতের সম্পদেও ইয়াতিমের অংশ রয়েছে। সাধারণত ইয়াতিম অভিভাবকবিহীন হয়ে থাকে, তাই 'উসমান (রা.) ইয়াতিমের হক আদায়ের ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখতেন।

---

২. আত-তাবারী, ২:১৯২।

ছ. কর কর্মকর্তাদের বিশ্বস্ততা ও আমানতদারী: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا

নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন আমানাত তার হকদারকে প্রত্যর্পণ করতে। তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে। আল্লাহ তোমাদেরকে যে উপদেশ দেন তা কত উৎকৃষ্ট! আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। [আলকুরআন ৪:৫৮।]

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُوْنَ

এবং যারা নিজেদের আমানাত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে। [আলকুরআন ২৩:৮।]

রাজস্ব বিভাগের কর্মকর্তাদের আবশ্যকীয় যোগ্যতা ছিল বিশ্বস্ততা ও আমানতদারী। আর্থিক কর্মকাণ্ডে জড়িত সকলের জন্য এটি ছিল অপরিহার্য গুণ। বিশ্বস্ততা ও আমানতদারীতে ঘাটতি থাকলে বাইতুল মাল ও করদাতা দু'জনেরই ক্ষতি সাধিত হওয়ার আশংকা থাকে। রাজস্ব কর্মকর্তাদের অসততার কারণে জনগণের সাথে সরকারের সম্পর্ক বিনষ্ট হতে পারে। তাই 'উসমান (রা.) এই বিষয়ে নিরাপোষ ছিলেন। বিশ্বস্ততার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হলেই কেবল কালেক্টর পদে নিয়োগ দেওয়া হত। কর্মরত রাজস্ব কর্মীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হলে তিনি প্রমাণ সাপেক্ষে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন।

জ. স্থাবর সম্পত্তির মালিকানা হস্তান্তর সহজীকরণ: 'উসমান (রা.)-এর অন্যতম আর্থিক সংস্কার ছিল স্থাবর সম্পত্তির মালিকানা হস্তান্তর সহজীকরণ। এ ব্যাপারে 'উমার (রা.) কিছু কঠোরতা আরোপ করেছিলেন। তিনি শীর্ষস্থানীয় মুহাজির ও আনসারী সাহাবীগণকে মাদীনার বাইরে বিশেষত নববিজিত অঞ্চলে স্থাবর সম্পত্তির মালিক হতে বারণ করতেন। নাগরিক অধিকার সংরক্ষণের চিন্তায় 'উসমান (রা.) এই প্রতিবন্ধকতা তুলে দেন এবং রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে নাগরিকদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি কেনাবেচা করা ও মালিক হওয়ার অধিকার মেনে নেন।

অনেক বিশিষ্ট সাহাবী খালীফার এই নীতির সুযোগ গ্রহণ করেন। তালহা ইবনু 'উবাইদিল্লাহ (রা.) খাইবারে সুহমান নামক একটি ভূখণ্ডের মালিক ছিলেন। তিনি ওটির বিনিময়ে হিজাযে বসবাসকারী কয়েকজন কূফাবাসী হতে ফোরাত তীরের নাশাসতাজ নামক জমিটুকু কিনে নেন। মারওয়ান ইবনুল হাকাম খালীফার কাছ থেকে কিছু অর্থ উপহার হিসেবে পেয়েছিলেন, সেটি গ্রহণ না করে তার বিনিময়ে তিনি 'নাহর মারওয়ান' কিনে নেন। অপরদিকে আল-আশ'আস তাঁর মালিকানাধীন হাদরামাউতের কিছু জমির

বিনিময়ে তীযনাবায নামক এলাকায় স্থাবর সম্পত্তির মালিক হন। তাছাড়া আরো অনেক ইরাকী ও হিজাযবাসী এই সুযোগে নিজেদের সম্পত্তি কেনাবেচা করেন।[৩]

ঝ. দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ: 'উসমান (রা.)-এর অন্যতম রীতি ছিল এই যে, তিনি দ্রব্যমূল্যের খোঁজখবর নিতেন এবং এর লাগাম ধরতেন। মূসা ইবনু তালহা বলেন, 'আমি 'উসমান (রা.)-কে দেখেছি তিনি জুমু'আর খুতবার সময় মিম্বারে দাঁড়িয়ে জনগণের কাছ থেকে দ্রব্যমূল্য সম্পর্কে খবরাখবর নিচ্ছেন।[৪]

ঞ. বিলাস-ব্যসনে গা ভাসিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে সাবধানতা: 'উসমান (রা.)-এর আমল ছিল প্রাচুর্যে ভরপুর। খিলাফাতের চতুঃসীমানায় বিজয় অর্জিত হওয়ায় বিপুল সম্পদের আমদানী হয় ইসলামী রাষ্ট্রে। কল্যাণ রাষ্ট্র হওয়ায় সেই সম্পদ জনগণের মাঝে বণ্টন করা হত। ফলে পুরো খিলাফাত প্রাচুর্য ও ঐশ্বর্যে ভরপুর হয়ে যায়। প্রাচুর্যের আধিক্য ও লাগামহীন ভোগবিলাস বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ধ্বংসের কারণ হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا

আমি যখন কোন জনপদ ধ্বংস করতে চাই তখন এর সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিদেরকে সৎকর্ম করতে আদেশ করি, কিন্তু তারা অসৎকর্ম করে; অতঃপর এর প্রতি দণ্ডাজ্ঞা ন্যায়সঙ্গত হয়ে যায় এবং তা আমি সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করি। [আলকুরআন ১৭:১৬।]

'উসমান (রা.) এ ব্যাপারে সম্যক ওয়াকিফহাল ছিলেন। তাই তিনি ভোগ-বিলাসের পরিণতি সম্পর্কে জনগণকে সাবধান করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, তিনটি বিষয় পূর্ণরূপে পাওয়া গেলে বিকৃতির সূচনা হয়: ক) নিয়ামাতের পূর্ণতা, খ) দাসীদের সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া, গ) অনারবদের কিরাআত। 'উসমান (রা.)-এর এই ভবিষ্যদ্বাণী পরবর্তীতে সত্য প্রমাণিত হয়েছিল। তাঁর খিলাফাতের শেষার্ধে বিজয়াভিযান বন্ধ হয়ে গেলে প্রাচুর্যাধিপতি কিছু অলস মস্তিষ্ক খিলাফাত ধ্বংসের পাঁয়তারা শুরু করে, যা খালীফার শাহাদাতের মত বেদনাদায়ক ও মর্মান্তিক ঘটনার জন্ম দেয়।

---

৩. আত-তাবারী, ৪:২৮০; ইবনুল আসীর, ২:৩৯৮।
৪. ইবনু সা'দ, ৩:৫৯।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাষ্ট্রীয় আয়ের উৎস ও ব্যয়ের খাত

এক: যাকাত[৫]:

'উসমান (রা.)-এর খিলাফাতকালে ইসলামী রাষ্ট্রের আয়ের অন্যতম উৎস ছিল যাকাত। এটি ছিল বাধ্যতামূলক আর্থিক ইবাদাত, যা নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদের মালিকের কাছ থেকে আদায় করা হত। পূর্ববর্তী দুই খালীফার মত 'উসমান (রা.)-এর আমলেও রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাত আদায় ও বন্টন করা হত। যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে তিনি নির্দেশনামূলক বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি বলেন,

> هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم، ومن لم تكن عنده لم تطلب منه، حتى يأتي بها تطوعا، ومن أخذ منه حتى يأتي هذا الشهر من قابل.
>
> এটি তোমাদের যাকাতের মাস; কেউ ঋণ গ্রহণ করে থাকলে তা আদায় করো, যাতে তোমাদের (প্রকৃত) সম্পদের যাকাত আদায় করতে পার। যার নিকট (নিসাব পরিমাণ) সম্পদ নেই তার কাছ থেকে যাকাত চাওয়া হবে না। তবে সে যদি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কিছু দান করতে চায় তাহলে ভিন্ন কথা। যার কাছ থেকে একবার যাকাত আদায় করা হবে আগামী বছরের এই মাস আসার পূর্বে তার কাছ থেকে পুনর্বার যাকাত আদায় করা হবে না।[৬]

যাকাতের মাস বলতে কোন্ মাসকে বুঝানো হয়েছে, এ বিষয়ে দু'ধরনের বক্তব্য পাওয়া যায়: ক) ইবরাহীম ইবনু সা'দ বলেন, রামাদান মাস; খ) আবূ 'উবাইদ বলেন, মুহার্‌রাম মাস। সে যাই হোক না কেন 'উসমান (রা.)-এর এই উক্তি হতে যাকাত আদায়ের কিছু মূলনীতি পাওয়া যায়:

১. অর্জিত সম্পদের বর্ষপূর্তি: বর্ষপূর্তি ছাড়া যাকাত ফারয হয় না। তবে যাকাতের ক্ষেত্রে চান্দ্রবর্ষের হিসাব করা হয়, সৌরবর্ষের হিসাবে যাকাত আদায় করা যায় না। 'উসমান (রা.)-এর বক্তব্যের শেষাংশ হতে এটি পরিষ্কার হয় যে এক বছরে দু'বার যাকাত আদায় করা হয় না।

---

৫. আরবী যাকাত শব্দের অর্থ বৃদ্ধি বা পবিত্রতা; যাকাত প্রদানের মাধ্যমে সম্পদ আবর্তিত হয় এবং চূড়ান্ত বিচারে সম্পদের পরিবৃদ্ধি ঘটে। অপরদিকে যাকাত সম্পদকে পবিত্র করার পাশাপাশি সম্পদশালীর মন হতে লোভ-লালসা ও কৃপণতা দূর করে। কারো অধিকারে ৭.৫ তোলা (বা ততোধিক) স্বর্ণ বা ৫২.৫ তোলা (বা ততোধিক) রৌপ্য বা সমপরিমাণ (প্রয়োজনের অতিরিক্ত) অর্থ এক বছর জমা থাকে তাহলে তাকে ২.৫% যাকাত দিতে হবে। গবাদিপশু ও উৎপন্ন ফসলেরও যাকাত রয়েছে [বিস্তারিত জানতে ফিক্‌হের গ্রন্থ দেখুন]।

৬. আবূ 'উবাইদ, আল-আমওয়াল, ৫৩৪।

২. যাকাতের পরিমাণ নির্ধারণের সুবিধার্থে ঋণ পরিশোধের আহ্বান: যাকাতের পরিমাণ নির্ধারণের জন্য নিজের সম্পদের সঠিক হিসাব করা দরকার। এজন্য 'উসমান (রা.) নির্দেশনা দিয়েছেন, নিজের সম্পদের সঠিক হিসাবের জন্য ঋণ আদায় করা উত্তম। ঋণ আদায়ের পর বাকি সম্পদ যদি নিসাব পরিমাণ হয় তাহলে হিসাব করে যাকাত প্রদান করতে হবে।

৩. নফল সাদাকাহ্ প্রদানের আহ্বান: নিসাব পরিমাণ সম্পদ না থাকায় যাদের ওপর যাকাত ফারয হয় না তাদেরকে নফল সাদাকাহ্ প্রদানের আহ্বান জানিয়েছেন 'উসমান (রা.)। স্বতঃপ্রবৃত্ত ঐচ্ছিক দান করার মাধ্যমে স্বল্প আয়সম্পন্ন নাগরিকরা রাজস্ব আয় বৃদ্ধিতে এবং রাষ্ট্রের উন্নয়নে ভূমিকা পালন করতে পারে।

এখানে একটি বিষয় পরিষ্কার করে আলোচনা করা দরকার। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও খুলাফা রাশিদূনের আমলে মানুষের প্রকাশ্য সম্পদ তথা গবাদিপশু ও উৎপাদিত ফসলের যাকাত বাধ্যতামূলকভাবে আদায় করা হত। গবাদিপশুর যাকাত না দেওয়ার কারণে আবূ বাক্‌র (রা.) যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। স্বর্ণ, রৌপ্য ও নগদ টাকাকড়ির যাকাতও রাষ্ট্রীয়ভাবে আদায় করা হত; তবে এসব গোপন সম্পদ প্রকাশ করতে বাধ্য করা হত না। বরং সম্পদের মালিক যে হিসাব দিত তাই মেনে নেওয়া হত। প্রকাশ্য সম্পদের যাকাত আদায়ে রাষ্ট্র বাধ্য করতে পারত। গোপন সম্পদের যাকাত যদি না দেয় তাহলে তা বান্দা ও আল্লাহর মাঝে ফায়সালা হবে।

ব্যয়ের খাত: আলকুরআনে যাকাতের সম্পদ বণ্টনের খাতগুলো সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করা হয়েছে:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَالعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِى سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

সাদাকা (যাকাত) তো কেবল নিঃস্ব, অভাবগ্রস্ত ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের জন্য, যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা যায় তাদের জন্য, দাসমুক্তির জন্য, ঋণ ভারাক্রান্তদের, আল্লাহর পথে ও মুসাফিরদের জন্য। এটি আল্লাহর বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। [আলকুরআন ৯:৬০]

'উসমান (রা.)-এর আমলেও উপর্যুক্ত আটটি খাতে যাকাতের সম্পদ ব্যয় করা হত। তবে তিনি উল্লেখিত খাতগুলোর আওতায় যাকাতের সম্পদ ব্যয়ের কিছু নতুন পন্থা চালু করেন। নিম্নে সেগুলোর বিবরণ উপস্থাপিত হল:

১. দরিদ্র ও মুসাফিরের মাঝে খাবার বিতরণে যাকাতের অর্থ ব্যয়: দরিদ্র ও মুসাফিরদের জন্য যাকাতের অর্থব্যয়ের নতুন একটি পন্থা উদ্ভাবন করেন 'উসমান (রা.)। তিনি রামাদান মাসে দরিদ্র ও মুসাফিরদের জন্য মাসজিদে খাবারের আয়োজন করতেন।

ই'তিকাফকারীরা এই খাবার গ্রহণ করতে পারতেন। এই কর্মসূচির মাধ্যমে 'উসমান (রা.), রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সুন্নাত পালনে মুসল্লিদেরকে উদ্বুদ্ধ করেন। মাসজিদে ইফতার ও সাহরী প্রস্তুত থাকায় ই'তিকাফকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।[৭]

২. যাকাতের অর্থে মেহমানখানা নির্মাণঃ সেকালে মাসজিদ সংলগ্ন কিছু কামরা থাকত যেখানে মুসাফিররা স্বল্প সময়ের জন্য অবস্থান করত। 'উসমান (রা.) যাকাতের অর্থে বিভিন্ন শহরে বেশ কিছু অতিথিশালা নির্মাণ করেন, ফলে মুসাফিরদের কষ্ট দূর হয়[৮]।

৩. যাকাত তহবিল হতে দাসদেরকে অর্থ প্রদানঃ কূফার দাসদেরকে 'উসমান (রা.) যাকাত তহবিল হতে মাসিক ভাতা দিতেন।[৯] পরিমাণে নগণ্য হলেও এটি দাসদের উপকারে আসত। ইতোপূর্বে সাধারণত দাস-মুক্তির ক্ষেত্রে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা হত। 'উসমান (রা.) সর্বপ্রথম এই খাত হতে দাসদেরকে মাসোহারা প্রদান করেন।

৪. জিহাদের প্রস্তুতিঃ জিহাদের জন্য অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় ও মুজাহিদদের সামান সরবরাহের ক্ষেত্রে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা হত। আলকুরআনে যাকাতের অর্থ ব্যয়ের অন্যতম যে খাতের কথা বলা হয়েছে তা হল 'আল্লাহর পথে'। এখানে 'আল্লাহর পথে' বলতে *আল্লাহর পথে জিহাদকে* বুঝানো হয়েছে বলে অধিকাংশ 'আলিম মত প্রকাশ করেছেন। তাই জিহাদের প্রস্তুতিতে যাকাতের অর্থ ব্যয় ন্যায়সঙ্গতই ছিল।

৫. যাকাত তহবিল হতে ঋণ গ্রহণ করে জনকল্যাণে ব্যয়ঃ মাঝে মাঝে 'উসমান (রা.) যাকাত তহবিল হতে উদ্বৃত্ত অর্থ ধার করে জনকল্যাণে ব্যয় করতেন। পরবর্তীতে অন্যান্য তহবিলে অর্থ আগমন ঘটলে তা হতে যাকাত তহবিলে অর্থ ফেরত দিতেন। খালীফার এই ইখতিয়ার ছিল যে তিনি প্রয়োজন সাপেক্ষে এবং প্রত্যর্পণের শর্তে এক তহবিলের অর্থ অন্য তহবিলে স্থানান্তর করতে পারতেন।

দুই. গানীমাতের এক-পঞ্চমাংশঃ

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আমলে জিহাদ ও কিতাল শুরু হয়। জিহাদের এই ধারা আবূ বাকর (রা.) ও 'উমার (রা.)-এর আমলেও অব্যাহত ছিল। তৃতীয় খালীফা 'উসমান (রা.)-এর আমলে বিভিন্ন সীমান্তে বিজয়াভিযান অব্যাহত থাকে। বিভিন্ন দিকে বিজয় অর্জিত হওয়ায় রাষ্ট্রীয় কোষাগার স্ফীত হচ্ছিল। যেসব অঞ্চল যুদ্ধের মাধ্যমে বিজিত হয় সেখান থেকে অর্জিত যুদ্ধলব্ধ সম্পদকে গানীমাত বলা হয়; এর পুরো অংশ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হয় না। গানীমাতের সম্পদকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করে চার

---

৭. ইবনু কাসীর, ৭: ১৪৮।

৮. প্রাগুক্ত।

৯. আত-তাবারী, ৫:২৭৫।

ভাগই যোদ্ধাদের মাঝে বণ্টন করা হয়। বাকি এক পঞ্চমাংশ বাইতুল মাল বা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে প্রেরণ করা হয়। 'উসমান (রা.)-এর আমলে কী পরিমাণ গানীমাতের সম্পদ অর্জিত হয়েছিল, মাত্র একটি যুদ্ধের গানীমাতের হিসাব দিলে এ বিষয়ে অনুমান করা সম্ভব হবে।

আফ্রিকার গানীমাতের সম্ভাব্য হিসাব:

আবদুল মালিক ইবনু মাসলামা বলেন, আমরা 'আবদুল্লাহ ইবনু সা'দের সাথে আফ্রিকায় যুদ্ধ করেছি, তিনি আমাদের মাঝে গানীমাতের সম্পদ বণ্টন করেছেন নিম্নরূপে: পদাতিক সৈনিককে ১০০০ দীনার এবং অশ্বারোহীকে ৩০০০ দীনার বা স্বর্ণমুদ্রা।

এই বিবরণের আলোকে আফ্রিকার মোট গানীমাতের হিসাব বের করা যাক। আফ্রিকা অভিযানে মোট সৈনিক ছিল ২০,০০০ জন। আমরা যদি ধরে নিই শতকরা ১০ জন অশ্বারোহী ছিল তাহলে এদের সংখ্যা দাঁড়ায় ২,০০০ জনে। বাকী ১৮,০০০ ছিল পদাতিক সৈনিক।

সৈন্য সংখ্যা	প্রতিজনকে (দীনার)	মোট (দীনার)
১৮,০০০ জন (পদাতিক)	১০০০	১,৮০,০০,০০০
২,০০০ জন (অশ্বারোহী)	৩০০০	৬০,০০,০০০
বাইতুলমালে	এক-পঞ্চমাংশ	৬০,০০,০০০

সর্বমোট = ৩,০০,০০,০০০ (তিন কোটি দীনার)

মাত্র একটি অভিযানের গানীমাতের সম্পদের হিসাব প্রদত্ত হল। অনুরূপ অন্যান্য বিজয়ে কী পরিমাণ গানীমতের সম্পদ অর্জিত হয়েছে তা সহজেই অনুমেয়।

ব্যয়ের খাত:

গানীমাতের সম্পদ ব্যয়ের খাতও আলকুরআন দ্বারা সুনির্ধারিত:

وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِي الْقُرْبٰى
وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ

আরও জেনে রাখ যে, যুদ্ধে তোমরা যা লাভ কর তার এক পঞ্চমাংশ আল্লাহর, রাসূলের, রাসূলের স্বজনদের, ইয়াতীমদের, মিসকীনদের এবং পথচারীদের.. [আলকুরআন ৮:৪১]

এই আয়াতের আলোকে গানীমাতের সম্পদের চার পঞ্চমাংশ যোদ্ধাদের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া হয়। বাকি এক পঞ্চমাংশ বাইতুল মালে জমা করা হয়। এই অংশটুকু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আমলে আলকুরআনের নির্দেশনা অনুসারে পাঁচ ভাগে বণ্টন করা হত: ক) রাসূলের অংশ, খ) রাসূলের আত্মীয়স্বজনের অংশ, গ) ইয়াতিমের অংশ, ঘ) মিসকীনের অংশ এবং ঙ) মুসাফিরের অংশ।

খুলাফা রাশিদূনের আমলে ইয়াতিম, মিসকীন ও মুসাফিরদের মাঝে যথারীতি তাদের প্রাপ্য অংশ বণ্টন করা হত। রাসূলের আত্মীয়ের অংশটি বানূ হাশিম ও বানূ আবদিল মুত্তালিবের মাঝে বণ্টন করা হত। খালীফারা ছিলেন রাসূলুল্লাহর প্রতিনিধি; সেই হিসেবে গানীমাতের সম্পদ হতে তাঁরা রাসূলের অংশটি নিতে পারতেন। তবে খুলাফা রাশিদূনের কেউ এই অংশটি নেননি। বরং তারা এই অংশের অর্থ যুদ্ধপ্রস্তুতির কাজে ব্যয় করতেন। গানীমাতের সম্পদ ব্যয়ের এই ধারা 'উসমান (রা.)-এর আমলেও বহাল থাকে। তবে তাঁর কার্যধারার কিছু বিবরণ প্রদান প্রাসঙ্গিক হবে বলে মনে করা হচ্ছে:

১. 'উসমান (রা.)-এর আমলে শিশুকে গানীমাতর সম্পদ দেওয়া হয়নি: তামীম ইবনু আল-মাহরী বলেন, আমি আলেকজান্দ্রিয়ার দ্বিতীয় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। প্রথম পর্যায়ে আমার জন্য গানীমাতের অংশ বরাদ্দ করা হয়নি। এ নিয়ে আমার কাওম ও কুরাইশের মাঝে ঝগড়া হওয়ার উপক্রম হয়। একদল লোক বলল, 'এ বিষয়ে তোমরা বাসরা আল-গিফারী ও উকবা ইবনু 'আমির আল-জুহানীর সাথে কথা বল, এই দুইজন সাহাবী ছিলেন; এঁরা সমস্যার সমাধান দিতে পারবেন।' বিবদমান লোকগুলো দু'সাহাবীর কাছে গিয়ে গানীমাতের সম্পদ বণ্টনে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান চাইলেন। তারা দু'জনেই বললেন, 'এই কিশোরের নিম্নাভিমূলে লোম গজালে তাকে গানীমাতের অংশ প্রদান কর।' কয়েকজন লোক পরীক্ষা করে দেখতে পেল আমার লোম ওঠেছে; তখন তারা আমাকে গানীমাতের অংশ প্রদান করল।[১০]

এই ঘটনা হতে জানা গেল, 'উসমান (রা.)-এর আমলে শিশুদেরকে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হত না। তারা যদি সাহায্যকারী হিসেবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করত তবে তাদেরকে সামান্য কিছু দান করা হত; গানীমাতের অংশ দেওয়া হত না। এই কার্যধারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কর্মপদ্ধতির সাথে সাযুজ্যপূর্ণ।

২. সালব হত্যাকারীর জন্য: সালব বলতে নিহত যোদ্ধার অস্ত্রশস্ত্র ও বাহন (অশ্ব)-কে বুঝানো হয়। আবূ কাতাদা বলেন, হুনাইন যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঘোষণা দিয়েছিলেন, من قتل قتيلا له بينة فله سلبه 'কেউ কোনো শত্রুসৈন্যকে হত্যা করলে, এ ব্যাপারে যদি প্রমাণ থাকে তবে নিহতের সালব সে পাবে।'[১১] এ হাদীস হতে বুঝা যায় সালব পেতে হলে প্রমাণ উপস্থাপন করতে হবে; শুধু মৌখিক দাবি করলে হবে না।

৩. গানীমাতের সম্পদ হতে যুদ্ধ প্রস্তুতিতে ব্যয় করা: গানীমাতের সম্পদের এক পঞ্চমাংশ বাইতুল মালে জমা হত। তা হতে দরিদ্র, ইয়াতিম ও মুসাফিরদেরকে সাহায্য করা হত। রাসূলের (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অংশটি খালীফা গ্রহণ করতেন না; বরং এই অর্থ দিয়ে যুদ্ধাস্ত্র ও বাহন ক্রয় করা হত।

---

১০. ফুতূহু মিসর ওয়া আখবারুহা, ১২১।
১১. সাহীহুল বুখারী, কিতাবুল মাগাযী।

তিন. ফাই:

মুশরিকদের কাছ থেকে বিনাযুদ্ধে যে সম্পদ অর্জিত হয় তাকে ফাই বলে।[১২] এই সম্পদ অর্জনে যোদ্ধাদের ভূমিকা না থাকায় এটি তাদের মাঝে বণ্টন করা হয় না। ফাই বণ্টনের নীতিমালা আলকুরআন দ্বারা সাব্যস্ত:

مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُوْلِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ ولِلرَّسُوْلِ ولِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيْنِ وابْنِ السَّبِيْلِ

আল্লাহ জনপদবাসীদের নিকট হতে তাঁর রাসূলকে যা কিছু দিয়েছেন তা আল্লাহ্র, তাঁর রাসূলের, রাসূলের স্বজনগণের, ইয়াতিমদের, অভাবগ্রস্ত ও পথচারীদের [আল:কুরআন ৫৯:৭]।

এই আয়াতের নির্দেশনা অনুসারে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আমলে ফাই পাঁচ ভাগ করা হত: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অংশ, তাঁর আত্মীয়স্বজনের অংশ, ইয়াতিমের অংশ, মিসকীনের অংশ ও মুসাফিরের অংশ। ন্যায়নিষ্ঠ খালীফাদের আমলে গানীমাতের এক পঞ্চমাংশের ন্যায় ফাই বণ্টিত হত।

চার. জিযইয়া:

বিজিত জনগোষ্ঠী যদি ইসলাম গ্রহণ না করে তবে ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে বসবাসের জন্য তাদেরকে নির্দিষ্ট হারে বার্ষিক কর দিতে হয়। এটিকে জিযইয়া বলা হয়। তাদের জানমাল হিফাযাতের দায়িত্ব ইসলামী রাষ্ট্রের ওপর বর্তায় বলে এদেরকে যিম্মী বলা হয়। জিযইয়া প্রদানের বিনিময়ে যিম্মীরা নিরাপত্তা লাভ করে। তবে তাদেরকে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষায় অস্ত্রধারণ করতে হত না।

জিযইয়া ও খারাজ সমপর্যায়ের কর; তবে জিযইয়া ব্যক্তির ওপর আরোপ করা হয় এবং এটি আলকুরআন দ্বারা সাব্যস্ত:

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لا يُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَ لَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُوْلُهُ وَ لَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ أوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُوْنَ

যাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে তাদের মধ্যে যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে না ও শেষদিনেও নয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম গণ্য করে না এবং সত্য দীন অনুসরণ করে না; তাদের সাথে যুদ্ধ করবে, যে পর্যন্ত না তারা নত হয়ে স্বহস্তে জিয্ইয়া দেয় [আলকুরআন ৯:২৯]।

---

১২. হাসান ইবরাহীম হাসান, ৩৮৫।

ইসলাম গ্রহণ করলে জিযইয়া রহিত হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে ইসলাম গ্রহণকারী যিম্মীকে অন্যান্য মুসলিমের ন্যায় যাকাত দিতে হবে। অন্যদিকে খারাজ ভূমির ওপর আরোপ করা হয় এবং ভূস্বামীর ইসলাম গ্রহণের কারণে তা রহিত হয় না এবং এটি ইজতিহাদের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়েছে। মুসলিমদের যেমনি যাকাত দিতে হয় আহলি কিতাবকে তেমনি জিযইয়া দিতে হয়। দুই সম্প্রদায়-ই রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা সমানভাবে ভোগ করে। অন্যদিকে চিন্তা করলে দেখা যায়, ইসলামী রাষ্ট্রে আহলি কিতাবের ওপর কম কর আরোপ করা হয়। কারণ তাদের চতুষ্পদ জন্তুর ওপর কোন কর নেই।

যে শ্রেণীর মানুষের ওপর জিহাদ ফারয নয় তাদের ওপর জিযইয়া আরোপ করা হয় না; এজন্য শিশু, বৃদ্ধ এবং উপার্জনহীন সন্ন্যাসীর ওপর কোন জিযইয়া নেই। জিযইয়া আদায়ের ক্ষেত্রে অমুসলিম জনগোষ্ঠীকে সাধারণত তিন স্তরে বিভক্ত করা হয়:

ধনী: জিযইয়ার পরিমাণ: বার্ষিক ৪৮ দিরহাম;

মধ্যবিত্ত: জিযইয়ার পরিমাণ: বার্ষিক ২৪ দিরহাম;

নিম্নবিত্ত: জিযইয়ার পরিমাণ: বার্ষিক ১২ দিরহাম।

কারো ওপর জিযইয়া আদায় আবশ্যক হয়েছে, কিন্তু আদায়ের পূর্বে সে মারা গেল, তাহলে তা তার ওয়ারিসদের কাছ থেকে আদায় করা হবে না।

'উসমান (রা.)-এর আমলে জিযইয়া বাবদ আয়:

'উসমান (রা.)-এর আমলে রাষ্ট্রীয় কোষাগারের আয়ের অন্যতম উৎস ছিল জিযইয়া। এই খাত হতে কি পরিমাণ সম্পদ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হত তার একটি চিত্র নিম্নের বিবরণে পাওয়া যাবে:

ক. 'উমার (রা.)-এর আমলে চুক্তির ভিত্তিতে আজারবাইজান পদানত হয়েছিল। 'উসমান (রা.)-এর খিলাফাতের শুরুতে তারা চুক্তি ভঙ্গ করে। ফলে কূফার গভর্ণর আল-ওয়ালীদ ইবনু 'উকবা আজারবাইজানে অভিযান পরিচালনা করতে বাধ্য হন। আজারীরা পুনরায় বার্ষিক আট লক্ষ দিরহাম জিযইয়া প্রদানের শর্তে চুক্তি করে।[১৩]

খ. 'আবদুল্লাহ ইবনু সা'দ আফ্রিকাবাসীর সাথে ৩০০ কিনতার স্বর্ণ প্রদানের শর্তে চুক্তি করেছিলেন।[১৪]

গ. মু'আবিয়া সাইপ্রাসবাসীর সাথে এই শর্তে চুক্তি করেছিলেন যে, তারা বার্ষিক সাত হাজার দীনার প্রদান করবে।[১৫]

ঘ. জুরজান থেকে জিযইয়াহ্ বাবদ এক লাখ দিরহাম বাইতুল মালে জমা হত। এই পরিমাণ কখনো কখনো বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে তিন লাখে পৌঁছত।

---

১৩. আত-তাবারী, ৪:২৪৬।
১৪. প্রাগুক্ত, ৪: ২৫৫।
১৫. প্রাগুক্ত, ৪:২৬১।

ঙ. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমির মার্ভবাসীর সাথে এই শর্তে চুক্তি করেছিলেন যে, তারা বার্ষিক বিশ লক্ষ দিরহাম প্রদান করবে।[১৬]

চ. আল-আহনাফ ইবনু কায়স বালখবাসীর সাথে এই শর্তে চুক্তি করেন যে, তারা বার্ষিক চার লক্ষ দিরহাম প্রদান করবে।[১৭]

নাজরানবাসীর সাথে সম্পাদিত চুক্তির বাস্তবায়ন ও জিযইয়া হ্রাসকরণঃ

ইয়ামানের একটি অঞ্চলের নাম নাজরান। এটি ছিল খৃস্টান অধ্যুষিত এলাকা। হিজরী নবম সনে এদের একটি প্রতিনিধিদল রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে জিযইয়ার বিনিময়ে স্বভূমে বসবাসের অনুমতি প্রার্থনা করে। তাদের সেই আবেদন মঞ্জুর করা হয় এবং মুসলিমদের সাথে সম্পাদিত চুক্তির আলোকে তারা নাজরানে বসবাস করতে থাকে। আবূ বাকর (রা.) খালীফা নির্বাচিত হওয়ার পর তারা পূর্বের শর্তের আলোকে নতুন করে চুক্তি সম্পাদন করে। দ্বিতীয় খালীফা 'উমার (রা.) তাদেরকে ইয়ামানের নাজরান হতে ইরাকী নাজরানে স্থানান্তরিত করেন এবং তাদেরকে একটি লিখিত চুক্তিপত্র প্রদান করেন।[১৮]

'উসমান (রা.)-এর আমলে ইরাকী নাজরানের খৃস্টানদের একদল প্রতিনিধি কিছু দাবি-দাওয়া নিয়ে খালীফার সাথে সাক্ষাতের জন্য মাদীনায় আগমন করে। এদের সাথে আলোচনার পর খালীফা 'উসমান (রা.) নাজরান নিয়ন্ত্রণকারী গভর্ণর আল-ওয়ালীদকে নিম্নরূপ পত্র লিখেন:

بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله عثمان إلى الوليد بن عقبة، سلام الله عليك، فإني أحمد الله الذي لا إله هو، أما بعد؛ فإن الأسقف والعاقب وسراة أهل نجران الذين بالعراق، أتوني فشكوا إليّ وأروني شرط عمر لهم، وقد علمت ما أصابهم من المسلمين، وإني قد خففت عنهم ثلاثين حلة من جزيتهم وتركتها لوجه الله تعالى جل ثناؤه، وإني وفيت لهم بكل أرضهم التي تصدق عليهم عمر عقبى مكان أرضهم باليمن فاستوص بهم خيرا فإنهم أقوام لهم ذمة، وكانت بيني وبينهم معرفة، وانظر صحيفة كان عمر كتبها لهم فأوفهم ما فيها، وإذا قرأت صحيفتهم فارددها عليهم والسلام

১৬. প্রাগুক্ত, ৪: ৩১৮।
১৭. প্রাগুক্ত, ৪:৩০৭।
১৮. আবূ ইউসুফ, আল-খারাজ, ৭৪।

> বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, 'আবদুল্লাহ 'উসমান (রা.) হতে আল-ওয়ালীদ ইবনু 'উকবা'র প্রতি– তোমার ওপর আল্লাহ্‌র শান্তি বর্ষিত হোক! আমি আল্লাহ্‌র প্রশংসা করি, যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। অতঃপর, ইরাকী নাজরানের খৃস্টান বিশপ, 'আকিব ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের একটি প্রতিনিধি দল আমার কাছে কিছু অভিযোগ নিয়ে এসেছিল। উমার (রা.)-এর সাথে সম্পাদিত চুক্তিপত্রটি তারা আমাকে দেখিয়েছে। মুসলিমদের কাছে থেকে যে বিপদের সম্মুখীন তারা হয়েছে আমি সে সম্পর্কে অবগত হয়েছি। তাদের জিযইয়া হতে আল্লাহর তা'আলার খাতিরে আমি ৩০ পোশাক কমিয়ে দিয়েছি। ইয়ামানের ভূমির বিনিময়ে 'উমার (রা.) তাদেরকে ইরাকে যে পরিমাণ ভূমি দিয়েছিলেন তার সম্পূর্ণটুকু তাদেরকে প্রদানের ওয়াদা আমি করেছি। সুতরাং তুমি তাদের মঙ্গল কামনা কর, কারণ এদের যিম্মা তোমার ওপর। তদুপরি এরা আমার পূর্বপরিচিত। ওদের কাছে 'উমার (রা.) প্রদত্ত যে চুক্তিপত্র আছে সেটি দেখো, ওটির সকল শর্ত পূরণ কর। ও হ্যাঁ, পত্রটি পড়ার পর তাদের কাছে ফেরত দেবে।[১৯] এটি ছিল হিজরী সাতাশ সনের শাবান মাসের ঘটনা।

চুক্তি পালনকারী যিম্মীদের সম্পদ রক্ষা করবে ইসলামী রাষ্ট্রঃ 'উমার (রা.)-এর আমলে মিসরের রাজধানী আলেকজান্দ্রিয়া বিজিত হয়। শহরটির খৃস্টান অধিবাসীরা জিযইয়ার বিনিময়ে স্বধর্ম বহাল থাকা ও স্বভূমে বসবাসের অনুমতি পায়। 'উসমান (রা.)-এর আমলের শুরুর দিকে রোমানদের উস্কানিতে আলেকজান্দ্রিয়ার কিছু খৃস্টান বিদ্রোহ করে। 'আমর ইবনুল 'আস (রা.)-এর নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী রোমানদের পরাভূত করে আলেকজান্দ্রিয়া পুনর্দখল করে। যুদ্ধশেষে গানীমাতের সম্পদ বণ্টনের পূর্বে আলেকজান্দ্রিয়ার অধিবাসী কিছু খৃস্টান এসে দাবি করে যে, তারা চুক্তি ভঙ্গ করেনি। অতএব তাদের সম্পদ যেন গানীমত হিসেবে বণ্টন করা না হয়। 'আমর তাদের দাবি মেনে নেন এবং প্রমাণের ভিত্তিতে চুক্তি পালনকারী সকল যিম্মীর সম্পদ ফেরত দেন। মুসলিমরা শান্তিতে-সমরে এমনিভাবেই যিম্মীদের জানমাল রক্ষার দায়িত্ব পালন করেছে।

সামষ্টিক দায়িত্ব পালনের যিম্মীদের অংশগ্রহণঃ

'উসমান (রা.) ও তাঁর অধীনস্থরা যিম্মীদেরকে সমাজের মূলধারার সাথে সম্পৃক্ত করার জন্য সামষ্টিক দায়িত্ব পালনের সুযোগ দিতেন। তাদের ওপর আরোপিত কর সর্বদা অপরিবর্তিত থাকত না। বরং রাষ্ট্রীয় ব্যয় কমলে জিযইয়ার হারও হ্রাস করা হত। এ প্রসঙ্গে উদাহরণস্বরূপ আলেকজান্দ্রিয়া যুদ্ধের একটি ঘটনা বর্ণনা করা হচ্ছেঃ

আলেকজান্দ্রিয়ায় দ্বিতীয় অভিযানের প্রাক্কালে ইখনা'র খৃস্টান শাসক তালমা 'আমর ইবনুল 'আস (রা.)-এর কাছে এসে বলল, আমাদের একেক জনের ওপর

---

১৯. প্রাগুক্ত, ৭৪

আরোপিত জিযইয়ার পরিমাণ কত? 'আমর গীর্জার এক কোণার দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, 'তোমরা আমাদের ভাণ্ডারসদৃশ, যদি আমাদের খরচ বেড়ে যায় তবে আমরা তোমাদের জিযইয়ার হার বাড়িয়ে দেব, আর খরচ কমে গেলে জিযইয়ার হার কমিয়ে দেব। (সম্ভবত 'আমর এই ইঙ্গিত করলেন যে, এখন যুদ্ধাবস্থা চলছে, জিযইয়ার হার বেশি হওয়াটা স্বাভাবিক।)'

একথা শুনে তালমা রাগান্বিত হয়ে রোমে চলে যায়; রোমান বাহিনীর সাথে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়; আল্লাহর মেহেরবানীতে মুসলিমরা বিজয়ী হয়। যুদ্ধে তালমা বন্দী হলে তাকে 'আমরের কাছে আনা হল। কেউ কেউ বললেন, একে হত্যা করা হোক। 'আমর তাকে হত্যা তো করলেনই না, বরং যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করলেন। 'আমরের এই আচরণ দেখে তালমা স্বেচ্ছায় জিযইয়া প্রদানে রাজি হয়ে গেল। তাকে জিজ্ঞেস করা হল, এমন পরিস্থিতিতে রোমান শাসকের সামনে উপস্থিত করা হলে তিনি কী করতেন। তালমা বললেন, 'তিনি আমাকে হত্যা করতেন।'[২০]

আমরের এই উক্তি পর্যালোচনায় আমরা জিযইয়া আরোপের মূলনীতির সন্ধান পাই: 'তোমরা আমাদের ভাণ্ডারসদৃশ, যদি আমাদের খরচ বেড়ে যায় তবে আমরা তোমাদের জিযইয়ার হার বাড়িয়ে দেব, আর খরচ কমে গেলে জিযইয়ার হার কমিয়ে দেব।'

যিম্মীরা ইসলামী রাষ্ট্রের রাজস্ব আয়ের অন্যতম যোগানদাতা। আমর কর্তৃক ভাণ্ডার হিসেবে অভিহিত হওয়া তাদের জন্য সম্মানের ব্যাপার। যিম্মীদের ওপর জিযইয়া আরোপের মূলনীতিই রাষ্ট্রীয় চাহিদা। রাষ্ট্রীয় চাহিদা কমলে জিযইয়ার হার হ্রাস পাবে। যিম্মীদের করের হারের হ্রাস-বৃদ্ধির সাথে নাগরিকের রাষ্ট্রীয় কর্তব্য পালনে অংশগ্রহণের বিষয়টি ওৎপ্রোতভাবে জড়িত।

ব্যয়ের খাত: যাকাত ও গানীমাতের ন্যায় জিযইয়ার অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্র সুনির্ধারিত নয়। খালীফাগণ প্রয়োজনের তাকিদে নিজস্ব বিবেচনা অনুসারে এই সম্পদ ব্যয় করতেন। সাধারণত নাগরিকদের সামষ্টিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে জিযইয়ার অর্থ ব্যয় করা হত।

পাঁচ. খারাজ ও 'আশূর:

ক. খারাজ: তৃতীয় খালীফা 'উসমান (রা.)-এর আমলে ইসলামী বিজয় সম্প্রসারিত হয়। বিশাল এলাকা ইসলামী রাষ্ট্রের আওতাভুক্ত হয়। অনেক এলাকায় স্থানীয় অধিবাসীদেরকে ভূমিকর প্রদানের শর্তে স্বসম্পত্তিতে বহাল রাখা হয়। ফলে খারাজ খাত হতে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে বিপুল অর্থ সঞ্চিত হয়।

---

২০. ফুতূহু মিসর ওয়া আখবারুহা, ১০২।

খ. 'আশূরঃ এই কর ব্যবসায়িক পণ্যের মূল্যের ওপর আরোপ করা হয়। 'উমার (রা.) এর আমলে এটি প্রবর্তিত হয়। একবার আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা.) খালীফাকে লিখলেন, 'মুসলিম ব্যবসায়ীরা দারুল হারবে (কাফির রাষ্ট্র, যার সাথে মুসলিমদের চুক্তি নেই) গেলে তাদের কাছ থেকে পণ্যমূলের এক দশমাংশ কর আদায় করা হয়।' জবাবে 'উমার (রা.) 'আশূর-এর বিধান আরোপ করলেন। তিনি আবূ মূসা (রা.)-কে লিখলেন, 'তাদের (অর্থাৎ কাফির ব্যবসায়ীদের) কাছ থেকেও অনুরূপ কর (অর্থাৎ পণ্যমূলের এক দশমাংশ) আদায় কর, জিম্মীদের কাছ থেকে বিশ ভাগের এক ভাগ এবং মুসলিমদের কাছ থেকে ৪০ দিরহামে এক দিরহাম আদায় কর। তবে তাদের পণ্যমূল্য ২০০ দিরহামের কম হলে কোন কর দিতে হবে না, দুইশ' দিরহাম হলে পাঁচ দিরহাম দেবে।' আশূর একজন ব্যবসায়ীর কাছ থেকে বছরে একবারই আদায় করা হত। একদেশ থেকে অন্যদেশে না গেলে এই কর আরোপ করা হত না।

আশূরের এই নীতিমালা 'উসমান (রা.)-এর আমলেও বহাল ছিল। তৃতীয় খালীফার আমলে চতুর্মুখী বিজয়ের ফলে ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানা বর্ধিত হয়; জনসাধারণের হাতে প্রভূত পরিমাণ নগদ টাকা সঞ্চিত হয়; ফলে তাদের ক্রয়ক্ষমতা বেড়ে যায়। এর অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে ব্যবসাবাণিজ্য বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছিল। ফলশ্রুতিতে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে *'আশূর* খাত হতে আয়ও বেড়ে গিয়েছিল; কারণ এই কর পণ্যের ওপর আরোপ করা হয় না, বরং পণ্যমূল্যের ওপর আরোপ করা হয়।
'আশূর ও খারাজের সুনির্দিষ্ট ব্যয়ের খাত নেই; খালীফা ও গভর্ণরগণ নিজস্ব বিবেচনার আলোকে সামষ্টিক প্রয়োজন মেটাতে এই অর্থ ব্যয় করতেন।

ছয়. ভূমি বন্দোবস্ত বা জায়গীর প্রদানঃ

অনাবাদী জমি আবাদের জন্য ভূমি বন্দোবস্ত প্রদানের ধারা আবূ বাকর (রা.)-এর আমলে প্রবর্তিত হয়। আল-জারফ ও কানাতের মধ্যবর্তী এক খণ্ড অনাবাদী জমি তিনি আয-যুবাইর ইবনুল 'আওয়াম (রা.)-কে বন্দোবস্ত প্রদান করেছিলেন।[২১] মাজা'আ ইবনু মুরারা আল-হানাফীর অনুকূলে তিনি ইয়ামামার হাদরামা নামক গ্রামটি বরাদ্দ প্রদান করেন। আরো কয়েকজনকে তিনি ভূমি জায়গীর প্রদানে মনস্থ করেছিলেন; তারা হলেন, আয-যাবারকান ইবনু বাদর, 'উয়াইনা ইবনু হিসন আল-ফাযারী ও আকরা' ইবনু হাবিস আত-তামীমী। কিন্তু 'উমার (রা.)-এর বিরোধিতার কারণে এদের অনুকূলে জমির বন্দোবস্ত প্রদান করতে পারেননি। 'উমার (রা.) জায়গীর প্রথার বিরোধী ছিলেন না; তবে জমি বন্দোবস্ত প্রদানের মাধ্যমে আনুকূল্য দেখিয়ে কাউকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করার

---

২১. ইবনু সা'দ, ৩:১০৪।

বিরুদ্ধে তিনি অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। 'উমার (রা.) নিজেই জমি বন্দোবস্ত প্রদানের বিষয়ে উদারতা দেখিয়েছেন। তিনি বলেছেন, يا أيها الناس من أحيا أرضا ميتا فهي له 'হে জনমণ্ডলী! যে ব্যক্তি কোন অনাবাদী জমি আবাদ করবে সেটি তার হয়ে যাবে।' প্রাথমিকভাবে তিন বছরের জন্য অনাবাদী জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হত। এই সময়ের মাঝে আবাদ করা না হলে 'উমার (রা.) তা ফিরিয়ে নিতেন। 'উমার (রা.) আয-যুবাইর ইবনুল 'আওয়াম (রা.)-কে পুরো আকীক অঞ্চল, আলী ইবনু আবি তালিব (রা.)-এর অনুকূলে ইয়ানবু এলাকার বন্দোবস্ত প্রদান করেছিলেন। 'আলী (রা.) তাঁর নামে বরাদ্দকৃত জমিকে উর্বর জমিতে পরিণত করেছিলেন; পরে এটি সাদকাহ করে দেন।

অনাবাদী জমি বন্দোবস্ত প্রদানের এই ধারা 'উসমান (রা.)-এর আমলে বৃদ্ধি পায়। তিনি যাদের অনুকূলে জমি বরাদ্দ দিয়েছিলেন তার একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হল:[২২]

'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ আল-হুযালী [দুই নদের (দজলা-ফোরাত) মধ্যবর্তী একটি গ্রাম],
'আম্মার ইবনু ইয়াসির আল-'আনসী (আসবীনা অঞ্চল),
খাব্বাব ইবনুল আরাত আত-তামীমী (সা'নাব),
'আদী ইবনু হাতিম আত-তাঈ (রাওহা অর্থাৎ আবস নদীর তীরবর্তী ইরাকের একটি গ্রাম),
সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস আয-যুহরী আল-কুরাশী (পারস্যের হরমুয গ্রাম),
আয্-যুবাইর ইবনুল 'আওয়াম
উসামা ইবনু যায়িদ আল-কালবী
সা'ঈদ ইবনু যায়িদ আল-'আদভী আল-কুরাশী
জারীর ইবনু 'আবদিল্লাহ আল-বাজালী (ইউফ্রেটিস তীরবর্তী একটি গ্রাম)
ইবনু হুব্বার
তালহা ইবনু 'উবাইদিল্লাহ আত-তামীমী (নাশাসতাজ),
ওয়ায়িল ইবনু হিজর আল-হাদরামী (যুরারাহ)
খালিদ ইবনু 'উরফুতাহ আল-কুযা'ঈ (হাম্মাম আ'য়ান),
আল-আশ'আস ইবনু কায়স আল-কিন্দী (তীযানাবায),
আবূ মিরবাদ আল-হানাফী
নাফি' ইবনু আল-হারিছ ইবনু কালদা আস-সাকাফী
আবূ মূসা আল-আশ'আরী
'উসমান ইবনু আবিল 'আস আস-সাকাফী
ইমরান ইবনু হুসাইন
হুমরান (আযাদকৃত দাস)

'উসমান (রা.)-এর অনুমতিক্রমে মু'আবিয়াও (রা.) অনেক জমির জায়গীর

২২. তালিকাটি আল-বালাযুরীর আলোকে প্রস্তুতকৃত, পৃ. ২৭৩-৭৪।

প্রদান করেছিলেন। বিশেষত রোমান সীমান্তবর্তী এলাকায় প্রতিরক্ষার সুবিধার্থে বন্দোবস্ত প্রদানের মাধ্যমে জমি আবাদ করার ব্যবস্থা করা হয়।

অনাবাদী জমি আবাদ করার জন্য জায়গীর প্রদানের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় কোষাগারের আয় বর্ধনের ব্যবস্থা করেন 'উসমান (রা.)। জায়গীরদারকে কোন ভাড়া প্রদান করতে হত না; কিন্তু তাঁরা উৎপন্ন ফসলের 'উশর আদায় করতেন যা বাইতুল মাল বা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হত। 'উসমান (রা.) কর্তৃক গৃহীত এই কার্যক্রম অত্যন্ত সফল হয়েছিল। 'উমার (রা.)-এর আমলে বন্দোবস্তকৃত জমি হতে বার্ষিক ৯,০০,০০০ (নয় লাখ) দিরহাম আয় হত। 'উসমান (রা.)-এর আমলে এই খাতের রাজস্ব ৫,০০,০০,০০০ (পাঁচ কোটি) দিরহামে উন্নীত হয়।

সাত. রাষ্ট্রীয় চারণভূমিঃ

খুলাফা রাশিদূনের আমলে যাকাতের গবাদিপশু ও যুদ্ধের অশ্ব বিচরণের জন্য চারণভূমি সংরক্ষণ করা হত। রাষ্ট্রীয় আয়ের একটি অংশ এই খাতে ব্যয় করতে হত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নাকী' উপত্যকার চারণভূমিটি রাষ্ট্রীয় অশ্বের জন্য সংরক্ষণ করেছিলেন।[২৩] আবূ বাকর (রা.) ও 'উমার (রা.)-এর আমলেও এই চারণভূমিটি সংরক্ষিত ছিল। মাদীনার ৪০ কিলোমিটার দক্ষিণে এটির সীমানা শুরু; আর এটি আশি কিলোমিটার দীর্ঘ। আবূ বাক্‌র ও 'উমার (রা.)-এর আমলে এটি চারণভূমি হিসেবে সংরক্ষিত ছিল। 'উমার (রা.)-এর আমলে যাকাতের পশু এবং জিহাদের অশ্বের সংখ্যা বৃদ্ধিতে চারণভূমির সংখ্যা ও আয়তন বেড়ে যায়; এগুলির মধ্যে একটি ছিল রাবাযার চারণভূমি; হানী নামে এক গোলাম এটির দেখভাল করতেন। 'উমার (রা.) তাকে বলেছিলেন, গরীবদের গবাদিপশু রাষ্ট্রীয় চারণভূমিতে বিচরণ করতে পারবে; তবে ধনীদের জন্তু-জানোয়ার যেন তথায় বিচরণ না করে। বানূ সা'লাবা'র এলাকায় তিনি আরেকটি চারণভূমি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। স্থানীয়রা বিরোধিতা করলে উমার (রা.) এই বলে জবাব দিয়েছিলেন যে, البلاد بلاد الله، تحمى لنعم مال الله। 'ভূমি মাত্রই আল্লাহর! আল্লাহর সম্পদের জন্য তা সংরক্ষণ করা যাবে।'[২৪]

চারণভূমি সংরক্ষণের ক্ষেত্রে 'উসমান (রা.) পূর্বসূরি দু'খালীফার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন। তাঁর আমলে ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানা বর্ধিত হওয়ায় জনসংখ্যা বেড়ে যায়; যাকাত ও সাদাকাহ খাতে সংগৃহীত পশুর সংখ্যাও বেড়ে যায়। ফলে অধিক সংখ্যক চারণভূমি সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তাই তিনি পূর্বোক্ত চারণভূমিগুলোর পাশাপাশি আরো চারণভূমি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন।

---

২৩. আল-আলবানী, সাহীহ সুনানি আবি দাউদ, ২:৫৯৫।
২৪. ইবনু সা'দ, ৩:৩২৬।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বাইতুল মালের অর্থ ব্যয়ে জনকল্যাণে গৃহীত পদক্ষেপ

তৃতীয় খালীফা 'উসমান (রা.)-এর আমলে রাষ্ট্রীয় আয়ের উৎস এবং ব্যয়ের সুনির্ধারিত খাত সম্পর্কে পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে। যাকাত ও গানীমাতের সম্পদের ব্যয়ের খাত সুনির্দিষ্ট ছিল। রাষ্ট্রীয় আয়ের অন্যান্য উৎস হতে সংগৃহীত অর্থ খালীফা ও গভর্ণরগণ জনকল্যাণমূলক বিভিন্ন খাতে ব্যয়ে করতেন। 'উসমান (রা.)-এর আমলে রাষ্ট্রীয় ব্যয়ে যেসব জনকল্যাণমূলক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই পরিচ্ছেদে উপস্থাপন করা হবে।

ক. মাসজিদুল হারাম সম্প্রসারণ: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সময়ে কা'বাঘরের চারপাশে সংকীর্ণ চত্বর ছিল যা সালাত আদায় ও তাওয়াফের জায়গা হিসেবে ব্যবহৃত হত। আবূ বাকর (রা.)-এর আমলেও কা'বাঘরে কোন সম্প্রসারণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়নি। 'উমার (রা.) কাবার চারপাশে কিছু ভূমি ক্রয় করে তা মাসজিদুল হারামের অন্তর্ভুক্ত করেন। চারপাশে অনুচ্চ দেওয়ালও দেয়া হয়।

'উসমান (রা.)-এর আমলে বিজয়াভিযান বেড়ে যাওয়ায় ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানা বর্ধিত হয়। মুসলিমগণ অধিকহারে কা'বাঘরে হাজ্জ ও 'উমরা আদায় করতে আসে। ফলে 'উসমান (রা.) আবার মাসজিদুল হারাম সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। ২৬ হিজরীতে তিনি মাসজিদুল হারামের চারপাশের জমি ক্রয় করে তা মাসজিদের অন্তর্ভুক্ত করে এটি সম্প্রসারিত করেন। এবারেও চারপাশে অনুচ্চ দেওয়াল নির্মাণ করা হয়। একদল লোক জমি বিক্রি করতে অস্বীকার করেছিল। 'উসমান (রা.) তাদের জমির মূল্য বাইতুল মালে জমা দেন এবং তাদেরকে গ্রেফতার করেন। এই লোকদের ঔদ্ধত্য সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন, 'আমার ধৈর্যই এদেরকে দুঃসাহসী করেছে। ইতোপূর্বে 'উমার (রা.)ও জমি ক্রয় করে মাসজিদুল হারাম সম্প্রসারণ করেছেন। কৈ, তখনতো কেউ শোরগোল করেনি!' পরবর্তীতে 'আবদুল্লাহ ইবনু খালিদ ইবনু আসীদ বন্দীদের মুক্তির ব্যাপারে সুপারিশ করলে 'উসমান (রা.) তাঁদেরকে ছেড়ে দেন।[২৫]

খ. মাসজিদে নববী পুনর্নির্মাণ: 'উসমান (রা.)-এর আমলে মাদীনার জনসংখ্যা ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পায়। ফলে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে মাসজিদে নববী সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। এ বিষয়ে 'উসমান (রা.) বিশিষ্ট সাহাবীদের সাথে পরামর্শ গ্রহণ করেন; তারা মাসজিদটি ভেঙ্গে ফেলে নতুন করে বৃহদায়তনের মাসজিদ নির্মাণের পরামর্শ দেন। ২৯

---

২৫. আত-তাবারী, ৪:২৫১; ইবনুল আসীর, ৩৮২; আয-যাহাবী, ১০৫; ইবন কাসীর, ৭:১৫১।

হিজরীর কোন এক শুক্রবার জুম'আর খুতবা দিতে দাঁড়িয়ে 'উসমান (রা.) বলেন, আমি রাসূলের মাসজিদ ভেঙ্গে বৃহদাকারে এটিকে পুনঃনির্মাণ করতে চাই। আর আমি এই সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে এই কথা বলতে শুনেছি: من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة 'যে আল্লাহর জন্য মাসজিদ নির্মাণ করবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে বাড়ি বানাবেন।'[২৬] আমার পূর্বসূরির কাজ আমার জন্য আদর্শ ও অনুপ্রেরণা; উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) বর্ধিত আকারে মাসজিদটি পুনঃনির্মাণ করেছিলেন। এ বিষয়ে আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহাবীদের সাথেও পরামর্শ করেছি; তাঁরাও মাসজিদের বর্তমান কাঠামো ভেঙ্গে এটিকে বৃহদাকারে পুনঃনির্মাণের ব্যাপারে একমত হয়েছেন।' 'উসমান (রা.)-এর এই সিদ্ধান্ত মানুষ ভাল মনে গ্রহণ করে এবং তারা তাঁর সাফল্যের জন্য দু'আ করে। পরদিন সকালে নির্মাণ শ্রমিক নিয়োগ করে মাসজিদে নববী পুনঃনির্মাণের কাজ শুরু করেন। এবারের নির্মাণে নকশাকৃত পাথর ব্যবহার করা হয়, খুঁটিতে ব্যবহার করা হয় সীসাযুক্ত পাথর, ছাদে ব্যবহার করা হয় সেগুন কাঠ। ছয় দরজাবিশিষ্ট নবনির্মিত মাসজিদের দৈর্ঘ্য ছিল ১৬০ হাত এবং প্রস্থ ছিল ১৫০ হাত।[২৭]

খালীফার অনুসরণে গভর্ণরগণ বিভিন্ন প্রদেশে মাসজিদ নির্মাণ করতেন ও পুরাতন মাসজিদ সংস্কার করে সম্প্রসারিত করতেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আলেকজান্দ্রিয়ায় 'আমর ইবনুল 'আস (রা.) নির্মাণ করেন মাসজিদুর রাহমাহ। সেনাপতি শুরাইক ইস্তাখ্‌র বিজয়ের পর সেখানে একটি মাসজিদ নির্মাণ করেন।[২৮]

গ. জিদ্দায় বন্দর নির্মাণ: জাহিলী যুগে মাক্কাবাসীদের সমুদ্র বন্দর ছিল শা'ঈবা; এটি কিছুটা দূরত্বে অবস্থিত ছিল। ২৬ হিজরীতে একদল মাক্কাবাসী 'উসমান (রা.)-কে অনুরোধ করেন শা'ঈবা'র পরিবর্তে জিদ্দাকে যেন বন্দরে পরিণত করা হয়। কারণ এটি মাক্কার সন্নিকটে অবস্থিত। সরেজমিন যাচাই করার জন্য 'উসমান (রা.) জিদ্দায় গমন করলেন, জায়গাটি তাঁর পছন্দ হল। তিনি জিদ্দাকে একটি মনোরম সৈকত ও বন্দরে পরিণত করার জন্য নির্দেশ দিলেন। 'উসমান (রা.) নিজে লোহিত সাগরের পানিতে সাঁতার কাটলেন, বললেন, 'এটি বরকতময়।' সফরসঙ্গীদেরকে তিনি বললেন, 'তোমরাও পানিতে নাম, গোসল কর, তবে ইযার খুলে যেন কেউ না নামে।' তারপর 'আসফান-এর পথ ধরে তিনি মাদীনায় ফিরে গেলেন। ধীরে ধীরে শা'ঈবা সৈকতটি পরিত্যক্ত হয়, সৈকত ও বন্দর হিসেবে জিদ্দা চালু হয়ে যায়।[২৯]

ঘ. প্রথম নৌবহর প্রতিষ্ঠা: 'উসমান (রা.)-এর আমলেই মুসলিম বাহিনীকে প্রথমবারের মত নৌযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। সিরিয়ার গভর্ণর

---

২৬. আত-তাবারী, তারীখ., ৫:২৬৭।

২৭. আত-তাবারী, ৪:২৬৭; ইবনুল আসীর, ২:৩৯৩; ইবন কাসীর, ৭:১৫৪; আল-বালাযুরী, ৬।

২৮. আত-তাবারী, ৪:৩০১; ইবনুল আসীর, ২:৪০৮।

২৯. মুহাম্মাদ রাশীদ, যুন্নুরাইন 'উসমান ইবন 'আফ্‌ফান, ২৬।

মু'আবিয়া (রা.) ইসলামী রাষ্ট্রের প্রথম নৌবহর গড়ে তোলেন এবং রোমান সাম্রাজ্যের অংশ সাইপ্রাসে অভিযান পরিচালনা করেন। এই নৌবহর প্রতিষ্ঠায় বাইতুল মালের অর্থ ব্যয় করা হয়েছিল।

ঙ. সুপেয় পানির জন্য কূপ খনন: বাইতুল মাল বা রাষ্ট্রীয় কোষাগারের অর্থে গৃহীত জনকল্যাণমূলক পদক্ষেপের আরেকটি নমুনা হল আরীস কূপ খনন। মাদীনাবাসীদের সুপেয় পানির অভাব দূর করার জন্য ত্রিশ হিজরীতে এটি খনন করা হয়েছিল। এটি মাদীনা হতে দু'মাইল দূরত্বে অবস্থিত ছিল। একবার এক ঘটনা ঘটল: 'উসমান (রা.) কূপের কিনারায় বসে ছিলেন। তাঁর আঙ্গুলে ছিল রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নামাঙ্কিত আংটি। হঠাৎ আংটিটি কূপের পানিতে পড়ে গেল। বস্তুটির সন্ধান করতে গিয়ে কূপের সমস্ত পানি ফেলে দেওয়া হয়। উদ্ধারকারী শ্রমিকের জন্য 'উসমান (রা.) বিরাট এনামের ঘোষণাও দিলেন। কিন্তু ব্যাপক খোঁজাখুজির পরও আংটিটি পাওয়া গেল না। এতে 'উসমান (রা.) নিদারুণ দুঃখ পেলেন। পরবর্তীতে হারিয়ে যাওয়া আংটির আদলে আরেকটি রূপার আংটি বানানো হয় যাতে محمد رسول الله এই লেখাটি উৎকীর্ণ ছিল। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত 'উসমান (রা.) এই আংটি ব্যবহার করেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর এটি কোথায় হারিয়ে যায় বা কে নিয়ে যায় তা কেউ বলতে পারে না।[৩০]

চ. হাজ্জ ব্যবস্থাপনায় বাইতুল মালের অর্থ ব্যয়: 'উসমান (রা.)-এর আমলে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার হাজ্জ ব্যবস্থাপনা সহজীকরণের জন্য বাইতুল মালের অর্থ ব্যয় করতেন। কিবাতী তথা মিসরীয় লিনেন কাপড় দ্বারা কা'বা ঘরের গিলাফ প্রস্তুত করা হত।

ছ. বাইতুল মাল হতে মুআয্যিনের বেতন প্রদান: 'উসমান (রা.)-ই হলেন প্রথম খালীফা যিনি বাইতুল মাল হতে মুআয্যিনের জন্য বেতন নির্ধারণ করেছেন। ইমাম আশ-শাফি'ঈ বলেন,

قد أرزق المؤذنين إمام هدى عثمان بن عفان

সত্যপন্থী ইমাম 'উসমান ইবনু 'আফ্ফান (রা.) মুআয্যিনদের জন্য বেতন নির্ধারণ করেন।[৩১]

জ. বাইতুল মালের অর্থ হতে সৈনিকদের বেতন প্রদান: প্রাদেশিক গভর্ণরগণ নিজস্ব বাইতুল মাল হতে সৈনিকদেরকে বেতন প্রদান করতেন। এটি ছিলো গানীমাতের অতিরিক্ত। এ ব্যাপারে খালীফার অনাপত্তি ছিল; তিনি মিসরের শাসক 'আবদুল্লাহ ইবনু সা'দ ইবনু আবি সারাহ কে লিখেন,

---

৩০. ইবনু কাসীর, ৭:১৬১; ইবনুল আসীর, ২:৪০০-৪০১; আত-তাবারী, ৪:২৮১-৮২।

৩১. মুহাম্মাদ রাওওয়াস কিল'আজী, মাওসূ'আতু ফিকহি 'উসমান ইবন 'আফ্ফান (দারুন নাফাইস ১৯৮৩), ১৪।

قد علمت كيف كان هم أمير المؤمنين بالإسكندرية، وقد نقضت الروم مرتين، فألزم الإسكندرية رابطتها ثم أجر عليهم أرزاقهم وأعقب بينهم في كل ستة أشهر

আলেকজান্দ্রিয়ার ব্যাপারে আমিরুল মু'মিনীনের দুশ্চিন্তার বিষয়ে তুমি অবগত আছ। রোমানরা দু'বার বিদ্রোহ করেছে। সীমান্তরক্ষীরা যেন আলেকজান্দ্রিয়ায় সতর্ক প্রহরা অব্যাহত রাখে। অতঃপর তুমি তাদেরকে বেতন প্রদান করবে, প্রত্যেক ছয় মাস পর তাদেরকে অদলবদল করবে।[৩২]

ঝ. ইবাদাতকারীদের জন্য মাসজিদে খাবারের ব্যবস্থা: 'উসমান (রা.) মাসজিদে খাবারের ব্যবস্থা করেন; ফলে 'আবিদ ও ই'তিকাফকারীদের কষ্ট লাঘব হয়। মুসাফির ও দরিদ্ররাও মাসজিদে খাবার গ্রহণ করতে পারতেন।[৩৩]

ঞ. খালীফা ও গভর্ণরদের বেতন: প্রাদেশিক গভর্ণরদের বেতন বাইতুল মাল হতে নির্বাহ করা হত। তারা পূর্ণকালীন কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করতেন বলে তাদের নিজস্ব আয়ের কোন উৎস ছিল না। তাই বাইতুল মাল হতে তাদের বেতন–ভাতা প্রদান করা হত। খালীফা হিসেবে 'উসমান (রা.) রাষ্ট্রীয় রাজস্ব হতে কোন বেতন–ভাতা গ্রহণ করতেন না। তিনি কুরাইশদের মধ্যে সবচাইতে ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন। বাইতুল মালের অর্থের প্রতি তিনি মুহতাজ ছিলেন না। পারিবারিক ব্যয় তিনি ব্যক্তিগত আয় হতে নির্বাহ করতেন।

ট. রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে প্রদত্ত ভাতা বৃদ্ধি: রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে জনসাধারণকে ভাতা প্রদানের প্রথা দ্বিতীয় খালীফা 'উমার (রা.) চালু করেছিলেন।[৩৪] এই ব্যবস্থা 'উসমান (রা.)-এর আমলেও অব্যাহত ছিল। রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে দানের ক্ষেত্রে দীনে অগ্রগামীদেরকে প্রাধান্য দেওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়। একবার তিনি কূফার গভর্ণরকে লিখেন,

أما بعد، ففضل أهل السابقة القدمة ممن فتح الله عليك تلك البلاد، وليكن

---

৩২. কুত্ব ইবরাহীম মুহাম্মাদ, আস-সিয়াসাতুল মালিয়্যাহ্ লি 'উসমান ইবন 'আফ্ফান (কায়রো: আল-হাইআতুল মিসরিয়্যাহ আল-'আম্মাহ্ লিল কিতাব ১৯৮৬), ১৪০

৩৩. ইবনু কাসীর, ৭:১৪৮

৩৪. 'উমার (রা.)-এর আমলে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে বিপুল সম্পদ সঞ্চিত হলে তিনি সাহাবায়ে কিরামের পরামর্শক্রমে জনসাধারণের মাঝে ভাতা বিতরণের ব্যবস্থা করেন। এক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে আত্মীয়তা ও ইসলাম গ্রহণে অগ্রগণ্যতার ভিত্তিতে অগ্রাধিকারের নীতি প্রবর্তিত হয়। উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা (রা.)-এর জন্য বার্ষিক ১২ হাজার দিরহাম নির্ধারণ করেন। অন্যান্য নবীপত্নিগণকে বার্ষিক দশ হাজার দিরহাম প্রদান করা হত। এরপর ছিল বাদরী সাহাবীগণ; মুহাজির ও আনসার সাহাবীগণের মাঝে যারা বাদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের প্রত্যেকের জন্য বার্ষিক পাঁচ হাজার দিরহাম ভাতা নির্ধারণ করেন। এভাবে অন্যান্য নাগরিকদেরকেও ভাতা প্রদান করা হয়। বিস্তারিত জানতে দেখুন আল-বালাযুরী, ৪৪৮-৪৬১

من نزلها بسببهم تبعا لهم، إلا أن يكونوا تثاقلوا عن الحق وتركوا القيام به وقام به هؤلاء، واحفظ لكل منزلته وأعطهم جميعا بقسطهم من الحق، فإن المعرفة بالناس بها يصاب العدل.

অতঃপর, যাদের হাতে ঐ এলাকা বিজিত হয়েছে সেসব অগ্রগামীদেরকে প্রাধান্য দেবে, তাদের মাধ্যমে যারা এসেছে তারা যেন প্রথমোক্তদের অনুগামী হয়। তবে প্রথমোক্তরা যদি সত্যবিমুখ হয় এবং দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে অনীহা প্রকাশ করে এবং পরবর্তীরা যদি তা পালন করে তবে ভিন্ন কথা। প্রত্যেকের অবস্থান অনুযায়ী আচরণ করবে এবং সবাইকে অধিকার প্রদান করবে। কারণ মানুষকে জানাশোনা ন্যায় প্রতিষ্ঠায় সহায়ক।[৩৫]

বিজয়ের আধিক্যের কারণে 'উসমান (রা.)-এর আমলে ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানা বর্ধিত হয়; ফলে রাষ্ট্রীয় কোষাগারের আয়ও বেড়ে যায়। জনসাধারণকে ভাতা প্রদানে বর্ধিত আয়ের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। সৈনিকদের বেতন একশ দীনার করে বাড়িয়ে দেওয়া হয়। 'উসমান (রা.)ই প্রথম খালীফা যিনি রাষ্ট্রীয় ভাতার পরিমাণ বৃদ্ধি করেন। পরবর্তী খালীফারা তাঁর এই সুন্নাহ্ অনুসরণ করেন।[৩৬]

আল-হাসান বলেন, আমি 'উসমান (রা.)-এর ঘোষককে এই ঘোষণা দিতে শুনেছি, 'সকালে তোমরা পোশাক সংগ্রহ করে নেবে।' এই ঘোষণা শুনে লোকেরা সকালেই জামা সংগ্রহ করল। ঘোষক আরো বলল, 'সকালে তোমরা ঘি ও মধু সংগ্রহ করো।' আল-হাসান আরো বলেন, 'অঢেল রিযক ও প্রভুত কল্যাণ। ভূপৃষ্ঠে এমন কোন মু'মিন ছিল না যে অপর মু'মিনকে ভয় করত; তারা পরস্পরকে ভালবাসত, সহযোগিতা করত।'[৩৭]

সামাজিক জীবনে ও আর্থিক ক্ষেত্রে উপচে পড়া সম্পদের ভূমিকা:

'উসমান (রা.)-এর আমল ছিল আর্থিক প্রাচুর্যের আমল। বিজয়াভিযানের ফলে রাষ্ট্রের সম্প্রসারণ, জনাধিক্য ও আর্থিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পাওয়ায় রাষ্ট্রীয় কোষাগারে বিপুল অর্থের সমাগম ঘটে। অনিবার্যভাবেই সামাজিক জীবনে ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। রাষ্ট্রীয় কোষাগারের অর্থ পুঞ্জিভূত না রেখে 'উসমান (রা.) তা জনকল্যাণে ব্যয় করতেন, ফলে জনসাধারণের মাঝেও আর্থিক স্বচ্ছলতা ফিরে আসে; সামাজিক জীবনে যার প্রভাব ছিল লক্ষ্যণীয়। আবূ ইসহাক বলেন, একবার তাঁর দাদা 'উসমান (রা.)-এর কাছে গেলেন; খালীফা জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার পরিবারের মানুষ

---

৩৫. আত-তাবারী, ৪:২৮০।

৩৬. আত-তাবারী, ৪:২৪৫; ইবন কাসীর, ৭:১৪৭-৪৮; আল-বালাযুরী, ৪৫২।

৩৭. নূরুদ্দীন আল-হায়সামী, মাজমা'উয যাওয়াইদ (বৈরুত:দারুল কিতাবিল 'আরাবী ১৪০২ হি), ৯:৯৩-৪।

ক'জন?' আমার দাদা বললেন, 'এত জন।' 'উসমান (রা.) বললেন, 'তোমার জন্য ১৫০ দিরহাম ও তোমার পরিবারের জন্য ১০,০০০ দিরহাম নির্ধারণ করলাম।' মুহাম্মাদ ইবনু হিলাল আল-মাদীনী বলেন, তাঁর দাদী, 'উসমান (রা.)-এর কাছে যেতেন। একদিন 'উসমান (রা.) তাঁর খোঁজ লাগালেন। খালীফার স্ত্রী বললেন, 'গত রাতে সে এক বাচ্চা প্রসব করেছে।' খালীফা নির্দেশ দিলেন, 'তার কাছে ৫০ দিরহাম ও একটি পোশাক পাঠিয়ে দাও।' তারপর বললেন, 'এটি শিশুর জন্য উপহার এবং কাপড়টি তার মায়ের জন্য। এক বছর পার হলে শিশুর ভাতা ১০০ দিরহামে উন্নীত করা হবে।'[৩৮] মাদীনার আওয়ালী'র অধিবাসীদের ভরণপোষণ ভাতাও তিনি বাড়িয়ে দেন। সেনাপতি কুতন ইবনু 'আমর আল-হিলালী একবার তাঁর বাহিনীর সদস্যদের চার হাজার দিরহাম পুরস্কার দেন। বাসরার গভর্ণর 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমিরের কাছে অঙ্কটি বেশি হয়েছে বলে প্রতীয়মান হল; তিনি খালীফাকে লিখলেন। বিষয়টি অনুমোদন করে 'উসমান (রা.) বললেন, ما كان معونة في سبيل الله فهو جائز 'আল্লাহর রাস্তায় পথ চলায় সাহায্য হিসেবে যা দেওয়া হয় তা জায়েয।' 'উসমান (রা.)-এর এই উক্তি হতে পরবর্তীতে পুরস্কার অর্থে আরবীতে জায়িযা (جائزة) শব্দটি চালু হয়।[৩৯]

কোন সৈনিক মারা গেলে তার বেতন–ভাতার প্রাপ্য অংশটি তার ওয়ারিসদের মাঝে বণ্টন করতেন 'উসমান (রা.)। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রা.) মারা গেলে তার পুরস্কারের অংশ হিসেবে ১৫,০০০ দিরহাম তাঁর পরিবার-পরিজনের মাঝে বণ্টন করা হয়।[৪০]

'উসমান (রা.) এর আমলে কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায়িক কার্যক্রম সম্প্রসারিত ও বহুমুখী হয়। জনগণের হাতে প্রচুর প্রাচুর্যের আগমন ঘটে। সভ্যতা-ভব্যতা ও জীবনাচারের এমন নব নব পন্থা চালু হয় যা আরব বিশ্বে ইতোপূর্বে ছিল না। বৈষয়িক বিষয়ে বিজিত জাতিগুলোর কলাকৌশল দ্বারা বিপুলভাবে উপকৃত হয় আরবরা। শীর্ষস্থানীয় সাহাবীরাও দালান নির্মাণ করেন। বিভিন্ন দেশ হতে আনীত দাসরা খিলাফাতের সামাজিক রূপান্তর ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে বিপুল অবদান রাখেন।

---

৩৮. আল-ইদারাতুল 'আসকারিয়্যাহ্ ২:৭৬৯।
৩৯. আল-আসকারী, আল-আওয়াইল, ২:২৬,২৭।
৪০. প্রাগুক্ত।

৪র্থ পরিচ্ছেদ
বিচার ব্যবস্থা

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আমলে মাদীনায় স্বতন্ত্র কোন কাযী (বিচারক) ছিল না। রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার পাশাপাশি তিনি নিজেই ছিলেন বিচারক। প্রথম খালীফা আবূ বাক্র (রা.)-এর আমলেও বিচার ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানীকরণে খুব একটা অগ্রগতি হয়নি। দ্বিতীয় খালীফা 'উমার (রা.) তাঁর নিজস্ব প্রজ্ঞাবলে বিচার ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করতে সক্ষম হন। তিনি মাদীনা ও অন্যান্য প্রদেশে বিচারক নিয়োগ দেন এবং কুরআন সুন্নাহ্র আলোকে বিচার কাজ পরিচালনার জন্য সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা জারি করেন। 'উসমান (রা.) বিচার ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে দু'টো বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন:

এক: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও পূর্বসূরি দুই খালীফার আমলের কার্যধারা অনুসরণ ও সংরক্ষণ;

দুই: নতুন পরিস্থিতি ও নবোদ্ভূত সমস্যার সমাধানে যুগোপযোগী বিচার ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা।

এক. কাযী নিয়োগে 'উসমান (রা.)-এর নীতি:

কাযী নিয়োগে 'উমার (রা.)-এর কর্মনীতি থেকে 'উসমান (রা.)-এর কর্মনীতি ভিন্ন ছিল। দ্বিতীয় খালীফার আমলে মাদীনায় তিনজন কাযী বা বিচারক ছিলেন; তাঁরা হলেন আলী ইবনু আবি তালিব, যায়িদ ইবনু সাবিত ও আস-সাইব ইবনু ইয়াযিদ (রা.)। এঁরা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করতেন। 'উমার (রা.) এঁদের কাজে বিন্দুমাত্র হস্তক্ষেপ করতেন না। 'উসমান (রা.) খালীফা হওয়ার পর এঁদেরকে বরখাস্ত করেননি। তবে এঁদেরকে বিচার কাজের পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতাও প্রদান করেননি। কোন কোন ক্ষেত্রে কাযীরা খালীফাকে অবহিত করে ফায়সালা দিতেন। কখনো বা 'উসমান (রা.) নিজেই ফায়সালা করতেন, তবে তিনি তিন কাযীসহ শীর্ষস্থানীয় সাহাবীদের পরামর্শ গ্রহণ করতেন।

প্রদেশগুলোতে কাযী নিয়োগে 'উসমান (রা.) তিন ধরনের কর্মপন্থা অবলম্বন করেছেন। এক: কখনো কখনো তিনি সরাসরি কাযী নিয়োগ দিতেন। যেমন, তিনি কা'ব ইবনু সূরকে বাসরার কাযী নিয়োগ করেন। দুই: কখনো বা বিচারের দায়িত্ব ওয়ালী বা গভর্ণরের স্কন্ধে অর্পণ করতেন। যেমন, কা'ব ইবনু সূরকে বাসরার কাযী পদ হতে প্রত্যাহারের পর ওই দায়িত্ব প্রদেশের গভর্ণরের স্কন্ধে অর্পণ করেন। ইয়া'লা ইবনু

উমাইয়াকে তিনি সান'আ-এর গভর্ণর ও কাযী পদে নিয়োগ প্রদান করেন।[৪১] তিন: কোন কোন সময় গভর্ণরগণ প্রাদেশিক কাযী নিয়োগ দিতেন।

'উসমান (রা.) গভর্ণর, সেনাপতি ও জনসাধারণের উদ্দেশে পত্র লিখতেন, যার নমুনা এই গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে প্রদত্ত হয়েছে। কিন্তু তিনি কাযী বা বিচারকদের উদ্দেশ্যে পত্র লিখেছেন এমন নযির একেবারেই বিরল। এতেই অনুমিত হয় তিনি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে গভর্ণরের কাঁধে বিচারের দায়িত্ব অর্পণ করতেন। পক্ষান্তরে 'উমার (রা.)-এর পত্রাবলির উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল কাযীদের উদ্দেশ্যে প্রেরিত। এতেই প্রতীয়মান হয় 'উমার (রা.) প্রদেশগুলোতে স্বতন্ত্র কাযী নিয়োগ দিতেন।[৪২]

কাযী হিসেবে দায়িত্ব পালনে ইবনু 'উমার (রা.)-এর অপারগতা প্রকাশ:

একবার 'উসমান (রা.) ইবনু 'উমার (রা.)-কে কাযী হওয়ার প্রস্তাব দিলেন। প্রস্তাবটি ফিরিয়ে দিয়ে ইবনু 'উমার (রা.) বললেন, 'আমি দু'জনের মাঝে ফায়সালা করতে পারব না, এমনকি দুই ব্যক্তির ইমামতিও করতে পারব না। আপনি কি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেননি, من عاذ بالله فقد عاذ بمعاذ 'যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে পানাহ চাইল সে যথার্থ পানাহ চাইল।' 'উসমান (রা.) বললেন, হ্যাঁ (শুনেছি)।' ইবনু 'উমার (রা.) বললেন, 'আমি আল্লাহর কাছে পানাহ চাই, আপনি আমাকে কোন পদে নিয়োগ করবেন না।' তখন 'উসমান (রা.) তাঁকে অব্যাহতি দিলেন এবং বললেন, 'তুমি এ বিষয়টি কাউকে বল না।'[৪৩]

বিচারালয়:

কিছু ঐতিহাসিক বিবরণ পাঠে প্রতীয়মান হয় যে, 'উসমান (রা.) বিচারালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এটা যদি সত্য হয় তাহলে 'উসমান (রা.) ই হবেন প্রথম খালীফা যার আমলে বিচারালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। পূর্ববর্তী দুই খালীফা মাসজিদে বসে বিচারকাজ পরিচালনা করতেন।

'উসমান (রা.)-এর আমলের কয়েকজন বিচারক:

উসমান (রা.) স্বল্পসংখ্যক বিচারক নিয়োগ দিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হলো :

যায়িদ ইবনু সাবিত (মাদীনা)

আবুদ দারদা (দামিশক)

কা'ব ইবনু সূর (বাসরা)

---

৪১ আকরাম দিয়া আল-'উমরী, আসরুল খিলাফাতির রাশিদা (মাকতাবাতুল 'উলূম ওয়াল হিকাম ১৯৯৪), ১৪৩।

৪২ আল-বিলায়াহ 'আলাল বুলদান, ২:৯২।

৪৩. মুসনাদ আহমাদ, নং- ৪৭৫।

আবূ মূসা আল-আশ'আরী (বাসরা, গভর্ণর ও কাযী)
শুরাইহ (কূফা)
ইয়া'লা ইবনু উমাইয়া (ইয়ামান)
সুমামা (সান'আ)
'উসমান ইবনু কায়স ইবনু আবিল আস (মিসর)

দুই. 'উসমান (রা.)-এর বিচারকাজের কতিপয় নমুনা:

১. খালীফা হওয়ার সাথে সাথেই 'উসমান (রা.) একটি হত্যা মামলার সম্মুখীন হন: খালীফা হওয়ার সাথে সাথে 'উসমান (রা.)-এর আদালতে একটি হত্যা মামলা উত্থাপন করা হয়। সেটি হল 'উবাইদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.)-এর বিরুদ্ধে উত্থাপিত হত্যা মামলা। আবূ লুলু নামে এক মাজূসী 'উমার (রা.)-কে হত্যা করেছিল। 'উমার (রা.)-এর পুত্র 'উবাইদুল্লাহ (রা.) পিতৃহত্যার সংবাদে ক্রোধে বেসামাল হয়ে আবূ লুলুকে হত্যা করেন। একই সাথে তিনি জুফাইনা[৪৪] ও হুরমুযান নামক দু'ব্যক্তিকেও হত্যা করেন। 'উমার (রা.) ছুরিকাহত হওয়ার পর 'আবদুর রহমান ইবনু আবি বাক্র, 'উবাইদুল্লাহ্‌কে বলেছিলেন, গত রাতে আমি হুরমুজান, আবূ লুলু ও জুফাইনাকে গোপন সলা-পরামর্শ করতে দেখেছি। তাঁদের হাতে দু'ধারী এই ছুরিটিও দেখেছিলাম, যেটি দিয়ে তোমার পিতাকে হত্যা করা হয়। এজন্য 'উবাইদুল্লাহ ওই তিনজনকে হত্যা করেন। ক্রুদ্ধ 'উমার-পুত্রকে সা'দ ইবনু আবি ওয়াক্কাস (রা.) পাকড়াও করে তাঁর বাড়িতে আটক রাখেন। 'উসমান (রা.)-এর বাই'আত সম্পন্ন হওয়ার পর তিনি মাসজিদের পাশে বসতে না বসতেই তাঁর কাছে এই মামলা উত্থাপন করা হয়। খালীফা এ ব্যাপারে ফায়সালা দেওয়ার জন্য সাহাবায়ে কিরামের পরামর্শ কামনা করেন। 'আলী (রা.) বলেন, 'আমার মনে হয় সে মৃত্যুদণ্ড পাওয়ার উপযুক্ত।' একথা শুনে কয়েকজন মুহাজির সাহাবী বললেন, 'গতকাল তাঁর পিতা নিহত হয়েছেন, আজ তাকে হত্যা করা হবে?!' এই পরামর্শ গ্রহণ করে 'উসমান (রা.) মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে রক্তপণ আদায়ের নির্দেশ দিলেন। শুধু তাই নয়, 'উবাইদুল্লাহ (রা.)-এর পক্ষে সদাশয় খালীফা নিজ সম্পদ থেকে রক্তপণ আদায় করেন।[৪৫]

২. হত্যাকারীর বিচার: আল-ওয়ালীদ ইবনু 'উকবা তখন কূফার গভর্ণর। শহরের কয়েক যুবক ইবনুল হায়সামান আল-খুযা'ঈ-এর ঘরে প্রবেশ করে তাকে হত্যা করে। পার্শ্ববর্তী বাড়ির কর্তা আবূ শুরাইহ আল-খুযা'ঈ ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেন। তিনি চিৎকার করে লোকদেরকে ডাকাডাকি করলে লোকজন বের হয়ে হত্যাকারীদেরকে ধরে

---

৪৪. হীরার অধিবাসী জুফাইনা খ্রিস্টান ছিলেন। সা'দ ইবনু আবি ওয়াক্কাস (রা.) তাঁকে মাদীনায় এনেছিলেন মানুষকে লেখা শিখানোর জন্য [আয-যাহাবী ১০৩]।

৪৫. আত-তাবারী, ৪:২৩৯; ইবনুল আসীর, ২:৩৮৪।

ফেলে। এ সংক্রান্ত মামলা 'উসমান (রা.)-এর কাছে উত্থাপন করা হলে তিনি খুনীদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দেন।[৪৬]

৩. এক ব্যক্তি সম্পদের লোভে ব্যবসায়ীকে হত্যা করে: 'উসমান (রা.)-এর আমলে এক ব্যক্তি সম্পদের লোভে জনৈক ব্যবসায়ীকে হত্যা করে। খুনীর ওপর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়।[৪৭]

৪. যাদুকরের শাস্তি: উম্মুল মু'মিনীন হাফসা (রা.)-এর এক দাসী ছিল। সে তার মনিবাকে যাদু করেছিল। হাফসা জেরা করলে দাসীটি অপরাধ স্বীকার করে। তারপর হাফসার নির্দেশে আবদুর রহমান ইবনু যায়িদ দাসীটির ওপর মৃত্যুদণ্ড প্রয়োগ করেন। বিষয়টি 'উসমান (রা.)-এর কানে পৌঁছলে তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তখন হাফসার ভাই ইবনু 'উমার (রা.) খালীফাকে বলেন, 'আপনি উম্মুল মু'মিনীনের কাজের সমালোচনা করছেন কেন? অথচ ওই দাসী যাদু করার বিষয়টি স্বীকার করেছে। সে যথার্থ শাস্তিই পেয়েছে।' বস্তুতঃ 'উসমান (রা.) শাস্তির বিরোধিতা করেননি। বরং শাস্তি প্রয়োগ পদ্ধতির সমালোচনা করেছেন। একটি নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বৈধ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ও সম্পৃক্ততা ব্যতীত শাস্তি প্রয়োগ করা যায় না। এ কারণেই 'উসমান (রা.) হাফসার কাজের সমালোচনা করেন। এর অর্থ এই নয় যে, শাস্তি বেআইনী ছিল।[৪৮]

৫. অন্ধের শাস্তি: অন্ধ ব্যক্তি অজ্ঞাতসারে ও অনিচ্ছাকৃতভাবে কোন অপরাধ করলে তা ক্ষমার্হ। 'উসমান (রা.) বলেন, أيما رجل جالس أعمى فأصابه الأعمى بشيء فهو هدر 'কোন ব্যক্তি যদি অন্ধের সাথে বসে এবং তার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে তা অযথা বলে গণ্য হবে অর্থাৎ শাস্তিযোগ্য হবে না।'[৪৯]

৬. পারস্পরিক আক্রমণের অপরাধ: দু'ব্যক্তি যদি একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লিপ্ত হয় তবে উভয়েই অপরাধী বলে গণ্য হবে। কারণ দু'জনেই ইচ্ছাকৃতভাবে অপরের ক্ষতিসাধনে সচেষ্ট ছিল। এ বিষয়ে 'উসমান (রা.)-এর ফায়সালা ছিল: إذا اقتتل المقتتلان فما كان بينهما من جراح فهو قصاص 'দু'লড়াইকারী সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে আঘাতপ্রাপ্ত হলে কিসাসের মাধ্যমে তার প্রতিবিধান করা হবে।'[৫০]

৭. পশুর বিরুদ্ধে অপরাধ: কেউ কোন পশুর বিরুদ্ধে অপরাধ করলে বা পশুকে আঘাত করলে প্রতিকার হিসেবে জরিমানা দিতে হবে। 'উকবা ইবনু 'আমির বললেন, 'উসমান (রা.)-এর খিলাফাতকালে এক ব্যক্তি একটি পারদর্শী শিকারী কুকুর হত্যা করে।

---

৪৬. আত-তাবারী, ৪:২৭২।
৪৭. 'আসরুল খিলাফাতির রাশিদা, ১৫৩।
৪৮. মুহাম্মাদ রাওওয়াস কিল'আজী, ১৬৯-৭০।
৪৯. প্রাগুক্ত, ৯৯।
৫০. প্রাগুক্ত, ১০০।

বিচারে ঐ কুকুরের মূল্য ৮০০ দিরহাম নির্ধারিত হয়। 'উসমান (রা.)-এর নির্দেশে হত্যাকারী লোকটি কুকুরের মালিককে ঐ পরিমান জরিমানার অর্থ প্রদান করে।[৫১]

৮. আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে অপরাধঃ কোন ব্যক্তি নিজ জান-প্রাণ, ধন-মাল ও সম্মান-সম্ভ্রম রক্ষার্থে আক্রমণকারীকে আঘাত করলে বা হত্যা করলে তা অনর্থক বলে গণ্য হবে অর্থাৎ আত্মরক্ষার্থে হত্যাকারীর বিরুদ্ধে কিসাস প্রয়োগ করা যাবে না। ইবনু হাযম আল-মুহাল্লায় উল্লেখ করেছেন, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে অন্য পুরুষকে শয্যায় দেখতে পেয়ে ক্ষোভে-দুঃখে ঐ পুরুষটিকে হত্যা করে। বিষয়টি 'উসমান (রা.)-এর কাছে উত্থাপিত হলে তিনি রক্তের দাবি বাতিল করে দেন; কারণ হত্যাকাণ্ডটি সংঘটিত হয়েছিল সম্ভ্রম রক্ষার্থে।[৫২]

৯. মুরতাদের শাস্তিঃ মুরতাদের (ধর্মত্যাগী) ওপর শাস্তি প্রয়োগের পূর্বে তাকে তিনবার তাওবা করার জন্য আহ্বান জানাতে হবে। যদি সে তাওবা করে ইসলামে ফিরে আসে তবে তার ওপর কোন শাস্তি প্রয়োগ করা হবে না। আর যদি ইসলামে ফিরে আসতে অব্যাহতভাবে অস্বীকৃতি জানায় তাহলে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। 'উসমান (রা.)-এর আমলে 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রা.) কয়েকজন মুরতাদকে আটক করেছিলেন, এরা মুসাইলামা আল-কাযযাবের বাতিল দাওয়াত পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করছিল। ইবনু মাস'উদ (রা.) এদের ব্যাপারে 'উসমান (রা.)-কে লিখলেন; জবাবে 'উসমান (রা.) লিখলেন, 'সত্য দীন তাদের সামনে উপস্থাপন করুন, তাদেরকে বলুন কালিমার স্বীকৃতি দিতে। যারা এই আহবানে সাড়া দেবে তাদেরকে হত্যা করবেন না। আর যারা বাতিল ধর্মে অটল থাকবে তাদেরকে হত্যা করুন।' ইবনু মাস'উদ খালীফার নির্দেশনা অনুসারে তাদের সামনে সত্য দীন উপস্থাপন করলেন। কয়েকজন তাওবা করে ইসলামে ফিরে আসল, ইবনু মাস'উদ (রা.) তাদেরকে ছেড়ে দিলেন। বাকিরা তাওবা করতে অস্বীকার করলে তাদের ওপর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়।[৫৩]

১০. মদ্যপানের শাস্তিঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আমলে মদপায়ীর ওপর শাস্তি হিসেবে চল্লিশ বেত্রাঘাত করা হত। কখনো বা লোকেরা জুতো ও কাপড়ের প্রান্ত দিয়ে আঘাত করত। একই ব্যবস্থা আবূ বাকর (রা.)-এর সময়ও প্রচলিত ছিল। 'উমার (রা.)-এর শাসনকালের শুরুর দিকে মদ্যপানের শাস্তি চল্লিশ বেত্রাঘাতই ছিল। পরবর্তীতে সাহাবায়ে কিরামের সাথে পরামর্শক্রমে 'উমার (রা.) মদ্যপানের শাস্তি বাড়িয়ে আশি বেত্রাঘাতে উন্নীত করেন। 'উসমান (রা.) মদ্যপানের শাস্তির ব্যাপারে যুক্তিযুক্ত ও ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান গ্রহণ করেন। তাঁর ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি

---

৫১. প্রাগুক্ত, ১০২।
৫২. প্রাগুক্ত, ১০৩।
৫৩. প্রাগুক্ত, ১৫০।

প্রথমবার মদপায়ীকে চল্লিশ বেত্রাঘাত করেছেন। এই অপরাধ বারংবার সংঘটিত করলে তিনি আশি বেত্রাঘাত করেছেন। মদ্যপানের শাস্তির ক্ষেত্রে উপর্যুক্ত কার্যধারা গ্রহণ করে তিনি তাঁর দু'পূর্বসূরি আবূ বাকর (রা.), ও 'উমার (রা.)-এর বিচার-পদ্ধতির মাঝে অপূর্ব উপায়ে সমন্বয় সাধন করেছেন।[৫৪]

১১. মদ্যপানের অপরাধে বৈপিত্রেয় ভাইয়ের ওপর শাস্তি প্রয়োগ: আল-ওয়ালীদ ইবনু 'উকবা 'উসমান (রা.) বৈপিত্রেয় ভাই ছিলেন। খালীফা তাঁকে কূফার গভর্ণর পদে নিয়োগ করেছিলেন। কূফার কিছু ব্যক্তি তাঁর বিরুদ্ধে মদ্যপানের অভিযোগ উত্থাপন করেন; দু'জন সাক্ষীও অভিযোগের সপক্ষে বক্তব্য রাখেন। 'উসমান (রা.) আত্মীয়তার সম্পর্কের প্রতি দৃষ্টিপাত ও দুর্বলতা প্রদর্শন না করে আল-ওয়ালীদের ওপর শাস্তি প্রয়োগের জন্য আলী (রা.)-এর ওপর দায়িত্ব অর্পণ করেন। আলী (রা.) ও তাঁর পুত্র আল-হাসানের নির্দেশের ধারাবাহিকতায় 'আবদুল্লাহ ইবনু জা'ফর তাকে বেত্রাঘাত করতে থাকেন। 'আলী (রা.) গণনা করছিলেন; চল্লিশ বেত্রাঘাত সম্পন্ন হলে 'উসমান (রা.) তাঁকে থামতে বলেন। তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও আবূ বাকর (রা.) চল্লিশ বেত্রাঘাত করতেন, 'উমার (রা.) আশি বেত্রাঘাত করতেন, দু'টিই সুন্নাহ্; তবে চল্লিশই আমার কাছে ন্যায্য মনে হয়।'[৫৫]

আল-ওয়ালীদের ওপর শাস্তি প্রয়োগের এই ঘটনা 'উসমান (রা.)-এর প্রশংসামূলক কাজ হিসেবে পরিগণিত হয়। কারণ আল্লাহর বিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রে তিনি নিজের ভাইকেও ছাড় দেননি।

১২. অপ্রাপ্ত বয়স্কের চুরি: চুরির শাস্তি তখনই প্রয়োগ করা হবে যখন চোর প্রাপ্তবয়স্ক ও জ্ঞানসম্পন্ন হবে। অপ্রাপ্তবয়স্ক ও পাগলের ওপর চুরিসহ অন্য কোন অপরাধের শাস্তি প্রয়োগ করা হবে না। একবার 'উসমান (রা.)-এর কাছে এক বালক চোর আনা হল। তিনি বললেন, তোমরা ওর লোম গজানোর স্থানটি পরীক্ষা করে দেখ। পরীক্ষা করে দেখা গেল তার লোম গজায়নি। 'উসমান (রা.) তাঁর হাত কর্তন করেননি।[৫৬]

১৩. শিক্ষা প্রদানের জন্য বন্দী করে রাখা: দাবী ইবনু আল-হারিছ আল-বারজামী এক আনসারী গোত্র হতে কারহান নামে হরিণ-শিকারী একটি কুকুর ধার করেছিল। পরে সে কুকুরটি ফেরত দানে অস্বীকার করে। এ নিয়ে তার কাউম ও আনসার গোত্রটির মাঝে বিবাদ সৃষ্টি হয়। বিষয়টি 'উসমান (রা.)-এর কানে পৌঁছলে তিনি লোকটিকে বন্দী করে রাখেন। ঐ অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।[৫৭]

---

৫৪. প্রাগুক্ত, ৯৩।
৫৫. সাহীহ মুসলিম বি শারহ আন-নববী, ১১:২১৬।
৫৬. মুহাম্মাদ রাওওয়াস কিল'আজী, ১৭১।
৫৭. আত-তাবারী, ৪:৪০২।

১৪. মানহানির জন্য অপবাদের শাস্তি আরোপঃ মানহানির মামলায় 'উসমান (রা.) অপবাদের অনুরূপ শাস্তি প্রয়োগ করতেন। তাঁর আমলে এক লোক অপর ব্যক্তিকে বলেছিল, يا ابن شامة الوذر 'হে তিলক-ফাটার বাচ্চা।' মূলতঃ লোকটি অপর ব্যক্তির মাকে যিনাকারী বলে অপবাদ দিতে চেয়েছে। অপমানিত লোকটি খালীফার কাছে নালিশ করলে তিনি অভিযুক্তকে ডাকলেন; সে ইনিয়ে বিনিয়ে অপরাধ অস্বীকার করতে চাইল। 'উসমান (রা.) তার বক্তব্য গ্রহণ না করে তার ওপর অপবাদের শাস্তির অনুরূপ শাস্তি প্রয়োগ করলেন।[৫৮]

১৫. যিনার শাস্তিঃ স্বাধীন ও বিবাহিত নারী-পুরুষের যিনা (ব্যভিচার) প্রমাণিত হলে তার শাস্তি ছিল প্রস্তর নিক্ষেপে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা। 'উসমান (রা.)-এর আমলে এক রমণীর বিরুদ্ধে ব্যভিচার প্রমাণিত হলে 'উসমান (রা.) তাকে রজম করার নির্দেশ দেন। তবে রজম কার্যকরের সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন না।[৫৯]

---

৫৮. মুহাম্মাদ রাওওয়াস কিল'আজী, ২৪৭।
৫৯. প্রাগুক্ত, ১৬৪।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ফিকহী ইজতিহাদ

আলকুরআন ও আস-সুন্নাহ্‌র জ্ঞানে 'উসমান (রা.) এত বেশি পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন যে, তাঁকে মুজতাহিদ হিসেবে গণ্য করা যায়। ইবাদাত ও মু'আমালাতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি ইজতিহাদী সিদ্ধান্ত প্রদানের নযির স্থাপন করেছেন। নিম্নে তাঁর ইজতিহাদের কিছু নমুনা উপস্থাপন করা হল।

১. মিনা ও আরাফাতে পূর্ণ সালাত আদায় করাঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), আবূ বাকর (রা.) ও উমার (রা.) হাজ্জের সফরে মিনা ও আরাফাতে কসর সালাত আদায় করতেন অর্থাৎ চার রাক'আতের সালাত দু'রাক'আত আদায় করতেন। 'উসমান (রা.) তাঁর খিলাফাতের প্রাথমিক বছরগুলোতে হাজ্জের সফরে মিনা ও আরাফাতে কসর সালাত আদায় করেন। কিন্তু ২৯ হিজরীতে হাজ্জ সফরকালে তিনি মিনা ও আরাফাতে পূর্ণ সালাত আদায় করেন, অর্থাৎ চার রাক'আতের সালাত চার রাক'আতই আদায় করেন। খবর পেয়ে বিশিষ্ট সাহাবী আবদুর রহমান ইবনু 'আউফ (রা.) খালীফার কাছে ছুটে যান। তাঁর সাথে ইবনু 'আউফের দীর্ঘ কথোপকথন হয়:

ইবনু 'আউফ: এই স্থানে আপনি কি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে দু'রাক'আত সালাত আদায় করেননি?

'উসমান: হ্যাঁ।

ইবনু 'আউফ: আপনি কি আবূ বাকর (রা.)-এর সাথে এই স্থানে দু'রাক'আত সালাত আদায় করেননি?

'উসমান: হ্যাঁ।

ইবনু 'আউফ: আপনি কি 'উমার (রা.)-এর সাথে এই স্থানে দু'রাক'আত সালাত আদায় করেননি?

'উসমান: হ্যাঁ।

ইবনু 'আউফ: আপনি কি আপনার খিলাফাতের প্রাথমিক বছরগুলোতে এই স্থানে দু'রাক'আত সালাত আদায় করেননি?

'উসমান: হ্যাঁ।

এরপর খালীফা তাঁর কর্মনীতির ব্যাখ্যা দিয়ে বলেনঃ হে আবূ মুহাম্মাদ![৬০] শুনো, গত বছর কিছু ইয়ামানী হাজ্জযাত্রী ও কতিপয় অভদ্র লোক বলাবলি করছিল: 'মুকীমের সালাত দুই রাক'আত। কারণ তোমাদের ইমাম 'উসমান দু'রাক'আত সালাত আদায় করেন।' আমি তাদের এই ভুল ধারণা অপনোদন করতে চেয়েছি। তাছাড়া মাক্কায় আমার

---

৬০. আবদুর রহমান ইবনু 'আউফ (রা.)-এর উপনাম।

পরিবার রয়েছে, তায়েফেও আমার সম্পদ রয়েছে; এসব কারণে আমি এখানে মুকীমের ন্যায় চার রাক'আত সালাত আদায় করেছি।' খালীফার জবাব শুনে আবদুর রহমান ইবনু 'আউফ (রা.) বললেন, 'আপনার কোন ওযরই গ্রহণযোগ্য নয়। আপনি যে বললেন, মাক্কায় আপনার স্ত্রী আছে, এটি কোন গ্রহণযোগ্য কারণ নয়; আপনি চাইলে মাদীনায় অবস্থানরত স্ত্রী নিয়ে বের হতে পারেন। আপনার স্ত্রী তো আপনার ঘরেই অবস্থান করে। আর তায়েফের সম্পত্তির কারণেও আপনি মাক্কায় পূর্ণ সালাত আদায় করতে পারেন না। কারণ তায়েফের সাথে মাক্কার দূরত্ব তিন দিনের সফরের বেশি। তাছাড়া আপনি তায়েফবাসী নন। আর ইয়ামানবাসী ও অভদ্র লোকদের সম্পর্কে যা বললেন তাও যুক্তি হিসেবে ধোপে টিকবে না। দেখুন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওপর ওয়াহী নাযিল হচ্ছিল, তখনকার মুসলিমদের অনেকে পরিপূর্ণ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছিলেন না; তারপর আবূ বাকর (রা.) ও 'উমার (রা.) এলেন। তাঁদের সময়ে ইসলাম বিজয়ী ও স্থিতিশীল হল। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত 'উমার (রা.) তো দু'রাক'আত সালাতই আদায় করেছেন। ইসলামের এহেন শক্তিশালী অবস্থায় কতিপয় অভদ্রের সমালোচনায় চার রাক'আত সালাত আদায়ের কোন যুক্তি নেই।' ইবনু 'আউফের দীর্ঘ জবাব শুনে 'উসমান (রা.) বললেন, 'এটি একটি অভিমত যা আমি পোষণ করেছি।' একথা শুনে ইবনু 'আউফ (রা.) বের হয়ে গেলেন। পথিমধ্যে তাঁর সাথে 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রা.)-এর সাক্ষাৎ হল। তিনি বললেন, 'আবূ মুহাম্মাদ! 'উসমান (রা.) কি তাঁর মত পরিবর্তন করেছেন?' ইবনু 'আউফ (রা.) বললেন, 'না।' ইবনু মাস'ঊদ (রা.) বললেন, 'আমি কি করব?' ইবনু আউফ বললেন, 'আপনার জ্ঞানানুসারে আমল করুন।' ইবনু মাসঊদ (রা.) বললেন, 'মতবিরোধ খারাপ বিষয়, আমি জেনেছি খালীফা চার রাক'আত সালাত আদায় করেছেন, তাই আমিও চার রাক'আত সালাত আদায় করেছি।' আবদুর রহমান ইবনু 'আউফ (রা.) বলেন, 'আমিও বিষয়টি জেনেছিলাম, তবে আমি দুই রাক'আত সালাত আদায় করেছি। তবে এখন মতবিরোধ এড়ানোর জন্য আপনি যেভাবে বলছেন সেভাবে চার রাক'আতই আদায় করব।'[৬১]

'উসমান (রা.) ভিন্ন এক পরিস্থিতিতে ভিন্নরূপ এক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কতিপয় দুর্বল মুসলিম এই বলে অপপ্রচার চালাচ্ছিল যে খালীফা 'উসমান (রা.) মুকীম হওয়া সত্ত্বেও দুই রাক'আত সালাত আদায় করছেন। তাদের এই ভুল ধারণা ও অপপ্রচার দূর করার জন্য 'উসমান (রা.) মিনা ও 'আরাফাতে চার রাক'আত সালাত আদায় করলেন। আবদুর রহমান ইবনু 'আউফ (রা.) ও 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রা.) ভিন্নমত পোষণ করা সত্ত্বেও 'উসমান (রা.)-এর অনুসরণে চার রাক'আত সালাত আদায় করেন। কারণ তারা মতবিরোধের ফলে সৃষ্ট উম্মাহ্‌র বিভক্তির ব্যাপারে খুবই সাবধান ছিলেন।

---

৬১ আত-তাবারী, ৪:২৬৬-৬৮; ইবনুল আসীর, ২:৩৯৩-৯৪।

বস্তুত সফরে সালাত কসর ও পূর্ণরূপে আদায় করার বিষয়টিকে অনেক সাহাবী ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছেন। সফরে পূর্ণ সালাত আদায় করা সম্পূর্ণ অবৈধ হলে 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রা.) ও আবদুর রহমান ইবনু 'আউফ (রা.) বিষয়টি মেনে নিতেন না। কয়েকজন সাহাবী, যেমন 'আয়িশা, 'উসমান ও সালমান (রা.) সফরে পূর্ণরূপে সালাত আদায় করতেন। মোদ্দাকথা শারী'আহ-প্রদত্ত ঐচ্ছিকতার আওতায় 'উসমান (রা.) এমন এক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন যার মাধ্যমে তিনি দুর্বল ও দূরাগত মুসলিমদের ভুল ধারণা দূর করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

২. জুমু'আর দিনে দ্বিতীয় আযান বৃদ্ধিঃ বর্তমানে জুমুআর সালাতের পূর্বে দু'টি আযান দেওয়া হয়। একটি খুতবার শুরুতে, অপরটি জুমুআর ওয়াক্ত হওয়ার পর। বর্তমান যেটি প্রথম আযান সেটি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), আবূ বাকর (রা.) ও 'উমার (রা.)-এর আমলে প্রচলিত ছিল না। ৩০ হিজরীতে 'উসমান (রা.) এটি চালু করেন।[৬২] মাদীনা শহরের আয়তন বেড়ে যাওয়ায় সালাতের সময়ের ব্যাপারে মানুষকে সতর্ক-সজাগ করার জন্য এটি প্রবর্তন করা হয়। মাদীনার যাওরা' নামক স্থানে এই আযান দেওয়া হত।[৬৩] 'উসমান (রা.) (বর্তমানে যেটি প্রথম আযান) জুমু'আর এই দ্বিতীয় আযান চালু করেন। পরবর্তীতে এটি একটি প্রতিষ্ঠিত সুন্নাহ-এ পরিণত হয়। 'আলী (রা.), বানূ উমাইয়া ও বানূ 'আব্বাসের আমলে এটি চালু ছিল। শুধু তাই নয়, বর্তমান সময়েও সারা পৃথিবীতে এটি চালু রয়েছে। খুলাফা রাশিদূনের আনুগত্য করার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন, عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي 'তোমরা আমার সুন্নাহ্ ও আমার পরে আগত খুলাফা রাশিদূনের সুন্নাহ আঁকড়ে ধরবে।'[৬৪] এই হাদীসের আলোকে খালীফা রাশিদ 'উসমান (রা.) প্রবর্তিত জুমু'আর দিনের দ্বিতীয় আযান মুসলিম উম্মাহ্‌র ব্যাপক সমর্থনে স্থায়ী সুন্নাহ-এ রূপান্তরিত হয়েছে।

৩. ইসলাম গ্রহণের পর প্রতিদিন গোসল করাঃ ইসলাম গ্রহণ করার পর থেকে আজীবন প্রতিদিন গোসল করেছেন 'উসমান (রা.)। একবার অজ্ঞাতসারে নাপাক অবস্থায় তিনি ফাজরের সালাতে ইমামতি করেন। পরে কাপড়ে দাগ দেখে বুঝতে পারেন যে রাতে তাঁর স্বপ্নদোষ হয়েছে; পাক-পবিত্র হয়ে তিনি পুনরায় সালাত আদায় করেন; তবে মুক্তাদীদেরকে পুনরায় সালাত আদায় করতে বলেননি।[৬৫]

৪. তিলাওয়াতে সাজদাঃ 'উসমান (রা.) এই অভিমত পোষণ করতেন যে,

---

৬২ আত-তাবারী, ৪:২৮৭, ৪০১।

৬৩ ইবনুল আসীর, ২:৪০৩।

৬৪. সুনানুত তিরমিযী, কিতাবুল 'ইলম, ৪:৪১৪-১৫।

৬৫. মুহাম্মাদ রাওওয়াস কিল'আজী, ১৯০।

তিলাওয়াতকারী ও শ্রবণকারী-দু'জনের ওপরই তিলাওয়াতে সাজদা আদায় করা ওয়াজিব; তবে যে ব্যক্তি অনিচ্ছাকৃতভাবে সাজদার আয়াত শুনে ফেলে সাজদা আদায় করা তার ওপর ওয়াজিব নয়। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, إنما السجود على من استمع! 'যে স্বেচ্ছায় মনোযোগের সাথে (সাজদার আয়াত) শ্রবণ করে তার ওপর তিলাওয়াতে সাজদা ওয়াজিব।' তিনি আরো অভিমত পোষণ করেন যে, মাসিক অবস্থায় কোন নারী যদি সাজদার আয়াত শুনে তাহলে সে ইশারা করে সাজদা আদায় করবে; সালাতের সাজদার ন্যায় সাজদা করবে না, আবার সাজদা বাদও দেবে না।[৬৬]

৫. খুতবার সময় বিশ্রাম নেওয়া: কাতাদা বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), আবূ বাক্র (রা.) ও 'উমার (রা.) দাঁড়িয়ে জুমু'আর খুতবা দিতেন। 'উসমান (রা.)-এর পক্ষে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে বক্তব্য রাখা কঠিন হয়ে পড়লে তিনি দ্বিতীয় খুতবা বসে দিতেন।[৬৭]

৬. রুকু'র পূর্বে কুনূত পড়া: আনাস বলেন, সর্বপ্রথম যিনি রুকু'র পূর্বে কুনূত পড়েছেন তিনি হলেন 'উসমান ইবনু 'আফফান (রা.)। সাধারণ মুসল্লিদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তিনি এটি করেছিলেন; তাঁর কামনা ছিল অধিক মুসল্লি যেন জামা'আতে শামিল হতে পারে।[৬৮]

৭. হাজ্জের নিয়মাবলী সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি: মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন বলেন, হজ্জের নিয়মকানুন সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন 'উসমান (রা.); তারপরে 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.)।[৬৯]

৮. মীকাতের পূর্বে ইহরাম বাঁধতে নিষেধাজ্ঞা: বাসরার শাসনকর্তা 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমির খুরাসান জয়ের পর আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া জ্ঞাপনের জন্য এই পণ করেন যে, তিনি খুরাসান থেকেই ইহরাম বেঁধে 'উমরাহ আদায়ের জন্য মাক্কায় গমন করবেন। সিদ্ধান্ত মুতাবিক কায়স ইবনুল হায়সামকে খুরাসানে স্থলাভিষিক্ত করে নিশাপুর থেকে ইহরাম বেঁধে মাক্কায় গমন করেন। 'উমরাহ সমাপনান্তে তিনি মাদীনায় খালীফার সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলেন; মীকাতের পূর্বে ইহরাম বাঁধায় অসন্তোষ প্রকাশ করে 'উসমান (রা.) বললেন, 'মীকাত হতে ইহরাম বাঁধলেই তুমি ভাল করতে।'[৭০]

'৯. ইদ্দত পালনকারী নারীকে হাজ্জ ও 'উমরার সফর থেকে ফিরিয়ে দেওয়া: ইদ্দত পালনকারী নারীর কর্তব্য হল স্বগৃহে অবস্থান করা; তাঁর জন্য সফর করা সমীচীন

---

৬৬. প্রাগুক্ত, ১৬৮।
৬৭. ইয়াহইয়া আল-ইয়াহইয়া, আল-খিলাফাতুর রাশিদা, ৪৪৪।
৬৮. প্রাগুক্ত।
৬৯. মুহাম্মাদ রাওওয়াস কিল'আজী, ১১২।
৭০. আত-তাবারী, ৪:৩১৪; ইবনুল আসী, ২:৪১১; ইবন কাসীর, ৭:১৬০-৬১।

নয়। হাজ্জ ও 'উমরাহ্-এ যেতে হলে সফর করতে হয়। তাই 'উসমান (রা.) ইদ্দত পালনকারী নারীকে হাজ্জ ও 'উমরার সফরে যেতে বারণ করতেন; তিনি যুলহুলাইফা ও জুহফা হতে ইদ্দত পালনকারী নারীদেরকে ফিরিয়ে দিতেন।[৭১]

১০. ইফরাদ হাজ্জ উত্তম: হাজ্জ তিন প্রকার: ইফরাদ তথা শুধু হজ্জ আদায় করা; তামাত্তু' তথা একই সফরে দুই ইহরামে হাজ্জ ও 'উমরাহ আদায় করা; কিরান অর্থাৎ একই সফরে একই ইহরামে হাজ্জ ও 'উমরাহ আদায় করা। তিন প্রকার হাজ্জের মধ্যে কোনটি উত্তম, এ বিষয়ে সাহাবায়ে কিরামের বিভিন্ন মত ছিল। 'উসমান (রা.)-এর অভিমত ছিল ইফরাদ হাজ্জ উত্তম; তাই তিনি তামাত্তু' ও কিরান হাজ্জ করতে নিরুৎসাহিত করতেন। তবে কেউ তামাত্তু' ও কিরান হাজ্জ করলে তিনি তার নিন্দা করতেন না।[৭২]

১১. মুহরিম অবস্থায় শিকারের গোশ্ত খাওয়া: ইহরাম অবস্থায় শিকারের গোশ্ত খাওয়া হারাম বলে অভিমত পোষণ করতেন 'উসমান (রা.)। আবদুর রহমান ইবনু হাতিব বলেন, আমি একবার 'উসমান (রা.)-এর সাথে 'উমরাহ্র সফরে ছিলাম। কাফিলা রাওহা-এ পৌঁছার পর খাবারের সাথে পাখির গোশ্ত পরিবেশন করা হল। 'উসমান (রা.) বললেন, 'তোমরা খাও।' আমর ইবনুল 'আস (রা.) বললেন, 'আপনি যা খেতে চাচ্ছেন না তা আমাদেরকে খেতে বলছেন?' খালীফা বললেন, 'তোমরা আমার মত নও; এটি আমার জন্য শিকার করা হয়েছে।' 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমির ইবনু রাবী'আহ আরেকবার 'উসমান (রা.)-এর সাথে মুহরিম অবস্থায় সফর করছিলেন। 'আরাজ নামক জায়গায় কাফিলা বিশ্রামের জন্য থামল। খাবারের সাথে 'উসমান (রা.)-এর সামনে শিকারকৃত পশুর গোশ্ত পরিবেশন করা হল। তিনি নিজে না খেয়ে বললেন, 'তোমরা খাও; এ ব্যাপারে তোমরা আমার মত নও, এটি তো আমার জন্য শিকার করা হয়েছে।'[৭৩]

১২. আত্মীয়-স্বজনের মাঝে বিয়ে-শাদী নাপছন্দ করতেন: 'উসমান (রা.) শত্রুতা সৃষ্টির আশঙ্কায় নিকটাত্মীয়ের মাঝে বিয়ে-শাদী পছন্দ করতেন না।

১৩.দুধ ভাই-বোনের মাঝে বিয়ে-শাদী হতে পারে না: একবার এক কাফ্রী মহিলা দাবী করে যে সে এক জুটি স্বামী-স্ত্রীকে দুধ পান করিয়েছে। এ কথার ভিত্তিতে 'উসমান (রা.) ওই দম্পতির বিবাহ ভঙ্গ করেন।[৭৪]

১৪. খুলা'[৭৫] তালাকের বিষয়ে সিদ্ধান্ত: রুবায়য়ি' বিনতু মু'আওয়ায বলেন, আমার চাচাতো ভাইয়ের সাথে আমার বিয়ে হয়েছিল। তাঁর সাথে আমার এমন বচসা হল

৭১. মুহাম্মাদ রাওওয়াস কিল'আজী, ১১২।
৭২. প্রাগুক্ত, ২০।
৭৩. প্রাগুক্ত, ২০।
৭৪. ইবনুল আসীর, ৮:৪৪৮।
৭৫. বিশুদ্ধ উচ্চারণ হল খুল্'।

যে আমি বলতে বাধ্য হলাম, আমার সব কিছুর বিনিময়ে তুমি বিচ্ছেদ মেনে নাও। সে আমার সবকিছু নিয়ে গেল, এমনকি আমার বিছানা ও চুলের ফিতা পর্যন্ত নিয়ে গেল। আমি বিষয়টি 'উসমান (রা.)-কে জানালে তিনি খুলা' তালাকটি অনুমোদন করেন।[৭৬]

১৫. স্বামীর মৃত্যুজনিত কারণে ইদ্দত পালনকারী নারীর সৌন্দর্য বর্জন করতে হবেঃ দু'টো কারণে নারীর ইদ্দত পালন করতে হয়; বিবাহ বিচ্ছেদের কারণে, এ সময় শোক পালন করতে হয় না। আবার স্বামীর মৃত্যুতেও নারীকে ইদ্দত পালন করতে হয়; এ সময় তাকে শোক পালন করতে হয়। শোক পালনের অংশ হল সাজসজ্জা ও সৌন্দর্যের উপকরণ বর্জন করা এবং স্বামী যে ঘরে মারা গেছে তার বাইরে রাত্রিযাপন না করা। তবে প্রয়োজনে দিনের বেলায় বাইরে যেতে পারবে। ফুরাই'আ বিনতু মালিক ইবনু সানান ছিলেন আবূ সা'ঈদ আল-খুদরীর বোন। একদা তিনি রাসূলূল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে গিয়ে বললেন যে, তার স্বামী কয়েকজন পলায়নকারী দাসের সন্ধানে বের হয়ে ওই দাসদের কুড়ালের আঘাতে মারা যান। তিনি রাসূলূল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে নিজের পরিবারের বাড়িতে বসবাসের অনুমতি চান; কারণ তার স্বামী তার জন্য নিজ মালিকানাধীন কোন বাসস্থান রেখে যাননি। রাসূলূল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে অনুমতি দেন। কিন্তু ফুরাই'আ কিছু দূর যেতে না যেতেই রাসূলূল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে ডেকে পাঠান। ফুরাই'আ বলেন, 'আমি ফিরে এলে তিনি বলেন, 'তুমি কিনা বলেছিলে?' আমি আমার স্বামীর ঘটনা পুনরায় বর্ণনা করলাম। এবার রাসূলূল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 'ইদ্দত পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তোমার স্বামীর ঘরে অবস্থান কর।' তিনি বলেন 'আমি চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করলাম স্বামীর বাড়িতে।' ফুরাই'আ বলেন, 'উসমান খালীফা হওয়ার পর আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি তাকে পুরো ঘটনা বললাম। তিনি এর ভিত্তিতে ফায়সালা করতেন এবং স্বামীর মৃত্যুতে ইদ্দত পালনকারী মহিলার বাইরে রাত যাপনের ব্যাপারে খুব কড়াকড়ি করতেন।[৭৭]

১৬. হিল্লা বিবাহ করতে নিষেধঃ একদা জনৈক ব্যক্তি এসে 'উসমান (রা.)-কে বললেন, আপনার কাছে আমার জরুরী প্রয়োজন আছে। 'উসমান (রা.) তখন উটে আরোহন করছিলেন। তিনি বললেন, 'আমার তাড়া আছে; তোমাকে আলাপ করতে হলে আমার পেছনে চড়তে হবে।' লোকটি খালীফার পেছনে বাহনে চড়লেন। লোকটি বলল, 'আমার এক প্রতিবেশী রাগের মাথায় তার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে। এখন সে পস্তাচ্ছে। আমার ইচ্ছে আমি ঐ মহিলাকে বিয়ে করে বাসর যাপন করব, তারপর তাকে তালাক দেব, যাতে প্রথম স্বামী তাকে আবার বিয়ে করতে পারে।' 'উসমান বললেন, 'এটা করো না; তুমি যদি সত্যিই তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে থাক তবে তাকে বিয়ে কর।'[৭৮]

---

৭৬. মুহাম্মাদ রাওওয়াস কিল'আজী, ২৪৪।
৭৭. প্রাগুক্ত, ২৪৪।
৭৮. প্রাগুক্ত, ৮১।

১৭. মদ্যপের তালাক: 'উসমান (রা.)-এর অভিমত ছিল এই যে, মদ্যপের কথাবার্তা নিরর্থক। সুতরাং তার তালাকও কার্যকর হয় না। কারণ সে কি বলে তা বুঝে না এবং যা বলে তা উদ্দেশ্যও করে না। আর নিয়ত বা এরাদা ছাড়া কোন কিছু অত্যাবশ্যকীয় হয় না। তিনি বলতেন, ليس لسكران ولا مجنون طلاق 'মদ্যপ ও পাগলের তালাক কার্যকর হয় না।'[৭৯]

১৮. সন্তানের জন্য পিতার দান: পিতা তার সন্তানকে দান করতে পারবে, তবে এজন্য সাক্ষী রাখতে হবে। তবে পুত্র নাবালক হলে ওলী হিসেবে পিতা ওই সম্পদের দেখভাল করতে পারবে। 'উসমান (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, 'কেউ যদি অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুকে দান করে তবে তা বৈধ হবে; তবে শর্ত হল তাকে ঘোষণা দিতে হবে এবং সাক্ষী রাখতে হবে। আর ওলী হিসেবে পিতা ওই সম্পদের তত্ত্বাবধান করতে পারবে।'[৮০] তবে সাক্ষী না রাখলে তা অকার্যকর দান বলে পরিগণিত হবে। 'উসমান (রা.) আরো বলেন, 'এক দল লোকের কি হয়েছে যে, তারা নিজ পুত্রকে দান করে, পুত্র মারা গেলে বলে ঐ সম্পদ আমার নিজস্ব এবং আমার কব্জায় রয়েছে। আবার পিতা মারা গেলে বলা হয়, এটি আমি দান করেছি। মনে রেখো, পুত্র দখল না নিলে সেই দান কার্যকর হয় না।'

১৯. নির্বোধকে অযোগ্য ঘোষণা: 'উসমান (রা.) মনে করতেন নির্বোধ ও বোকা লোকদেরকে নিজ সম্পদ ব্যবহারে পার্থিব কর্মকাণ্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে অযোগ্য ঘোষণা করা যায়। 'আবদুল্লাহ ইবনু জা'ফর ষাট সহস্র দীনার দিয়ে এক খণ্ড জমি কিনলেন; খবর পেয়ে তাঁর চাচা আলী (রা.) বিষয়টি যাচাই করে দেখতে পেলেন, 'আবদুল্লাহ বড় ঠকা ঠকেছে এবং অনেক বেশি মূল্য দিয়ে জমিটি কিনেছে। তিনি এই ঘোষণাও দিলেন যে, তিনি খালীফার কাছে গিয়ে আবেদন করবেন, বোকামী ও নির্বুদ্ধিতার কারণে 'আবদুল্লাহ ইবনু জা'ফরকে যেন নিজস্ব সম্পদ লেনদেনে অযোগ্য ঘোষণা করা হয়। চাচা আলী (রা.)-এর এই মনোভাব জানতে পেরে 'আবদুল্লাহ ছুটলেন আয-যুবাইরের (ইনি খুব অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী ছিলেন) কাছে। তাকে বললেন, 'আমি এই এই মূল্যে একটি জমি কিনেছি, আমার চাচা আলী (রা.) মনে করছেন আমি খুবই ঠকেছি; তাই তিনি খালীফার কাছে গিয়ে আমাকে লেনদেনে অযোগ্য ঘোষণা করার জন্য আবেদন করবেন। এখন আপনি আমাকে সাহায্য করুন।' আয-যুবাইর বললেন, 'ওই জমি ক্রয়ে আমি তোমার অংশীদার হলাম।' আলী (রা.), খালীফার কাছে গিয়ে বললেন, 'আমার ভাতিজা এত দীনার দিয়ে একটি জমি কিনেছে, আমি এক জোড়া জুতা দিয়েও তা কিনতাম না। আপনি

---

৭৯. প্রাগুক্ত, ৫৩।

৮০. সুনানুল বাইহাকী, ৬:১৭০।

তাকে লেনদেনে অযোগ্য ঘোষণা করুন।' সাথে সাথে আয-যুবাইর বললেন, 'ওই জমি ক্রয়ে আমি অংশীদার হয়েছি।' একথা শুনে 'উসমান (রা.) আলীকে বললেন, 'আমি 'আবদুল্লাহকে নির্বুদ্ধিতার কারণে অযোগ্য ঘোষণা করতে পারি না; কারণ এই কেনাবেচায় তার সাথে আয-যুবাইরের মত পাকা ব্যবসায়ী অংশীদার ছিল।'[৮১]

২০. কপর্দকশূন্য ব্যক্তিকে লেনদেনে অযোগ্য ঘোষণা: অনেক সময় কপর্দকশূন্য ব্যক্তিরা বাকিতে লেনদেন করে ব্যবসায়ীদের ক্ষতি করে থাকে। তাই 'উসমান (রা.) মনে করতেন কপর্দকশূন্য ব্যক্তিদেরকে লেনদেনের ক্ষেত্রে অযোগ্য ঘোষণা করা যায়। কাউকে অযোগ্য বা দেউলিয়া ঘোষণা করা হলে ঋণদাতারা প্রদত্ত ঋণের অনুপাতে ওই ব্যক্তির সম্পদ বণ্টন করে নেবে। তবে কেউ যদি তার কাছ থেকে কেনা কোন নির্দিষ্ট পণ্য দেউলিয়া ঘোষিত ব্যক্তির কাছে অবিকৃত অবস্থায় পায় তবে সে পূর্বের কেনাবেচা বাতিল করে ওটি নিয়ে নিতে পারবে।[৮২]

২১. মজুদদারী অবৈধ: 'উসমান (রা.) মজুদদারীকে অবৈধ ঘোষণা করেন। 'উমার (রা.)-এর ন্যায় তিনি ব্যাপক অর্থে মজুদদারী অবৈধ ঘোষণা করেন। সুতরাং খাদ্যদ্রব্যসহ অন্যান্য বস্তু মজুদ করার বিরুদ্ধে তিনি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।[৮৩]

২২. মৃত্যু শয্যায় তালাক দেওয়া হলে স্ত্রী ওয়ারিসী সম্পত্তির মালিক হবে: মৃত্যু শয্যায় আবদুর রহমান ইবনু 'আউফ তাঁর স্ত্রীকে তালাক দেন। ইদ্দত পার হওয়ার পর আবদুর রহমান মারা গেলে 'উসমান (রা.) তাঁর তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে ওয়ারিসী সম্পত্তির অংশ প্রদান করেন। এ বিষয়ে 'উমার (রা.)-এর ফায়সালা কিছুটা ভিন্ন ছিল। তাঁর মতে, মৃত্যুর রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর কোন পুরুষ যদি তার স্ত্রীকে তালাক দেয় এবং ইদ্দতের মধ্যে যদি ওই লোক মারা যায় তবে স্ত্রী ওয়ারিস হবে। আর ইদ্দতের পর যদি স্বামী মারা যায় তবে স্ত্রী ওয়ারিস হবে না। কিন্তু 'উসমান (রা.)-এর মত ছিল এই যে, মৃত্যু রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী তার স্বামীর ওয়ারিস হবে সে ইদ্দতের মধ্যে মারা যাক বা ইদ্দতের পরে মারা যাক। এ বিষয়ে সুস্পষ্ট কোন নস নেই; দু'খালীফা নিজস্ব বিচার-বুদ্ধি অনুযায়ী রায় প্রদান করেছেন।[৮৪]

২৩. ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার আগে স্বামী-স্ত্রীর কেউ মারা গেলে একে অপরের ওয়ারিস হবে: 'উসমান (রা.)-এর আরেকটি ইজতিহাদি রায় ছিল এই যে, কোন ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীকে তালাক দেয়, আর স্ত্রীর ইদ্দত পালনকালে স্বামী বা স্ত্রীর কোন একজন মারা যায়, তবে একে অপরের ওয়ারিস হবে। ইদ্দতের দীর্ঘস্থায়িত্ব এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হবে না। এ ধরনের একটি বিরল ঘটনা 'উসমান (রা.)-এর আমলে সংঘটিত হয়।

---

৮১. মুহাম্মাদ রাওওয়াস কিল'আজী, ১১৯।
৮২. প্রাগুক্ত।
৮৩. প্রাগুক্ত, ১৫।
৮৪. আল-ইজতিহাদ ফিল ফিকহিল ইসলামী, ১৪২।

হিব্বান ইবনু মুনকিয তাঁর স্ত্রীকে সুস্থ অবস্থায় তালাক দেন। তাঁর স্ত্রী গর্ভবতীও ছিলেন না, আবার বৃদ্ধাও ছিলেন না; বরং হিব্বানের ঔরসে তাঁর একটি দুগ্ধপোষ্য কন্যা ছিল। মেয়েকে দুধ পান করানোর কারণে তাঁর মাসিক বন্ধ হয়ে যায়। এভাবে সতের মাস তাঁর মাসিক বন্ধ থাকে। তালাকের সাত বা আট মাস পর হিব্বান অসুস্থ হন। তখন তাঁকে বলা হল: 'তোমার স্ত্রীর মাসিক হয়নি, ফলে তার ইদ্দত পূর্ণ হয়নি; অতএব সে তোমার ওয়ারিস হবে।' হিব্বান বললেন, 'আমাকে 'উসমান (রা–)-এর কাছে নিয়ে চল।' লোকজন তাঁকে 'উসমান (রা.)-এর কাছে নিয়ে গেল। তিনি এ বিষয়ে ফায়সালা চাইলেন। তখন 'উসমান (রা.)-এর কাছে 'আলী (রা.) ও যায়িদ (রা.) ছিলেন। খালীফা তাঁদের মতামত চাইলেন। তারা বললেন, এখন যে-ই মারা যাক, তারা একে অপরের ওয়ারিস হবে। কারণ তার স্ত্রীর ইদ্দত (তিন মাসিক) পূর্ণ হয়নি। সে তো অতিবৃদ্ধা নয় যে তার মাসিক স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে গেছে; আবার সে কুমারী নয় যে তার মাসিক শুরু হয়নি। এখন তার ইদ্দত যত দীর্ঘই হোক না কেন, ইদ্দতের মাঝে কেউ মারা গেলে তারা একে অপরের ওয়ারিস হবে।' অতঃপর হিব্বান তাঁর স্ত্রীর কাছ থেকে মেয়েকে নিয়ে যান; দুগ্ধপান বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তাঁর স্ত্রীর মাসিক শুরু হয় এবং দ্বিতীয় মাসিকের পর হিব্বান মারা যান। তখন তাঁর স্ত্রী নতুন করে মৃত্যুজনিত ইদ্দত পালন করেন এবং ওয়ারিসী সম্পত্তির মালিক হন।[৮৫]

উপস্থাপিত মাসআলা পর্যালোচনাদৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, 'উসমান (রা.) একজন মুজতাহিদ সাহাবী ছিলেন।

---

৮৫. সুনানুল বাইহাকী, ৭:৪১৯।

ষষ্ঠ অধ্যায়

আলকুরআন সংকলন

'উসমান (রা.) এর জীবনের সবচাইতে মূল্যবান কীর্তি হল কুরআন সংকলন। মনে রাখা আবশ্যক, আবূ বাকর (রা.) এর সময়ে সর্বপ্রথম কুরআন সংকলন করা হয়। তবে সর্বসাধারণের উপলব্ধির সুবিধার্থে এই পরিভাষা চালু হয়েছে যে, 'উসমান (রা.) কুরআনের সংকলক, আসলে ব্যাপারটি তেমন নয়। 'উসমান (রা.) প্রথমবারের মতো কুরআন সংকলন করেননি; তিনি বরং সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে এক 'হরফ' বা এক 'কিরাআত'-এর ওপর একত্র করেছিলেন বা একই ধরনের কিরাআত পদ্ধতির ওপর ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। কোন্ প্রেক্ষাপটে 'উসমান (রা.)-কে এক কিরাআতের ভিত্তিতে আলকুরআন একত্র করতে হয়েছিল আমরা তা আলোচনা করব। অবশ্য তৎপূর্বে আলকুরআন সংকলনের পূর্ববর্তী ইতিহাস সম্পর্কে আলোকপাত করা দরকার।

কুরআন সংকলনের পর্যায়সমূহ

প্রথম পর্যায়ঃ

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগঃ অকাট্য দলীল দ্বারা এ কথা প্রমাণিত যে, যখনই আলকুরআনের কোন অংশ নাযিল হত তখনই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা লিখিয়ে রাখতেন। কয়েকজন সাহাবী ওয়াহী লেখার দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন। এঁদেরকে 'কাতিবুল ওয়াহী' বলা হয়। ওয়াহী লেখার ক্ষেত্রে বিশিষ্টতা অর্জন করায় যায়িদ ইবনু সাবিত (রা.) 'কাতিবুন নাবী' অভিধায় ভূষিত হয়েছিলেন। ইমাম বুখারী ফাদাইলুল কুরআন অধ্যায়ে 'কাতিবুন নাবী' নামে একটি অনুচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এবং এর অধীনে দু'টো হাদীস উল্লেখ করেছেনঃ

> **প্রথম হাদীসঃ** আবূ বাকর (রা.), যায়িদ ইবনু সাবিত (রা.)-কে বলেছেন,.. তুমি তো রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নির্দেশে ওয়াহী লিপিবদ্ধ করতে..[১]
>
> **দ্বিতীয় হাদীসঃ** যখন সূরা আন্ নিসা'র ৯৫ নং আয়াত নাযিল হল তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 'যায়িদকে ডাকো, সে যেন ফলক, দোয়াত ও হাড় নিয়ে আসে..[২]

মাক্কী জীবনেও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওয়াহী লিখানোর ব্যবস্থা করতেন। মাক্কার ওয়াহী লেখকদের অন্যতম ছিলেন 'আবদুল্লাহ ইবনু সা'দ ইবনু আবি সারহ; অবশ্য তিনি মুরতাদ হয়ে যান, পরবর্তীতে মাক্কা বিজয়ের দিন পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করেন। চার খালীফাও ওয়াহী লিখতেন। সম্ভবত তাঁরা মাক্কী জীবনে ওয়াহী

---

১. সহীহুল বুখারী, কিতাবু ফাদাইলিল কুরআন, বাবু কাতিবিন নাবী, ২:৬৪৫।
২. প্রাগুক্ত, ২:৬৪৬

লিখতেন। মাক্কী জীবনে ওয়াহী লিপিবদ্ধ করার একটি প্রমাণ হল এই যে, ইসলাম গ্রহণের দিন 'উমার (রা.) সূরা তাহার আয়াতগুলো তাঁর বোনের কাছে পুস্তিকা আকারে লিপিবদ্ধ অবস্থায় পেয়েছিলেন। সূরা আলবায়্যিনাহ্-এ আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা দিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ আলকুরআন আবৃত্তি করেন:

رَسُوْلٌ مِنَ اللهِ يَتْلُوْ صُحُفًا مُطَهَّرَةً

আল্লাহর নিকট হতে প্রেরিত এক রাসূল, যে আবৃত্তি করে পবিত্র পুস্তিকাসমূহ [আলকুরআন ৯৮:২]।

মাক্কী ও মাদানী জীবনে আরো যারা ওয়াহী লিখতেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন: আয-যুবাইর ইবনুল 'আওয়াম (রা.), খালিদ ইবনু সা'ঈদ ইবনিল 'আস (রা.), আবান ইবনু সা'ঈদ ইবনিল 'আস (রা.) হানযালাহ ইবনুর রাবী' আলআসাদী (রা.), মু'আইকীব ইবনু আবি ফাতিমা (রা.) 'আবদুল্লাহ্ ইবনুল আরকাম (রা.), শুরাহ্বীল ইবনু হাসানাহ্ (রা.), 'আবদুল্লাহ্ ইবনু রাওয়াহা (রা.), মু'আবিয়া ইবনু আবি সুফইয়ান (রা.), উবাই ইবনু কা'ব (রা.), খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা.) ও সাবিত ইবনু কায়স (রা.) প্রমুখ।[৩]

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নির্দেশনা অনুসারে কাতিবগণ বিভিন্ন সূরার আওতায় আয়াতগুলোকে বিন্যস্ত করতেন। তিনি জিবরীল (আ.)-এর নির্দেশনার ভিত্তিতেই আয়াতের ধারাবাহিকতা নির্ধারণ করতেন। 'উসমান ইবনু আবিল 'আস (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে উপবিষ্ট ছিলাম; হঠাৎ তিনি চোখ তুলে ওপরের দিকে তাকালেন, কিছুক্ষণ পর চোখ নামিয়ে বললেন, 'আমার কাছে জিবরীল (আ.) এসেছিলেন, তিনি নির্দেশ দিলেন এই আয়াত যেন এই সূরার এই জায়গায় স্থাপন করি।'[৪] সকল তথ্যাভিজ্ঞ 'আলিম এ ব্যাপারে একমত যে বিভিন্ন সূরার আওতায় আয়াতগুলোর ধারাবাহিকতা ওয়াহীর নির্দেশনার আলোকে সম্পন্ন হয়েছে। তাই এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, বর্তমানে আয়াতগুলো যেভাবে বিন্যস্ত রয়েছে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগেও ঠিক সেভাবেই বিন্যস্ত ছিল। সংখ্যাগরিষ্ঠ 'আলিমগণের মতে সূরাগুলোর ধারাবাহিকতাও রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নির্দেশনার আলোকে বিন্যস্ত করা হয়েছে।[৫]

কাতিবগণ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নির্দেশে কুরআন লিপিবদ্ধ করতেন। এটিকে সরকারী ব্যবস্থাপনা বলা যায়। অনেক কাতিব সরকারী

---

৩. ইবনু হাজর, ফাতহ.., ৮:৬৮৩; সুবহী আস-সালিহ, মাবাহিস ফী 'উলূমিল কুরআন (বৈরুত: দারুল 'ইল্ম লিল মালাঈন ১৯৯৯), ৬৯

৪. সুবহী আস-সালিহ, ৭০।

৫. প্রাগুক্ত, ৭১।

অনুলিপির পাশাপাশি নিজেদের জন্য পৃথক অনুলিপি তৈরি করতেন। কাতিব ব্যতীত অন্যান্য সাহাবীগণও নিজেদের পঠন-পাঠনের সুবিধার্থে কুরআনের অনুলিপি প্রস্তুত করতেন। এটি খুবই স্বাভাবিক যে, ব্যক্তিগত অনুলিপিগুলো পুরো আলকুরআন ধারণ করত না।

বস্তুতঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মৃত্যুর পূর্বেই পুরো আলকুরআন লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল; তবে তা একত্রিত অবস্থায় ছিল না। আলকুরআন লিপিবদ্ধ ছিল খেজুরের ডাল, হাড়, কাষ্ঠফলক, চামড়া ও স্বচ্ছ পাথরে। তৎকালে এগুলোই ছিল লিখন উপকরণ। তাছাড়া বহু হাফিযের স্মৃতিতে পুরো আলকুরআন সংরক্ষিত ছিল। জিবরীল (আ.) প্রতি বছর একবার করে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে আলকুরআন পেশ করতেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মৃত্যুর বছর তিনি দু'বার আলকুরআন উপস্থাপন করেছিলেন। আলকুরআনের কোন আয়াত বা বিধান রহিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল বলেই সম্ভবত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর জীবদ্দশায় আলকুরআন এক জায়গায় একত্র করেননি। তাঁর মৃত্যুর মাধ্যমে আয়াত রহিত হওয়ার সম্ভাবনা চিরতরে বিলীন হওয়ায় আলকুরআন সংকলনে আর কোন বাধা রইল না।[৬]

দ্বিতীয় পর্যায়ঃ

আবূ বাকর (রা.)-এর আমলঃ আবূ বাক্র (রা.)-এর আমলে আলকুরআন সংকলন সম্পর্কে কাতিবুল ওয়াহী যায়িদ ইবনু সাবিত (রা.) বলেনঃ

> ইয়ামামার যুদ্ধের সময় আবূ বাকর (রা.) আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি এসে দেখলাম তাঁর কাছে 'উমার (রা.) উপস্থিত। আবূ বাকর (রা.) বললেন, 'উমার (রা.) আমার কাছে এসে বলল, 'ইয়ামামার যুদ্ধে বিপুল সংখ্যক হাফিযুল কুরআন শহীদ হয়েছেন। আমার আশঙ্কা হয় বিভিন্ন যুদ্ধের ময়দানে বিপুল সংখ্যক হাফিযুল কুরআনের শাহাদাতে আলকুরআনের বিরাট অংশ হারিয়ে যাবে। আমার অভিমত হচ্ছে আপনি কুরআন একত্রকরণের নির্দেশ দিন।' আমি (আবূ বাকর) 'উমার (রা.)-কে বললাম, 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে কাজ করেননি আমি তা কিভাবে করব?' জবাবে 'উমার (রা.) বললেন, 'আল্লাহর শপথ, এটি কল্যাণকর হবে।' এরপর 'উমার (রা.) বারংবার পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন, এমনকি আল্লাহ ঐ কাজ করার ব্যাপারে আমার অন্তর প্রশস্ত করে দিলেন যে ব্যাপারে ইতোপূর্বে 'উমার (রা.)-এর অন্তর প্রশস্ত করেছেন। যায়িদ (রা.) বলেন, অতঃপর আবূ বাকর (রা.) বললেন, নিশ্চয় তুমি বুদ্ধিমান যুবক, তোমার সম্পর্কে

৬. সুবহী আস-সালিহ, ৭৩।

কোন অভিযোগও নেই। তুমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আমলে ওয়াহী লিপিবদ্ধ করতে। সুতরাং এবারও অনুসন্ধান চালিয়ে কুরআন সংকলন কর।

যায়িদ (রা.) আরো বলেন:

আল্লাহর শপথ! তারা যদি আমার ওপর কোন পাহাড় স্থানান্তরের দায়িত্ব চাপাতো তাও আমার কাছে এতটা দুর্বহ মনে হত না যতটা মনে হয়েছে কুরআন সংকলনের দায়িত্ব। আমি খেজুরের ডাল, পাথর ও হাড় এবং হাফিযদের স্মৃতির সঞ্চয় হতে কুরআন সংকলন করলাম। সূরা আত্ তাওবার শেষ দু'টো আয়াত পেলাম আবূ খুযাইমা আলআনসারীর নিকট। একত্রিত ও সংকলিত কুরআনের কপি আবূ বাকর (রা.)-এর জীবদ্দশায় তাঁরই কাছে ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর 'উমার (রা.)-এর কাছে ছিল। 'উমার (রা.)-এর মৃত্যুর পর তা ছিল তদীয় কন্যা উম্মুল মু'মিনীন হাফসা (রা.)-এর নিকট।[৭]

যায়িদ ইবনু সাবিত (রা.)-এর উক্তির আলোকে আবূ বাক্র (রা.)-এর আমলে কুরআন সংকলন

ক. আবূ বাক্র (রা.)-এর আমলে কুরআন সংকলনের কারণ: আবূ বাকর (রা.)-এর আমলে কুরআন সংকলনের কারণ এটি ছিল না যে কুরআন লিপিবদ্ধ ছিল না। ইতিপূর্বে দলীলসহ উল্লেখিত হয়েছে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পুরো কুরআন লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা করেছিলেন; তবে লিখিত অংশগুলো একত্রিত অবস্থায় ছিল না। আবূ বাকর (রা.)-এর আমলে আরবের অনেকগুলো গোত্র ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যায়, অনেকে যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জানায়, কেউ কেউ মিথ্যা নুবুওয়াত দাবি করে। ভণ্ড নাবীদের মাঝে সবচাইতে শক্তিশালী ছিল মুসাইলামাহ্ আলকায্যাব। আবূ বাক্র (রা.) তাঁর বাহিনীর বিরুদ্ধে খালিদ ইবনুল ওয়ালীদের নেতৃত্বে বিরাট বাহিনী প্রেরণ করেন। ইয়ামামার প্রচণ্ড যুদ্ধে মুসাইলামাহ্ পরাজিত ও নিহত হয়। তবে এই যুদ্ধে মুসলিমদের বিপুল প্রাণহানি হয়; কোন কোন বর্ণনা মতে সাত শতাধিক সাহাবী শহীদ হন যাদের অনেকে হাফিযুল কুরআন ছিলেন।[৮] চারজন সাহাবীর কাছ থেকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কুরআন তিলাওয়াত শেখার নির্দেশ দিয়েছিলেন, সালিম (রা.) ছিলেন তাঁদের একজন।[৯] ইয়ামামার যুদ্ধে সালিমও (রা.) শহীদ হন।[১০]

---

৭. সহীহুল বুখারী, কিতাবু ফাদাইলিল কুরআন, বাবু জাম'ইল কুরআন, ২:৬৪৪-৪৫; সহীহুল বুখারী, কিতাবুল আহকাম, ৩:৪৯৫-৯৬।

৮. ইবনু হাজর, ফাতহ., ৮:৬৭১-৭২।

৯. সাহীহুল বুখারী, কিতাবু ফাদাইলিল কুরআন, বাবুল কুর্রা' মিন আসহাবিন নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম, ২:৬৪৮।

১০. আয-যাহাবী, তারীখ., ৩:২৭৮।

বিপুল সংখ্যক হাফিয সাহাবী বিশেষত সালিম (রা.)-এর মত অবিসংবাদিত কারীর মৃত্যুতে 'উমার (রা.) যারপরনেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। তাঁর আশঙ্কা ছিল এই যে, হাফিয ও কারীগণের তিরোধানে কুরআনের কোন অংশ বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে। তাই তিনি আবূ বাক্‌র (রা.)-কে কুরআন একত্রীকরণ ও সংকলনের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন। প্রথমে আবূ বাক্‌র (রা.) ইতস্তত করেন এই কারণে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা করেননি তা তিনি করতে চান না।[১১] অবশ্য পরে আল্লাহ্ কুরআন সংকলনের পক্ষে তাঁর অন্তর প্রশস্ত করে দেন এবং তিনি উম্মাহ্‌র জন্য অত্যন্ত উপকারী পদক্ষেপটি গ্রহণ করেন।

খ. কুরআন সংকলনের দায়িত্ব অর্পিত হয় কাতিবুল ওয়াহী যায়িদ (রা.)-এর ওপর: আবূ বাকর (রা.) কুরআন একত্রীকরণ ও সংকলনের এই গুরু দায়িত্ব অর্পণ করেন কাতিবুল ওয়াহী যায়িদ ইবনু সাবিত (রা.)-এর ওপর। এই গুরু দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়ার জন্য যায়িদ (রা.)-কে কেন বাছাই করলেন আবূ বাক্‌র (রা.) তাও পরিষ্কার করলেন তাঁর বক্তব্যে: 'নিশ্চয় তুমি বুদ্ধিমান যুবক, তোমার সম্পর্কে কোন অভিযোগও নেই। তুমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আমলে ওয়াহী লিপিবদ্ধ করতে।' এই উক্তি হতে যায়িদ (রা.)-এর উপযুক্ততার কারণগুলো পাওয়া যায়:

১. যায়িদ বয়সে তরুণ ছিলেন, তাঁর বয়স ছিল মাত্র একুশ; স্বভাবতই দায়িত্ব আনঞ্জাম দেয়ার ক্ষেত্রে তিনি তৎপর হবেন, এটি আশা করা যায়।
২. তিনি অধিক উপযুক্ত ছিলেন, যাকে আল্লাহ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত জ্ঞানবুদ্ধি দিয়েছেন কল্যাণের পথ তাঁর জন্য সহজ হবে।
৩. যায়িদ (রা.) আস্থাভাজন ছিলেন, তাঁর ব্যাপারে কোন অভিযোগ ছিল না। সুতরাং এটা ধরে নেওয়াই স্বাভাবিক যে তাঁর দায়িত্বে সম্পাদিত কাজ গ্রহণযোগ্য হবে।
৪. তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাতিবুল ওয়াহী ছিলেন; সুতরাং এই কাজে তাঁর পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল, এই কাজ তাঁর কাছে নতুন কিছু নয়।

গ. আলকুরআন সংকলনে যায়িদ (রা.)-এর কর্মধারা: আবূ বাক্‌র (রা.), যায়িদ (রা.)-কে কুরআন সংকলনের পদ্ধতি সম্পর্কেও নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি 'উমার (রা.) ও যায়িদ (রা.)-কে বলেন, 'তোমরা দু'জন মাসজিদের দরজায় বসো, কেউ আল্লাহ্‌র কিতাবের কোন অংশ দু'জন সাক্ষীসহ নিয়ে আসলে তোমরা তা লিপিবদ্ধ করবে।'[১২] এই নির্দেশনার আলোকে যায়িদ ইবনু সাবিত (রা.) পুরো এক বছরের প্রচেষ্টায় আলকুরআন একত্রকরণ ও সংকলনের কাজ সমাপ্ত করেন। যায়িদ (রা.)-এর

---

১১. কুরআন সংকলনের মাধ্যমে আবূ বাক্‌র অভিনব কোন কাজ করেননি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কুরআন লিপিবদ্ধ করেছিলেন; আবূ বাক্‌র তাই করেছেন, তবে তিনি বিক্ষিপ্ত অংশগুলো একত্রে গেঁথেছেন।

১২. আস-সুয়ূতী, আল-ইতকান (কায়রো: মাতবা'আ হিজাযী ১৯৪১), ১:১০০।

সংকলন পদ্ধতি এই ছিল যে, তিনি তখনই একটি আয়াত গ্রহণ করতেন যখন কেউ দাবি করত এটি সে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সামনে লিপিবদ্ধ করেছে। আবার শুধু মুখস্থ শক্তির ওপর নির্ভর করতেন না। লিখিত রূপের সাথে হাফিযদের স্মৃতিতে সংরক্ষিত আয়াত মিলিয়ে নিতেন। কমপক্ষে দু'জনের কাছে লিখিত অবস্থায় পাওয়া গেলেই কেবল সেই আয়াত গ্রহণ করা হত। কেউ এটা দাবি করলেই যায়িদ গ্রহণ করতেন না যে এটি কুরআনের আয়াত; বরং তাঁর সাথে দু'জন সাক্ষীর প্রয়োজন হতো, যারা সাক্ষ্য দেবে যে এই অংশটি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সামনে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এভাবেই সতর্ক পদক্ষেপে ও সুচারু অনুসন্ধানে যায়িদ (রা.) কুরআন সংকলনের কাজ সম্পন্ন করেন।

সূরা আত তাওবার শেষ দুটো আয়াত তিনি শুধু আবূ খুযাইমাহ্ আল-আনসারী (রা.)-এর কাছে লিখিত অবস্থায় পান। এই অংশটি দ্বিতীয় কারো কাছে লিখিত না পাওয়া গেলেও যায়িদ (রা.) এটি গ্রহণ করেন। কারণ প্ররাকারান্তরে এই দুই আয়াতের পক্ষে দু'ধরনের সাক্ষী ছিলঃ হিফয ও লিখন। আয়াত দু'টি যায়িদসহ অনেক সাহাবীর স্মৃতিতে সংরক্ষিত ছিল, অবশ্য লিখিত অবস্থায় ছিল শুধু এক জনের কাছে। অতএব এই দু'টি যে কুরআনের অংশ সে বিষয়ে কোন সংশয় ছিল না।

ঘ. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর লিখন ও আবূ বাকর (রা.)-এর লিখনের মধ্যে পার্থক্যঃ আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আমলে পুরো কুরআন লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। তৎকালে লিখন সামগ্রী হিসেবে যা ব্যবহৃত হত যথা ফলক, খেজুর ডাল, হাড়, পাথর প্রভৃতির ওপর কুরআন লিপিবদ্ধ করা হত। তবে কুরআনের সূরাগুলো ধারাবাহিকভাবে বিন্যস্ত এবং এক জায়গায় সংরক্ষিত ছিল না। আবূ বাকর (রা.)-এর আমলে সূরাগুলো ধারাবাহিকভাবে বিন্যস্ত করে একত্র করা হয়। বিন্যস্ত করার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নির্দেশনা অনুসরণ করা হয়।

সমগ্র মুসলিম উম্মাহ এই বিষয়ে একমত যে আবূ বাকর (রা.)-এর আমলে সংকলিত কুরআন হল সেটি যা জিবরীল (আ.), রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে তাঁর জীবনের শেষ বছরে উপস্থাপন করেছিলেন। আবূ বাকর (রা.)-এর মৃত্যুর পর কুরআনের কপিটি 'উমার (রা.)-এর কাছে রক্ষিত ছিল। তিনি আহত হয়ে মৃত্যুশয্যায় পতিত হলে আলকুরআনের কপিটি উম্মুল মু'মিনীন হাফসা (রা.)-এর নিকট গচ্ছিত রাখেন। কারণ তিনি কোন স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করেননি। বরং ছয় সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচক পরিষদের হাতে পরবর্তী খালীফা নিয়োগের দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন।

তৃতীয় পর্যায়ঃ 'উসমান (রা.)-এর আমলে কুরআন সংকলনঃ

ক. 'উসমান (রা.)-এর আমলে কুরআন সংকলনের হেতুঃ বিশিষ্ট সাহাবী হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা.) 'উসমান (রা.)-এর আমলে সিরিয় ও ইরাকী যোদ্ধাদের সাথে আর্মেনিয়া ও আজারবাইজান বিজয়াভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। নানা অঞ্চলের মানুষের কুরআন পাঠের ভিন্নতা দেখে তিনি শঙ্কিত হয়ে পড়লেন। তিনি পর্যবেক্ষণ করলেন, কেউ ইবনু মাস'ঊদ (রা.)-এর অনুসরণে কুরআন তিলাওয়াত করে, আবার অন্যরা আবূ মূসা আল-আশ'আরীর কিরাআত তিলাওয়াত করে। শুধু তাই নয়, এক দল অন্য দলকে হেয়জ্ঞান করে। এই অবস্থা দেখে তিনি বললেন, 'কূফাবাসী বলেঃ ইবনু মাস'ঊদের কিরাআত, বাসরাবাসী বলেঃ আবূ মূসার কিরাআত। আল্লাহ্‌র শপথ! আমি আমীরুল মু'মিনীনের কাছে গিয়ে অনুরোধ করব তিনি যেন সবাইকে একই পঠনপদ্ধতির ওপর একত্রিত করেন।' অভিযান শেষে মাদীনায় এসে হুযাইফা (রা.) 'উসমান (রা.)-কে বললেন, 'আমীরুল মু'মিনীন! ইয়াহুদী ও নাসারাদের মত নিজেদের কিতাবের ব্যাপারে মতভেদ করার পূর্বেই আপনি এই উম্মাহ্‌কে সামলান।'[১৩]

পঠনপদ্ধতির ভিন্নতার কারণে বিভিন্ন কারীর ছাত্রদের মাঝে বচসার বিষয়টি 'উসমান (রা.) মাদীনায়ও প্রত্যক্ষ করেছিলেন। একবার তিনি মাসজিদে খুতবা দিতে গিয়ে বলেছিলেন, 'তোমরা আমার সামনেই মতভেদ কর, না জানি দূরে যারা আছে তারা কী করে?!'[১৪]

খঃ কুরআন সংকলনের বিষয়ে সাহাবীদের সাথে 'উসমান (রা.)-এর পরামর্শঃ হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা.)-এর আরজটি 'উসমান (রা.) অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে নিলেন। করণীয় নির্ধারণে তিনি মুহাজির ও আনসারী সাহাবীগণকে একত্রিত করলেন; উম্মাহ-এর শ্রেষ্ঠ 'আলিম, ফকীহ ও বিজ্ঞ ব্যক্তি এঁদের মাঝেই ছিলেন, যাদের শীর্ষে ছিলেন 'আলী ইবনু আবি তালিব (রা.)। তাঁরা দীর্ঘ সময় ধরে আলোচনা-পর্যালোচনা শেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, এই অবস্থা দীর্ঘায়িত হতে দেয়া যায় না, মুমিনদের অন্তরে কোন প্রকার সন্দেহ-সংশয় যেন প্রবেশ না করতে পারে। তাঁরা হাফসা (রা.)-এর কাছে রক্ষিত সাহীফাগুলো হতে অনুলিপি প্রস্তুত করে কুরআনের বিশুদ্ধ কপি ইসলামী খিলাফাতের নানা স্থানে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

সিদ্ধান্ত অনুসারে খালীফা, উম্মুল মু'মিনীন হাফসা (রা.)-এর কাছে দূত পাঠিয়ে বললেন, 'আমার কাছে কুরআনের অংশগুলো পাঠিয়ে দিন, আমি কয়েকটি অনুলিপি তৈরী করে মূল কপিগুলো আপনার কাছে ফেরত পাঠাবো।' হাফসা (রা.) তাঁর কাছে রক্ষিত আলকুরআনের সাহীফাগুলো 'উসমান (রা.)-এর কাছে পাঠিয়ে দেন।

---

১৩. ইবনু হাজর, ফাতহ., ৮:৬৭৮।
১৪. প্রাগুক্ত, ৮:৬৭৯।

গ. কুরআন সংকলনের জন্য চার সদস্যের কমিটি গঠন: 'উসমান (রা.) চার সদস্যের একটি কমিটি গঠন করলেন, যার সদস্যরা ছিলেন: যায়িদ ইবনু সাবিত (রা.), 'আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা.), সা'ঈদ ইবনুল 'আস ও 'আবদুর রহমান ইবনুল হারিস ইবনি হিশাম (রা.)। তাদেরকে আবূ বাক্‌র (রা.)-এর সাহীফাগুলোর আলোকে কুরআনের অনুলিপি প্রস্তুত করার নির্দেশ দিলেন। কমিটির সদস্যদের মাঝে যায়িদ (রা.) ছিলেন আনসারী, বাকি তিনজন ছিলেন কুরাইশী। তিনজনের কুরাইশ দলকে 'উসমান (রা.) বললেন,

> إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيئ من القرآن، فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم
>
> কুরআনের কোন শব্দের আরবীত্বের ব্যাপারে যায়িদ ইবনু সাবিত (রা.)-এর সাথে তোমাদের মতভেদ হলে তোমরা তা কুরাইশী ভাষায় লিপিবদ্ধ কর; কারণ এই কিতাব তাদের ভাষায় নাযিল হয়েছে।[১৫]

২৫ হিজরীতে কমিটির সদস্যরা কাজ শুরু করেন। চার সদস্যের কমিটির সবাই হাফিযুল কুরআন হলেও তারা হাফসার কাছ থেকে আনীত সাহীফাগুলোর ওপর ভিত্তি করে কুরআনের কয়েকটি অনুলিপি প্রস্তুত করলেন। 'উসমান (রা.) কোন কোন শব্দের আরবীত্বের ব্যাপারে মতভেদের আশঙ্কা করেছিলেন; তবে একটি মাত্র শব্দ নিয়ে যায়িদ (রা.) ও কুরাইশী সংকলকদের মাঝে কোন বিষয়ে মতভেদ হয়েছিলো বলে জানা যায়। শব্দটি হল *তাবূত* التابوت ; মাদীনার আনসারদের উপভাষায় এটির পাঠ ছিল *তাবূহ* التابوه। এ বিষয়ে 'উসমান (রা.)-এর কাছে নির্দেশনা চাওয়া হলে তিনি *তাবূত* লিখতে বলেন।[১৬]

'উসমান (রা.)-এর আমলে সংকলিত আলকুরআনে আয়াত বা সূরার ধারাবাহিকতা রক্ষার ক্ষেত্রে কোনরূপ পরিবর্তন আনা হয়নি। আবূ বাকর (রা.)-এর সংকলনে যে ধারাবাহিকতা ছিল সেটিই হুবহু বহাল ছিল 'উসমান (রা.)-এর সংকলনে। তাছাড়া কোন শব্দে কোনরূপ পরিবর্তন আনা হয়নি, সেটি সম্ভবও ছিল না। কুরআন সংকলনকালে ইবনুয্ যুবাইর (রা.), 'উসমান (রা.)-কে বলেছিলেন, 'সূরা আলবাকারার ২৪০ নং আয়াতটি তো অন্য আয়াত দ্বারা (একই সূরার ২৩৪নং আয়াত দ্বারা) মানসূখ হয়ে গেছে, তবে কেন আপনি সেটি বহাল রাখছেন?'[১৭] জবাবে 'উসমান (রা.) বললেন,

---

১৫. সাহীহুল বুখারী, কিতাবু ফাদাইলিল কুরআন, বাবু জাম'ইল কুরআন, ২: ৬৪৫।

১৬. ইবনু হাজর, ফাতহ., ৮:৬৮০-৮১।

১৭. সূরাতুল বাকারার ২৪০নং আয়াতটির অনুবাদ নিম্নরূপ: 'তোমাদের মধ্যে যাদের মৃত্যু আসন্ন এবং স্ত্রী রেখে যায় তারা যেন তাদের স্ত্রীদেরকে গৃহ হতে বহিষ্কার না করে তাদের এক বছরের ভরণ-পোষণের ওয়াসীয়াত করে। কিন্তু যদি তারা বেরিয়ে যায় তবে বিধিমত নিজেদের জন্য যা করবে

يابن أخي لا أغير شيئا من مكانه

ভাতিজা, আমি (আলকুরআনের) কোন কিছু স্বস্থান হতে পরিবর্তন করতে পারি না।[১৮]

খালীফার এই জবাব হতে বুঝা যায়, কোন আয়াত বাদ দেয়া তো দূরের কথা, কোন আয়াতের স্থান পর্যন্ত পরিবর্তন করা হয়নি। মৃত্যুর পূর্বে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সামনে জিবরীল (রা.) পুরো কুরআন উপস্থাপন করেছিলেন। আবূ বাক্র (রা.)-এর সংকলনটি সেই উপস্থাপনার অনুরূপ, আবার 'উসমান (রা.)-এর সংকলনটি ছিল আবূ বাক্র (রা.)-এর সংকলনের অনুরূপ। এখানে কোনরূপ পরিবর্তন-পরিবর্ধনের কোন ক্ষমতা কারো ছিল না।

ঘ. বিভিন্ন প্রদেশে কারী ও কুরআনের কপি প্রেরণঃ গ্রন্থাকারে কুরআনের অনুলিপি তৈরির কাজ সম্পন্ন হলে 'উসমান (রা.) মূল কপির পৃষ্ঠাগুলো হাফসা (রা.)-এর কাছে ফেরত পাঠালেন এবং অনুলিপিকৃত কুরআনের এক একটি কপি দূরবর্তী অঞ্চলগুলোতে প্রেরণ করলেন। এই কপিগুলোতে হারাকাত বা স্বরচিহ্ন এবং নুক্তা ছিল না। ফলে কুরআনের শব্দগুলো বিভিন্নভাবে তিলাওয়াত করার সুযোগ ছিল। এ কারণে 'উসমান (রা.) কুরআনের অনুলিপি প্রেরণের পাশাপাশি কারীও প্রেরণ করেন, যাতে তারা জনগণকে একই পদ্ধতির কিরাআতের প্রশিক্ষণ দিতে পারেন।

'উসমান (রা.) বিভিন্ন শহরে আলকুরআনের কয়টি কপি পাঠিয়েছিলেন?

বিভিন্ন প্রদেশে প্রেরিত মুসহাফের (কুরআনের কপি) সংখ্যার বিষয়ে মতভেদ আছে। অধিকাংশ 'আলিম বলেন, 'উসমান (রা.) চারটি মুসহাফ প্রস্তুত করেছিলেন। মাদীনায় একটি মুসহাফ রেখে বাকিগুলো সিরিয়া, কূফা ও বাসরায় পাঠানো হয়েছিল। কেউ কেউ বলেন, উপর্যুক্ত চারটির পাশাপাশি কুরআনের আরেকটি কপি মাক্কাবাসীদের জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল। আবার কারো মতে, প্রেরিত মুসহাফের সংখ্যা ছয়; পূর্বোক্ত পাঁচটি এবং আরেকটি পাঠিয়েছিলেন বাহরাইনে। যারা বলেন, সাতটি মুসহাফ প্রেরণ করা হয়েছিল তারা বলেন সপ্তম কপিটি ইয়ামানে পাঠানো হয়েছিল। প্রেরিত মুসহাফের সংখ্যা আট বলেও একটি মত পাওয়া যায়, সেমতে অষ্টম মুসহাফটি 'উসমান (রা.) নিজের কাছে রেখেছিলেন। শাহাদাতের সময় তিনি সেটি তিলাওয়াত করছিলেন।[১৯] প্রতিটি মুসহাফের

তাতে তাদের কোন গুনাহ্ নেই। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় [আলকুরআন ২:২৪০]। এই আয়াতের বিধান অনুসারে স্বামীগতা নারীদের ইদ্দত ছিল এক বছর, এই সময় তাদের ভরণ-পোষণ স্বামীর সম্পদ হতে নির্বাহ করা হত। এই আয়াতের বিধান একই সূরার ২৩৪ নং আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। সূরাতুল বাকারার ২৩৪ নং আয়াতটির অনুবাদ নিম্নরূপঃ তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মৃত্যুমুখে পতিত হয় তাদের স্ত্রীগণ চার মাস দশ দিন প্রতীক্ষা করবে। [আলকুরআন ২:২৩৪]। এই আয়াত দ্বারা পূর্বোক্ত ২৪০নং আয়াতের বিধান রহিত হয়ে গেছে। বর্তমানে স্বামীগতা স্ত্রীরা চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করবে [যদি গর্ভবতী না হয়]।

১৮. সাহীহুল বুখারী, কিতাব তাফসীরিল কুরআন, ২:৪৬৮।

১৯. আদওয়াউল বায়ান ফী তারীখিল কুরআন, ৭৭।

সাথে একজন করে কারীও প্রেরণ করা হয়, যার দায়িত্ব ছিল বিশুদ্ধ তিলাওয়াত পদ্ধতি প্রশিক্ষণ দেওয়া। 'আবদুল্লাহ ইবনু সাইব (রা.)-কে মাক্কায়, আল-মুগীরা ইবনু শিহাবকে সিরিয়ায়, আবূ আবদিল্লাহ আস-সুলামীকে কূফায়, 'আমির ইবনু কায়সকে বাসরায় প্রেরণ করা হয়। যায়িদ ইবনু সাবিত (রা.)-কে মাদীনার অধিবাসীদেরকে কিরাআত প্রশিক্ষণের নির্দেশ দেয়া হয়।[২০]

ঙ. কুরআনের অন্য কপিগুলো জ্বালিয়ে দেওয়ার নির্দেশ: আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সরকারীভাবে কুরআনের প্রতিটি আয়াত লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা করেছিলেন। পাশাপাশি অনেক সাহাবী ব্যক্তিগত অধ্যয়নের জন্য কুরআনের আয়াত লিপিবদ্ধ করতেন। এই অনুলিপিগুলো পূর্ণাঙ্গ ছিল না। তাছাড়া কুরআনের বাণী উপলব্ধির সুবিধার্থে অনেক সময় সাহাবায়ে কিরাম তাঁদের ব্যক্তিগত অনুলিপিতে আয়াতের পাশাপাশি কোন কোন শব্দের ব্যাখ্যাও লিখে রাখতেন। খালীফা কর্তৃক রাষ্ট্রীয়ভাবে কুরআনের বিশুদ্ধতম ও পূর্ণাঙ্গ অনুলিপি তৈরি করার পর ব্যক্তিগত কপিগুলো বহাল রাখার উপায় ছিল না। কারণ এতে বিভ্রান্তি ছড়ানোর সুযোগ ছিল। প্রয়োজনে স্টান্ডার্ড কপি হতে অনুলিপি করার সুযোগ ছিল। তাই 'উসমান (রা.) নির্দেশ দিলেন মাদীনা হতে প্রেরিত মুসহাফ ব্যতীত কুরআনের অন্যান্য কপিগুলো যেন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়।[২১] ইবনু হাজর আল-'আসকালানী উল্লেখ করেছেন যে, কুরআনের কপিগুলো জ্বালিয়ে দেওয়ার পূর্বে পানি দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে ফেলা হয়েছিল।[২২] এভাবে আল্লাহ্‌র কালাম পাঠে মতভেদ করা হতে মুসলিম উম্মাহ্ পরিত্রাণ লাভ করে।

চ. সাহাবায়ে কিরামের ইজমা': সাহাবায়ে কিরামের ঐকমত্যের ভিত্তিতে কুরআন সংকলনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। তাঁরা 'উসমান (রা.)-এর এই সিদ্ধান্তে বিমোহিত হয়ে বলেছিলেন, 'আপনার সিদ্ধান্ত কতই না উত্তম,' এবং 'তিনি চমৎকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।'[২৩]

মুস'আব ইবনু সা'দ সাহাবায়ে কিরামের যুগ পেয়েছেন। তাঁর মন্তব্য হল এই যে, কুরআন সংকলনে 'উসমান (রা.)-এর সিদ্ধান্তে তাঁরা মুগ্ধ হয়েছিলেন।[২৪] কুরআন সংকলনের কারণে যারা 'উসমান (রা.)-এর সমালোচনা করতো, তাদেরকে 'আলী (রা.) বলতেন,

يا أيها الناس لا تغلوا في عثمان، ولا تقولوا له إلا خيرا، فوالله ما فعل

---

২০. প্রাগুক্ত।
২১. সহীহুল বুখারী, কিতাবু ফাদাইলিল কুরআন, বাবু জাম'ইল কুরআন, ২:৬৪৫।
২২. ইবনু হাজর, ফাতহ., ৮:৬৮২।
২৩. ফিতনাতু মাকতালি 'উসমান, ১:৭৮।
২৪. আল-বুখারী, আত-তারীখুস সাগীর, ১:৯৪।

الذي فعل –أى في المصاحف– إلا عن ملأ منا جميعا –أى الصحابة– والله لو وليت لفعلت مثل الذي فعل.

ওহে জনগণ, 'উসমান (রা.)-এর ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করো না, তাঁর সম্পর্কে ভাল বৈ অন্য কিছু বলো না। আল্লাহর শপথ, কুরআন সংকলনের ব্যাপারে তিনি তো আমাদের সাথে পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আল্লাহর শপথ, আমি যদি দায়িত্বে থাকতাম তবে অনুরূপ সিদ্ধান্তই নিতাম।[২৫]

আল-কুরতুবী (রাহ) স্বীয় তাফসীরে বলেন, 'উসমান (রা.) এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন মুহাজির ও আনসারী সাহাবীগণের সাথে পরামর্শ করে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে যা বিশ্বস্তসূত্রে বর্ণিত তা গ্রহণ এবং অন্যগুলো বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তাঁরা 'উসমান (রা.)-এর সিদ্ধান্তকে অনুমোদন করেছিলেন আর এটি ছিল যথার্থ ও সঠিক।[২৬]

ছঃ আবূ বাকর (রা.)-এর সংকলন ও 'উসমান (রা.)-এর সংকলনের মাঝে পার্থক্যঃ ইবনুত্‌ তীন (রাহ) বলেন, আবূ বাকর (রা.)-এর আমলে কুরআন সংকলন করা হয়েছিল এই কারণে যে, তিনি কারীদের তিরোধানে আংশিকভাবে কুরআন বিলুপ্তির আশঙ্কা করেছিলেন; কারণ এই মহাগ্রন্থ এক স্থানে একত্রিত অবস্থায় ছিল না। তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নির্দেশনা অনুসারে সূরাসমূহের আয়াতগুলো ধারাবাহিকভাবে সাজিয়ে কুরআন সংকলন করেন। 'উসমান (রা.)-এর আমলে কুরআনের পাঠপদ্ধতি নিয়ে মতভেদ দেখা দেয়; আরবী ভাষার বিভিন্ন উপভাষায় কুরআন তিলাওয়াতের সুযোগ থাকায় লোকজন নিজস্ব উপভাষায় কুরআন তিলাওয়াত করত এবং অন্য উপভাষায় তিলাওয়াতকারীদেরকে ভুল সাব্যস্ত করত। এই প্রবণতার ভয়াবহতা উপলব্ধি করে 'উসমান (রা.) সূরাগুলো ধারাবাহিকভাবে সাজিয়ে আবূ বাকর (রা.)-এর সংকলন হতে আলকুরআনের অনুলিপি প্রস্তুত করেন। আরবী ভাষার অন্যান্য উপভাষায় তিলাওয়াতের সুযোগ রহিত করে কেবল কুরাইশী আরবী ভাষায় আলকুরআন সংকলন করা হল। প্রাথমিক যুগে শিক্ষার অনগ্রসরতার কারণে বিভিন্ন গোত্রের লোকদের তিলাওয়াতের সুবিধার্থে নানা উপভাষায় কুরআন তিলাওয়াতের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে আরব গোত্রগুলো ইসলাম গ্রহণ করে এবং পরস্পরের কাছাকাছি আসায় ভাষার দূরত্ব দূর হয় এবং কুরাইশী ভাষা মানভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই, কুরআন তিলাওয়াতের অভিন্নতার সুবিধার্থে অন্যান্য উপভাষায় তিলাওয়াতের সুযোগ রহিত করে কেবল কুরাইশী ভাষায় কুরআন সংকলন করা হয়।

জঃ সাহীফা ও মুসহাফঃ সাহীহুল বুখারীর বর্ণনায় আবূ বাক্‌র (রা.)-এর আমলের কুরআনের সংকলন বুঝাতে *সাহীফা* ও 'উসমান (রা.)-এর আমলের সংকলন

২৫. ইবনু হাজর, ফাতহ., ৯:১৮।
২৬. আল-কুরতুবী, আল-জামি' লি আহকামিল কুরআন, ১:৮৮।

বুঝাতে *মুসহাফ*[২৭] উল্লেখ করা হয়েছে। আনাস ইবনু মালিক বলেন, 'তারা (সংকলকবৃন্দ) যখন *সাহীফা*গুলো (صحف) কপি করে *মুসহাফ* প্রস্তুত করলেন তখন 'উসমান (রা.) *সাহীফা*গুলো হাফসা (রা.)-এর কাছে ফেরত পাঠান এবং প্রতি প্রান্তে এক একটি *মুসহাফ* (مصحف) প্রেরণ করেন।' আরবী শব্দ সাহীফা-এর অর্থ হল ক্ষুদ্র গ্রন্থ বা পুস্তিকা। অপরদিকে মুসহাফ এর অর্থ হল: দুই মলাটের মাঝে একত্রিত ও বাধাইকৃত পুস্তিকাসমূহ [সাহীফাসমূহ]। আল-বুখারীর শব্দ চয়ন হতে প্রতীয়মান হয় আবূ বাক্‌র (রা.)-এর আমলে কুরআনের সূরাগুলো পুস্তিকা বা ছোট বই-এর আকারে লিপিবদ্ধ করে সেগুলোকে এক স্থানে একত্র করা হয়েছিল, তবে দু'টি মলাটের মাঝে সেগুলোকে বাঁধাই করা হয়নি। পক্ষান্তরে 'উসমান (রা.)-এর আমলে পুরো কুরআনের কয়েকটি অনুলিপি তৈরি করে প্রত্যেকটিকে বইয়ের মত করে বাঁধাই করা হয়েছিল। এজন্য আবূ বাক্‌র (রা.)-এর সংকলন বুঝাতে *সাহীফাসমূহ* এবং 'উসমান (রা.)-এর সংকলন বুঝাতে *মুসহাফ* শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে।

ঝ: মুসহাফে 'উসমান সম্পর্কে 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ-এর ভূমিকা: কুরআন সংকলনের ব্যাপারে 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ 'উসমান (রা.)-এর বিরোধিতা করেছিলেন এমন কোন বিষয় বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হয়নি। এই ধরনের কল্পিত কাহিনীর উৎস হল দুর্বল রিওয়ায়াত। অবশ্য সবকটি দুর্বল রেওয়ায়াতে এটাও বলা হয়েছে যে, ইবনু মাস'উদ সাহাবায়ে কিরামের ঐকমত্যের সিদ্ধান্তের দিকে ফিরে আসেন। শুধু তাই নয় তিনি এ বিষয়ে সাধারণ্যে ঘোষণাও প্রদান করেন এবং লোকদেরকে ঐকমত্যের সিদ্ধান্ত মেনে নেয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, 'আল্লাহ টেনেহিঁচড়ে 'ইলম উঠিয়ে নেবেন না, বরং তিনি 'আলিমগণের তিরোধানের মাধ্যমে 'ইলম উঠিয়ে নেবেন। উম্মাতে মুহাম্মাদ ভ্রান্তির ওপর ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে না। তাঁরা যে বিষয়ে একমত হয়েছেন সত্য অবশ্যই সেখানে থাকবে।'[২৮] এই বক্তব্যটুকু ইবনু মাস'উদ (রা.) লিখিতভাবে 'উসমান (রা.)-কে অবহিত করেন। ইবনু কাসীর ইবনু মাস'উদের ঐকমত্যে ফিরে আসার কথা উল্লেখ করেছেন।[২৯] আয-যাহাবী জোর দিয়ে বলেন, 'শেষাবদি 'উসমান (রা.)-এর কর্মপদ্ধতিতে ইবনু মাস'উদ (রা.) সন্তোষ প্রকাশ করেছেন এবং তাঁর আনুগত্য স্বীকার করেছেন।'[৩০]

---

২৭. মাসহাফ, মিসহাফ ও মুসহাফ- তিনটি শব্দের একই অর্থ: 'দু'টি মলাটের মাঝে একত্রিত পুস্তিকাসমূহ বা পৃষ্ঠাসমূহ [লূইস মা'লূফ, আল-মুনজিদ বৈরূত: ক্যাথলিক প্রেস ১৯০৮), ৪২৯], অর্থাৎ বাধাইকৃত বই বা পুস্তক। 'উসমান (রা.) কর্তৃক সংকলিত কুরআন বুঝাতে মাসহাফ ও মুসহাফ-দু'টি শব্দই ব্যবহার করা হয়। তবে সাহীহুল বুখারীতে মুসহাফ শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে। এই অর্থে মিসহাফ শব্দের প্রচলন দেখা যায় না। তিনটি শব্দের বহুবচনই হল মাসাহিফ। 'উসমান (রা.)-এর নির্দেশে সংকলিত কুরআনের কপিগুলোকে বুঝানোর জন্য মাসাহিফে উসমানী প্রয়োগ করা হয়।

২৮. ফিতনাতু মাকতালি 'উসমান ইবনু 'আফফান, ১:৭৯।

২৯. আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৭:২২৮।

৩০. আয-যাহাবী, সিয়ার.., ১:৩৪৯।

কুরআন সংকলন ও 'উসমান (রা.)-এর সাথে ইবনু মাস'উদের সম্পর্ক বিষয়ে তাহা হুসাইন কিছু উদ্ভট কথা বলেছেন। তিনি প্রাচ্যবিদদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এমন মন্তব্য করেছেন। কিছু লেখক আছেন যারা দুর্বল ও ইমামিয়া বর্ণনার ওপর ভিত্তি করে সাহাবায়ে কিরামের পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপারে মনগড়া মন্তব্য করেছেন।

ইবনু মাস'উদ, যিনি মতভেদ ও ফিতনার ভয়ে এবং খালিফার আনুগত্য প্রদর্শনের জন্য মিনায় নামায কসর না করে পূর্ণরূপে আদায় করেছেন, তিনি মিম্বারে আরোহন করে খালীফার বিরুদ্ধে উস্কানি দিয়েছেন- এটা যুক্তিযুক্ত নয়।[৩১]

কতিপয় ঐতিহাসিক ইবনু মাস'উদের নামে মিথ্যারোপ করেছেন এবং সাহাবায়ে কিরামের পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপারে বিদ্বেষপূর্ণ বক্তব্য রেখেছেন। এইসব বর্ণনা সুস্থ বিবেকের কাছে অগ্রহণযোগ্য। কেউ কেউ মিথ্যামূলকভাবে বলেছেন, ইবনু মাস'উদ (রা.), 'উসমান (রা.)-কে কাফির সাব্যস্ত করেছেন এবং খালীফাও তাঁকে প্রহারের নির্দেশ দিয়েছেন। এটি একটি চরম মিথ্যাচার; বর্ণনার পন্ডিতগণ জানেন যে, ইবনু মাস'উদ খালীফাকে কাফির প্রতিপন্ন করেননি। বরং 'উসমান (রা.)-এর হাতে বাই'আত করার পর তিনি মাদীনা হতে কূফা গমন করেন। সেখানে পৌঁছে তিনি আল্লাহ্র প্রশংসা করে জনগণের উদ্দেশ্যে বললেন, 'আমিরুল মু'মিনীন 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) মারা গেছেন, আমরা সাহাবায়ে কিরাম ঐকমত্যের ভিত্তিতে 'উসমান (রা.)-এর হাতে বাই'আত করেছি।'[৩২]

ঞঃ সাহীফা ও মুসহাফগুলো কোথায়?

সাহীফাঃ কুরআনের অনুলিপি প্রস্তুত করার পর 'উসমান (রা.) ওয়াদা মতো সাহীফাগুলো হাফসা (রা.)-এর কাছে ফেরত পাঠান। মারওয়ান ইবনুল হাকাম মাদীনার গভর্ণর থাকাকালে হাফসা (রা.)-এর কাছ থেকে সাহীফাগুলো নেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু উম্মুল মু'মিনীন রাজি হননি। হাফসা (রা.) মারা যাওয়ার পর মারওয়ান সাহীফাগুলো নিয়ে জ্বালিয়ে দেন। তাঁর কাজের সপক্ষে যুক্তি দেখিয়ে মারওয়ান বলেন, 'এই সাহীফাগুলো সম্পূর্ণরূপে মুসহাফুল ইমামে ('উসমান কর্তৃক সংকলিত কুরআনের কপিতে) লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, আমার আশঙ্কা এই যে, কালের বিবর্তনে কোন সন্দিগ্ধ এগুলোর ব্যাপারে সন্দেহে পতিত হতে পারে।'[৩৩]

মুসহাফঃ 'উসমান (রা.) কর্তৃক প্রেরিত কুরআনের কপিগুলো বর্তমানে কোথাও আছে কি? এই প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায় না। অনেকে মনে করে কায়রোর দারুল কুতুবে সংরক্ষিত আলকুরআনের প্রাচীন পাণ্ডুলিপিটি মাসাহিফে 'উসমান-এর একটি। তবে এ দাবি সত্য নয়। কারণ এই পাণ্ডুলিপিতে অনেক চিহ্নের ব্যবহার দেখা যায়, অথচ

---

৩১. আবদুস সাত্তার শায়খ, 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ, ৩৩৫।
৩২. ইবনু সাদ, আত্-তাবাকাত.., ৩:৬৩
৩৩. ইবনু আবি দাউদ, কিতাবুল মাসাহিফ, ২৪।

মুসহাফে 'উসমান ছিল চিহ্নবিহীন। তবে প্রাথমিক যুগের লেখকদের বিবরণ হতে জানা যায়, তারা বিভিন্ন শহরের গ্রন্থাগারে মুসহাফে 'উসমান বা তার অংশ বিশেষ দেখতে পেয়েছিলেন। সুবিখ্যাত পরিব্রাজক ইবনু বাত্তুতা গ্রানাডা, মারাকিশ ও বাসরায় মুসহাফে 'উসমানের কপি দেখতে পেয়েছেন বলে দাবি করেছেন।

'উসমান (রা.) কুরআনের যে কপিটি সিরিয়ায় প্রেরণ করেছিলেন তার একটি অনুলিপি হিজরী অষ্টম শতকের 'আলিম ইবনু কাসীর দামিশকের জামে' মাসজিদে দেখতে পেয়েছিলেন। ওটি তাবারিয়া শহর হতে ৫১৮ হিজরীতে দামিশকে আনা হয়েছিল। ইবনুল জাযারী ও ইবনু ফাদলও এই কপিটি দেখতে পেয়েছেন বলে দাবি করেছেন। একটি কাঠের ঘরে কুরআনের কপিটি সংরক্ষিত ছিল, ১৩১০ হিজরীতে এক অগ্নিকাণ্ডে সেটি ভস্মীভূত হয়।[৩৪]

বস্তুত আলকুরআন সংরক্ষণের ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহ যে যত্ন, সাবধানতা ও সতর্কতা প্রদর্শন করেছেন পৃথিবীর অন্য কোন গ্রন্থের ভাগ্যে তা জুটেনি। সত্যিই এটি হল সেই কিতাব যা সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন খোদ আল্লাহ্ তা'আলা এবং যাতে কোন মিথ্যা সামনে বা পেছন দিয়ে অনুপ্রবেশ করতে পারেনি, যা অবতীর্ণ হয়েছে প্রজ্ঞাময় ও প্রশংসার্হ আল্লাহর নিকট হতে।

---

৩৪. সুবহী আস-সালিহ, ৮৬-৮৯।

সপ্তম অধ্যায়

‘উসমান (রা.)-এর ওপর আরোপিত অভিযোগের পর্যালোচনা

'উসমান (রা.)-এর শাসনামলের শেষ ছয় বছর খিলাফাতের বিভিন্ন স্থানে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। একদল কুচক্রী খালীফা ও তাঁর গভর্ণরদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন করে জনগণের একাংশকে উত্তেজিত করে তোলে। খালীফার বিরুদ্ধে যে অভিযোগসমূহ উত্থাপন করা হয় সেগুলোকে নিম্নরূপে উপস্থাপন করা যায়:

ক. খালীফা হওয়ার পূর্বে 'উসমান (রা.)-এর কিছু ব্যক্তিগত পদক্ষেপ (যেমন, কয়েকটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করা);

খ. আর্থিক ব্যবস্থাপনা: রাষ্ট্রীয় ভাতা, চারণভূমি, আত্মীয়দের মাঝে রাষ্ট্রীয় সম্পদ বন্টন;

গ. প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা: নিকটাত্মীয়দের সরকারী পদে নিয়োগ প্রদান;

ঘ. শার'ঈ বিষয়ে ইজতিহাদ: (মিনায় পূর্ণরূপে সালাত আদায়, আলকুরআন সংকলন, মাসজিদে নববীর সম্প্রসারণ);

ঙ. কয়েকজন সাহাবীর সাথে তাঁর আচরণ: ইবনু মাস'ঊদ (রা.), আবূ যার (রা.) ও 'আম্মার (রা.)।

কিছু অভিযোগ সম্পর্কে এই গ্রন্থের বিভিন্ন পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে আমরা প্রধান তিনটি অভিযোগ সম্পর্কে আলোকপাত করব:

১. সরকারী পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বজনপ্রীতির অভিযোগ,

২. আত্মীয়স্বজনের মাঝে রাষ্ট্রীয় সম্পদ বিলি-বন্টনের অভিযোগ এবং

৩. বিশিষ্ট সাহাবী আবূ যার (রা.)-কে মাদীনা হতে বহিষ্কার।

নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক বিবরণের আলোকে সম্পূর্ণ নিরাসক্ত ভঙ্গিতে আমরা অভিযোগসমূহ পর্যালোচনা করব।

প্রথম পরিচ্ছেদ

গভর্ণর নিয়োগে 'উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে স্বজনপ্রীতির অভিযোগঃ

তৃতীয় খালীফা 'উসমান (রা.) ছিলেন একজন মাযলূম শাসক; জীবদ্দশায় তিনি যুল্‌মের শিকার হয়েছেন, ষড়যন্ত্রকারীরা তাঁকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে। অপরদিকে মৃত্যুর পরও তিনি অব্যাহতভাবে যুল্‌মের শিকার হচ্ছেন। ক্রমাগতভাবে ঐতিহাসিকগণ তাঁর বিরুদ্ধে স্বজনপ্রীতির অন্যায্য অভিযোগ নিয়ে লিখে যাচ্ছেন। প্রাথমিক যুগের ঐতিহাসিকগণের অনেকে অন্যায্যভাবে তাঁর সমালোচনা করেছেন; আল-ওয়ালীদ ইবনু 'উকবার নিয়োগ সম্পর্কে লিখতে গিয়ে অনেক ঐতিহাসিক লিখেছেন: إن عثمان استعمل على الكوفة أخاه لأمه الوليد بن عقبة 'উসমান তাঁর বৈপিত্রেয় ভাই আল-ওয়ালীদ ইবনু 'উকবাকে কূফার গভর্ণর নিয়োগ দিলেন।' এই সংক্রান্ত বিবরণের প্রথম ছত্রেই 'আল-ওয়ালীদ 'উসমানের বৈপিত্রেয় ভাই ছিলেন' এই বক্তব্যটুকু না থাকলে কোন অসুবিধা ছিল না। কিন্তু শুরুতেই 'উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে স্বজনপ্রীতির এলযাম দেয়ার জন্য এহেন বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে। আধুনিক ঐতিহাসিকগণের অনেকেই পূর্ববর্তী ঐতিহাসিকগণের দেয়া তথ্য ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে প্রকাশ করছেন, যা তৃতীয় খালীফা 'উসমান (রা.)-এর ওপর মরণোত্তর যুল্‌ম বাড়িয়ে দিচ্ছে।

এই পরিচ্ছেদে আমরা শাসনকর্তা নিয়োগে 'উসমান (রা.)-এর কর্মনীতি পর্যালোচনা করব। প্রকৃত সত্যকে জনসমক্ষে প্রকাশ করা ছাড়া আমাদের অন্য কোন লক্ষ্য নেই। সম্পূর্ণ নিরাসক্ত ভঙ্গিতে আমরা এই পর্যালোচনা উপস্থাপন করব।

ক. 'উসমান কর্তৃক নিয়োগকৃত শাসনকর্তার সংখ্যা ২৬ঃ প্রথমেই দেখা যাক, 'উসমান (রা.) মোট কতজন গভর্ণর ও শাসনকর্তা নিয়োগ করেছিলেন। ইতিহাস গ্রন্থগুলোতে ২৬ জন ব্যক্তির নাম পাওয়া যায় যাদেরকে 'উসমান (রা.) প্রাদেশিক গভর্ণর ও বিভিন্ন অঞ্চলের শাসনকর্তা হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন (এঁদের সবাই একই সময়ে কর্মরত ছিলেন না।)। তাঁরা হলেনঃ আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা.), আল-কা'কা' ইবনু 'আমর, জাবির আল-মুযানী, হাবীব ইবনু মাসলামা, আবদুর রহমান ইবনু খালিদ ইবনিল ওয়ালীদ, আবুল আ'ওয়ার আস-সুলামী, হাকীম ইবনু সালামাহ, আল-আশ'আছ ইবনু কায়স, জারীর ইবনু আবদিল্লাহ আল-বাজালী, 'উয়াইনা ইবনু আন-নাহ্‌হাস, মালিক ইবনু হাবীব, আন-নুসাইর আল-'আজালী, আস-সাইব ইবনুল আকরা', সা'ঈদ ইবনু কায়স, সালমান

ইবনু রাবী'আহ্ আল-বাহিলী, খুনাইস ইবনু হুবাইশ, আল-আহনাফ ইবনু কায়স, আবদুর রহমান ইবনু রাবী'আহ আল-বাহিলী, ইয়া'লা ইবনু মুনইয়াহ, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর আল-হাদরামী এবং 'আলী ইবনু রাবী'আহ ইবনু 'আবদিল উয্যা।

খ. উমাইয়া বংশীয় গভর্ণর ছিলেন পাঁচ জন: মু'আবিয়া ইবনু আবি সুফইয়ান (রা.), 'আবদুল্লাহ ইবনু সা'দ ইইন আবি সার্‌হ, আল-ওয়ালীদ ইবনু 'উকবা, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমির ইবনু কুরাইয ও সা'ঈদ ইবনুল 'আস (রা.)। আবার এঁরা সবাই একসাথে কর্মরত ছিলেন না; আল-ওয়ালীদকে অপসারণের পর সা'ঈদকে কূফার গভর্ণর করা হয়। আবার মৃত্যুর পূর্বে তাঁকেও সরিয়ে নেন। 'উসমান (রা.)-এর শাহাদাতের সময় তাঁর স্বগোত্রীয় গভর্ণর ছিলেন তিনজন: মু'আবিয়া ইবনু আবি সুফইয়ান, 'আবদুল্লাহ ইবনু সা'দ ইবনি আবি সার্‌হ ও 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমির।

গ. উমাইয়া বংশের লোকজনকে 'উসমান (রা.)-ই প্রথম সরকারী কাজে নিয়োগ করেননি: কোন কোন ঐতিহাসিকের বিবরণ পাঠে মনে হয় 'উসমান (রা.)-ই সর্বপ্রথম বানূ উমাইয়ার লোকজনকে সরকারী কাজে নিয়োগ করেছিলেন। অথচ বিষয়টি তেমন নয়, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উমাইয়া বংশের অনেক লোককে সরকারী কাজে নিয়োগ করেছিলেন। শুধু তাই নয়, একক গোত্র হিসেবে বিচার করলে দেখা যাবে তিনি বানূ উমাইয়া হতে সর্বাধিকসংখ্যক সরকারী কর্মচারী নিয়োগ দিয়েছিলেন। বিষয়টি অস্বাভাবিক নয়। কুরাইশদের মাঝে বানূ উমাইয়া ধনে-জনে সেরা ছিল। তদুপরি প্রশাসনিক ও সামরিক যোগ্যতা তাদের অনেক বেশি ছিল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সময়ে উমাইয়া বংশ হতে নিয়োগপ্রাপ্ত কয়েকজন হলেন: মক্কার শাসক 'আত্তাব ইবনু উসাইদ ইবনি আবিল 'আস, নাজরানের শাসক আবূ সুফইয়ান ইবনু হার্‌ব, বানূ মিজযাহ-এর কালেক্টর খালিদ ইবনু সা'ঈদ, বাহরাইনের শাসক আবান ইবনু সা'ঈদ।[১]

বানূ উমাইয়া হতে শাসনকর্তা ও অন্যান্য সরকারী কর্মচারী নিয়োগের এই ধারা আবূ বাকর (রা.) ও উমার (রা.)-এর আমলেও অব্যাহত ছিল। এই দুই খালীফার আমলে বানূ উমাইয়ার বিপুল সংখ্যক লোক সরকারী কাজে নিযুক্ত ছিলেন। অবশ্য এখানে একটি বিষয় বলা যায়, আবূ বাকর (রা.) ও 'উমার (রা.) উমাইয়া বংশের লোক ছিলেন না। তাই তাঁরা এই বংশের লোকদেরকে সরকারী পদে নিযুক্ত করেছেন। পক্ষান্তরে নিজেদের বংশের কোন লোককে তাঁরা সরকারী

১. মিনহাজুস সুন্নাহ, ৩: ১৭৫-৭।

কাজে নিয়োগ করেননি। আবূ বাকর (রা.) তাঁর খিলাফাতকালে আপন গোত্রের কোন লোককে সরকারী পদে নিয়োগ দেননি। 'উমার (রা.) তাঁর গোটা শাসনকালে তাঁর গোত্রের মাত্র একজন ব্যক্তিকে -যার নাম ছিল নু'মান ইবনু 'আদী- বাসরার কাছে মায়দান নামক এক ক্ষুদ্র এলাকার তহসিলদার নিযুক্ত করেছিলেন। অল্প কিছুদিন পরই তাঁকে এ পদ থেকে বরখাস্ত করেছিলেন।[২]

ঘ. খালীফার আত্মীয়দের মধ্য হতে যোগ্যদেরকে সরকারী পদে নিয়োগ দান করা সম্পূর্ণ বৈধঃ 'উসমান (রা.) তাঁর দুই পূর্বসূরির কাজের ধারাবাহিকতা বজায় রাখেন। তবে তাঁর কর্মনীতিতে সামান্য পরিবর্তন সাধিত হয়। তিনি বানূ উমাইয়া হতে পূর্বে নিযুক্ত শাসনকর্তাদের বহাল রাখেন এবং নবনিয়োগের ক্ষেত্রে স্বগোত্রীয়দের বঞ্চিত করেননি। এক্ষেত্রে পূর্বসূরি দু'খালীফার সাথে 'উসমান (রা.)-এর দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য ছিল। আবূ বাকর (রা.) ও 'উমার (রা.) নিজ গোত্রের লোকদেরকে সরকারী পদে নিয়োগ না দেওয়ার সুন্নাহ্ প্রবর্তন করেছিলেন। এটি ছিল তাঁদের নিজস্ব সাবধানতা। ইসলামে এই ধরনের কোন বিধান নেই যে, খালীফা বা শাসকের আপন গোত্রের লোকদেরকে সরকারী কাজে নিযুক্ত করা যাবে না। যোগ্য ব্যক্তিদের -যে গোত্রেরই হোক না কেন - তাদের যোগ্যতার সাথে মানানসই পদে নিয়োগ দেয়া যাবে। এক্ষেত্রে আত্মীয়তা অযোগ্যতার কারণ হতে পারে না। 'উসমান (রা.) এই মূলনীতির আলোকে কর্মনীতি গ্রহণ করেছিলেন, স্বগ্রোত্রীয়দের রাষ্ট্রীয় পদে নিয়োগ দানকে তিনি আত্মীয়দের সাথে সদাচরণের ইসলামী নির্দেশ পালনে সহায়ক পন্থা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলতেন, "উমার (রা.) আল্লাহ্র জন্য নিকটাত্মীয়দের বঞ্চিত করতেন, আমি আল্লাহ্র জন্য আমার নিকটাত্মীয়দেরকে দান করছি।"[৩] স্বগোত্রীয়দের সরকারী পদে নিয়োগ দিয়ে 'উসমান (রা.) কখনো বৈধতার সীমা অতিক্রম করেননি। আত্মীয়দের সরকারী পদে নিয়োগ না দেওয়ার রীতি - যা আবূ বাকর (রা.) ও উমার (রা.) অবলম্বন করেছিলেন - অতি উত্তম কর্মনীতি, তবে আত্মীয়দের মধ্য হতে যোগ্য প্রার্থীদেরকে সরকারী পদে নিয়োগ দেওয়া অবৈধ বা নিকৃষ্ট নীতি নয়। খোদ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজের গোত্রের তথা বানূ হাশিমের লোকদেরকে রাষ্ট্রীয় পদে নিয়োগ দিয়েছিলেন।

আমাদেরকে যে বিষয়টি দেখতে হবে তা হল, 'উসমান (রা.) কি শুধু আত্মীয়তার খাতিরেই স্বগোত্রীয়দের সরকারী পদে নিয়োগ দিয়েছিলেন না

২. ইবনু আবদিল বার, আল-ইস্তি'আব, ১ঃ ২৯৬।
৩. আত-তাবারী, তারীখ., ৩ঃ ২৯১।

সত্যিকার অর্থে তাঁরা ঐসব পদে নিয়োগ লাভের যোগ্য ছিলেন। তিনি যদি নিরেট আত্মীয়তার খাতিরে আপন গোত্রের অযোগ্য লোকদেরকে নিয়োগ দিয়ে থাকেন তবে অবশ্যই তা স্বজনপ্রীতি বলে গণ্য হবে এবং এহেন গর্হিত কাজ করার জন্য তিনি নিন্দিত হবেন। কিন্তু ইতিহাসের সাক্ষ্য ভিন্নরকম: 'উসমান (রা.) বানূ উমাইয়ার যে কয়েকজনকে গভর্ণর হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন তাঁদের প্রত্যেকে যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলেন, শুধু তাই নয় কর্মক্ষেত্রে তাঁরা প্রশাসনিক ও সামরিক যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখতে পেরেছেন। আলোচনার এ পর্যায়ে 'উসমান (রা.)-আমলে নিয়োগপ্রাপ্ত উমাইয়া বংশের গভর্ণরদের পরিচয় ও কীর্তি উপস্থাপন অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

ঙ. 'উমাইয়া বংশের গভর্ণরদের ভূমিকার মূল্যায়ন:

এক. মু'আবিয়া ইবনু আবি সুফইয়ান ইবনু হার্ব: মু'আবিয়া (রা.) তদীয় পিতা আবূ সুফইয়ানের সাথে মাক্কা বিজয়ের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। মাক্কা বিজয়ের অভিযানে আবূ সুফইয়ানের বাড়ির বিশেষ মর্যাদা ছিল, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, আবূ সুফইয়ানের বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণকারী ব্যক্তি নিরাপত্তা লাভ করবে।

ইসলাম গ্রহণের অব্যবহিত পরে মু'আবিয়া (রা.) হুনাইন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। যুদ্ধের প্রথমদিকে মুসলিমরা বিপর্যয়ে পড়েন। পরে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উদাত্ত আহবানে তাঁরা ঘুরে দাঁড়ান এবং কাফিররা পর্যুদস্ত হয়। এই যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

ثُمَّ أَنْزَلَ سَكِيْنَتَهُ عَلَى رَسُوْلِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَنْزَلَ جُنُوْدًا لَمْ تَرَوْهَا
وَعَذَّبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكٰفِرِيْنَ.

> অতঃপর আল্লাহ্ তাঁর নিকট হতে তাঁর রাসূল ও মু'মিনদের ওপর প্রশান্তি বর্ষণ করেন এবং এমন এক সৈন্যবাহিনী অবতীর্ণ করেন যা তোমরা দেখতে পাওনি এবং তিনি কাফিরদের শাস্তি প্রদান করেন; এটিই কাফিরদের কর্মফল। [আলকুরআন ৯:২৬।]

আলকুরআনের ঘোষণার আলোকে বলা যায় মু'আবিয়া (রা.) সেই সাহাবীগণের অন্তর্গত যাঁদের ওপর আল্লাহ প্রশান্তি বর্ষণ করেছিলেন।

মু'আবিয়া ওয়াহী লেখক হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। অত্যন্ত বিশ্বস্ত জানতেন বলেই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে ওয়াহী লিখার গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত করেছিলেন। মু'আবিয়া (রা.)-এর জন্য তিনি এ বলে দু'আও করেছেন: اللهم علّم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب 'আল্লাহ! মু'আবিয়াকে কিতাব ও গণিত শিক্ষা দাও এবং তাকে আযাব থেকে রক্ষা কর।'

এই উম্মাতের মধ্যে যাঁরা প্রথম নৌযুদ্ধে অবতীর্ণ হবেন তাঁদের জন্য রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দু'আ করেছিলেন। মু'আবিয়া (রা.) সর্বপ্রথম সমুদ্রে অভিযান চালিয়ে সাইপ্রাসে যুদ্ধ করেছিলেন।

প্রশাসনিক ময়দানে মু'আবিয়ার বিরল অর্জন রয়েছে। মু'আবিয়া (রা.) ধারাবাহিকভাবে তিন খালীফার আমলে রাষ্ট্রের খিদমাত করেছেন। আবূ বাকর (রা.) মু'আবিয়ার ভাই ইয়াযীদকে শাসনকাজে নিয়োগ করেন। তিনি মারা গেলে তদস্থলে মু'আবিয়া (রা.)-কে নিয়োগ দেন। দ্বিতীয় খালীফা 'উমার (রা.) মু'আবিয়া (রা.)-কে সিরিয়ার শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। তৃতীয় খালীফা 'উসমান (রা.) মু'আবিয়া (রা.)-এর অধীনে হিম্স ও ফিলিস্তিন ন্যস্ত করে তাঁকে খিলাফাতের সবচাইতে বড় প্রদেশের গভর্ণর হিসেবে নিয়োগ দেন। এভাবে দেখা যায় প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তিনি উত্তরোত্তর পদোন্নতি লাভ করেছেন। এটি তার যোগ্যতার স্বীকৃতি। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এত দীর্ঘ সময় ধারাবাহিকভাবে দায়িত্ব পালনের নযির ইসলামের ইতিহাসে খুব একটা পাওয়া যায় না। তিনি ২০ বছর গভর্ণর হিসেবে শাসনকার্য পরিচালনা করেছেন।

দুইঃ 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমির ইবনি কুরাইযঃ তাঁর পুরো পরিচয় হলঃ 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমির ইবনু কুরাইয ইবনু রাবী'আহ ইবনু শামস ইবনু আবদি মানাফ ইবনু কুসাই আল-কারশী আল-'আবশামী।[৪] 'উসমান (রা.)-এর মা আরওয়া বিনতু কুরাইয, 'আমির ইবনু কুরাইযের বোন। অতএব 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমির ইবনু কুরাইয, 'উসমান (রা.)-এর মামাতো ভাই।

চতুর্থ হিজরীতে তাঁর জন্ম। ৭ম হিজরীতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'উমরাতুল কাযা আদায় করতে মাক্কায় গেলে শিশু 'আবদুল্লাহকে তাঁর কাছে আনা হয়। সে হাই তুললে তিনি তার মুখে থুথু দিয়ে বললেন, 'এ সুলামিয়ার বেটা?' লোকজন বললঃ 'হ্যাঁ।' তিনি বললেন, 'এ তো আমাদের মত হয়েছে।' তিনি আবার তার মুখে থুথু দিলেন এবং অনিষ্টের হাত থেকে শিশুটির সুরক্ষার জন্য দু'আ করলেন। 'আবদুল্লাহ থুথু গিলে ফেলল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন 'এ তৃষ্ণা নিবারণকারী হবে।' বড় হয়ে 'আবদুল্লাহ কোন ভূমির ওপর দিয়ে গেলে সেখানে পানি পাওয়া যেত।[৫]

২৯ হিজরীতে বাসরার গভর্ণর হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্তির পূর্বে তিনি কোন সরকারী পদে সমাসীন হননি। 'উসমান (রা.)-এর শাহাদাতের সময়ও তিনি বাসরার গভর্ণর ছিলেন। খালীফার মৃত্যু সংবাদ শুনে বিরাট এক সেনাবাহিনী ও তার সমুদয় সহায়সম্বলসহ মাক্কার পথে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে আয-যুবাইর

---

৪. ইবনু কাসীর, আল-বিদায়াহ., ৮:৯১।
৫. ইবনু হাজর, তাহযীবুত তাহযীব, ৪:৪৯।

(রা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ হলে বাসরায় ফিরে যান এবং উষ্ট্রের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি অবশ্য সিফফিনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি। মু'আবিয়া তাঁকে তিন বছর বাসরার গভর্ণর হিসেবে বহাল রাখার পর বরখাস্ত করেন। তারপর তিনি আর সরকারী পদ গ্রহণ করেননি। ৫৭ হিজরীতে মাদীনায় তাঁর মৃত্যু হয়।

বিজয়াভিযানে 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমির উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। খিলাফাতের প্রাচ্যমুখী সম্প্রসারণে তাঁর বিরাট কীর্তি রয়েছে। তাঁকে 'উসমান (রা.)-এর আমলের সর্বশ্রেষ্ঠ সেনাপতি বলে গণ্য করা যায়ঃ পারস্য সম্রাটের রাজ্য পুনরুদ্ধারের সকল পরিকল্পনা তিনিই নস্যাৎ করেন। সর্বশেষ পারস্য সম্রাট ইয়াযদাগির্দ ইবনু শাহরিয়ার এবং পারস্যবীর রুস্তমের ভাই খুরযাদমাহরকে পরাস্ত করে তিনি ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানা সুরক্ষিত ও বর্ধিত করেন। সিজিস্তান, খুরাসান ও মাকরানের বিস্তৃত এলাকা তাঁর নেতৃত্বে বিজিত হয়। বিজয়াভিযানের আলোচনায় 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমিরের সামরিক সাফল্য ও কৃতিত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

জ্ঞানের ক্ষেত্রেও তার পদচারণা ছিল। তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছ থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, من قتل دون ماله فهو شهيد 'আপন সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে যে নিহত হয় সে শহীদ বলে গণ্য হবে।' আল হাকিম, মুস্তাদরাকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।[৬]

আর্থিক ও অবকাঠামোগত সংস্কার তথা জনগণের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব ও সুখ-সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য তিনি অবকাঠামোগত উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রেখেছেন। তাঁর আমলে বাসরা সমৃদ্ধতম ইসলামী প্রদেশে পরিণত হয়। প্রদেশের আর্থিক ও অবকাঠামোগত সংস্কারে গভর্ণর 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমিরের অবদানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

১. বাজার দান করাঃ বাসরার মধ্যভাগ দিয়ে একটি নদী প্রবাহিত হয়েছে। নদীতীরে একটি বাজার ছিল। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমির সেটি কিনে নিয়ে বাসরাবাসীর জন্য দান করে দেন। এতে বাসরার আর্থিক কর্মকাণ্ড গতিপ্রাপ্ত হয়।

২. উবুল্লাহ নহরঃ বাসরা থেকে চার ফার্লং দূরত্বে দজলা নদীর পশ্চিশ তীরে উবুল্লা শহর। এই অঞ্চলের কৃষিকাজের সুবিধার্থে দজলা থেকে পানি প্রবাহের জন্য একটি খাল কাটার কাজ শুরু করেছিলেন আবূ মূসা আল-আশ'আরী। খুরাসান অভিযানে বের হওয়ার পূর্বে ইবনু 'আমির খালটির খননকাজ সম্পন্ন করার নির্দেশ দেন। রাজস্ব বিভাগের প্রধান ছিলেন যিয়াদ ইবনু আবি সুফইয়ান; তিনি উবুল্লাহ

---

৬. প্রাগুক্ত।

খাল খননের ব্যবস্থা করেন। আবদুর রহমান ইবনু আবি বাকরার সার্বিক তত্ত্বাবধানে খালটি খনন করা হয়।[৭]

৩. নাহ্‌র নাফিয: 'আবদুল্লাহ্ ইবনু 'আমিরের এক আযাদকৃত দাসের নাম ছিল নাফিয। গভর্ণরের নির্দেশে তিনি একটি খাল খনন করেন; এটি নাহ্‌রে নাফিয নামে পরিচিত।[৮]

৪. নাহ্‌র মুর্‌রাহ: 'আবদুল্লাহ্ ইবনু 'আমিরের নির্দেশে মুর্‌রাহ্ নামক এক ব্যক্তি আরেকটি খাল খনন করেন। এটি নাহ্‌র মুর্‌রা নামে পরিচিত।[৯]

৫. নাহ্‌র উম্মু 'আবদিল্লাহ্: 'আবদুল্লাহ্ ইবনু 'আমিরের মায়ের নাম ছিল দাজ্জাজাহ; তাঁর নামানুসারে তিনি একটি খাল খনন করেন যেটি 'নাহ্‌র উম্মু আবদিল্লাহ দাজ্জাজাহ্' নামে পরিচিত। গায়লান ইবনু খারাশাহ আদ-দাব্বী এই খাল খননের সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করেন। একবার হারিসা ইবনু বাদর আল-গুদানী এই খাল সম্পর্কে 'আবদুল্লাহ্ ইবনু 'আমিরকে বলেছিলেন, 'এই খালের চেয়ে অধিক বরকতময় জলধারা আমি দেখিনি, দুর্বল ও দরিদ্ররা তাদের বাড়ির দোর থেকেই এই খালের পানি সংগ্রহ করতে পারে। আবার এই খালের ওপর দিয়ে প্রয়োজনীয় সামগ্রী তাদের ঘাটায় পৌঁছে যায়।'[১০]

৬. নাহ্‌র ইবনু 'উমাইর: গভর্ণর 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমির তাঁর বৈপিত্রেয় ভাই 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমাইরকে ৮ হাজার জারীব (জমির পরিমাপ) চাষযোগ্য জমি বন্দোবস্ত প্রদান করেন। ওই জমিতে সেচের সুবিধার্থে ইবনু 'উমাইর একটি খাল খনন করেন। সাধারণ মানুষও এই খাল হতে সেচসুবিধা গ্রহণ করতে পারতেন।[১১]

৭. নাহ্‌রুল আসাভিরাহ: বাসরাবাসীর জন্য ইবনু 'আমির আরেকটি খাল খনন করেন ; এটি নাহ্‌রুল আসাভিরাহ নামে পরিচিত[১২]।

৮. কুর্‌রাহ পুল (কানতারাতু কুররাহ): বাসরার একটি প্রাচীন নদীর ওপর কানতারাতু কুররাহ নামে একটি পুল ছিল; এটি সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত ছিল না। গভর্ণর ইবনু 'আমিরের মা এটি কিনে জনগণের জন্য উন্মুক্ত করে দেন।

'উসমান (রা.)-এর আমলে ব্যবসা-বাণিজ্য ও সামরিক কৌশলগত কারণে বাসরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শহরে পরিণত হয়েছিল। শহরটি দজলা নদীর সন্নিকটে অবস্থিত

---

৭. বালাযুরী, ৩৫৭।
৮. প্রাগুক্ত, ৩৬০।
৯. প্রাগুক্ত।
১০. প্রাগুক্ত, ৩৫৯।
১১. প্রাগুক্ত।
১২. প্রাগুক্ত, ৩৫৮।

হওয়ায় একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। নদী বিধৌত জনপদটির জমি অত্যন্ত উর্বর ছিল। ফলে চাষাবাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এলাকা ছিল বাসরা। সামরিক কৌশলের দৃষ্টিকোণ থেকে বাসরার অবস্থানগত মূল্য ছিল অপরিসীম। এই শহর হতে প্রাচ্যমুখী অভিযানগুলো পরিচালিত হত। ব্যাপক সামরিক বিজয় ও বিপুল আর্থিক কর্মকাণ্ডের ফলে বাসরা অত্যন্ত সমৃদ্ধ প্রদেশে পরিণত হয়েছিল।

গভর্ণর হিসেবে 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমির অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে নেতৃত্ব প্রদান করেন। অবকাঠামোগত উন্নয়নে তাঁর নেয়া প্রতিটি পদক্ষেপ প্রদেশের সমৃদ্ধিতে ভূমিকা পালন করেছে। খাল খননের ফলে একদিকে যেমন কৃষিকর্মের আওতা বেড়েছে তেমনি নৌবন্দর গড়ে ওঠায় ব্যবসা-বাণিজ্যের গতিবৃদ্ধি পেয়েছিল। অপরদিকে ইবনু 'আমিরের সুযোগ্য সামরিক নেতৃত্বে খিলাফাতের সীমানা অব্যাহতভাবে সুরক্ষিত ও বর্ধিত হচ্ছিল।

ব্যক্তিগতভাবে ইবনু 'আমির অত্যন্ত উদার ও দয়ালু প্রকৃতির লোক ছিলেন। জনসাধারণের সুখ-দুঃখের প্রতি বিশেষ নযর রাখতেন। তাঁর দানশীলতা ছিল সুবিদিত; ইসলামের ইতিহাসের অন্যতম সেরা দানবীর হিসেবে তাঁকে গণ্য করা হয়। ইবনু সা'দ বলেন,

كان عبد الله بن عامر شريفا، سخيا، كريما كثير المال والولد، محبا للعمران

আবদুল্লাহ্ ইবনু 'আমির ছিলেন সজ্জন, ভদ্র ও দানশীল, ধনে-সন্তানে সেরা এবং নির্মাণ-প্রিয়।

তাঁর সম্পর্কে ইবনু হাজর বলেন,

كان جوادا كريما ميمونا..جريئا شجاعا

তিনি ছিলেন বদান্য, উদার, সৌভাগ্যবান ও সাহসী।[১৩]

সামরিক সাফল্য, গণমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ ও অন্যান্য সুকৃতির বিচারে 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমিরকে খুলাফা রাশিদূনের আমলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গভর্ণর বলে গণ্য করা যায়। এমতাবস্থায় খালীফা 'উসমান (রা.)-এর মামাতো ভাই হওয়া তাঁর অযোগ্যতা হতে পারে না।

তিনঃ আল-ওয়ালীদ ইবনু 'উকবাঃ নাম আল-ওয়ালীদ ইবনু 'উকবা ইবনু আবি মু'আইত ইবনু আবি 'আমর ইবনু উমাইয়া ইবনু 'আবদি শামস ইবনু 'আবদি মানাফ। তিনি ক্ষণকালের জন্য রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর

---

১৩. ইবনু হাজর, তাহযীবুত তাহযীব, ৫:২৭২।

সাহচর্য লাভ করেছিলেন।[১৪] সম্পর্কের দিক দিয়ে ইনি 'উসমান (রা.)-এর বৈপ্রিত্রেয় ভাই।

আল-ওয়ালীদকে রাষ্ট্রীয় পদে 'উসমান (রা.) প্রথম নিয়োগ করেননি। প্রথম দু'খালীফা আল-ওয়ালীদকে রাষ্ট্রীয় কাজে নিযুক্ত করেছিলেন। এটি সর্বজনবিদিত যে, আবূ বাকর (রা.) ও 'উমার (রা.) কারো যোগ্যতা ও বিশ্বস্ততার বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার পূর্বে তাকে রাষ্ট্রীয় পদে নিয়োগ করতেন না। সর্বপ্রথম যে রাষ্ট্রীয় কাজে আমরা আল-ওয়ালীদকে দেখতে পাই তা হল তিনি পারস্যবাসীদের সাথে সংঘটিত আল-মাযারের যুদ্ধে খালীফা ও সেনাপতি খালিদ ইবনু ওয়ালীদের মাঝে পত্র বিনিময়ের গোপন কাজ করেছিলেন।[১৫] তারপর আল-ওয়ালীদকে সেনাপতি 'আয়ায ইবনু গান্‌ম আল-ফিহরীর সাহায্যে প্রেরণ করা হয়। ১৩ হিজরীতে তিনি কুযা'আ গোত্রের সাদাকা সংগ্রহের কাজে কালেক্টর পদে নিযুক্ত হন। বিশ্বস্ততার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ না হলে কাউকে এই পদে নিয়োগ দেওয়া হত না। তারপর সিরিয়ায় অভিযান পরিচালনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে আবূ বাকর (রা.), 'আমর ইবনুল 'আস (রা.) ও আল-ওয়ালীদকে সেনাপতি হিসেবে প্রেরণ করেন। 'আমর (রা.) ফিলিস্তিন জয় করেন, অপরদিকে আল-ওয়ালীদ জর্দানের পূর্বাংশ জয় করেন। তারপর 'উমার (রা.)-এর আমলে আমরা দেখি আল-ওয়ালীদ বানূ তাগলিব ও আরব আল-জাযীরার শাসক পদে নিযুক্ত হয়েছেন।[১৬]

আল-ওয়ালীদের কর্মস্থল বানূ তাগলিব তখনো খৃস্টানপ্রধান গোত্র ছিল। তাই তিনি ইসলাম প্রচারের সুযোগ গ্রহণ করলেন, তাগলিব ও ইয়াদ গোত্রের বিপুল সংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণে আল-ওয়ালীদের সক্রিয় ভূমিকা ছিল।

সামরিক ও প্রশাসনিক যোগ্যতা এবং কৃতিত্বের পূর্ব দৃষ্টান্ত ও অভিজ্ঞতা নিয়ে আল-ওয়ালীদ কূফার গভর্ণর নিযুক্ত হন। গভর্ণর হিসেবে তিনি পাঁচ বছরের কার্যকালে যথেষ্ট দক্ষতা ও কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন এবং সামরিক ও প্রশাসনিক যোগ্যতার প্রমাণ উপস্থাপন করতে পেরেছেন। তাঁর আমলে কূফা হতে খিলাফাতের প্রাচ্যমুখী সম্প্রসারণে অভিযান পরিচালিত হয়েছে। তিনি অত্যন্ত প্রজারঞ্জক শাসক ছিলেন। আত-তাবারী উল্লেখ করেছেন যে,

وكان أحب الناس في الناس وأرفقهم بهم، فكان كذلك خمس سنين وليس على داره باب

তিনি ছিলেন জনপ্রিয় ও শাসিতদের প্রতি কোমল ব্যবহারকারী। পাঁচ বছরের শাসনকালে তাঁর ঘরে কোন দোর ছিল না।[১৭]

---

১৪. আয-যাহাবী, সিয়ার., ৩:৪১২।
১৫. আত-তাবারী, তারীখ., ৪:১৬৮।
১৬. প্রাগুক্ত।
১৭. আত-তাবারী, ৪:২৭১

জনসাধারণের সুখ-দুঃখে তিনি অংশীদার হতেন এবং দুঃখ-দুর্দশা লাঘবে সচেষ্ট থাকতেন। তাঁর জনপ্রিয়তা সম্পর্কে আত-তাবারী আরো লিখেছেন: العامة معه والخاصة عليه 'সর্বসাধারণ তাঁর সাথে ছিল, বিশেষ লোকজন তাঁর বিরুদ্ধে ছিল।'[১৮] তাঁর যোগ্যতা ও কৃতিত্ব কেউ অস্বীকার করে না। 'উসমান (রা.) বলতেন, 'আমার ভাই বলে আমি তাকে নিয়োগ করিনি। বরং আমি তাকে এজন্য নিয়োগ করেছি যে সে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ফুফু উম্মু হাকীমের বেটা (নাতি)।'

আল-ওয়ালীদের বিরুদ্ধে দু'টো গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করা হয়: প্রথমত, তাঁর ব্যাপারে সূরা আল হুজুরাতের ৬ নং আয়াত অবতীর্ণ হওয়া যাতে তাঁকে ফাসিক বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয়ত, তাঁর মদ্যপান। নিম্নে এ দু'টো বিষয়ে নিরপেক্ষভাবে আলোচনা উপস্থাপন করা হচ্ছে:

সূরা আল হুজুরাতের ৬ নং আয়াত কি আল-ওয়ালীদ সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল?

'উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে স্বজনপ্রীতির কথিত অভিযোগের সমর্থনে যুক্তি দিয়ে বলা হয় যে, তিনি তাঁর বৈপিত্রেয় ভাই আল-ওয়ালীদকে গভর্ণর নিয়োগ করেছিলেন, যিনি বিশ্বস্ততার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হননি। অভিযোগ করা হয় যে, সূরা আল হুজুরাতের ৬ নং আয়াতটি আল-ওয়ালীদ সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল যেখানে তাঁকে ফাসিক হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوْا أَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِيْنَ

> হে মুমিনগণ, যদি কোন পাপাচারী (ফাসিক) তোমাদের নিকট কোন বার্তা আনয়ন করে, তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে, পাছে অজ্ঞতাবশত তোমরা কোন সম্প্রদায়কে ক্ষতিগ্রস্ত করে বস, এবং তোমাদের কৃতকর্মের জন্য তোমাদেরকে অনুতপ্ত হতে হয়। [আলকুরআন ৪৯:৬]

অধিকাংশ তাফসীরকার এই আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে নিম্নের ঘটনা উল্লেখ করেছেন: বানুল মুস্তালিক গোত্রের সর্দার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দরবারে এসে নিজ গোত্রের সাদাকাহ সংগ্রহের জন্য নির্দিষ্ট সময়ে একজন কালেক্টর প্রেরণের অনুরোধ করেন। নির্দিষ্ট সময়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাদাকাহ সংগ্রহের জন্য আল-ওয়ালীদ ইবনু 'উকবাকে বানুল মুস্তালিক গোত্রের নিকট প্রেরণ করেন। আল-ওয়ালীদ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কোন কারণে ভয় পেয়ে মাদীনায় ফিরে যান এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জানান যে, বানুল মুস্তালিক সাদাকাহ

---

১৮. প্রাগুক্ত, ৪:২৭৭।

প্রদানে অসম্মতি জ্ঞাপন করেছে এবং তারা মুর্তাদ হয়ে গেছে। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খালিদ ইবনু ওয়ালীদের নেতৃত্বে একটি বাহিনী প্রেরণ করলেন এবং বানুল মুস্তালিকের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার পূর্বে তাঁকে তথ্যানুসন্ধান করতে বললেন। অনুসন্ধানে খালিদ জানতে পারেন যে, বানুল মুস্তালিক দীন ইসলামে প্রতিষ্ঠিত আছে, তারা সাদাকাহ প্রদানে অসম্মতি জ্ঞাপন করেনি। আল-ওয়ালীদ তো তাদের কাছে যাননি। মাদীনায় ফিরে এসে খালিদ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে পুরো ব্যাপারটি অবহিত করেন। অধিকাংশ তাফসীরকারদের অভিমত হল এই ঘটনার প্রেক্ষিতে সূরা আল হুজুরাতের পূর্বোক্ত ৬ নং আয়াতটি নাযিল হয়। দেখা যাচ্ছে এই আয়াতে আল-ওয়ালীদকে ফাসিক বলে অভিহিত করা হয়েছে এবং এই ধরনের ফাসিকের সংবাদ গ্রহণের পূর্বে যাচাই-বাছাই করতে বলা হয়েছে। 'উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ হল তিনি কেবল আত্মীয়তার খাতিরে একজন ফাসিককে তথা আল-ওয়ালীদকে কূফার গভর্ণর হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন।

পর্যালোচনাঃ এই আয়াত আল-ওয়ালীদ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, এমন তথ্য বিশুদ্ধ বর্ণনা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নয়। তাফসীরকারগণ যেসব বর্ণনার ভিত্তিতে আয়াতটির শানে নুযূল বর্ণনা করেছেন সেগুলোর সনদ শক্তিশালী নয়। ফাদাইলের ক্ষেত্রে দুর্বল রেওয়ায়েত গ্রহণ করা যেতে পারে, কিন্তু একজন সাহাবীকে ফাসিক হিসেবে চিত্রিত করার মত গুরুতর বিষয়ে দুর্বল বর্ণনা কিছুতেই গ্রহণ করা যেতে পারে না। এই বর্ণনার সনদে মুহাম্মাদ ইবনুস সাইব আল-কালবী নামে একজন বর্ণনাকারী আছে যার সম্পর্কে ইবনু হাজর বলেছেন, كان بالكوفة كذابان، أحدهما الكلبي، والآخر: السدي 'কূফায় দু'জন মিথ্যাবাদী ছিলঃ এক হল কালবী, অপরজন সুদ্দী।' রাবী কালবী অত্যন্ত দুর্বল বলে এই বর্ণনাটি বিখ্যাত হাদীস সংকলনগুলোতে স্থান পায়নি। আল-বুখারী, মুসলিম ও তিরমিযীসহ অনেক হাদীসবেত্তা সূরা আল হুজুরাতের বিভিন্ন আয়াতের শানে নুযূল বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এঁদের কেউ এই সূরার ৬নং আয়াতের শানে নুযূল বর্ণনা করেননি। কারণ তাঁরা এই আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে কোন বিশুদ্ধ বর্ণনা পাননি। আল-কালবীর ন্যায় অতি দুর্বল একজন বর্ণনাকারীর রিওয়ায়াতের ভিত্তিতে একজন সাহাবীকে ফাসিক হিসেবে চিত্রিত করা যায় না।

আল-ওয়ালীদ মাক্কা বিজয়ের পর ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, এদেরকে অনেকে তোলাকা বলেছেন। তোলাকাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করা হয় যে তারা আন্তরিকতার সাথে ইসলাম গ্রহণ করেনি। এই ধরনের অভিযোগ অবশ্যই অন্যায্য। এই তোলাকাদের অনেকেই হুনাইনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন, যাঁদের ওপর আল্লাহ তা'আলা প্রশান্তি নাযিল করেছিলেন। বস্তুত মাক্কা বিজয়ের পর

ইসলাম গ্রহণকারীরাও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহচর্য লাভে ধন্য হয়েছেন এবং তাঁরা নিজেদের ইসলামকে সুন্দরও করেছেন।

সাদাকাহ আদায় করতে গিয়ে আল-ওয়ালীদ যদি অবিশ্বস্ততার পরিচয় দিতেন তবে প্রথম দু'খালীফা তাঁকে আবার সাদাকাহ সংগ্রহের কাজে নিয়োগ করতেন না। আবূ বাকর (রা.) ও 'উমার (রা.)-এর আমলে আল-ওয়ালীদ যথাক্রমে বানূ-কুযা'আ ও বানূ তাগলিব-এর কালেক্টর পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন।

বানুল মুস্তালিকের সাদাকাহ সংগ্রহ সম্পর্কে ঐ আয়াত অবতীর্ণ হয়ে থাকতে পারে। তবে আমাদের চূড়ান্ত বক্তব্য হল আয়াতটি আল-ওয়ালীদ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছিল এমন বক্তব্য অকাট্যভাবে বলা যায় না। আর অকাট্য প্রমাণ ব্যতীত একজন সাহাবীকে কিছুতেই ফাসিক বলা যায় না।

আল-ওয়ালীদের ওপর মদপানের হদ (শাস্তি) প্রয়োগ:

একদল ঐতিহাসিক 'উসমান (রা.)-এর সমালোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, তিনি এমন একজন ব্যক্তিকে (আল-ওয়ালীদকে) কূফার গভর্ণর নিয়োগ করেছিলেন যে মদপানের জন্য শাস্তিপ্রাপ্ত হয়েছিল। বিষয়টি সবিস্তারে আলোচনা করা দরকার। আল-ওয়ালীদের মদপান ও তাঁর ওপর শাস্তি প্রয়োগের বিষয়টি বিশুদ্ধ বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত; সাহীহুল বুখারী ও সাহীহ মুসলিমে এ সংক্রান্ত বিবরণ উল্লেখিত হয়েছে। তবে মুহাদ্দিসগণ আল-ওয়ালীদের ওপর মদপানের শাস্তি প্রয়োগের ঘটনাকে 'উসমান (রা.)-এর প্রশংসনীয় কাজ হিসেবে গণ্য করেছেন।

আল-ওয়ালীদ কূফার গভর্ণর থাকাকালে তাঁর বিরুদ্ধে মদপানের অভিযোগ উত্থাপিত হয়। কূফার একদল লোক[১৯] তাঁর বিরুদ্ধে 'উসমান (রা.)-এর কাছে সাক্ষ্য প্রদান করে। অন্যদিকে অপর দু'জন[২০] এই সাক্ষ্য দেয় যে, আল-ওয়ালীদ মদ্যপ অবস্থায় ফাজরের সালাত দু'রাক'আত আদায় করার পর জানতে চান, আরো রাক'আত আদায় করতে হবে কিনা। সাক্ষ্যের মাধ্যমে আল-ওয়ালীদের মদপান প্রমাণিত হলে 'উসমান (রা.) তাঁর ওপর হদ (শাস্তি) প্রয়োগের নির্দেশ দেন। খালীফার নির্দেশে 'আলী (রা.)[২১] তাঁকে চল্লিশ বার বেত্রাঘাত করেন।[২২]

---

১৯. আবূ যায়নাব, আবূ মুওয়াররি', জুনদুব ইবনু যুহাইর আল-আযদী ও সা'দ ইবনু মালিক আল-আশ'আরী। [ইবনু হাজর, ফাতহ., ৭:৬৬]।

২০. 'উসমান (রা)-এর গোলাম হুমরান ও সাহাবী আস-সা'ব ইবনু জুছামাহ। [প্রাগুক্ত]।

২১. আল-ওয়ালীদের ওপর কে শাস্তি প্রয়োগ করেছিলেন, এ বিষয়ে আরো মত পাওয়া যায়। কেউ কেউ বলেন, খালীফার নির্দেশে সা'ঈদ ইবনুল 'আস তাঁর ওপর শাস্তি প্রয়োগ করেছিলেন। ইবনু কাসীরের বর্ণনায় একটি সমন্বয় পাওয়া যায়, ওই বর্ণনা মতে, 'আলী (রা), আল-ওয়ালীদের পোশাক খুলেছিলেন আর সা'ঈদ বেত্রাঘাত করেছিলেন [ইবনু কাসীর ৭:১৫৫]।

২২. অন্য বর্ণনা মতে আশি বেত্রাঘাত। [সাহীহুল বুখারী, কিতাবুল মানাকিব, বাব মানাকিব 'উসমান ইবনু 'আফ্ফান, ২:২৬৪ ।]

আত-তাবারী উল্লেখ করেছেন যে, আল-ওয়ালীদ ইবনু 'উকবা প্রকৃতপক্ষে মদপান করেননি। বরং আবূ যুবাইদ নামে আল-ওয়ালীদের এক মেহমানের মদপানের বিষয়টি প্রতারণামূলকভাবে আল-ওয়ালীদের ওপর আরোপ করা হয়। গভর্ণর আল-ওয়ালীদকে তাঁর দৃঢ় পদক্ষেপের জন্য এই পরিণতি ভোগ করতে হয়। প্রকৃত ঘটনা এই যে, কূফার কতিপয় দুষ্কৃতিকারী ইবনুল হাইসামান নামে এক যুবককে হত্যা করে। আল-ওয়ালীদ যথাযথ সাক্ষ্যের ভিত্তিতে এই হত্যাকাণ্ডের বিচার করেন এবং খুনীদের শাস্তি দেন। এরপর থেকে খুনীদের অভিভাবকরা সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। একবার জাযীরা হতে এক নও মুসলিম আবূ যুবাইদ, আল-ওয়ালীদের কাছে বেড়াতে আসে। এই লোকটি ইতোপূর্বে খৃস্টান ছিল। সে আল-ওয়ালীদের বাসায় মদপান করে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রজারঞ্জক গভর্ণর আল-ওয়ালীদের বাসার একাংশ সর্বদা জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকত। ফলে সুযোগ-সন্ধানীরা মেহমানের মদপান দেখে ফেলে এবং আল-ওয়ালীদের বিরুদ্ধে মদ্যপানের অভিযোগ আরোপ করে।

আল-ওয়ালীদের বিরুদ্ধে আরোপিত মদপানের অভিযোগ সম্পর্কে 'উসমান (রা.)-এর মনে সন্দেহ ছিল, তিনি আল-ওয়ালীদকে বলেছিলেন,

نقيم الحدود ويبوء شاهد الزور بالنار فاصبر يا أخيّ!

(প্রাপ্ত সাক্ষ্যের ভিত্তিতে) আমরা হাদ প্রয়োগ করব, মিথ্যা সাক্ষীর বাসস্থান হবে জাহান্নামে। অতএব, ধৈর্যধারণ কর হে ভাই![২৩]

তবুও তিনি প্রাপ্ত সাক্ষ্যের ভিত্তিতে হাদ বা শাস্তি প্রয়োগ করেন। এটি কোনমতেই 'উসমান (রা.)-এর ত্রুটি নয়। এ ঘটনা বরং সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে তাঁর দৃঢ়তার সাক্ষ্য বহন করে। তাই মুহাদ্দিসগণ এটিকে 'উসমান (রা.)-এর প্রশংসনীয় কাজের আওতায় উল্লেখ করেছেন। গভর্ণর হিসেবে নিয়োগের পূর্বে আল-ওয়ালীদের বিরুদ্ধে মদপানের অভিযোগ ছিল না। তাঁর সামরিক ও প্রশাসনিক যোগ্যতার ওপর আস্থা রেখে খালীফা তাকে গভর্ণর নিয়োগ করেছিলেন। পরবর্তীতে যখন নৈতিক ত্রুটির বিষয় জানা গেল তখন তিনি তাঁর শাস্তি প্রয়োগ করলেন এবং তাঁকে বরখাস্ত করলেন। আত্মীয় বলে তাঁকে ক্ষমা করলেন না।

খুলাফা রাশিদূনের ইতিহাসে আল-ওয়ালীদই একমাত্র গভর্ণর নন যাঁকে মদপানের অভিযোগে শাস্তি দেওয়া হয় এবং বরখাস্ত করা হয়। ইতোপূর্বে 'উমার (রা.)-এর আমলে বাহরাইনের শাসনকর্তা কুদামা ইবনু মাজ'উন (রা.)-কে মদপানের অভিযোগে শাস্তি প্রদানপূর্বক বরখাস্ত করা হয়।[২৪]

---

২৩. আত-তাবারী, ৪:২৭৬।

২৪. 'উমার (রা)-এর ভগ্নিপতি কুদামা ইবনু মাজ'উন (রা) বাদরী সাহাবী ছিলেন। খালীফা তাঁকে বাহরাইনের শাসনকর্তা পদে নিয়োগ দেন। তিনি মদপান করলে 'উমার (রা) অপসারণপূর্বক

চারঃ সা'ঈদ ইবনুল 'আসঃ তাঁর নাম সা'ঈদ ইবনুল 'আস ইবনু উমাইয়া ইবনু আবদি শামস ইবনু 'আবদি মানাফ আল-কারশী আল-উমাভী। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের সময় তাঁর বয়স ছিল নয় বছর। তাঁর পিতা বাদর যুদ্ধে আলী (রা.)-এর হাতে নিহত হন। তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে দেখেছেন, তবে সাহাবীর মর্যাদাপ্রাপ্ত হননি। ইবনু হিব্বান তাঁকে বিশ্বস্ত তাবি'ঈদের মধ্যে গণ্য করেছেন। সা'ঈদের ঈমান এতই বলিষ্ঠ ছিল যে বাদর যুদ্ধে তাঁর পিতার নিহত হওয়ার ঘটনাকে তিনি উপযুক্ত প্রাপ্য মনে করতেন। একবার 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) তাঁকে বলেছিলেন, 'আমি তোমার পিতা আল-'আস ইবনু উমাইয়াকে হত্যা করিনি; আমি হত্যা করেছিলাম আমার মামা আল-'আস ইবনু হিশামকে।' একথা শুনে সা'ঈদ বললেন, 'আপনি যদি তাকে হত্যা করতেন তবে আপনিই সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতেন, তিনি পথভ্রষ্ট ছিলেন।' এ জবাব শুনে 'উমার (রা.) খুশী হয়েছিলেন।

সা'ঈদ বিশুদ্ধভাষী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উচ্চারণভঙ্গির সাথে তাঁর উচ্চারণের সবচেয়ে বেশি সাযুজ্য ছিল। এই কারণে 'উসমান (রা.) যখন যায়িদ ইবনু সাবিতের নেতৃত্বে কুরআন সংকলন কমিটি গঠন করলেন তখন সা'ঈদকে সে কমিটির সদস্য নিয়োগ করেছিলেন।

৩০ হিজরীতে আল-ওয়ালীদ ইবনু 'উকবাকে অপসারণের পর 'উসমান (রা.), সা'ঈদকে কূফার গভর্ণর নিয়োগ করেন। গভর্ণর হিসেবে তিনি ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেন। তাঁর নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী তাবারিস্তান জয় করেন। সা'ঈদ জুরজানেও অভিযান পরিচালনা করেন। হুযাইফা ইবনুল ইয়ামানসহ একদল সাহাবী তাঁর নেতৃত্বে যুদ্ধ করেছেন। সামরিক অভিযানে তাঁর সাফল্যগাথা সম্পর্কে বিজয়াভিযান অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

অত্যন্ত যোগ্য ও দক্ষ প্রশাসক এবং বিজেতা সা'ঈদ সম্পর্কে ইমাম যাহাবী বলেন,

> كان أميرا شريفا، جوادا، ممدحا، حليما، وقورا، ذا حزم وعقل، يصلح للولاية
>
> সা'ঈদ ছিলেন ভদ্র, অমায়িক, বদান্য, ধৈর্যশীল, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, দৃঢ় শাসক, গভর্ণর হওয়ার যোগ্য।[২৫]

তাঁর সম্পর্কে মু'আবিয়া (রা.) বলেন,

• তাঁর ওপর বিধিবদ্ধ শাস্তি প্রয়োগ করেন। পরবর্তীতে তিনি বলেছিলেন আলকুরআনের একটি আয়াত উপলব্ধিতে ভুল হওয়ায় তিনি মদপান করেছিলেন; আয়াতটি হলঃ لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوا 'যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তারা পূর্বে যা ভক্ষণ করেছে তজ্জন্য তাদের কোন গুনাহ নেই.. [আলকুরআন ৫:৯৩]। দেখুন, আয-যাহাবী, ৩:২৭৪।

২৫. আয-যাহাবী, সিয়ারু.., ৩:৪৪৭।

لكلّ قوم كريم، وكريمنا سعيد بن العاص

প্রত্যেক জাতিরই বদান্য লোক থাকে, আমাদের বদান্য হল সা'ঈদ ইবনুল 'আস।[২৬]

অত্যন্ত যোগ্যতা, ন্যায়পরায়ণতা ও ইনসাফের[২৭] সাথে শাসনকাজ পরিচালনা করা সত্ত্বেও সা'ঈদ কূফার একদল অধিবাসীর মন জয় করতে পারলেন না। একবার তিনি রাষ্ট্রীয় কাজে মাদীনায় গেলেন। ফেরার পথে কূফার একটি দল তাঁকে শহরে প্রবেশ করতে দিল না। বাধ্য হয়ে তিনি মাদীনায় ফিরে গেলেন এবং 'উসমানও কূফার গভর্ণর পরিবর্তন করতে বাধ্য হলেন। সা'ঈদ অযোগ্যতা বা অপশাসনের কারণে কূফা থেকে অপসারিত হননি। বরং একদল ষড়যন্ত্রকারী যারা পরবর্তীতে 'উসমান (রা.)-কে হত্যা করেছিলেন তাঁদের ষড়যন্ত্রের কারণে তিনি অপসারিত হন। বস্তুত প্রতিষ্ঠার পর থেকে খিলাফাতের পুরো সময়ে কূফা একটি সমস্যাসংকুল জনপদ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। একদল দুষ্টপ্রকৃতির লোক কূফার কোন শাসককেই সফল হতে দেয়নি। কূফাবাসীদের অবাধ্যতায় বিরক্ত হয়ে 'উমার (রা.)-এর মত দৃঢ় ও নিরাপোষ খালীফা বলতে বাধ্য হয়েছিলেন,

أعياني أهل الكوفة، فإن استعملت عليهم لينا استضعفوه، وإن استعملت عليهم شديدا شكوه

কূফাবাসীরা আমাকে ক্লান্ত করে ফেলেছে; নম্র-ভদ্র কাউকে গভর্ণর নিয়োগ দিলে তাঁকে তারা দুর্বল জ্ঞান করে, আর কঠোর কাউকে গভর্ণর নিয়োগ করলে তারা তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করতেই থাকে।

ত্যক্তবিরক্ত 'উমার (রা.) শেষ পর্যন্ত এই দু'আ করেছিলেন,

اللهم إنهم قد لبّسوا عليّ فلبس عليهم

হে আল্লাহ, এরা আমাকে সন্দেহে ফেলেছে। আপনিও এদেরকে সন্দেহে ফেলুন।

'উসমান (রা.)-এর শাহাদাতের পর সা'ঈদ ফিতনা হতে দূরে অবস্থান করেন। জামাল ও সিফ্‌ফিনের যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেননি। মাদীনা থেকে তিন মাইল দূরে 'আর্‌রাসা নামক জায়গায় নির্জনে তিনি বাকি জীবন কাটিয়ে দেন। ৫৮ হিজরীতে তিনি মারা যান।[২৮]

পাঁচ: 'আবদুল্লাহ ইবনু সাদ ইবনি আবি সার্‌হ: 'আবদুল্লাহ ইবনু সা'দ ইবনু আবি সার্‌হ মাক্কা বিজয়ের পর ইসলাম গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তিনি ইসলামী খিলাফাতের সেবা করেছেন; দ্বিতীয় খালীফা 'উমার (রা.)-এর আমলে

---

২৬. ইবনু হাজর, তাহযীব.., ৩:৬৭।

২৭. فسار فيهم سيرة عادلة 'তিনি প্রজাদের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করেন। [আত-তাবারী, তারীখ.,]।

২৮. মতান্তরে ৫৭ বা ৫৯ হিজরীতে তিনি মারা যান। [ইবনু হাজর, তাহযীব., ৩:৬৭]।

তিনি আমর ইবনুল 'আস (রা.)-এর নেতৃত্বে মিসর জয়ের অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। খালীফা 'উমার (রা.) তাঁকে আপার ইজিপ্টের কালেক্টর হিসেবে নিয়োগ করেছিলেন। রাজস্ব আদায়ে 'আবদুল্লাহ বিশেষ দক্ষতার স্বাক্ষর রেখে রাষ্ট্রীয় কোষাগার অর্থের যোগান বৃদ্ধিতে ভূমিকা পালন করেছিলেন। 'উসমান (রা.)-এর অভিষেকের সময় 'আমর ইবনুল 'আস (রা.) মিসরের গভর্ণর ছিলেন। এক বছর পর 'উসমান তাঁকে অপসারণ করে তদস্থলে 'আবদুল্লাহ ইবনু সা'দকে মিসরের গভর্ণর নিয়োগ করেন। পরবর্তীতে আমর (রা.) আলেকজান্দ্রিয়ার যুদ্ধে কৃতিত্বের পরিচয় দেন। 'উসমান (রা.) তাঁকে মিসরীয় সেনাবাহিনীর প্রধান নিযুক্ত করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি রাজি না হলে 'আবদুল্লাহ ইবনু সা'দকে রাজস্ব ও প্রতিরক্ষাসহ পূর্ণ কর্তৃত্ব দিয়ে মিসরের গভর্ণর পদে নিয়োগ প্রদান করেন।

গভর্ণর হিসেবে 'আবদুল্লাহ ইবনু সা'দ সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। রাজস্ব আদায়ে তাঁর অভিনব কৌশল সমগ্র মিসরে আরোপ করলেন। ফলে রাজস্ব আয় বেড়ে যায়। উত্তর আফ্রিকায় খিলাফাতের সম্প্রসারণে তিনি অবিস্মরণীয় অবদান রাখেন। তাঁর নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী আফ্রিকায় নিযুক্ত বারবার বংশোদ্ভূত রোমান শাসক জারজীরকে পরাজিত ও নিহত করে উত্তর আফ্রিকা জয় করে। এই যুদ্ধে তাঁর অধীনে কয়েকজন সাহাবী অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে 'আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর ও 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.)ও ছিলেন। তিনি নুবা'র অদম্য কালো যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের সাথে যুদ্ধবিরতির চুক্তি সম্পাদন করেন। যাতুস সাওয়ারী যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর বিজয় ইবনু সা'দের অনন্য কীর্তি হিসেবে ইতিহাসে সমুজ্জল থাকবে; কোনরূপ পূর্ব অভিজ্ঞতা ছাড়াই এই যুদ্ধে মুসলিম নৌবাহিনী কয়েক গুণ বেশি শক্তির অধিকারী রোমান বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে। 'উসমান (রা.)-এর সাথে তাঁর আত্মীয়তা ছিল সত্য, তবে তিনি অযোগ্য ছিলেন না। তাঁর পুরো শাসনকাল সাফল্যের দৃষ্টান্তে পূর্ণ।

'উসমান (রা.)-এর শাহাদাতের পর তিনি নির্জনে বাকি জীবন কাটিয়ে দেন। জামাল ও সিফ্ফিনের ডামাডোল হতে তিনি নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখেন। ফিলিস্তিনের রামলায় তিনি নির্জনে বাকি জীবন কাটিয়ে দেন। এক প্রত্যুষে তিনি বললেন, 'হে আল্লাহ, সালাতুল ফাজ্‌র যেন আমার শেষ আমল হয়। তারপর ওযু করে সালাত আদায় করলেন, ডানদিকে সালাম ফিরানোর পর বামদিকে সালাম ফিরানোর পূর্বে তাঁর প্রাণবায়ু দেহত্যাগ করে।[২৯]

২৯. সীয়ারু আ'লামিন নুবালা, ৩:৩৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাষ্ট্রীয় সম্পদ আত্মীয়-স্বজনদের মাঝে বিতরণের অভিযোগ

আধুনিক ও প্রাচীন ঐতিহাসিকদের অনেকে 'উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করেন যে, তিনি রাষ্ট্রীয় সম্পদ ব্যবহার করে আত্মীয়দের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। ইসলামের ইতিহাসের সর্বাধিক সর্বনাশ করেছেন শী'আ ঐতিহাসিকেরা যারা নিজেদের সংকীর্ণ গোষ্ঠী-স্বার্থে কাল্পনিক বক্তব্যে ভরপুর ইতিহাস রচনা করেছেন। চতুর্থ খালীফা 'আলী (রা.)-এর অনুসারীর দাবিদার এই দলটি 'উসমান (রা.)-কে শত্রুজ্ঞান করে। এদের বিকৃত ইতিহাসের ওপর ভর করে একদল প্রাচ্যবিদ কল্পনার ফানুস উড়িয়ে 'উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে অভিযোগের ফিরিস্তি তৈরি করে। তৃতীয় খালীফার বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ উত্থাপন করা হয় তন্মধ্যে অন্যতম হল রাষ্ট্রীয় কোষাগারের অর্থ আত্মীয়দের মাঝে বণ্টন। আমরা এই অভিযোগ নিরাসক্ত দৃষ্টিতে খতিয়ে দেখব। তবে আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার আগে আমরা বলতে চাই, 'উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপনের পূর্বে ভেবে দেখা দরকার ইনি এমন এক ব্যক্তিত্ব ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় যার সবচাইতে বেশি আর্থিক অবদান রয়েছে। মাক্কী জীবনে তিনি ইসলামের প্রচারে অকাতরে অর্থ ব্যয় করেন। মাদীনায় হিজরাতের পর মুহাজিরদের সুপেয় পানির সংকট দেখা দিলে তিনি রূমা কূপ ক্রয় করে মুসলিমদের জন্য ওয়াক্ফ করে দেন। তাবুক যুদ্ধের জাইশ আল-'উসরাহ-এর প্রস্তুতিতে তিনি বিপুল পরিমাণ দান করেন। যেসময় 'উসমান (রা.) বিরাট অঙ্কের অর্থ ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় ব্যয় করেন তখন সমগ্র আরব ভূখণ্ডে ইসলামের বিজয়ের কোন লক্ষণ ছিল না। 'উসমান (রা.) খালীফা হবেন এমন কোন দূরতম সম্ভাবনা ছিল না। এমন জটিল ও অনিশ্চিত সময়ে তিনি কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির খাতিরে ইসলামের সেবায় অকাতরে দান করেছেন। এই হলেন 'উসমান (রা.), তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় সম্পদ অপচয় বা আত্মীয়স্বজনের মাঝে সরকারী অর্থ বিলি-বণ্টনের অভিযোগ করার পূর্বে একটু ভেবে দেখা দরকার কার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপন করা হচ্ছে?

অভিযোগের সারকথা:

'উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপন করা হয় যে, তিনি আত্মীয়-স্বজনকে সরকারী পদে নিয়োগের পাশাপাশি তাদেরকে বাইতুল মাল তথা রাষ্ট্রীয় কোষাগার হতে অর্থ প্রদান করেছেন। এক্ষেত্রে দু'টো দৃষ্টান্ত খুব ফলাও করে প্রচার করা হয়: ক) তিনি আফ্রিকার গানীমতের মালের এক পঞ্চমাংশ তাঁর চাচাতো

ভাই মারওয়ান ইবনুল হাকামকে প্রদান করেন; খ) আফ্রিকার আরেক যুদ্ধের গানীমতের মালের এক পঞ্চমাংশ তাঁর বৈপিত্রেয় ভাই 'আবদুল্লাহ ইবনু সা'দকে প্রদান করেন।

পর্যালোচনাঃ বিশ্বস্ত উৎসের ভিত্তিতে নিরাসক্ত দৃষ্টিতে অভিযোগ দু'টি পর্যালোচনা করা হচ্ছেঃ

ক. 'আবদুল্লাহ ইবনু সা'দকে নাফল হিসেবে গনীমতের সম্পদের এক পঞ্চমাংশের পঞ্চমাংশ প্রদান (অবশ্য পরে তা ফিরিয়ে নেওয়া হয়)ঃ যেহেতু গানীমতের সম্পদ হতে দান করার অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে 'উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে সেহেতু এই বিষয়ে আলোচনা করার পূর্বে গানীমাতের সম্পদ বন্টন প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করা দরকার।

সূরা আল আনফালের ৪১ নং আয়াতে গানীমাতের সম্পদ বন্টনের বিধান বর্ণিত হয়েছে:

وَاعْلَمُوْا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِي الْقُرْبٰى
وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ

আরও জেনে রাখ যে, যুদ্ধে তোমরা যা লাভ কর তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহর, রাসূলের, রাসূলের স্বজনদের, ইয়াতিমদের, মিসকীনদের এবং পথচারীদের.. [আলকুরআন ৮:৪১]।

এই আয়াতের আলোকে গানীমাতের মাল বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ প্রথমে পাঁচ ভাগে ভাগ করতে হয়; চার পঞ্চমাংশ বা পাঁচ ভাগের চার ভাগ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈনিকদের মাঝে বন্টন করে দেওয়া হয়। বাকি এক ভাগকে আবার পাঁচ ভাগে বিভক্ত করে নিম্নের প্রত্যেকের জন্য এক ভাগ করে খরচ করা হত: ক) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম), খ) তাঁর আত্মীয় স্বজন, গ) ইয়াতিম, ঘ) মিসকীন ও ঙ) মুসাফির। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবদ্দশায় উপর্যুক্ত নিয়মে গানীমাতের সম্পদ বন্টন করা হত। তাঁর ওফাতের পর তাঁর ও তাঁর আত্মীয়ের অংশটি কিভাবে বণ্টিত হবে তা নিয়ে মতভেদ দেখা দেয়। খুলাফা রাশিদূন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আত্মীয়ের অংশ বানূ হাশিম ও বানূ আবদুল মুত্তালিবের সদস্যদের মাঝে বণ্টন করে দিতেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অংশের বন্টন প্রক্রিয়া নিয়ে মতভেদ দেখা দেয়; কেউ কেউ বলেন, এই অংশটি সমরাস্ত্র ক্রয়ের কাজে ব্যবহার করা হবে। প্রথম ও দ্বিতীয় খালীফা এমনটি করতেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। কেউ কেউ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অংশটির মালিক

হবেন খালীফা এবং আত্মীয়-স্বজনের অংশটি খালীফা নিজ আত্মীয়-স্বজনকে দিতে পারেন।[৩০]

গানীমাতের পাশাপাশি 'নাফল' সম্পর্কেও জ্ঞান রাখা প্রয়োজন। নাফল এর অর্থ অতিরিক্ত; যুদ্ধের পূর্বে বিশেষ কোন লক্ষ্য হাসিলের বিনিময় হিসেবে যে পুরস্কার ঘোষণা করা হয় সেটিই নাফল।

এবার 'আবদুল্লাহ ইবনু সা'দকে গানীমাতের সম্পদের এক পঞ্চমাংশ প্রদানের বিষয়টি পর্যালোচনা করা হবে।

ঐতিহাসিক আত-তাবারী উল্লেখ করেছেন যে, মিসর থেকে আফ্রিকায় অভিযান শুরুর পূর্বেই 'উসমান (রা.) 'আবদুল্লাহ ইবনু সা'দকে বলেছিলেন,

إن فتح الله عز وجل عليك غدا إفريقية، فلك مما أفاء الله على المسلمين خمس الخمس من الغنيمة نفلا

তোমার হাতে যদি আল্লাহ আগামীকাল আফ্রিকা পদানত করেন তাহলে আল্লাহ যে সম্পদ গানীমাত হিসেবে মুসলিমদেরকে দান করবেন তা হতে এক-পঞ্চমাংশের পঞ্চমাংশ তোমাকে নাফ্‌ল হিসেবে দেওয়া হবে।[৩১]

'আবদুল্লাহ ইবনু সা'দ আফ্রিকা জয় করে বিপুল গানীমাতের সম্পদ অর্জন করলেন। তারপর যুদ্ধলব্ধ সম্পদের চার পঞ্চমাংশ যোদ্ধাদের মাঝে বণ্টন করে দিলেন। বাকি এক ভাগকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করে চার ভাগ 'উসমান (রা.)-এর কাছে পাঠিয়ে দিলেন এবং পূর্ব ঘোষণানুযায়ী এক পঞ্চমাংশ নিজে গ্রহণ করলেন। বীর যোদ্ধাদেরকে উৎসাহ প্রদানের জন্য 'নাফল' বা অতিরিক্ত পুরস্কার ঘোষণার রীতি প্রচলিত ছিল। সেই রীতির আলোকেই 'উসমান (রা.) 'নাফল' ঘোষণা করেছিলেন এবং 'আবদুল্লাহ ইবনু সা'দও 'নাফল' হিসেবে গানীমাতের সম্পদের এক পঞ্চমাংশের এক পঞ্চমাংশ গ্রহণ করেছিলেন। এটা অবৈধ কিছু ছিল না। তবুও একদল লোক এ বিষয়ে 'উসমান (রা.)-এর কাছে আপত্তি উত্থাপন করেন। ফলশ্রুতিতে 'উসমান (রা.) ইবনু সা'দকে ঐ সম্পদ ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন। 'আবদুল্লাহ ইবনু সা'দ আদেশমত সেই সম্পদ বাইতুল মালে ফেরত দেন। [৩২]

খ. মারওয়ানকে গানীমাতের সম্পদের এক পঞ্চমাংশ দেওয়া হয়নি: আফ্রিকার গানীমাতের সম্পদে কিছু জন্তু-জানোয়ার ও ভারী বস্তু ছিল যা মাদীনায় প্রেরণ করা হয়নি। এই অবশিষ্টটুকু মারওয়ান কিনে নেন। পণ্যমূল্যের একটি অংশ

---

৩০. আস-সাবূনী, মুখতাসার তাফসীর ইবনি কাসীর (বৈরূতঃ দারুল কুরআনিল কারীম ১৯৮১), ১০৬-০৮।

৩১. আত-তাবারী, ৪:২৫৩।

৩২. আত-তাবারী, ৪:২৫৪; আয-যাহাবী, ৩:১০৭; ইবনুল আসীর, ২:৩৮৫।

মারওয়ান আদায় করতে পারেননি; যা বাকি রয়ে যায়। 'উসমান (রা.) এই বাকি অংশটুকু তাকে দান করে দেন। এটি অবৈধ কোন কাজ ছিল না। মারওয়ানকে সুসংবাদের বিনিময়ে পুরস্কার হিসেবে তা দেওয়া হয়েছিল। দীর্ঘদিন আফ্রিকা থেকে কোন সংবাদ না আসায় মাদীনায় উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা বিরাজ করছিল। আফ্রিকায় মুসলিম বাহিনী কোন বিপদ পড়ল কিনা সবাই এই ভয়ে শঙ্কিত ছিল। এমন মুহূর্তে মারওয়ান আফ্রিকা বিজয়ের বিরাট সুসংবাদ নিয়ে আসেন। খালীফা পুরস্কারস্বরূপ বাকি মূল্য মাফ করে দেন। আফ্রিকার গানীমাতের সম্পদের এক পঞ্চমাংশ মারওয়ানকে প্রদানের বিষয়টি বিশুদ্ধ বর্ণনাসূত্রে সমর্থিত নয়।

গ. আত্মীয়-স্বজনকে রাষ্ট্রীয় সম্পদ প্রদানের অভিযোগ 'উসমান (রা.) দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন: 'উসমান (রা.) দানবীর ও বদান্য ছিলেন। ইসলামের সেবায় যেমন তিনি অকাতরে সম্পদ বিলিয়ে দিয়েছেন, তেমনি আত্মীয়-স্বজনের হকও আদায় করেছেন। আত্মীয়দের মাঝে রাষ্ট্রীয় সম্পদ বণ্টনের অভিযোগ তিনি দৃঢ়তার সাথে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি বলেন:

> وقالوا إني أحب بيتي وأعطيهم... فأما حبي لهم فإنه لم يمل معهم إلى جور، بل أحمل الحقوق عليهم .. وأما إعطاؤهم فإني إنما أعطيهم من مالي، ولا أستحل أموال المسلمين لنفسي ولا لأحد من الناس، وقد كنت أعطي العطية الكبيرة الرغية من صلب مالي أزمان رسول الله وأبي بكر وعمر
>
> দুর্জনরা বলে, আমি আত্মীয়-স্বজনকে ভালবাসি, তাদেরকে দান করি; তাদের প্রতি আমার ভালবাসা কোন অন্যায়-অবিচারে পর্যবসিত হয় না; বরং তাদের উপর দায়িত্ব চাপিয়ে দেই। আর আমি তো আমার নিজের সম্পদ হতে তাদেরকে দান করি, মুসলিমদের সম্পদ আমি নিজের জন্য বা অন্য কোন মানুষের জন্য হালাল মনে করি না। আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম), আবূ বাকর (রা.) ও 'উমার (রা.)-এর আমলে জনসাধারণকে বিপুল পরিমাণে দান করেছি।[৩৩]

মাজলিসে শূরার বৈঠকেও 'উসমান (রা.) অনুরূপ বক্তব্য রাখেন:

> أنا أخبركم عني وعما وليت، إن صاحبيّ اللذين كانا قبلي ظلما أنفسهما، وإن رسول الله كان يعطي قرابته وأنا في رهط أهل عيلة وقلة معاش، فبسطت يدي في شيئ من ذلك لما أقوم به فيه فإن رأيتم ذلك خطأ فردوه.

---

৩৩. আত-তাবারী, ৪:৩৪৭-৪৮।

আমি নিজ সম্পর্কে এবং যাদেরকে নিয়োগ দিয়েছি তাদের সম্পর্কে তোমাদেরকে অবহিত করব। আমার পূর্বসূরি দু'জন নিজেদের ওপর যুল্ম করেছেন। .. তোমরা জানো রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বীয় আত্মীয়-স্বজনকে দান করতেন। আর আমার খান্দানের জনসংখ্যা বেশি, তারা দরিদ্রও বটে। তাই আমি তাদের জন্য হস্ত সম্প্রসারিত করি। তোমরা যদি এটাকে ভুল মনে কর তবে তা ফিরিয়ে নিতে পার।[৩৪]

ঘ. 'উসমান (রা.) নিজের সমস্ত সম্পদ আত্মীয়-স্বজনের মাঝে বণ্টন করে দেন: শাহাদাতের পূর্বে 'উসমান (রা.) নিজের সব স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি আত্মীয়-স্বজনের মাঝে বণ্টন করে দেন। নিজের সন্তানকে পর্যন্ত অতিরিক্ত কিছু দান করেননি। বানূ আবিল আসকে দিয়ে বন্টন শুরু করেন; আল-হাকাম পরিবারের প্রত্যেক পুরুষকে ১০০০০ দিরহাম করে প্রদান করেন। এভাবে তারা এক লক্ষ দিরহাম পেল। অনুরূপ পরিমাণ বানূ 'উসমানকেও প্রদান করেন। তারপর বানুল 'আস, বানুল 'ঈস ও বানূ হারবকে সম্পদ ভাগ করে দেন। তাঁর গোত্রের অন্য কোন সদস্যের চেয়ে তাঁর পুত্রদেরকে বেশি প্রদান করেননি।[৩৫]

বস্তুতঃ 'উসমান (রা.)-এর গোত্র একটি বড় গোত্র ছিল; এদের সদস্য সংখ্যা অনেক বেশি ছিল; তাই 'উসমান (রা.)-এর দানের বিষয়টি শত্রুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পক্ষান্তরে আবূ বাকর (রা.) ও 'উমার (রা.)-এর গোত্র বড় গোত্র ছিল না। ফলে আত্মীয়-স্বজনের প্রতি প্রথম দু'খালীফার সুনজর প্রদানের বিষয়টি খুব বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি।

ঙ. আলকুরআন ও রাসূলুল্লাহ-এর আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে 'উসমান আত্মীয়-স্বজনকে দান করতেন: আত্মীয়স্বজনের প্রতি সদাচরণের প্রেরণা 'উসমান (রা.) পেয়েছিলেন আলকুরআন ও আস-সুন্নাহ-এ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

ذَٰلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللهُ عِبَادَهُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيْهَا حُسْنًا إِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ

এই সুসংবাদই আল্লাহ্ দেন তাঁর বান্দাদেরকে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে। বল, 'আমি এর বিনিময়ে তোমাদের নিকট আত্মীয়ের সৌহার্দ ছাড়া অন্য কোন প্রতিদান চাই না।' যে উত্তম কাজ করে আমি তার জন্য এতে কল্যাণ বর্ধিত করি। আল্লাহ ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী। [আলকুরআন ৪২: ২৩।]

---

৩৪. ইবনু সা'দ, ৩:৬৩।
৩৫. আত-তাবারী, ৪:৩৪৮।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا

আত্মীয়-স্বজনকে দেবে তার প্রাপ্য এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও এবং কিছুতেই অপব্যয় করবে না। [আলকুরআন ১৭:২৬।]

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সুন্নাহ-এ আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সদাচরণের নির্দেশ সম্বলিত অনেক বর্ণনা এসেছে। তাছাড়া বাস্তব জীবনেও তিনি আত্মীয়-স্বজনকে দান করতেন। বাহরাইন থেকে জিয্ইয়ার সম্পদ মাদীনায় আনা হলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা হতে স্বীয় চাচা আব্বাস (রা.)-কে পর্যাপ্ত পরিমাণে দান করেন।

প্রথম খালীফা আবূ বাকরের (রা.) জীবনেও আত্মীয়-স্বজনকে দান করার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। তিনি স্বীয় ভাগ্নে মিসতাহ ইবনু উসাসাকে নিয়মিত মাসোহারা দিতেন। এমনকি মিসতাহ, আয়িশা (রা.)-এর ব্যাপারে অপবাদ দিলে আবূ বাকর (রা.) মাসোহারা প্রদান বন্ধ করেননি।

বস্তুত 'উসমান (রা.)-এর বংশ আবূ বাকর (রা.) ও 'উমার (রা.)-এর বংশের তুলনায় বড় ছিল। ফলে আত্মীয়স্বজনকে তার দান করার বিষয়টি সহজে নযরে পড়ে যায়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

'উসমান (রা.) কি আবূ যার গিফারী (রা.)-কে বহিষ্কার করেছিলেন?

আবূ যার আল-গিফারী (রা.) রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নুবুওয়াতী জিন্দেগীর শুরুর দিকে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন বানূ গিফার-এর সদস্য। নিজ ভাই-এর কাছ থেকে সংবাদ পেয়ে তিনি মাক্কায় এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। প্রত্যয়দীপ্ত আবূ যার (রা.) নিজের ঈমানের ঘোষণা দিতে গিয়ে বারকয়েক কুরাইশ মুশরিকদের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে স্বগোত্রে ইসলাম প্রচারের নির্দেশ দিলে তিনি বানূ গিফারে ফিরে গিয়ে ইসলাম প্রচারে ব্রতী হন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাদীনায় হিজরাত করলে আবূ যারও মাদীনায় চলে আসেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর তিনি সিরিয়া চলে যান। সেখানে অর্থসম্পদ সঞ্চয়ের ব্যাপারে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি প্রচার করেন। এ বিষয়ে গভর্ণর মু'আবিয়া (রা.)-এর সাথে তাঁর মতবিরোধ হয়। ফলে 'উসমান (রা.) তাঁকে মাদীনায় ডেকে নেন। পরবর্তীতে খালীফার অনুরোধে তিনি রাবাযায় স্বেচ্ছা নির্বাসন গ্রহণ করেন।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে 'উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে কল্পিত অভিযোগ উত্থাপন করা হয় যে, তিনি আবূ যার গিফারী (রা.)-এর মত শীর্ষস্থানীয় সাহাবীকে মাদীনা হতে বহিষ্কার করেছেন। নিম্নে এতদসংক্রান্ত অভিযোগ ও তার জবাব তুলে ধরা হলো:

অভিযোগের সারকথা: আবূ যার গিফারী (রা.) সাদাসিধে মানুষ ছিলেন। সিরিয়ায় বসবাসকালে তিনি ইয়ামানী ইয়াহুদী 'আবদুল্লাহ ইবনু সাবা দ্বারা প্রভাবিত হন। ইবনু সাবা পারস্যের ধর্মগুরু মাযদাকের সাম্যনীতি দ্বারা প্রভাবিত ছিল। তার প্রভাবে আবূ যার গিফারী অর্থ-সম্পদ সঞ্চয়ের ব্যাপারে অভিনব এক পথ গ্রহণ করেন। তিনি প্রচার করেন যে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন স্বর্ণ-রৌপ্য বা অন্য ধনসম্পদ সঞ্চয়ে রাখা যাবে না; বরং সবকিছুই আল্লাহ্‌র রাহে বিলিয়ে দিতে হবে। সিরিয়ায় এই মত প্রচার করলে মু'আবিয়া তাঁকে মাদীনায় পাঠিয়ে দেন। 'উসমান (রা.), তাঁর সাথে কথা বলেন, তিনি নিজ অভিমতে অটল থাকলে 'উসমান (রা.) তাঁকে রাবাযায় নির্বাসিত করেন।

পর্যালোচনা: দু'জন বিশিষ্ট সাহাবীর বিরুদ্ধে এখানে দু'টি গুরুতর অভিযোগ উল্লেখ করা হয়েছে। এক: আর্থিক বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করার কারণে 'উসমান (রা.), বিশিষ্ট সাহাবী আবূ যার (রা.)-কে মাদীনা হতে বহিষ্কার করেছিলেন। দ্বিতীয়টি হল আবূ যার (রা.) পারস্য ধর্মগুরু মাযদাক দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। এখানে দু'টো বিষয়ই নিরাসক্ত দৃষ্টিতে পর্যালোচনা করা হবে।

এক: আবূ যার (রা.)-কে 'উসমান (রা.) বহিষ্কার করেননি: 'উসমান (রা.) আবূ যার (রা.)-কে বহিষ্কার করেছিলেন কিনা- এ বিষয়ে আমরা স্বয়ং আবূ যার (রা.)-এর বর্ণনা উল্লেখ করছি: সাহীহুল বুখারীর বর্ণনাটি নিম্নরূপ:[৩৬]

عن زيد بن وهب قال: مررت بالربذة، فإذا أنا بأبي ذرٍ رضي الله عنه، فقلت له: ما أنزلك منزلك هذا؟ قال: كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية في وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ الله قَالَ مُعَاوِيَةُ: نَزَلَتْ فِي أَهْلِ الكِتَابِ، فقلت: نزلت فينا وفيهم، فكان بيني وبينه في ذاك، وكتب إلى عثمان رضي الله عنه يشكوني، فكتب إليَّ عثمان أن أقدم المدينة، فقدمتها فكثر عليَّ الناسُ حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك، فذكرت ذلك لعثمان، فقال لي: إن شئت تنحيت، فكنت قريبا فذاك الذي أنزلني هذا المنزل. ولو امروا عليَّ حبشيا لسمعت وَاطعت.

যায়িদ ইবনু ওয়াহাব হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা রাবাযাহ দিয়ে যাচ্ছিলাম; হঠাৎ তথায় আবূ যার (রা.)-এর সাথে আমার সাক্ষাত হল। আমি তাঁকে বললাম: কিসে আপনাকে এখানে নিয়ে এসেছে? তিনি বললেন, আমি সিরিয়ায় ছিলাম, আমি ও মু'আবিয়া এই আয়াতের মর্মার্থের বিষয়ে মতভেদ করলাম: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ ولا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيْلِ الله মু'আবিয়া বলল, এটি আহলুল কিতাব তথা ইয়াহূদী ও নাসারাদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। আমি বললাম, (বরং) আমাদের ও তাদের অর্থাৎ মুসলিম ও আহলুল কিতাব-সবার ব্যাপারে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। এ বিষয়ে তার সাথে আমার কথাবার্তা হয়। মু'আবিয়া (রা.), 'উসমান (রা.)-এর কাছে আমার ব্যাপারে অভিযোগ করে পত্র লিখল। এ প্রেক্ষিতে 'উসমান আমাকে লিখলেন,

---

৩৬. সাহীহুল বুখারী, কিতাবুয যাকাত, বাবু মা উদ্দিয়া যাকাতুহু ফালায়সা বি কানযিন, ১:৩৩৭-৭।

আপনি মাদীনায় আসুন! ফলে আমি মাদীনায় চলে এলাম। দেখলাম আমার চারপাশে লোকজন ভীড় করছে, তারা যেন আমাকে ইতোপূর্বে দেখেইনি। 'উসমান (রা.)-কে আমি বিষয়টি জানালাম। তিনি বললেন, 'আপনি চাইলে কাছে কোথাও সরে যেতে পারেন। এটিই হল সেই কারণ যার জন্য আজ আমি এখানে। ওরা যদি কোন হাবশীকেও আমার নেতা বানায় তাহলেও আমি তার কথা শুনব, আনুগত্য করব।

এই হাদীসে অতি সংক্ষেপে আবূ যার (রা.)-এর সাথে অন্যান্য সাহাবীগণের মতভেদের বিষয় ও তাঁর স্বেচ্ছানির্বাসনের বিষয়টি উল্লেখিত হয়েছে। আবূ যার (রা.)-এর নির্বাসনের ব্যাপারে 'উসমান (রা.)-এর নির্দোষিতা প্রমাণের জন্য এই বর্ণনাটিই যথেষ্ট। তবুও দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও সন্দেহ অপনোদনের জন্য এই বর্ণনার আলোকে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ উপস্থাপিত হচ্ছে:

ক. আবূ যার (রা.) স্বেচ্ছায় সিরিয়া গিয়েছিলেন: আবূ যার (রা.) কেন মাদীনা ত্যাগ করে সিরিয়ায় চলে গিয়েছিলেন তার হেতু এই বর্ণনায় নেই। তবে আবূ ইয়া'লার নিম্নোক্ত বর্ণনায় কারণটি উল্লেখিত হয়েছে: আবূ যার (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে বলেছিলেন, إذا بلغ البناء سلعا ترحل إلى الشام 'মাদীনার বাড়িঘর যখন সাল' (একটি স্থানের নাম) পর্যন্ত পৌঁছবে তখন তুমি সিরিয়ায় চলে যেও।'[৩৭] এই নির্দেশনা অনুসারে ক্রমবর্ধমান মাদীনা শহর সাল' পর্যন্ত বর্ধিত হওয়ার পর আবূ যার (রা.) দামিশ্‌কে চলে যান। আবূ যার (রা.)-এর স্ত্রীর বক্তব্যেও এ কথার সমর্থন মেলে।

খ. কুরআনের একটি আয়াত নিয়ে আবূ যার ও মু'আবিয়ার মাঝে ইজতিহাদী মতভেদ হয়েছিল: অর্থ-সম্পদ গচ্ছিত রাখার ব্যাপারে আবূ যার (রা.) ভিন্ন এক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন। সিরিয়ায় অবস্থানকালে তিনি এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রচার করেন। এ বিষয়ে গভর্ণর মু'আবিয়া (রা.)-এর সাথে তাঁর মতভেদ হয়। আলকুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় উভয়ের ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীই ছিল মতভেদের মূল:

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنَّ كَثِيْرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُوْنَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيْمٍ

হে মু'মিনগণ, পণ্ডিত এবং সংসারবিরাগীদের মধ্যে অনেকেই লোকের ধন অন্যায়ভাবে ভোগ করে থাকে এবং লোককে আল্লাহর পথ হতে

৩৭. ইবনু হাজর, ফাতহ.., ৩:৩৩২।

নিবৃত্ত করে। আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির সুসংবাদ দাও। [আলকুরআন ০৯:৩৪।]

গঃ আবূ যার (রা.)-এর ব্যাখ্যা: প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন সম্পদ সঞ্চয় করা যাবে না:

উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় আবূ যার (রা.) বলেন, প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন সম্পদ (স্বর্ণ, রৌপ্য বা যে কোন সম্পদ) সঞ্চিত করে রাখা যাবে না; যারা প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ সঞ্চিত করে রাখবে তাদেরকে আখিরাতে কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে। তিনি মনে করতেন, একদিন-একরাতের খরচের সমপরিমাণ সম্পদ জমা রাখা যাবে। অতিরিক্ত হিসেবে আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচের জন্য কিছু সম্পদ রেখে বাকি সব সম্পদ বিলিয়ে দিতে হবে। দামিশ্‌কে তিনি ধনীদের উদ্দেশ্যে বলতেন, 'ওহে ধনীরা, দরিদ্রদের প্রতি সহানুভূতিশীল হও। যারা ধনসম্পদ সঞ্চয় করে এবং আল্লাহর পথে খরচ করে না পরকালে তাদের কপালে, পাঁজরে ও পিঠে আগুনের তপ্ত লোহা দিয়ে ছেক দেওয়া হবে।'[৩৮] মুসলিমদের মাঝে বিলাস-ব্যসনের উপকরণ দেখে আবূ যার (রা.) এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রচার করতে শুরু করেন। আল-আহনাফ ইবনু কায়স বলেন, আমি একদল কুরাইশের সাথে উপবিষ্ট ছিলাম, এমন সময় রুক্ষ চুল, মোটা পোশাক ও রূঢ় গড়নের এক ব্যক্তি এসে তাদেরকে সালাম দিয়ে বললেন, 'ধন-সম্পদ সঞ্চয়কারীকে সুসংবাদ দাও, তাকে জাহান্নামের আগুন দ্বারা উত্তপ্ত পাথর দিয়ে ছেক দেওয়া হবে; তপ্ত পাথর তার স্তনের বোঁটায় এমনভাবে চেপে ধরা হবে যে তা কাঁধ দিয়ে বের হয়ে যাবে, আবার কাঁধে উত্তপ্ত পাথর চেপে ধরা হবে যে তা স্তনের বোটা দিয়ে বের হয়ে যাবে।' এই কথা বলে লোকটি খুঁটির কাছে গিয়ে বসল। আমি তাঁকে চিনতে পারলাম না; তাই তাঁর পিছু পিছু গিয়ে বললাম, 'লোকেরা মনে হয় আপনার কথা ভালভাবে নেয়নি।' তিনি বললেন, 'এরা কিছুই বুঝে না।'[৩৯]

আবূ যার (রা.)-এর ব্যাখ্যা স্বকপোলকল্পিত ছিল না। তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর একটি হাদীস দ্বারা প্রভাবিত ও উৎসাহিত হয়ে এই ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম), আবূ যার (রা.)-কে বলেছিলেন,

ما أحب أن لي مثل أحدٍ ذهبا أنفقه كله إلا ثلاثة دنانير

আমার কাছে উহুদ পর্বত সমান স্বর্ণ থাকলেও তা হতে তিন দীনার ছাড়া বাকিগুলো আমি বিলিয়ে দিতাম।[৪০]

---

৩৮. ইবনুল আসীর, ২:৪০২।
৩৯. সাহীহুল বুখারী, কিতাবুয যাকাত, বাবু মা উদ্দিয়া যাকাতুহু ফালায়সা বি কানযিন, ১:৩৩৮।
৪০. প্রাগুক্ত।

ঘঃ মু'আবিয়া (রা.)-এর ব্যাখ্যা: এই আয়াত আহ্লুল কিতাব সম্পর্কে নাযিল হয়েছেঃ মু'আবিয়া (রা.) মনে করতেন যাকাত আদায় করার পর বাকি সম্পদ সঞ্চয় করতে কোন অসুবিধা নেই। তাঁর মতে পূর্বোক্ত আয়াত আহ্লুল কিতাব বা ইয়াহুদী ও নাসারা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তাঁর এই ব্যাখ্যার যৌক্তিকতা রয়েছে, আয়াতের শুরুতে আহ্লুল কিতাবের পাদ্রী ও বিরাগীদের ধনলিপ্সার নিন্দা করা হয়েছে।

অধিকাংশ সাহাবী ও পরবর্তী কালের 'আলিম আবূ যার (রা.)-এর সাম্যবাদী ব্যাখ্যা সমর্থন করেননি। ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ 'আলিম এই বিষয়ে একমত যে, যাকাত আদায়ের পর ধনসম্পদ সঞ্চয় করা যাবে। এক্ষেত্রে সঞ্চয়কারী নিন্দিত বা আখিরাতে শাস্তিপ্রাপ্ত হবে না। সূরা আত্ তাওবার উপর্যুক্ত আয়াত সম্পর্কে ইবনু 'উমার (রা.) বলেন,

من كنزها فلم يؤد زكاتها، فويل له، وإنما كان قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال

যে ব্যক্তি সম্পদের যাকাত আদায় করে না সে-ই অবৈধ সঞ্চয়কারী, তার জন্য ধ্বংস। (প্রয়োজনের অতিরিক্ত সকল সম্পদ ব্যয় করার বিধান) যাকাতের বিধান নাযিল হওয়ার পূর্বে ছিল। যাকাতের বিধান নাযিলের মাধ্যমে আল্লাহ সম্পদ পবিত্র করার সুযোগ দান করলেন।[৪১]

আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

ليس فيما دون أواق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس أوسق صدقة

পাঁচ উকিয়ার কম রৌপ্যে যাকাত নেই, পাঁচটির কম উটে যাকাত নেই, পাঁচ ওয়াসাকের কম খেজুরে যাকাত নেই।[৪২]

এই হাদীস হতে জানা গেল, নিসাবের চেয়ে কম সম্পদ সঞ্চয় করা যাবে, শুধু তাই নয় নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকলে যাকাত আদায়ের পর বাকি সম্পদ সঞ্চয় করে রাখা যাবে।

আবূ হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك

৪১. প্রাগুক্ত, ১:৩৩৭।
৪২. প্রাগুক্ত, ১: ৩৩৭-৮।

তুমি যখন তোমার সম্পদের যাকাত আদায় করলে, তোমার দায়িত্ব
তুমি পালন করলে।[৪৩]

অনুরূপ চেতনাবাহী অনেকগুলো হাদীস বর্ণিত হয়েছে, এ কারণে সাহাবায়ে কিরামসহ ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকীহ, মুহাদ্দিস ও 'আলিম আবূ যার (রা.)-এর দর্শন সমর্থন করেননি। ইমাম আল বুখারী তাঁর সাহীহ গ্রন্থের একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম করেছেন নিম্নরূপ: باب ما أدي زكاته فليس بكنز 'যে সম্পদের যাকাত আদায় করা হয়েছে তা অবৈধভাবে সঞ্চিত সম্পদ (বা কানয) বলে পরিগণিত হবে না।'

ঙঃ মু'আবিয়ার (রা.) অনুরোধে 'উসমান (রা.) আবূ যার (রা.)-কে মাদীনায় ডেকে নিলেন:

দামিশ্কে আবূ যার (রা.) যখন তাঁর সাম্যবাদী দর্শন প্রচার করছিলেন তখন ষড়যন্ত্রকারীরা 'উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে জোট পাকিয়ে অপপ্রচার চালাতে ব্যস্ত। মু'আবিয়া (রা.) আশঙ্কা করলেন, আবূ যার (রা.) যদি তাঁর দর্শন প্রচার অব্যাহত রাখেন তবে দুষ্কৃতিকারীরা তাঁকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করবে। তাই তিনি আবূ যার (রা.)-কে দামিশ্ক থেকে সরিয়ে দেওয়ার চিন্তাভাবনা করলেন। তবে প্রথমে তিনি আবূ যার (রা.)-এর কথায় ও কাজে মিল আছে কিনা তা যাচাই করার জন্য একটি কৌশল অবলম্বন করলেন: এক রাতে জনৈক দূত মারফত আবূ যার (রা.)-এর কাছে এক হাজার দীনার প্রেরণ করলেন। আবূযার (রা.) ঐ রাতেই মুদ্রাগুলো বিলিয়ে দেন। পরদিন সকালে মু'আবিয়া (রা.) ঐ দূতকে আবার আবূ যার (রা.)-এর কাছে এ-কথা বলার জন্য প্রেরণ করেন যে, 'আমি ভুলে আপনাকে এক হাজার দীনার দিয়েছিলাম, মূলতঃ টাকাটা আরেকজনকে দেওয়ার কথা। অনুগ্রহ করে আমাকে টাকাটা ফেরত দিন, মু'আবিয়া (রা.)-এর শাস্তি হতে আমার পিঠ বাঁচান!' দূত আবূ যার (রা.)-এর কাছে গিয়ে এই কথা বলল। আবূ যার (রা.) বললেন, 'বাছা! মু'আবিয়াকে গিয়ে বলো, তাঁর দেওয়া দীনারের একটিও আমার কাছে নেই। সে যেন আমাকে তিনদিন সময় দেয়, এরি মাঝে আমি এক হাজার দীনার সংগ্রহ করে ফেরত দেব।' আবূ যার (রা.)-এর কথা ও কাজের মাঝে মিল দেখতে পেয়ে মু'আবিয়া (রা.) খালীফাকে লিখলেন, আবূ যার (রা.)-কে যেন সিরিয়া থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়। মু'আবিয়ার পত্র পেয়ে 'উসমান (রা.) আবূ যার (রা.)-কে মাদীনা আসার অনুরোধ জানিয়ে পত্র দেন। আবূ যার (রা.) বিনাবাক্যব্যয়ে খালীফার নির্দেশ মেনে নেন এবং মাদীনায় চলে আসেন।[৪৪]

---

৪৩. জামিউত তিরমিযী, ২:২।
৪৪. আত-তাবারী, ৪:২৮৪; ইবনুল আসীর, ২:৪০২।

চঃ খালীফার অনুরোধে আবূ যার (রা.) দূরে সরে গেলেনঃ আবূ যার (রা.) মাদীনায় এসেও তাঁর ভিন্নধর্মী দর্শন প্রচার করতে থাকেন। এতে জনগণের মাঝে ঔৎসুক্য সৃষ্টি হয়। সাধারণ জনগণ এভাবে আবূ যার (রা.)-কে ঘিরে ধরে যে তিনি বিব্রতবোধ করেন। এ বিষয়ে তিনি খালীফার কাছে অনুযোগ করে বলেন, 'লোকজন এমনভাবে আমার চারপাশে ঘুরঘুর করে যে, তারা যেন আমাকে আগে কখনো দেখেইনি।' মু'আবিয়া (রা.) সিরিয়ায় যে বিপদের আশঙ্কা করেছিলেন 'উসমান (রা.) মাদীনায় একই বিপদের আশঙ্কা করলেন। তিনি অনুভব করলেন, দুষ্কৃতিকারীরা সরলমনা আবূ যার (রা.)-কে ব্যবহার করে ফিতনা সৃষ্টি করতে চাইবে। তাই তিনি তাঁকে অনুরোধ করে বললেন, 'আপনি যদি কাছে কোথাও সরে যেতেন তাহলে ভাল হতো।'

খালীফার অনুরোধ আবূ যার (রা.) প্রশান্ত মনে গ্রহণ করেন। তিনি রাবাযায় চলে গেলেন। এটি মাক্কা ও ইরাকের রাস্তার ধারে অবস্থিত একটি মরু জনপদ। আবূ যার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আমলে কখনো-সখনো এখানে আসতেন। এ জায়গাটিকে তিনি নির্জনবাসের জন্য বেছে নিলেন। 'আবদুল্লাহ ইবনুস সামিতের এক বর্ণনায় দেখা যায়, আবূ যার নিজে 'উসমান (রা.)-এর কাছে গিয়ে বললেন, 'আল্লাহর শপথ! আমি বিদ্রোহী নই।' 'উসমান (রা.) বললেন, 'আমি কখনো আপনাকে বিদ্রোহী মনে করিনি। আমি তো আপনাকে ডেকেছি মাদীনায় আমার কাছে অবস্থান করার জন্য।' জবাবে আবূ যার (রা.) বললেন, 'তার প্রয়োজন নেই। আমাকে রাবাযায় চলে যেতে দিন।' খালীফা তাঁকে অনুমতি দিলে তিনি রাবাযায় চলে যান। যাওয়ার সময় 'উসমান (রা.) তাঁকে উট ও প্রয়োজনীয়সংখ্যক দাস দিলেন। সেখানে তিনি একটি মাসজিদ প্রতিষ্ঠা করলেন।[৪৫]

উল্লেখ্য বিদ্রোহের পতাকাধারীরা আবূ যার (রা.)-কে বারবার উস্কানি দিয়েছিল তাঁদের নেতৃত্ব গ্রহণ করার জন্য। তাঁরা জানত, আবূ যার (রা.) প্রাথমিক যুগের মুসলিমদের একজন। সমাজে তাঁর ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। কিন্তু আবূ যার (রা.) তাদের এই প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলেন, কোন হাবশীকেও যদি আমার নেতা বানানো হয় তবে আমি তাঁর আনুগত্য করব। 'উসমান (রা.) যদি আমাকে পূর্ব থেকে পশ্চিমে চলে যেতে বাধ্য করে তবুও আমি তাঁর আনুগত্য করব।'[৪৬]

---

৪৫. ইবনু হাজর, ফাতহ.., ৩:৩৩২; ইবনুল আসীর, ২:৪০২।
৪৬. প্রাগুক্ত।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা দরকার। তা হল, সংখ্যাগরিষ্ঠ সাহাবী সম্পদ সঞ্চয় করার ব্যাপারে আবূ যার (রা.)-এর সাথে দ্বিমত পোষণ করলেও তাঁরা আবূ যার (রা.)-কে মত পরিবর্তন করতে বলেননি। কারণ আবূ যার (রা.)-এর ইজতিহাদী রায় ছিল এই যে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত সকল সম্পদ রাষ্ট্রীয় ও জনকল্যাণে দান করে দিতে হবে। যে ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব তাঁর জন্য এটি অবশ্যই একটি প্রশংসনীয় কাজ। তবে সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমত ছিল এই যে, যাকাত আদায় করা ফারয, এরপর প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ দান করে দেওয়া ফারয নয়, তবে উত্তম। এই মতের সমর্থন হাদীসেও পাওয়া যায়:

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه ذكر الزكاة فقال رجل يا رسول الله هل عليّ غيرها؟ فقال لا إلا أن تطوع

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছ থেকে একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে যে, তিনি যাকাতের আলোচনা করলে এক ব্যক্তি বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল! এ ছাড়াও কি আমার করণীয় আছে?' তিনি বলেন, 'না, তবে অতিরিক্ত দান খয়রাত করতে পার।'[৪৭]

এ হাদীস থেকেও বুঝা যায়, যাকাত আদায়ের পর বাকি সম্পদ সঞ্চয় করা যায়। তবে অতিরিক্ত দান করা উত্তম।

আবূ যার (রা.) মাক্কী জীবনের একেবারে শুরুর দিকে ইসলাম গ্রহণ করেন। কা'বার চত্বরে নিজের ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিতে গিয়ে তিনি ব কয়েক লাঞ্ছনার শিকার হয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে নিজ গোত্রে গিয়ে ইসলাম প্রচারের নির্দেশ দেন। ইসলামের শুরুতে অতিরিক্ত সম্পদ সঞ্চয় করে রাখা যেত না। অধিকাংশ মুসলিম দরিদ্র শ্রেণীর হওয়ায় সম্পদ বন্টনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সেই নির্দেশ জেনেই আবূ যার নিজ গোত্রে চলে গিয়েছিলেন। পরবর্তীতে মুসলিমদের মাঝে স্বচ্ছলতা আসে এবং যাকাত আদায়ের পর বাকি সম্পদ সঞ্চয় করার অনুমতি দেওয়া হয়। আবূ যার নিজ গোত্রে অবস্থানের কারণে হয়ত পরিবর্তিত এই বিধানের ব্যাপারে অনবহিত ছিলেন। তাই তিনি সাম্যবাদী দর্শন প্রচার করতেন।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে প্রমাণিত হল যে, 'উসমান (রা.), আবূ যার (রা.)-কে তাঁর চিন্তাধারা পরিত্যাগ করতে বলেননি। তিনি আবূ যার (রা.)-কে

৪৭. জামি'উত তিরমিযী, ২:২-৩।

মাদীনা হতে বহিষ্কারও করেননি। বরং তিনি যখন দেখলেন, ফিতনাবাজরা আবূ যার (রা.)-কে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যবহার করবে তখন তাঁকে আশেপাশে কোথাও সরে যেতে অনুরোধ করলেন। আবূ যারও (রা.) খালীফার এই অনুরোধ হৃষ্টচিত্তে মেনে নিলেন এবং তিনি রাবাযায় চলে গেলেন, যেখানে তিনি জীবনের শেষ কয়টা দিন কাটিয়ে দেন। গালিবুল কাত্তান এ বিষয়ে আল-হাসান আল-বাসরীর কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'না, কখনো না, 'উসমান (রা.), আবূ যার (রা.)-কে বের করে দেননি।' ইবনু সীরীনও একই কথা বলেছেন, 'আবূ যার (রা.) স্বেচ্ছায় চলে গেছেন, 'উসমান (রা.) তাঁকে বের করে দেননি।'

দুইঃ আবূ যার (রা.) 'আবদুল্লাহ ইবনু সাবা' কর্তৃক প্রভাবিত ছিলেন নাঃ আবূ যার (রা.)-এর ওপর 'আবদুল্লাহ ইবনু সাবার কথিত প্রভাব নিয়ে ধূম্রজাল সৃষ্টি করা হয়েছে। আত-তাবারীর একটি বর্ণনার ওপর ভিত্তি করে এই অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। তাবারী লিখেছেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু সাবা সিরিয়ায় আবূ যার (রা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে এবং তাঁর মস্তিষ্কে সাম্যবাদী চিন্তা ঢুকিয়ে দেয়।[৪৮] এই বর্ণনার ওপর ভিত্তি করে বর্তমান সময়ের কতিপয় ঐতিহাসিক ও প্রাচ্যবিদ কল্পনার রঙ চড়িয়ে নানাবিধ কল্পকাহিনী তৈরী করেছেন। মিসরীয় লেখক আহমাদ আমীন, আবূ যার (রা.)-এর চিন্তাধারায় পারস্য উপাদানের সন্ধান পেয়েছেন। তাঁর মতে 'আবদুল্লাহ ইবনু সাবা' ইরাকে ব্যাপকহারে ভ্রমণ করে। তথায় সে পারস্য ধর্মগুরু মিযদাকের সাম্যনীতি দ্বারা প্রভাবিত হয়। ইবনু সাবা পরবর্তীতে ইসলামী প্রদেশগুলোতেও সফর করে। এক পর্যায়ে সিরিয়ায় আবূ যার (রা.)-এর সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। 'আবদুল্লাহ ইবনু সাবা সরলমনা আবূ যার (রা.)-কে সাম্যবাদী চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত করতে সক্ষম হন। আবূ যার ঐ চিন্তাধারা প্রচার করতে থাকলে ফিতনা সৃষ্টির ভয়ে মু'আবিয়া তাঁকে মাদীনায় পাঠিয়ে দেন।

ঐতিহাসিক বাস্তবতা ও অন্যান্য বিবরণের আলোকে পর্যালোচনা করে বলা যায় আবূ যার (রা.)-এর ওপর ইবনু সাবার প্রভাবের বিষয়টি বাস্তবতা-বিবর্জিত ও কল্পনাপ্রসূত। নিম্নোক্ত তথ্যগুলো মিলিয়ে দেখা যেতে পারে।

ইয়ামানী ইহুদি ইবনু সাবা' 'উসমান (রা.)-এর আমলে বাহ্যিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করে। তাঁর ভ্রান্ত চিন্তা ও কার্যকলাপ প্রথম প্রকাশ পায় বাসরায়, যেখানে তাকে দেখা যায় 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমির-এর গভর্ণরীর তৃতীয় বছর তথা ৩২ হিজরীতে (ইবনু 'আমির ২৯ হিজরীতে গভর্ণর নিযুক্ত হন)। ধ্বংসাত্মক

---

৪৮. আত-তাবারী, ৪:২৮৩।

প্রচারণার কারণে বাসরার গভর্ণর ইবনু সাবা'কে আরাফা'র দিন তথা জিলহজ্জের নয় তারিখে শহর হতে বহিষ্কার করেন।

ঐতিহাসিকগণ বলেন, এরপর সে কূফা অভিমুখে রওয়ানা করে, তথায় কিছু সমর্থক যোগাড় করতে সক্ষম হয়। পরবর্তীতে সে সিরিয়ায় গমন করে। এই কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে তার কমপক্ষে এক বছর সময় লেগেছিল বলে ধরে নেওয়া যায়। সে হিসেবে ৩৩ হিজরীর শেষদিকে সে সিরিয়ায় পৌঁছে থাকবে। অপরদিকে বিশুদ্ধতম বর্ণনার আলোকে ৩০ হিজরীতে আবূ যার (রা.) মাদীনায় আগমন করেন এবং রাবাযায় চলে যান। ৩১ বা ৩২ হিজরীতে রাবাযায় এই নিভৃতচারী সাহাবীর মৃত্যু হয়। এর অর্থ হল এই যে, 'আবদুল্লাহ ইবনু সাবা' সিরিয়ায় উপস্থিত হওয়ার কমপক্ষে এক বছর পূর্বে আবূ যার (রা.) মৃত্যুবরণ করেন।

মু'আবিয়া আবূ যার (রা.) সম্পর্কে খালীফাকে যে পত্র লিখেন তাতে ইবনু সাবার কোন উল্লেখ নেই: إن أبا ذر قد أعضل بي، وقد كان من أمره كيت كيت 'আবূ যার (রা.) সংকট সৃষ্টি করছেন, তিনি এই এই করছেন।'[৪৯]

আবূ যার (রা.) ও মু'আবিয়ার মতভেদের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন ইবনু কাসীর; তিনি কোথাও 'আবদুল্লাহ ইবনু সাবা-এর নামোল্লেখ করেননি।

ইতোপূর্বে আবূ যার (রা.) ও মু'আবিয়া (রা.)-এর মতভেদের বিষয়ে সাহীহুল বুখারীর বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে। ঐ বর্ণনায় ইবনু সাবার কোন উল্লেখ নেই।

নির্ভরযোগ্য ইতিহাস গ্রন্থগুলো আবূ যার-এর ওপর ইবনু সাবার প্রভাব বিষয়ে একেবারেই নিশ্চুপ।

উপর্যুক্ত বর্ণনা ও ঐতিহাসিক বাস্তবতার আলোকে বলা যায়, আবূ যার (রা.)-এর ওপর 'আবদুল্লাহ ইবনু সাবা'র প্রভাবের কাহিনী একেবারেই কল্পনাপ্রসুত। বস্তুত এই মহান সাহাবীর সাথে কুচক্রী ইয়াহুদীটির কখনো সাক্ষাতই হয়নি।

তিনঃ আবূ যার (রা.)-এর মৃত্যু ও খালীফা কর্তৃক তাঁর পরিবারকে নিজের পরিবারের সাথে সংযুক্তিঃ

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবূ যার (রা.)-কে বলেছিলেন,

رحم الله أبا ذر، يمشي وحيدا، ويموت وحيدا ويبعث وحيدا.

---

৪৯. প্রাগুক্ত।

আল্লাহ আবূ যার (রা.)-এর প্রতি দয়াপরবশ হউন; সে একাকী চলে, একাকী অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হবে এবং নিঃসঙ্গ অবস্থায় সে পুনরুত্থিত হবে।[৫০]

মু'আবিয়া (রা.) আবূ যার (রা.)-এর পরিবারকে রাবাযায় পাঠিয়ে দেন। এখানে নির্জনে তিনি শেষ দিনগুলো কাটিয়ে দেন। তিনি একটি মাসজিদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেখানে মুজাশি' নামে রাজস্ব বিভাগের এক কর্মচারী সালাত আদায় করতেন। খালীফার প্রতি আবূ যার (রা.)-এর আনুগত্য এত বেশি ছিল যে, ওই কর্মচারীর উপস্থিতিতে আবূ যার কখনো সালাতে ইমামতি করতেন না। আবূ যার (রা.), মুজাশি'কে বলেছিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, কোন অঙ্গকর্তিত গোলামকেও যদি তোমার আমীর বানানো হয় তবে তাঁর আনুগত্য করবে।'[৫১]

আবূ যার (রা.) তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলো কাটাতে লাগলেন। এক পর্যায়ে মৃত্যু উপস্থিত হলে তিনি তাঁর মেয়েকে বললেন, 'দেখো তো রাস্তায় কাউকে দেখা যায় কিনা।' মেয়েটির কাছ থেকে না-সূচক জবাব পেয়ে আবূ যার (রা.) বললেন, 'আমার মৃত্যুর সময় এখনো আসেনি, তুমি একটি মেষ জবাই করে গোশ্ত রান্না কর।' মেয়েটি পাতিলে গোশ্ত চড়িয়ে দেওয়ার পর তার পিতা বললেন, 'এবার দেখো তো রাস্তায় কাউকে দেখা যায় কিনা।' মেয়েটি বলল, 'হ্যাঁ, একটি কাফিলা আসছে।' আবূ যার (রা.) বললেন, 'আমার সময় শেষ হয়ে এসেছে, তুমি আমাকে কিবলা-রোখ করে শুইয়ে দাও।' মেয়েটি তাই করল। তারপর আবূ যার (রা.) 'বিসমিল্লাহি ওয়া বিল্লাহি ওয়া 'আলা মিল্লাতি রাসূলিল্লাহ্' বলতে বলতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। অতঃপর মেয়েটি রাস্তায় দাঁড়িয়ে কাফিলার লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল, 'আপনারা আবূ যার (রা.)-কে দেখে যান।' ঐ কাফিলায় ইবনু মাস'উদ[৫২] ছিলেন। তিনি চিৎকার করে বললেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সত্য বলেছেন, আবূ যার (রা.)-এর

---

৫০. ইবনু হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ৪: ১৭৮।

৫১. ইবনুল আসীর, ২:৪০৩।

৫২ ইবনু মাস'উদ (রা)-এর সাথে আরো যারা ছিলেন তাঁদের নাম:আবূ মিফরায, বাক্র ইবনু 'আবদিল্লাহ্, আল-আসওয়াদ ইবনু ইয়াযীদ, 'আলকামাহ ইবনু কায়স, মালিক আল-আশতার, আল-হালহাল আদ-দাব্বী, আল-হারিস ইবনু সুওয়াইদ, 'আমর ইবনু 'উতবাহ্, ইবনু রাবী'আহ্ আস-সুলামী, আবূ রাফি' আল-মুযানী, সুওয়াইদ ইবনু শু'বা, যিয়াদ ইবনু মু'আবিয়া, আল-কারসা' আদ-দাব্বী-এর ভাই, মি'দাদ আশ-শাইবানী-এর ভাই [ইবনুল আসীর, ২:৪১৬]।

প্রতি আল্লাহ্ দয়াপরবশ হউন, তিনি একাকী চলেছেন, একাকী মৃত্যুবরণ করেছেন, আবার একাকী পুনরুত্থিত হবেন।' কাফিলার লোকজন দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করল। তারা যখন চলে যেতে চাইলেন তখন আবূ যার (রা.)-এর কন্যা বললেন, 'আবূ যার (রা.) আপনাদেরকে সালাম জানিয়েছেন, আল্লাহ্র দোহাই! আপনারা কিছু মুখে না দিয়ে যাবেন না।' তখন ইবনু মাস'উদ ও তাঁর সফরসঙ্গীরা আবূ যার (রা.)-এর পরিবারের আতিথেয়তা গ্রহণ করলেন। অতঃপর তাদেরকে নিয়ে মাক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করলেন। মাক্কায় খালীফা অবস্থান করছিলেন। তিনি আবূ যার (রা.)-এর কন্যাকে নিজ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। খালীফা মাদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করলেন আর ইবনু মাস'উদসহ অন্যরা ইরাক পানে ছুটলেন।[৫৩]

---

৫৩. আত-তাবারী, ৪:৪০৩।

অষ্টম অধ্যায়

‘উসমান (রা.)-এর শাহাদাত

প্রথম পরিচ্ছেদ

'উসমান (রা.) হত্যার কারণ

'উসমান (রা.) মোট বারো বছর খালীফা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর খিলাফাতের প্রথম ছয় বছর খুব শান্তিপূর্ণ ছিল; মানুষ 'উমার (রা.)-এর চেয়ে 'উসমান (রা.)-কে বেশি পছন্দ করত। কারণ তিনি 'উমার (রা.)-এর ন্যায় কঠোর ছিলেন না; একজন কঠোর খালীফার পর 'উসমান (রা.)-এর ন্যায় উদার ও কোমল ব্যক্তিত্বের এক সাহাবীকে খালীফা হতে দেখে মানুষ বরং খুশীই হয়েছিল। কিন্তু কোমল প্রকৃতির এই খালীফার শাসনকালের দ্বিতীয়ার্ধ ছিল গোলযোগে ভরা। গোলযোগের কারণ হিসেবে সাধারণত নিম্নোক্ত বক্তব্যটুকু উল্লেখ করা হয়:

وليّ عثمان، فعمل ست سنين لا ينقم عليه الناس شيئا، وإنه لأحب إليهم من عمر، لأن عمر كان شديدا عليهم، فلمّا وليهم عثمان لان لهم ووصلهم، ثم إنه توانى في أمرهم، واستعمل أقرباءه وأهل بيته في الست الأواخر، وكتب لمروان بن الحكم بخمس مصر أو بخمس إفريقية، وآثر أقرباءه للمال، وتأول في ذلك الصلة التي أمر الله بها. واتخذ الأموال، واستسلف من بيت المال، وقال إن أبا بكرٍ وعمر تركا من ذلك ما هو لهما، وإني أخذهما فقسمته في أقربائي، فأنكر الناس عليه ذلك.

'উসমান (রা.) দায়িত্ব গ্রহণের পর ছয় বছর কাজ করলেন, এই সময় তাঁর কোন কাজ জনগণ অপছন্দ করেনি। শুধু তাই নয়, তিনি 'উমার (রা.)-এর চেয়ে বেশি প্রিয় ছিলেন; কারণ 'উমার (রা.) তাদের ওপর কঠোরতা আরোপ করতেন, অপরদিকে দায়িত্ব গ্রহণের পর 'উসমান (রা.) তাদের সাথে কোমল ব্যবহার করতেন ও সুসম্পর্ক স্থাপনে সচেষ্ট ছিলেন। শেষের ছয় বছরে তিনি শাসিতদের বিষয়ে শৈথিল্য প্রদর্শন করলেন, নিজের আত্মীয়-স্বজন ও পরিবারের লোকদেরকে রাষ্ট্রীয় পদে নিয়োগ দিলেন; মারওয়ানকে আফ্রিকা বা মিসরের গানীমাতের এক-পঞ্চমাংশ দিলেন, সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে আত্মীয়স্বজনকে অগ্রাধিকার দিলেন, এ ব্যাপারে আল্লাহ নির্দেশিত আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার দোহাই দিলেন। তিনি সম্পদ গ্রহণ করলেন, বাইতুল মাল হতে টাকা কর্জ করলেন। তিনি বলতেন, 'আবূ বাক্র (রা.) ও 'উমার (রা.) (বাইতুল

> মালের সম্পদে) নিজেদের অধিকার ত্যাগ করেছিলেন, আমি তা গ্রহণ করে আত্মীয়দের মাঝে বণ্টন করেছি।' ফলে মানুষ তাঁর এই কাজ অপছন্দ করল।[১]

অনুরূপ বিবরণ ইবনু সা'দও উল্লেখ করেছেন।[২]

এই বর্ণনা থেকে কয়েকটি বিষয় জানা গেল:

ক. শাসনামলের প্রথম ছয় বছর 'উসমান (রা.) খুব জনপ্রিয় শাসক ছিলেন; এমনকি লোকেরা তাঁকে 'উমার (রা.)-এর চেয়ে বেশি পছন্দ করত।

খ. পরের বছরগুলোতে তিনি জনগণের বিষয়ে অমনোযোগী হয়ে পড়েন।

গ. তাঁর বিরুদ্ধে অসন্তোষের কারণ হল: (১) তিনি আত্মীয়-স্বজনকে রাষ্ট্রীয় পদে নিয়োগ দিয়েছিলেন, (২) রাষ্ট্রীয় সম্পদ বিতরণের ক্ষেত্রে তিনি আত্মীয়-স্বজনকে অগ্রাধিকার দিতেন, (৩) নিজে সম্পদ গ্রহণ করেছিলেন, (৪) বাইতুল মাল থেকে অর্থ কর্জ করেছিলেন।

অভিযোগ সম্পর্কে স্বতন্ত্র অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে এগুলো পর্যালোচনা করা সম্ভব নয়। এখানে আমরা পর্যালোচনা করে দেখব উপর্যুক্ত বিষয়গুলো আদৌ অসন্তোষের কারণ ছিল কিনা। নিরপেক্ষ বিশ্লেষণের আলোকে আমরা বলতে পারি, এগুলো জনঅসন্তোষের অনুঘটক ছিল না; তবে খালীফার কিছু বৈধ কর্মকাণ্ডের ওপর অবৈধতার রঙ চড়িয়ে পরিকল্পিত উপায়ে অসন্তোষ সৃষ্টি করা হয়েছিল।

প্রথমতঃ খালীফা 'উসমান (রা.) তাঁর আত্মীয়-স্বজনকে প্রথম ছয় বছরের মধ্যেই রাষ্ট্রীয় পদে নিয়োগ দিয়েছিলেন; আল-ওয়ালীদ ইবনু 'উকবাকে ২৫ হিজরীতে তথা 'উসমান (রা.)-এর খিলাফাতের দ্বিতীয় বছরে কূফার গভর্ণর পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল, অপরদিকে 'আবদুল্লাহ ইবনু সা'দকে মিসরের গভর্ণর হিসেবে ২৭ হিজরীতে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। এভাবে আমরা দেখতে পাব প্রথম ছয় বছরেই 'উসমান (রা.) বেশির ভাগ নিয়োগ প্রদান করেছিলেন। আত্মীয়-স্বজনকে রাষ্ট্রীয় পদে নিয়োগ প্রদান যদি অসন্তোষের কারণ হত তবে প্রথম ছয় বছরেই তা প্রকাশিত হত। তাহলে বুঝা গেল এটি অসন্তোষের কারণ নয়; পরবর্তী আলোচনায় দেখা যাবে এটিকে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করে পরিকল্পিত উপায়ে অসন্তোষ সৃষ্টি করা হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ তিনি আত্মীয়-স্বজনকে খালীফা হওয়ার পূর্বেও দান করতেন। বলাবাহুল্য খালীফা হওয়ার পরও তিনি নিজ সম্পদ থেকেই নিকটাত্মীয়দেরকে দান করেছেন। মারওয়ান ও আবদুল্লাহ ইবনু সা'দকে প্রদত্ত গানীমাতের এক পঞ্চমাংশ ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছিল।

---

১. আয-যাহাবী, ৩:১১৫।
২. ইবনু সা'দ, ৩:৬৪।

তৃতীয়তঃ খালীফা হিসেবে তিনি যদি রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে ভাতা নিয়ে থাকেন তবে তা সম্পূর্ণ বৈধ।

চতুর্থতঃ বাইতুল মাল হতে ঋণ গ্রহণের বিষয়টি প্রমাণিত নয়। এটিকে সত্য হিসেবে ধরে নিয়েও বলা যায় প্রত্যর্পণের শর্তে ঋণ গ্রহণ কিছুতেই অবৈধ কাজ নয়। অতএব দেখা যাচ্ছে খালীফা 'উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে ধোপে টিকবার মত কোন অভিযোগ ছিল না। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য এই যে ফিতনাবাজরা সমাজের একটি ক্ষুদ্র অংশকে খালীফার বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ করে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। এই ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করতে হলে আমাদেরকে সেই সময়ের সমাজ বাস্তবতার আলোকে পর্যালোচনা করতে হবে। 'উসমান (রা.) যখন খালীফা হন তখন ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকগণ কোন পর্যায়ের ছিলেন, তাঁর খিলাফাতের শেষ পর্যায়ে সেই নাগরিকের নৈতিকতা ও মানসগঠনে কী পরিবর্তন এসেছিল তা আমাদের বিবেচনায় আনতে হবে।

প্রথম দু'খালীফা ও 'উসমান (রা.)-এর খিলাফাতের অর্ধাংশে ইসলামী সমাজ নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত ছিলঃ

সাধারণভাবে তা ছিল একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী সমাজ। এর সদস্যরা ছিলেন আল্লাহ্ ও আখিরাতের ওপর গভীরভাবে বিশ্বাসী, পরিপূর্ণ আন্তরিকতার সাথে ইসলামী শিক্ষা বাস্তবায়নকারী। সেটি ছিল বিশ্বের ইতিহাসে সবচাইতে কম পাপগ্রস্ত সমাজ। তাদের জীবনে দীন অপাংক্তেয়, তুচ্ছ, নগণ্য বা ঐচ্ছিক কোন বিষয় ছিল না; বরং দীন-ই ছিল তাঁদের জীবন-প্রাণ ও আত্মা। কতিপয় আচার-সর্বস্ব উপাসনা পালনের মধ্যে তাঁদের দীন সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁদের নৈতিকতা, চরিত্র, প্রাধিকার, কল্পনা, মূল্যবোধ, সামাজিক সম্পর্ক, পারিবারিক সম্পর্ক, কেনাবেচা, ভ্রমণ, উপার্জন, পারস্পরিক লেনদেন, সৎ-অসৎ নির্ণয়সহ ইত্যাকার যাবতীয় বিষয় নিয়ন্ত্রিত হত দীনের মাধ্যমে, দীনের আওতায়। তবে আমরা এটি দাবি করব না যে, সমাজের সকল সদস্য উপর্যুক্ত গুণের পূর্ণ আধার ছিল; তা কোনকালেও সম্ভব ছিল না। তবে সামগ্রিক কল্যাণ, সুকৃতি ও দীনদারীর আধিক্য ছিল। দুষ্ট লোক যা-ও ছিল তাঁদের বিন্দুমাত্র প্রভাব ছিল না সমাজ জীবনে। সামগ্রিক দৃষ্টিতে সেটি ছিল এমন এক সমাজ যেখানে সততা, সুকৃতি, তাকওয়া ও পরহেজগারীর প্রাধান্য ছিল।

প্রথম দু'খালীফা ও 'উসমান (রা.)-এর প্রথমার্ধের ইসলামী রাষ্ট্র ছিল এমন এক সমাজ যেখানে 'উম্মাহ' শব্দটি সর্বাধিক প্রায়োগিক অর্থ খুঁজে পেয়েছিল। ভাষাগত ও ভৌগলিক স্বার্থের কারণে মুসলিম উম্মাহ ঐক্যবদ্ধ ছিল না। এগুলোতো জাহিলী সমাজের বাসিন্দাদের ঐক্যের গাঁথুনি। মুসলিম উম্মাহ্র ঐক্যের ভিত্তি ছিল ঈমান ও বিশ্বাস; ভাষা ও বর্ণভিত্তিক জাতীয়তার কোন মূল্য ছিল না সেখানে। ঈমান ও বিশ্বাসের রশিতে দৃঢ়ভাবে বাঁধা ছিল তাঁদের সম্পর্ক। ফলে আরব-অনারব, হাবশী ও রূমীর সমন্বয়ে গড়ে

ওঠেছিল ঈমানভিত্তিক অখণ্ড এক জাতিসত্তা। 'উম্মাহ্' শব্দটি ইতিহাসের আর কোন অধ্যায়ে এতটা সার্থকতা খুঁজে পায়নি।

প্রথম দু'খালীফা ও 'উসমান (রা.)-এর প্রথমার্ধের মুসলিম সমাজ ছিল সামগ্রিক অর্থে একটি নৈতিক সমাজ, যেখানে নৈতিকতা ও চরিত্রের প্রবল প্রতাপ ছিল। আর এই নৈতিকতা ছিল দীনী চেতনা ও শিক্ষা উৎসারিত। যে কোন প্রকারের বেহায়াপনা, অশ্লীলতা, নির্লজ্জতা, চরিত্র হানিকর চিন্তা-চেতনা ও ক্রিয়াকলাপ থেকে মুক্ত। নৈতিকতার বিষয়টি কেবল নারী-পুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিরাজিত ছিল এমন নয়, বরং এটি ছিল সামগ্রিক অর্থে সর্বব্যাপী। আর্থিক ক্রিয়াকলাপ থেকে শুরু করে চিন্তার জগত সবটুকুই ছিল নৈতিকতা প্রভাবিত, আর এ কারণেই সমাজে মানুষের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল সততা, সত্যবাদিতা, আমানতদারী, নিষ্ঠা, পারস্পরিক সহায়তা, ও ভালোবাসার ওপর। সেখানে চোগলখুরী, নিন্দাবাদ, কুৎসা, অপবাদ ও সম্মানহানির কোন স্থান ছিল না।

সেই সমাজের সদস্যরা ছিলেন একনিষ্ঠ; তাঁরা উন্নততর কাজ সম্পাদনে ব্যস্ত থাকতেন, নিকৃষ্ট ধরনের কাজে তাঁদের কোন মনোযোগ ছিল না। সেই ঐকান্তিকতা ও একনিষ্ঠতা ছিল এমন এক প্রাণশক্তি যা মানুষের মনে সাহস জোগাত, তাঁদেরকে কর্মতৎপর হতে উৎসাহ দিত। অলস ও কর্মবিমুখ সমাজের কোন চিহ্ন সেখানে ছিল না। আড্ডা ও গল্পগুজবে সময় কাটানোর পরিবর্তে তাঁরা একনিষ্ঠভাবে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত থাকতেন।

সৈনিকী তৎপরতায় কাজ করতে অভ্যস্ত ছিলেন সেই সমাজের সদস্যরা। তার অর্থ এ নয় তাদের সবাই সৈনিক হিসেবে যুদ্ধের ময়দানে লড়াইয়ে ব্যস্ত থাকতেন। হ্যাঁ, এটি সত্য যে সমাজের বড় অংশ যুদ্ধে লিপ্ত থাকতেন; তবে বাকিদের মধ্যে সৈনিকসুলভ তৎপরতা ছিল; জড়তা, দুর্বলতা বা অবসাদগ্রস্ততার কোন স্থান ছিল না। যখনই কারো ওপর কোন দায়িত্ব অর্পণ করা হত তখনই বিনা বাক্যব্যয়ে সেই কাজ সম্পাদনে তিনি লেগে যেতেন।

সেই সমাজ ছিল একটি ইবাদাতকারী সমাজ। ইবাদাতের প্রাণশক্তি শুধু ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে প্রকাশিত হত এমন নয়, বরং সকল কাজ বাস্তবায়ন ও সম্পাদন করা হত ইবাদাতের চেতনায়। এই চেতনাই ছিল সকল কর্মের মূল নিয়ামক। শাসক শাসন করতেন ইবাদাতের চেতনায়; শিক্ষক, ব্যবসায়ীসহ সব শ্রেণী-পেশার মানুষ ইবাদাতের চেতনায় নিজেদের দায়িত্ব পালন করতেন তথা কর্ম সম্পাদন করতেন। এমনকি গৃহকর্তার স্ত্রী-পরিজনের জন্য রোযগার বা কর্ত্রীর বাড়িঘর দেখাশোনা করা-সবকিছুই সম্পাদিত হত ইবাদাতের চেতনায়।[৩]

এগুলো ছিল খুলাফা রাশিদূনের আমলের ইসলামী সমাজের বৈশিষ্ট্য। প্রথম দু'খালীফার আমলে এই বৈশিষ্ট্যগুলো যত অধিকহারে বিদ্যমান ছিল পরবর্তীতে তেমনটা ছিল না।

---

৩. মুহাম্মাদ কুতব-এর কায়ফা নাকতুবুত তারীখাল ইসলামী গ্রন্থের ১০০-১০২ পৃষ্ঠা অবলম্বনে লিখিত।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আমল থেকে যত দূরে সরে যাওয়া হয়েছে এই বৈশিষ্ট্যগুলো ততই হ্রাস পেয়েছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলো ওই যুগকে ভিন্নভাবে চিহ্নিত করেছে বিশ্বের ইতিহাসে। বিশ্বের ইতিহাসে এতটা আদর্শ-অনুগামী সমাজ আর কখনো পাওয়া যায়নি। আর এই কারণেই আশ্চর্য ক্ষিপ্রতায় বিস্তৃত হয়েছে ইসলামী খিলাফাত; মাত্র পঞ্চাশ বছরের মধ্যে পশ্চিমে আটলান্টিক ও পূর্বে ভারত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে ইসলামী রাষ্ট্র। সাম্রাজ্য বিস্তারের পাশাপাশি ইসলাম বিজিত এলাকার মানুষের মণিকোঠায় স্থান করে নিতে পেরেছে। মুসলিমরা দেশ জয় করেছে সত্য, তবে ইসলাম গ্রহণে কাউকে বাধ্য করেনি। অথচ বিজিত এলাকায় বিদ্যুৎগতিতে ইসলাম ছড়িয়ে পড়েছে; এর পেছনে নেপথ্য শক্তি হিসেবে কাজ করেছে ইসলামী সমাজের পূর্বোল্লেখিত বৈশিষ্ট্যগুলো।

ওই সময়ের ইতিহাস অধ্যয়নকালে আমাদের একটি বিষয় মনে রাখতে হবে, তা হল: খিলাফাতের স্বর্ণযুগে ইসলাম একটি জীবন বিধান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এটি বাস্তবায়ন-অযোগ্য কতিপয় কল্পিত আদর্শের নাম নয়, বরং ইসলাম হল বাস্তব জীবনে প্রয়োগযোগ্য আদর্শ, যা বাস্তবায়িত হয়েছিল। একবার যা বাস্তবায়িত হয়েছে তা আবারো বাস্তবায়িত হতে পারে, তবে সেই আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য যথাযথ পন্থায় প্রচেষ্টা চালাতে হবে। কোন এক উচ্চতায় উন্নীত হওয়ার পর তা হতে বিচ্যুত হলে মানুষ সর্বদা সেই মানে উন্নীত হতে সচেষ্ট থাকে। মুসলিমদেরও উচিত সেই সমাজ ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট হওয়া:

وَعَدَ اللهُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُوْنَنِيْ وَلَا يُشْرِكُوْنَ بِيْ شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ.

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত করবেন তাদের দীনকে যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং ভয়ভীতির পরিবর্তে তাদেরকে নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ইবাদাত করবে, আমার কোন শরীক করবে না, অতঃপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে তারা তো সত্যত্যাগী। [আলকুরআন ২৪:৫৫]।

আমরা যদি সত্যিকার অর্থে খিলাফাতে রাশিদা ফিরিয়ে আনতে চাই তাহলে আমাদেরকে খিলাফাতের পতনের কারণগুলো জানতে হবে। যাতে সেই কারণগুলো হতে

আমরা বিরত থাকতে পারি এবং তা পরিহার করে ইতিবাচক দিকগুলো গ্রহণ করে নিজেরা সামনের দিকে অগ্রসর হতে পারি।

'উসমান (রা.)-হত্যার কারণ:

এক. সামাজিক রূপান্তর:

এই অধ্যায়ের শুরুতে আমরা খুলাফা রাশিদূনের আমলের কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য আলোচনা করেছি। আমরা এটাও উল্লেখ করেছি যে নুবুওয়াতের যুগের সাথে যত কালিক দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে ঐ বৈশিষ্ট্যগুলো তত হ্রাস পেয়েছে। 'উসমান (রা.)-এর যুগে ধীরে ও অলক্ষ্যে সামাজিক রূপান্তরের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিলো; ফলে যে বৈশিষ্ট্যগুলো ছিল খিলাফাতে রাশিদার প্রাণশক্তি, সেগুলোতে ধীরে ধীরে পরিবর্তন সাধিত হয়। সামাজিক রূপান্তরের এই বিষয়টি খালীফা 'উসমান (রা.)-এর হত্যাকাণ্ডের মত ঘটনা সংঘটনের ক্ষেত্রে পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। তাই আমরা এখানে সেই আমলের সামাজিক রূপান্তরের প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করব।

ইসলামী বিজয়াভিযানের ফলে সামাজিক সংগঠনের উপাদানে একটি বড় ধরনের পরিবর্তন সাধিত হয়। বিশাল ভূখণ্ডের বিপুল জনগোষ্ঠীর ভাষা, সংস্কৃতি, আচার-আচরণ, চিন্তা-বিশ্বাস, সাহিত্য ও ইমারত শিল্পসহ ইত্যাকার নানাবিধ উপাদানের সমন্বয়ে অভূতপূর্ব এক মিশ্রণের সৃষ্টি হয়। শুধু তাই নয় বড় বড় শহরগুলোর জনমিতিতে অতি দ্রুত পরিবর্তন সাধিত হয়; কূফা, বাসরা বা সিরিয়া হতে বড় বড় সেনাবাহিনী অভিযানে বের হত; কিন্তু সেনাবাহিনীর একাংশ যুদ্ধে নিহত হওয়ায় প্রেরণকারী শহরে জনসংখ্যা কমে যেত, পরক্ষণে জনসংখ্যা আবার বেড়ে যেত যখন সেনাবাহিনী বিপুল সংখ্যক বন্দী নিয়ে শহরে প্রবেশ করত। অনেক সময় জনসংখ্যা বৃদ্ধির বিপরীতে জনগণের নৈতিক গুণাবলীতে ঘাটতি লক্ষ্য করা যেত; কারণ যুদ্ধে নিহত জনগোষ্ঠীর বিপরীতে বিজিত অঞ্চল হতে আনীত জনসংখ্যা স্বাভাবিকভাবেই যোগ্যতা ও গুণাবলীতে শহীদ যোদ্ধা ও ইসলামী রাষ্ট্রের মূল নাগরিকের সমপর্যায়ের হত না। তদুপরি বিজিত অঞ্চলে বসবাসকারী আরবরা প্রধানত মূল আরব তথা হিজাযের অধিবাসী না হওয়ায় তাদেরও ইসলামী প্রশিক্ষণ যথাযথ ছিল না।

১. নৈতিকতার মানদণ্ডে জনসংখ্যার শ্রেণিকরণ: 'উসমান (রা.)-এর আমলে খিলাফাতের নাগরিকদের নৈতিকতাভিত্তিক শ্রেণিকরণ করলে আমরা তাদেরকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করতে পারব:

ক. সাহাবায়ে কিরাম: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগ যতই দূরবর্তী হচ্ছিল সাহাবায়ে কিরামের সংখ্যা ততই হ্রাস পাচ্ছিল। তবুও 'উসমান (রা.)-এর আমলে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সাহাবী বেঁচে ছিলেন। তবে পূর্ববর্তী দুই খালীফার সময়ের ন্যায় তাঁরা মাদীনায় কেন্দ্রীভূত ছিলেন না; অনেক সাহাবী

ইতোমধ্যে মারা গেছেন, অনেকে যুদ্ধের ময়দানে শহীদ হয়েছেন, বাকি যাঁরা ছিলেন তাঁরাও বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলেন।

খ. বিজিত অঞ্চলের বাসিন্দা: নববিজিত অঞ্চলে স্থানীয়রা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। কারণ বিজয়ী যোদ্ধাদের বেশির ভাগ তাদের মূল শহরে ফেরত যেতেন। প্রশাসনিক প্রয়োজনে খুব কম সংখ্যক বিজয়ী সৈনিক বিজিত শহরে অবস্থান করতেন। ফলে ওইসব শহরের আদি বাসিন্দারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ হতেন। তবে এটা সত্য যে, বিজিত অঞ্চলের জনগণের ক্ষুদ্র একটি অংশ নিজেদের শহর ত্যাগ করে খিলাফাতের অন্য কোন শহর বা রাজধানীতে স্থানান্তরিত হতেন। এদের কেউ কেউ তাদের মনিবের সাথে হিজরাত করতেন, কেউবা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে নিজ শহর ত্যাগ করে বড় বড় শহরে স্থানান্তরিত হতেন। পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে যে এই শ্রেণির লোকেরা খুব সহজেই ফিতনাবাজদের শিকারে পরিণত হয়েছে; দুষ্কৃতিকারীরা নানাভাবে এদেরকে খালীফার বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছে। কারণ এদের সাথে কুফ্‌রীর বন্ধন ছেদের মেয়াদ খুব বেশি দিন হয়নি এবং তারা দীর্ঘ সময় ইসলামে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেনি। তাছাড়া তাদের অনেকের মনে হারানো সাম্রাজ্যের প্রতি আবেগ কাজ করত যা খিলাফাতের বিরুদ্ধে ভূমিকা পালনে প্রণোদনা দিয়েছে। এই জনগোষ্ঠীর অনেকে আন্তরিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করেনি, ফলে ইসলামের ক্ষতিসাধনে তারা উৎসাহী ছিল। মোদ্দাকথা, যে ত্যাগ ও কুরবানীর ভিত্তির ওপর ইসলামী খিলাফাতের অনুপম প্রাসাদ প্রতিষ্ঠিত সেই ভিত্তি তারা প্রদান করেনি, তাই এই ব্যবস্থার প্রতি তাদের অনেকের আন্তরিক সমর্থন ছিল না। এই শ্রেণির লোকেরা খুব সহজেই ফিতনাবাজদের আহবানে সাড়া দিয়ে ইসলামী খিলাফাতের ধ্বংসের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে।

গ. মরুচারী বেদুইন: খিলাফাতের জনগোষ্ঠীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল মরুচারী বেদুইন। কোন সন্দেহ নেই যে, এদের মাঝে অনেক খাঁটি ঈমানদার ছিলেন; তবে তাদের উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল কাফির ও মুনাফিক। যেমনটি আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

> اَلْأَعْرَابُ اَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوْا حُدُوْدَ مَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَى رَسُوْلِهِ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ
>
> কুফ্‌রী ও কপটতায় মরুবাসিগণ কঠোরতর; এবং আল্লাহ তাঁর রাসূলের প্রতি যা অবতীর্ণ করেছেন, তার সীমারেখা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার যোগ্যতা এদের অধিক। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় [আলকুরআন ৯:৯৭]।

এরা কঠোর হৃদয়ের অধিকারী, স্বভাবে নির্মম; এসব কারণে আল্লাহর সীমারেখা সম্পর্কে এরা ছিল অনবহিত।

এই মরুচারিদের একদল 'কুর্‌রা' নামে পরিচিত ছিল। শব্দটির অর্থ হল 'কুরআন পাঠে পারদর্শী'। কিন্তু মরুচারিদের বেলায় এই শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হত।

মরুচারি কুর্‌রা-এর অনেকে খারিজীদের মত নিজেদের খেয়াল-খুশি অনুযায়ী আলকুরআনের মনগড়া ব্যাখ্যা দিত। অনেকে আবার বৈরাগী ছিল; এরা যা তিলাওয়াত করত তা বুঝত না, আবার বাস্তব জীবনের সাথেও খাপ খাওয়াতে পারত না। বাহ্যিকভাবে এরা খুব দীনদারি প্রদর্শন করত, কিন্তু দীনের সমঝ ছিল খুবই কম। আলকুরআনের কতিপয় আয়াত হিফয করেই তারা বড়াই করত, মনে করত তারা বিশাল কিছু অর্জন করেছে। ফলে আলিম-উলামার কাছ থেকে এরা দূরে সরে থাকত। নিজেদের স্বল্পজ্ঞানকেই তারা যথেষ্ট মনে করত। এই অজ্ঞ কারীর দল খুব সহজেই ফিতনাবাজদের শিকারে পরিণত হয়েছিল। দুর্বৃত্তরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এদেরকে ব্যবহার করতে পেরেছিল।

ঘ. সাবেক মুরতাদ: ‘উসমান (রা.)-এর আমলের মুসলিম সমাজে এমন একদল লোক ছিল যারা আবূ বাকর (রা.)-এর আমলে মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল তথা ধর্মত্যাগ করেছিল। প্রথম খালীফা এদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করলে তাদের বেশিরভাগ তাওবা করে ইসলামে প্রত্যাবর্তন করেছিল। ‘উসমান (রা.)-এর আমলে বংশবৃদ্ধির কারণে তাদের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, তাওবার পরে মুরতাদদের কেউ কেউ একনিষ্ঠ মুসলিমে পরিণত হয়েছিল। তবে অনেকের কার্যকলাপ প্রমাণ করে যে, তাদের তাওবা ছিল লোক দেখানো। এরা বাহ্যিকভাবে ইসলাম প্রকাশ করলেও অন্তরে কুফ্‌র পোষণ করত এবং ইসলামের বিরুদ্ধে দ্বেষ ও হিংসা পোষণ করত। জাহিলী গোত্রবাদের তাড়নায় তারা ইসলামের ক্ষতিসাধনের জন্য সুযোগের অপেক্ষায় ছিল।

সাবেক মুরতাদরা আবূ বাকর (রা.) ও ‘উমার (রা.)-এর আমলেও মুসলিম সমাজের অংশ হিসেবে বসবাস করত। কিন্তু ওই আমলে তারা ইসলামের বিরুদ্ধে দুরভিসন্ধিমূলক কোন পদক্ষেপ গ্রহণের সুযোগ পায়নি। কারণ প্রথম খালীফাদ্বয় সাবেক মুরতাদদের ব্যাপারে অত্যন্ত সাবধানতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন; সাধারণত তাদেরকে রাষ্ট্রীয় কাজে নিয়োগ করা হত না। আবূ বাকর (রা.) তাঁর গভর্ণরদের উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন, শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যেন মুরতাদদের সহায়তা গ্রহণ করা না হয়। এ ব্যাপারে তিনি সেনাপতি খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ ও ‘ইয়াজ ইবনু গান্‌মকে কঠোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। আশ-শা‘বী বলেন, আবূ বাকর (রা.) তাঁর খিলাফতকালে কখনো কোন মুরতাদের কাছ থেকে সহায়তা নেননি। তাই দেখা যায়, মুরতাদদের মধ্য হতে যারা একনিষ্ঠভাবে ইসলাম চর্চা করতে শুরু করেছিল তারাও আবূ বাক্‌র (রা.)এর সাথে সাক্ষাৎ করতে সঙ্কোচবোধ করতেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, তুলাইহা ইবনু খুওয়াইলিদ ‘উমরাহ করার জন্য মাক্কা গিয়ে খালীফার সাথে সাক্ষাৎ করতে পারেননি। জীবদ্দশায় তাঁর পক্ষে আবূ বাকর (রা.)-এর সাথে আর সাক্ষাৎ করা সম্ভব হয়নি।

সাবেক মুরতাদদের এই কর্মনীতিতে কিছুটা পরিবর্তন আনা হয় 'উমার (রা.)-এর আমলে। সিরিয়া ও ইরাকের বিভিন্ন যুদ্ধে তিনি সাবেক মুরতাদদের অংশগ্রহণের অনুমতি দেন। সা'দ ইবনু আবি ওয়াক্কাস (রা.)-এর সাথে কাদিসিয়ার যুদ্ধে কিছু সংখ্যক সাবেক মুরতাদ অংশগ্রহণ করেন, যেমন, কায়স ইবনু মাকশূহ আল-মুরাদী ও 'আমর ইবনু মা'দীকারাব। তবে 'উমার (রা.) ঢালাওভাবে সাবেক মুরতাদদেরকে ইসলামী রাষ্ট্রের সেবা করার অনুমতি দেননি। একনিষ্ঠতার সাথে দীন পালনের নজির যাঁরা স্থাপন করেছিলেন কেবল তাঁদেরকেই যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। তদুপরি সাবেক মুরতাদদেরকে বড় কোন দলের সেনাপতি হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হত না। 'উমার (রা.)-এর নির্দেশ ছিল তাদের অধীনে একশত-এর অধিক যোদ্ধা যেন সমর্পণ না করা হয়। তাই আমরা দেখতে পাই সেনাপতি সা'দ ইবনু আবি ওয়াক্কাস (রা.) লাইলাতুল হারীরে কায়স ইবনু মাকশূহকে সত্তর জন সৈনিকের অধিনায়ক নিযুক্ত করেছিলেন।[৪]

সাবেক মুরতাদদের প্রতি পূর্বসূরি দু'খালীফার কর্মনীতিতে পরিবর্তন আনেন তৃতীয় খালীফা 'উসমান ইবনু 'আফ্ফান (রা.)। তাঁর ধারণা ছিল এই যে, 'ধর্মত্যাগের ঘটনার পর অনেক দিন পার হয়ে গেছে, সংশোধনের জন্য এই সময় যথেষ্ট; তাই সাবেক মুরতাদদের রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে নিয়োগ করতে কোন অসুবিধা থাকার কথা নয়।' 'উসমান (রা.) সাবেক মুরতাদেরকে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব নিয়োগ করার অনুমতি দেন; অন্য মুসলিমদের সাথে যে আচরণ করা হয় তাদের সাথে অনুরূপ আচরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়। তাঁর আশা ছিল এই পদক্ষেপ তাদের সংশোধনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। কিন্তু এই পদক্ষেপের ফল ছিল প্রত্যাশার বিপরীত। রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে সাবেক মুরতাদদের নিয়োগ তাঁদের অবাধ্যতা বাড়িয়ে দেয়। 'উসমান (রা.)-হত্যায় নেতৃত্বদানকারী দুষ্কৃতিকারীদের অনেকে মুরতাদ গোত্রভুক্ত ছিল; যেমন, সুদান ইবনু হুমরান আস-সাকূনী, কুতাইরা ইবনু ফুলান আস-সাকূনী ও হুকাইম ইবনু জাবালা আল-'আবদী।

ঙ. ইয়াহূদী ও নাসারা: জাজীরাতুল আরবের ইয়াহূদী ও নাসারাদের বেশির ভাগ পার্শ্ববর্তী প্রদেশগুলোতে যেমন বাসরা ও কূফায় স্থানান্তরিত হয়েছিল। খ্রিস্টানরা অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করত। তবে ইয়াহূদীরা চিরাচরিত নিয়মানুযায়ী আর্থিক কর্মকাণ্ড কব্জায় এনে খিলাফাতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হল। এই অধ্যায়ে আরো পরে এ বিষয়ে সবিস্তারে আলোচনা করা হবে।

২. সমাজের সাংস্কৃতিক বুনন: প্রাথমিক যুগে মুসলিমরা আরব সংস্কৃতির বাইরে অন্য কোন সংস্কৃতির মুখোমুখি হয়নি। আরবদের কৃষ্টিতে বিদ্যমান জাহিলী উপাদানগুলো

---

৪. আত-তাবারী, ৪:৩৮২।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুনির্দিষ্টভাবে পৃথক করেছেন। আরব সংস্কৃতির অনুমোদিত অংশ ইসলামের সাথে সহজে মিশে যায়। আরবের বাইরে নতুন ভূখণ্ড বিজিত হলে মুসলিমরা ব্যাপকহারে অমুসলিম সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসে। বিশেষত ইরাক বিজয়ের পর মুসলিমরা নতুন এক সংস্কৃতির মুখোমুখি হয়। ইরাক, পারস্য সাম্রাজ্যের অংশ হওয়ায় এই সংস্কৃতি ছিল অগ্নি-উপাসকদের সংস্কৃতি। এদের সাংস্কৃতিক উপাদানের কিছু অংশ ইসলাম কর্তৃক অনুমোদিত ছিল। আবার বড় একটা অংশ ছিল বর্জনীয়। ফলে গ্রহণ-বর্জনের মাপকাঠির জ্ঞান ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নববিজিত এলাকার জনগোষ্ঠীর বড় অংশ ছিল স্থানীয় পরাজিত জনগণ। বিজয়ী যোদ্ধাদের খুব কম অংশ বিজিত এলাকায় বসবাস করে। যোদ্ধাদের সাথে দীনের প্রচারক ও প্রশিক্ষকও গমন করেন বিজিত ভূমিতে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় এঁদের সংখ্যা ছিল খুবই অপ্রতুল। মূলতঃ নবদীক্ষিত মুসলিমদের প্রশিক্ষণের দায়িত্ব পালন করতেন সাহাবায়ে কিরাম, যারা নুবুওয়াতের মূল ফল্গুধারা হতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। কিন্তু 'উসমান (রা.)-এর আমলে এঁদের সংখ্যা খুব কমে গিয়েছিল, তাঁদের অনেকে যুদ্ধের ময়দানে শহীদ হয়েছেন, কেউবা বার্ধক্যজনিত কারণে মারা গেছেন। ফলে বিপুল সংখ্যক নবদীক্ষিত মুসলিমকে প্রশিক্ষণ দেওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। এই কাজে সাহাবায়ে কিরামের পদাংক অনুসরণ করে এগিয়ে আসেন তাবি'ঈগণ। কিন্তু এঁদের বড় একটি অংশ জিহাদের ময়দানে ব্যস্ত থাকতেন, ফলে তারাও সর্বোতভাবে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের কাজে নিজেদেরকে নিয়োগ করতে পারেননি, যার পরিণতিতে বিজিত এলাকায় এমন এক দল নবদীক্ষিত মুসলিমের উদ্ভব হল যারা চিন্তা-চেতনা ও মন-মগজে প্রাথমিক যুগের মুসলিমদের সমচিন্তার অধিকারী ছিল না। এরা সাবেক সভ্যতার অনেক সাংস্কৃতিক উপাদান বহন করত যা ইসলামের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না। সাংস্কৃতিক অসম মিথস্ক্রিয়ার প্রভাব দেখা যায় তৃতীয় খালীফা 'উসমান (রা.)-এর খিলাফাতের শেষাংশে; এই সময় ফিতনার উদ্গীরণ হয় এবং বিজিত অঞ্চলের বাসিন্দারা খুব সহজে ষড়যন্ত্রকারীদের ফাঁদে পা দিয়ে তাদের আহবানে সাড়া দেয়।

৩. নতুন প্রজন্ম: 'উসমান (রা.)-এর আমলে নতুন প্রজন্মের সন্তানেরা বড় হতে থাকে। শুধু তাই নয়– তারা বিভিন্ন দায়িত্বেও আসীন হয়। এই প্রজন্ম সাহাবায়ে কিরামের প্রজন্ম হতে ভিন্ন। সাহাবায়ে কিরাম সরাসরি নুবুওয়াতী আলোকে আলোকিত ছিলেন। কিন্তু পরবর্তী প্রজন্ম সেই সুযোগ পাননি। সাহাবায়ে কিরাম জানমাল কুরবানী দিয়ে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা পালন করেছেন। ইসলামী রাষ্ট্রের গুরুত্ব তাঁরা সম্যক উপলব্ধি করতে পারতেন। এই রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতি তাঁদের দরদ ছিল, আর তাই ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা, প্রতিরক্ষা ও স্থায়িত্ব বিধানে তাঁরা সদা তৎপর ছিলেন। ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতি পরবর্তী প্রজন্মের অনুরূপ অনুভূতি ছিল না। তাঁরা ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা নয়।

ফলে সাহাবায়ে কিরাম যে দরদ ও পেরেশানির সাথে খিলাফাতের স্থায়িত্ব বিধানে কাজ করেছেন নতুন প্রজন্ম তা পারেননি। এটা খুবই স্বাভাবিক, নুবুওয়াতী পরশ যাঁরা পেয়েছে তাঁদের সাথে অন্যদের তুলনা হতে পারে না।

৪. গুজব ও অপপ্রচার গ্রহণে সমাজের প্রস্তুতি: বিভিন্ন জাতি, সভ্যতা ও সংস্কৃতির মিশ্রণে গঠিত জনগোষ্ঠী এমন ছিল যে, তারা গুজব ও অপপ্রচার বিশ্বাস ও গ্রহণে মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিল। ইবনু তাইমিয়া এই বিষয়টি সুন্দরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন,

> আবূ বাকর (রা.) ও 'উমার (রা.)-এর আনুগত্য করার জন্য মুসলিমদেরকে নির্দেশ দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر। 'আমার পরবর্তী দু'জন তথা আবূ বাকর ও 'উমার এর এক্তেদা করো।' মুসলিমরা এই নির্দেশ পালন করেছিলেন; প্রথম দু'খালীফার যুগের মুসলিমরা নুবুওয়াতের যুগের নিকটবর্তী ছিলেন, ঈমানে মজবুত ছিলেন; তাঁদের নেতৃবৃন্দ দায়িত্ব পালনে তৎপর ছিলেন, ফলে রাষ্ট্রে স্থিতিশীলতা বিরাজ করেছিল, প্রশান্ত আত্মার (আন-নাফসুল মুতমাইন্নাহ) অধিকারী মানুষের আধিক্যের কারণে ফিতনা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার সুযোগই পায়নি।
>
> 'উসমান (রা.)-এর খিলাফাতের শেষার্ধে ও আলী (রা.)-এর শাসনকালে তৃতীয় শ্রেণির মানুষের সংখ্যা বেড়ে যায়, দীনদারী ও ঈমানের পাশাপাশি তাদের প্রবৃত্তি ও সন্দেহগ্রস্ততার রোগ ছিল। কতিপয় শাসকও এই রোগে আক্রান্ত ছিল; পরবর্তীতে মন্দ আমলের সাথে ভাল আমলের মিশ্রণকারী মানুষের সংখ্যা আরো বেড়ে যায় যা ফিতনা সৃষ্টি ও বিস্তারে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।[৫]

ফিতনা বিস্তারে জনগোষ্ঠির নৈতিক মানের অবনতির ভূমিকা আলী (রা.) ফুটিয়ে তুলেছেন অত্যন্ত চমৎকারভাবে। জনৈক অনুসারী 'আলী (রা.)-কে প্রশ্ন করেছিলেন, 'মুসলিমদের কি হয়েছে যে তারা আপনার ব্যাপারে মতবিরোধ করছে? কৈ? তারা তো আবূ বাকর (রা.) ও 'উমার (রা.)-এর ব্যাপারে মতভেদ করেনি।' জবাবে 'আলী (রা.) বললেন, 'আবূ বাকর (রা.) ও 'উমার (রা.) আমার মত লোকদের শাসক ছিলেন আর আমি তোমাদের মত লোকদের শাসক।'[৬] জনগণের মাঝে যে অস্থিরতা বিরাজ করছে সে সম্পর্কে আমীরুল মু'মিনীন 'উসমান (রা.) অবগত ছিলেন; তাই তিনি গভর্ণরদের উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন,

---

৫. ইবনু তাইমিয়া, মাজমূ'উল ফাতাওয়া, ২৮: ১৪৮-১৪৯।
৬. ইবনু খালদূন, আল-মুকাদ্দিমা ১৮৯।

أما بعد فإن الرعية قد طعنت في الانتشار، ونزعت إلى الشره، وأعداها علي ذلك ثلاث: دنيا مؤثرة، وأهواء مسرعة، وضغائن محمولة.

অতঃপর, জনগণ গুজবে কান দিয়েছে, লোভ-লালসার প্রতি ঝুঁকে পড়েছে, এই সংক্রমণের পেছনে তিনটি কারণ রয়েছে: প্রভাব বিস্তারকারী দুনিয়া, ধাবমান প্রবৃত্তি, বহনযোগ্য ঘৃণা ও দ্বেষ।[৭]

দুই. প্রাচুর্য ও ফিতনা সৃষ্টিতে এর প্রভাব:

প্রাথমিক যুগের মুসলিমরা অত্যন্ত ক্লেশের মাঝে জীবন যাপন করেছেন। মাদীনায় হিজরাতের পরও মুসলিমদের এই দুরবস্থা কাটেনি। খাইবারের বিজয়ের পর মুসলিমদের অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়; কিন্তু প্রাচুর্য বলতে যা বোঝায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবদ্দশায় মুসলিমরা তার দেখা পায়নি। তবে তিনি সাহাবায়ে কিরামকে এই সুসংবাদ দিয়েছিলেন যে, তাঁদের দুরবস্থা কেটে যাবে, দুনিয়ার সম্পদরাশি মুসলিমদের সামনে মেলে ধরা হবে। পাশাপাশি তিনি পার্থিব ভোগবিলাস যেন ইবাদাত, আমলে সালেহ ও দীনী দায়িত্ব পালন হতে তাদেরকে বিরত না রাখে এ বিষয়ে সাবধান করেছিলেন।

আবূ বাকর (রা.) বিজয়াভিযানের মাধ্যমে খিলাফাতের সীমানা বর্ধনের চেয়ে অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা দমনে বেশি তৎপর ছিলেন; ধর্মত্যাগী ও যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তাঁর আমলের বেশির ভাগ সময় কেটে গেছে। তদুপরি তার শাসনকাল ছিল সংক্ষিপ্ত; ফলে ইসলামী রাষ্ট্রে প্রাচুর্যের আধিক্য পরিলক্ষিত হয়নি।

'উমার (রা.)-এর আমলে পরিস্থিতি পাল্টে যেতে থাকে; তাঁর আমলে পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্যের আওতাভুক্ত বিপুল ভূখণ্ড মুসলিমদের হস্তগত হয়। প্রভূত পরিমাণ গানীমাতের সম্পদ অর্জিত হয়। তাছাড়া কৃষি ও ব্যবসাসমৃদ্ধ বিভিন্ন অঞ্চল বিজিত হওয়ায় রাষ্ট্রীয় আয়ও বিপুলভাবে বেড়ে যায়। সাধারণ জনগণের মাঝে প্রাচুর্যের ঘাটতি ছিল না। তবে 'উমার (রা.) প্রাচুর্য ও বিলাসিতার পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক-সজাগ ছিলেন। তিনি প্রাচুর্যপূর্ণ অনারব ভূমিতে বসতি স্থাপন হতে মুসলিমদেরকে বারণ করেন। পরবর্তীতে এই নিষেধাজ্ঞা তুলে দেওয়া হলেও মাদীনায় অবস্থানরত শীর্ষস্থানীয় সাহাবা, আনসার ও মুহাজিরদেরকে তিনি অনারব ভূমিতে বসতি স্থাপন করতে দেননি।

'উমার (রা.)-এর এই কর্মনীতি রাষ্ট্রের জন্য কল্যাণকর বলে প্রমাণিত হয়েছিল। সাধারণ মুসলিমদেরকে তিনি পার্থিবতার গ্রাস থেকে রক্ষা করতে পেরেছিলেন। অন্যদিকে

৭. মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহ্ইয়া আল-আন্দালুসী, আল-বায়ান ওয়াত-তামহীদ ফি মাকতালিশ শাহীদ 'উসমান (দোহা: দারুস সাকাফাহ্ ১৯৮৫), ৬৪।

শীর্ষস্থানীয় সাহাবায়ে কিরাম-যারা ছিলেন উম্মাহ্‌র প্রাণশক্তি-তাদেরকে তিনি রাজধানী মাদীনায় কেন্দ্রীভূত করে রাখতে পেরেছিলেন। ফলে সংকটময় মুহূর্তে রাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয় নাগরিকদের পরামর্শ ও সহযোগিতায় ইসলামী রাষ্ট্র উপকৃত হয়েছে।

তৃতীয় খালীফা 'উসমান (রা.) তাঁর পূর্বসূরির কর্মনীতিতে পরিবর্তন আনেন। এর অর্থ এই নয় যে, তিনি জনসাধারণকে দুনিয়াদারীতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। তিনিও পার্থিবতার কুফল সম্পর্কে জনগণকে বারবার সাবধান করেছেন। তবে তিনি সম্পদ অর্জন ও বাসস্থান নির্ধারণে জনগণের স্বাধীনতায় বাধা প্রদান করতেন না। তাঁর দৃষ্টিতে এটি ছিল জনগণের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের নামান্তর। তবে পার্থিব পঙ্কে নিমজ্জন দীনের সর্বনাশ করবে সে ব্যাপারে তিনি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন।

তিন. পূর্বসূরি খালীফাদের কর্মনীতিতে পরিবর্তন:

'উসমান (রা.) তাঁর পূববর্তী দু'খালীফা কর্তৃক অনুসৃত কোন কোন কর্মনীতিতে পরিবর্তন আনেন। এগুলোর কোনটি শরী'আহ্‌র সীমা অতিক্রমকারী ছিল না। তবুও রাষ্ট্রীয় স্থিতিশীলতার দৃষ্টিতে 'উসমান (রা.) কর্তৃক আনীত পরিবর্তনগুলো ক্ষতিকর বলে প্রমাণিত হয়েছিল। এখানে মাত্র দু'টো উদাহরণ উপস্থাপন করা হচ্ছে:

ক. শীর্ষস্থানীয় সাহাবীগণকে মাদীনা ত্যাগের অনুমতি প্রদান: দ্বিতীয় খালীফা 'উমার (রা.) কুরাইশ বংশোদ্ভূত নেতৃস্থানীয় সাহাবায়ে কিরামকে স্থায়ীভাবে মাদীনা ত্যাগের অনুমতি দিতেন না। তাঁর এই কঠোর পদক্ষেপের ব্যাপারে সমালোচনা করা হলে তিনি বললেন,

'আমি *উটের রীতি* প্রবর্তন করেছি; এই প্রাণীটি শাবক হিসেবে জীবন শুরু করে, তারপর ছানী[৮] হয়, অতঃপর রাবা'ঈ[৯] ও সাদীস[১০]-এর স্তর অতিক্রম করে তার কর্তনদাঁত গজায় অর্থাৎ সে বার্ধক্যে উপনীত হয়। বুড়ো প্রাণী ক্ষয়িষ্ণুতা ছাড়া অন্য কিছুর প্রত্যাশা করতে পারে কি? জেনে রাখো, ইসলামের কর্তনদাঁত গজিয়েছে। সাবধান! কুরাইশের কিছু লোক আল্লাহ্‌র সম্পদের সহায়তা নিতে আগ্রহী হয়ে পড়েছে। সাবধান! ইবনুল খাত্তাব জীবিত থাকতে তা হতে দেবে না। আমি হার্‌রাহ গিরিপথে দাঁড়িয়ে কুরাইশের কণ্ঠনালী ও কোমর আঁকড়ে ধরে তাদেরকে আগুনে ঝাঁপ দেওয়া হতে রক্ষা করব।'[১১]

'উমার (রা.)-এর আশঙ্কা ছিল এই যে, বিজিত অঞ্চলে শীর্ষস্থানীয় সাহাবীগণকে স্থায়ীভাবে বসবাসের অনুমতি দেওয়া হলে খিলাফাতের রাজধানী নেতৃত্বশূন্য হয়ে পড়বে

৮. যে পশুর সামনের দাঁত পড়েছে অর্থাৎ যে প্রাণী তিন বছরে পড়েছে।
৯. যে প্রাণীর সামনের দাঁতের পাশের দাঁত পড়েছে অর্থাৎ যে চার বছরে পড়েছে।
১০. যে প্রাণীর বয়স ছয় বছর হয়েছে।
১১. আত-তাবারী, ৪:৩৯৬-৯৭।

এবং সংকটময় মুহূর্তে রাষ্ট্র এঁদের ভূমিকা থেকে বঞ্চিত হবে। মুহাজিরদের কেউ উমার (রা.)-এর কাছে জিহাদে গমনের অনুমতি চাইলে তিনি বলতেন, 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণই আপনার জন্য যথেষ্ট। যুদ্ধে অংশগ্রহণের চেয়ে আপনার জন্য উত্তম হচ্ছে আপনি দুনিয়া দেখবেন না, দুনিয়াও আপনাকে দেখবে না।'[১২]

উসমান (রা.) এ বিষয়ে উদারতার পরিচয় দেন। তিনি নেতৃস্থানীয় অনেক মুহাজির সাহাবীকে মাদীনা ত্যাগ করে বিজিত অঞ্চলের শহরগুলোতে বসবাসের অনুমতি প্রদান করেন। নাগরিক অধিকারের দৃষ্টিতে 'উসমান (রা.)-এর পদক্ষেপ অধিক যুক্তিযুক্ত; রাষ্ট্রীয় সীমানার যে কোন অংশে স্থাবর সম্পত্তির মালিক হওয়া ও বসতিস্থাপন একজন নাগরিকের বৈধ অধিকার। 'উসমান (রা.) এই অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে চাননি বলেই সাহাবায়ে কিরামকে মাদীনার বাইরে স্থায়ীভাবে বসবাসের অনুমতি দিয়েছিলেন। তবে তাঁর এই পদক্ষেপ রাষ্ট্রীয় স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে ক্ষতিকর বলে প্রমাণিত হয়েছে; তাঁর আমলে অনেক সাহাবী মাদীনা ত্যাগ করে কূফা, বাসরাসহ অন্যান্য শহরগুলোতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেন। অনেকে বিপুল সম্পদের মালিক হন এবং নতুন এলাকার বাসিন্দা কর্তৃক তাঁরা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েন। ফলে শীর্ষস্থানীয় সাহাবীকেন্দ্রিক ভক্তশ্রেণির উদ্ভব হয় যারা নিজেদের ইমামকে অন্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করত। এভাবে জ্যেষ্ঠ সাহাবীগণের অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁদেরকে কেন্দ্র করে উম্মাহ্র মাঝে সূক্ষ্ম বিভক্তির সূচনা হয়। যার ফলাফল আমরা দেখতে পাই অবরোধকালে, যখন মিসরীয় বিদ্রোহীরা খালীফা হিসেবে 'আলী (রা.)-এর নাম প্রস্তাব করে, অপরদিকে বাসরার বিদ্রোহীরা আয-যুবাইর (রা.) ও কূফার বিদ্রোহীরা তালহা (রা.)-এর নাম প্রস্তাব করেছিল।[১৩] 'উসমান (রা.)-এর এই পদক্ষেপের সবচাইতে মারাত্মক ক্ষতিকর দিক ছিল এই যে, তিনি সংকটকালে রাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠ নাগরিকদের পরামর্শ ও সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন যা ফিতনার উদ্ভব ও বিস্তারে ভূমিকা পালন করেছে।

খ. গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় পদে নিকটাত্মীয়দের নিয়োগ প্রদান: প্রথম খালীফা আবূ বাকর (রা.) ও দ্বিতীয় খালীফা 'উমার (রা.) রাষ্ট্রীয় পদে নিকটাত্মীয়দের নিয়োগ দিতেন না; মৃত্যুশয্যায় 'উমার (রা.) পরবর্তী খালীফা নির্বাচনের জন্য ছয় সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেন। এই কমিটির সবাই ছিলেন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবী। ঐ সময় জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত আরো একজন সাহাবী জীবিত ছিলেন; তিনি হলেন সা'ঈদ ইবনু যায়িদ। 'উমার (রা.)-এর স্বগোত্রীয় বলে তাঁকে কমিটির অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

খালীফা হওয়ার পর 'উসমান (রা.) তাঁর পূর্বসূরি খালীফাদ্বয়ের এই কর্মনীতিতে পরিবর্তন

---

১২. প্রাগুক্ত।

১৩. আত-তাবারী, ৪:৩৪৮-৪৯; হাসান ইবরাহীম হাসান, ২৯২, ২৯৩।

আনেন; তিনি আপন গোত্রের লোকজনকে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় পদে নিয়োগ প্রদান করেন।[১৪] এই নিয়োগের মাধ্যমে তিনি ইসলামের প্রতিষ্ঠিত কোন বিধান বা রীতি লঙ্ঘন করেননি। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আপন গোত্রের লোকজনকে রাষ্ট্রীয় পদে নিয়োগ প্রদান করেছেন। তাছাড়া 'উমার (রা.) ও আবূ বাকর (রা.)-এর গোত্রে অপেক্ষাকৃত কম জনসংখ্যা ছিল; তাই তারা নিজ গোত্রের লোকদেরকে সরকারী পদে নিয়োগ প্রদান এড়াতে পেরেছেন। 'উসমান (রা.) মনে করতেন আত্মীয়স্বজনকে রাষ্ট্রীয় পদে নিয়োগ প্রদান ইসলাম ঘোষিত আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করারই অংশ।

নিকটাত্মীয়দের সরকারী পদে নিয়োগ প্রদানে ইসলামের কোন বিধান লঙ্ঘিত না হলেও রাষ্ট্রীয় স্থিতিশীলতা রক্ষার বিবেচনায় এই পদক্ষেপ ইতিবাচক প্রমাণিত হয়নি। ফিতনাবাজরা এটিকে বিতর্কের বিষয় বানিয়ে জনসাধারণকে উত্তেজিত করতে সক্ষম হয়েছিল। তাছাড়া গভর্ণরদের ব্যর্থতা ও অদক্ষতার দায়ভারও আত্মীয়তার কারণে খালীফার ওপর চাপানো হয়েছে।

বস্তুতঃ 'উসমান (রা.) কর্তৃক গৃহীত কিছু পদক্ষেপ শারী'আহ-এর দৃষ্টিতে গর্হিত না হলেও রাষ্ট্র পরিচালনার দৃষ্টিতে ক্ষতিকর বলে প্রমাণিত হয়েছে।

চার. 'উমার (রা.)-এর পর 'উসমান (রা.)-এর আগমন:

'উমার (রা.)-এর মত কঠোর শাসকের পর 'উসমান (রা.)-এর মত কোমল শাসকের আগমন ফিতনাবাজদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহায়ক হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। 'উমার (রা.) অত্যন্ত কঠোর খালীফা ছিলেন; তিনি অধীনস্থদেরকে তাঁদের কাজের জন্য জবাবদিহি করতেন; শুধু তাই নয়, ততোধিক কড়াকড়ির সাথে তিনি আত্মসমালোচনাও করতেন। পক্ষান্তরে 'উসমান (রা.) ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু ও উদার প্রকৃতির; তিনি সাধারণত তেমন কড়াকড়ি করতেন না। এই কারণে তাঁর শাসনকালের শুরুর দিকে তিনি জনগণের প্রিয় শাসক ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে ফিতনাবাজরা তাঁর এই ঔদার্যের সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন অপপ্রচার ছড়িয়ে জনগণকে তাঁর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তোলে।

বিদ্রোহীদের তৎপরতা রোধেও 'উসমান (রা.) অতিরিক্ত উদারতার পরিচয় দেন। শীর্ষস্থানীয় সাহাবীগণ তাঁকে বারংবার শক্তি প্রয়োগে বিদ্রোহ দমনের পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি পৌনঃপুনিক সহনশীলতার নীতি অবলম্বন করেছেন: 'না, সাধ্যানুযায়ী সংযমের পরিচয় দিয়ে আমি বরং তাদেরকে ক্ষমা করে দেব। শাস্তি পাওয়ার উপযোগী অপরাধ না করলে বা প্রকাশ্যে কুফ্‌র না করলে আমি কারো ওপর হদ প্রয়োগ

---

১৪ 'উসমান (রা)-এর দুধভাই আবদুল্লাহ ইবনু সা'দ ইবনু আবি সারহ মিসরের গভর্নর নিযুক্ত হয়েছিলেন, খালীফার বৈপিত্রেয় ভাই আল-ওয়ালীদ ইবনু 'উকবা কূফার গভর্নর ছিলেন এবং তাঁর মামাতো ভাই সা'ঈদ ইবনুল 'আস বাসরার গভর্নর ছিলেন।

করব না।' খালীফার অত্যধিক সহনশীলতা শেষ পর্যন্ত এমন বিপর্যয় ডেকে আনল যে তাঁর হত্যার মাধ্যমেও এর পরিসমাপ্তি ঘটল না।

পাঁচ. বিজয়াভিযানে স্থবিরতা:

'উসমান (রা.)-এর আমলের শেষার্ধে চতুর্দিকে হঠাৎ করেই বিজয়াভিযান থেমে যায়। পারস্য ও সিরিয়া সীমান্তে এবং আফ্রিকায়ও দুরতিক্রম্য প্রাকৃতিক ও মানবিক প্রতিবন্ধকতার কারণে বিজয়াভিযান থেমে যায়। স্বাভাবিভাবেই গানীমাতের সরবরাহও বন্ধ হয়ে যায়। বিস্মিত বেদুইনরা পরস্পর বলাবলি করতে থাকে: 'আগের যুগের সেই গানীমাত কোথায় গেল? বিজিত ভূমি কোথায়? আমাদের প্রদেয় সুযোগ-সুবিধা কোথায় গেল?' খালীফার বিরুদ্ধে অপপ্রচার ছড়ানো হল এই বলে যে, তিনি মুসলিমদের জন্য ওয়াকফকৃত ভূমি আত্মসাৎ করে পছন্দের লোকদেরকে বরাদ্দ দিয়েছেন। এই অপপ্রচারে বেদুইনরা বেশি প্রভাবিত হয়; এদের বড় একটি অংশ ছিল বেকার; খাওয়া-দাওয়া ও নিদ্রাগমন ছাড়া যাদের কোন কাজ ছিল না। আরেক দল ছিল অপরাজনীতিতে লিপ্ত; এরাই খালীফার বিরুদ্ধে অপপ্রচার ছড়ানোর কাজে বেশি ব্যস্ত ছিল। বাসরার গভর্ণর আবদুল্লাহ ইবনু 'আমির বিজয়াভিযানের স্থবিরতাজনিত সমস্যা উপলব্ধি করতে পেরে খালীফাকে বলেছিলেন, 'এদেরকে যুদ্ধে প্রেরণ করে ব্যস্ত রাখুন; যাতে সবাই নিজ নিজ কাজে ব্যতিব্যস্ত থাকে এবং আপনার ব্যাপারে নাক গলানোর সুযোগ না পায়।'[১৫]

বিজয়াভিযানের স্থবিরতার প্রেক্ষাপটে যুদ্ধব্যস্ততায় অভ্যস্ত একদল অবুঝ ও বেকার লোক তাদের অফুরান অবসরকে ফিতনা ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টিতে ব্যয় করল।

ছয়. জাহিলী গোত্রবাদ:

ইসলামে গোত্রবাদের কোন স্থান নেই। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিবিড় সাহচর্যে মুহাজির, আনসার, কুরাইশ গোত্রীয় ও হিজাযবাসী সাহাবায়ে কিরাম পূর্ণরূপে গোত্রবাদমুক্ত চিন্তা-চেতনা ও ধ্যান-ধারণার অধিকারী ছিলেন। তবে বানূ বাক্‌র ইবনু ওয়াইল, বানূ আবদিল কায়স, বানূ রাবী'আহ, বানূ আয্‌দ, কিন্দা ও কুযা'আসহ অন্যান্য গোত্রের লোকদের মন-মগজ ও চিন্তা-চেতনা হতে গোত্রবাদী ভাবনা সম্পূর্ণরূপে দূর করা সম্ভব হয়নি। খিলাফাতের সম্প্রসারণে এই গোত্রগুলো বিপুল ভূমিকা পালন করেছিল। ফলে তাদের মনে এক ধরনের শ্রেষ্ঠত্বের মনোভাব সৃষ্টি হয়েছিল। অবশ্য তাঁদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ অগ্রবর্তী মুসলিমদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতেন। ফলে এই গোত্রগুলোর অহংবোধ ক্ষতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করেনি। তবে 'উসমান (রা.)-এর শাসনামলের শেষের দিকে সাহাবায়ে কিরামের সংখ্যা কমে এলে

---

১৫. আত-তাবারী, ৪:৩৩৩।

এদের মাঝে পুরনো যুগের জাহিলী গোত্রবাদ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে; কুরাইশী মুহাজির ও আনসারের নেতৃত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব মেনে না নেওয়ার মানসিকতা সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন প্রদেশের গভর্ণরদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করা হয়, নানা ধরনের অবাধ্যতামূলক পদক্ষেপের মাধ্যমে তারা আনুগত্য বর্জনের ইঙ্গিত প্রদান করে। এই সংবাদ মাদীনায় পৌঁছলে খালীফা শীর্ষস্থানীয় সাহাবায়ে কিরামের পরামর্শে বিভিন্ন প্রদেশে তদন্ত দল প্রেরণ করেন। তদন্ত দল সরেজমিন পরিদর্শনে দেখতে পায় যে, জনসাধারণ সুখে-শান্তিতে বসবাস করছে, খালীফা বা প্রশাসকদের বিরুদ্ধে তাদের কোন অভিযোগ নেই। কুচক্রী একটি মহল খিলাফাত ধ্বংস করার মানসে অপপ্রচারে লিপ্ত রয়েছে।

সাত. الورع -এর ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে জনগণকে উত্তেজিত করা:

الورع শারী'আহ-এর দৃষ্টিতে একটি পছন্দনীয় বিষয়। আর তা হল পাপে লিপ্ত হওয়ার ভয়ে কিছু বৈধ বিষয় হতে নিজেকে বিরত রাখা। ব্যক্তিগত পর্যায়ে الورع -এর চর্চা প্রশংসনীয়; অন্যদেরকে الورع অবলম্বনের জন্য উৎসাহও দেওয়া যেতে পারে। তবে কেউ এটি পালন না করলে কিছুতেই তার নিন্দা করা যায় না। কারণ এটি সম্পূর্ণ ঐচ্ছিক বিষয়। 'উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে অপপ্রচারের একটি বড় কারণ ছিল الورع সম্পর্কে ভুল ধারণা। কিছু লোক তাকওয়া পরহেজগারীকে এই পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল যে, তারা হালাল বিষয়কে হারাম বানিয়ে ফেলেছিল। অন্যদের কাছ থেকেও তারা অনুরূপ কাজ প্রত্যাশা করত। শুধু তাই নয়, হালালকে হারাম বানানোর ক্ষেত্রে তাদের অনুসরণ না করলে তারা ঐ ব্যক্তির/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাত। 'উসমান (রা.) কিছু বৈধ কাজ করেছিলেন যা পূর্ববর্তী খালীফাগণ করেননি। যেমন, তিনি আত্মীয়-স্বজনকে রাষ্ট্রীয় পদে নিয়োগ দিয়েছিলেন। এটি ছিল একটি বৈধ কাজ, পূর্ববর্তী খালীফাগণ অতিরিক্ত সতর্কতার খাতিরে এই কর্মনীতি গ্রহণ করেননি। তথাকথিত পরহেজগার লোকেরা 'উসমান (রা.)-এর এই বৈধ কাজকে অবৈধ হিসেবে প্রচার করে জনসাধারণকে খালীফার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তোলে। আজ অবধি তাকওয়া-পরহেজগারীর নামে ক্ষতিকর বাড়াবাড়ি মুসলিম সমাজে প্রচলিত রয়েছে।

আট. পরাজিত জাতি ও শাস্তিপ্রাপ্তদের ষড়যন্ত্র:

খালীফাগণের যুগে দাওয়াত, বিজয়াভিযান ও সন্ধির মাধ্যমে বিপুল ভূখণ্ড খিলাফাতের অন্তর্ভুক্ত হয়। ফলে ইয়াহুদী, খ্রিস্টান ও পারসিকসহ বহু জাতি পদানত হয়। বিজিত জাতির বিপুল সংখ্যক মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, এঁদের অনেকে খাঁটি মুসলিমে পরিণত হন। তবে অনেকে বাহ্যিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করলেও চিন্তা-চেতনা ও মন-মগজে পূর্ববর্তী ধ্যান-ধারণা পোষণ করত এবং মনে মনে ইসলামী রাষ্ট্রের অমঙ্গল কামনা করত। বিজিত অঞ্চলসমূহের অনেক অধিবাসী স্বধর্মে

বহাল ছিল। এরাও ইসলামী রাষ্ট্রের অকল্যাণ কামনা করত। এদের সাথে যুক্ত হয়েছিল মুসলিম সমাজেরই একটি অংশ যারা খালীফা বা তাঁর গভর্ণর কর্তৃক বিভিন্ন অপরাধের জন্য শাস্তিপ্রাপ্ত হয়েছিল। এরা ছিল বোধ-বুদ্ধিহীন গোঁয়ারের দল; ইতিহাসের গ্রন্থগুলোতে বিভিন্ন নেতিবাচক অভিধায় এদের পরিচয় জ্ঞাপন করা হয়েছে: উচ্ছৃঙ্খল শহুরে (الغوغاء من أهل الأمصار), আরবের নেকড়ে (ذؤبان العرب), জন-আবর্জনা (حثالة الناس), অকল্যাণ সাধনে একতাবদ্ধ (متفقون على الشر), গোত্রের ইতর (أراذل من أوباش القبائل), রূঢ় (أهل جفاء), বর্বর (همج), নিম্নশ্রেণীর ইতর (سفلة الأطراف الأراذل), শাইতানের অস্ত্র (آلة الشيطان) ইত্যাদি। হিংসাপরায়ণ পরাজিত জাতিগোষ্ঠী ও প্রতিশোধস্পৃহ শাস্তিপ্রাপ্ত লোকেরা খিলাফাতের অকল্যাণ কামনা করত। যখনই তারা সুযোগ পেল ফিতনার আগুন জ্বালানোর তখনই তারা কাজে নেমে গেল।

নয়. খালীফার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে জনগণকে উত্তেজিত করার সুনিপুণ পরিকল্পনা:

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সমাজের একদল লোক গুজব ও অপপ্রচার বিশ্বাস করার জন্য প্রস্তুত ছিল। সেই অপপ্রচারের অস্ত্র ব্যবহার করেই খালীফার বিরুদ্ধে অসন্তোষ সৃষ্টি করে জনগণকে উত্তেজিত করে তোলে বিদ্রোহীরা। অপপ্রচারের কৌশল হিসেবে তারা অত্যন্ত সুন্দর বর্মের আড়ালে নিজেদের অসৎ উদ্দেশ্য আড়াল করে; 'সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে বারণ' করার কথা বলে তারা জনসমর্থন আদায় করার চেষ্টা করে। প্রাদেশিক গভর্ণরগণ সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করছেন না বলে তাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার ছড়ানো হয়, রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে খালীফাও অভিযোগ হতে মুক্ত হতে পারেন না। অপপ্রচারের কৌশল হিসেবে বিদ্রোহীরা যে অভিযোগগুলো উত্থাপন করেছিল সেগুলো সংক্ষেপে নিম্নোক্ত পয়েন্টে প্রকাশ করা যায়:

১. খালীফা হওয়ার পূর্বে উসমান (রা.)-এর কিছু ব্যক্তিগত পদক্ষেপ (যেমন, কয়েকটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করা);
২. আর্থিক ব্যবস্থাপনা: রাষ্ট্রীয় ভাতা, চারণভূমি;
৩. প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা: নিকটাত্মীয়দের সরকারী পদে নিয়োগ প্রদান;
৪. শার'ঈ বিষয়ে ইজতিহাদ: (মিনায় পূর্ণরূপে সালাত আদায়, আলকুরআন সংকলন, মাসজিদে নববীর সম্প্রসারণ);
৫. কয়েকজন সাহাবীর সাথে তাঁর আচরণ: ইবনু মাস'ঊদ (রা.), আবূ যার (রা.) ও 'আম্মার (রা.)।

এই অভিযোগগুলোর প্রতিটি সম্পর্কে আমরা স্বতন্ত্র অধ্যায়ে আলোচনা করেছি এবং অভিযোগগুলোর অসারতাও প্রমাণ করা হয়েছে।

দশ. প্ররোচক উপায়-উপকরণ ও কৌশল প্রয়োগঃ

জনগণকে উত্তেজিত করার জন্য খালীফা ও তাঁর গভর্ণরদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করেই ক্ষান্ত হয়নি বিদ্রোহীরা; বরং তারা নিত্য-নতুন কৌশল ও উপায়-উপকরণ প্রয়োগ করে জনগণের মনে প্ররোচনা সৃষ্টি করত। যেমন, তাঁরা সাহাবায়ে কিরামের নামে মিথ্যা চিঠি লিখে জনসাধারণের মাঝে ছড়িয়ে দিত; 'আয়িশা (রা.), আলী (রা.), তালহা (রা.) ও আয-যুবাইরের (রা.) নাম ব্যবহার করে অনেক জাল চিঠি ছড়ানো হয়েছে। এগুলোর মূল বক্তব্য ছিল এই যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আত্মীয় হওয়ার সুবাদে 'আলী (রা.)-ই খিলাফাতের অধিক হকদার। পরবর্তী আলোচনায় আমরা দেখতে পাব কূফা, বাসরা ও মিসর এই তিনটি শহরের প্রত্যেকটি হতে চারটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে বিদ্রোহীরা মাদীনায় উপস্থিত হয়েছিল। সুনিপুণ পরিকল্পনা ব্যতীত এটা সম্ভব ছিল না। তারা মাদীনাবাসীকে এই ধারণা দিয়েছিল যে, সাহাবায়ে কিরামের আহবানেই তারা রাজধানী অবরোধ করতে এসেছে।

উপর্যুক্ত কৌশলের পাশাপাশি কিছু শ্লোগান ব্যবহার করত, যেমন, 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি, 'অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই' 'সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ হতে বারণই আমাদের লক্ষ্য'। কূটকৌশলের অংশ হিসেবে তারা গভর্ণরদের পদত্যাগ দাবি করতে থাকে। তারা যখন দেখল খালীফা তাদের দাবি পূরণ করে একের পর এক গভর্ণর অপসারণ করছেন এবং এই দাবির মাধ্যমে ফিতনা সৃষ্টি করা যাচ্ছে না তখন তারা খালীফার পদত্যাগ দাবি করে বসল।

এগার. 'আবদুল্লাহ ইবনু সাবা'র ষড়যন্ত্রঃ

উপরের আলোচনায় ষড়যন্ত্রকারী, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীসহ বিভিন্ন নেতিবাচক শব্দ ব্যবহার করে একটি গোষ্ঠী বা গ্রুপকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। সেই গোষ্ঠীর মূল হোতা বা মেন্টরের নাম হল আবদুল্লাহ ইবনু সাবা। তৃতীয় খালীফা 'উসমান (রা.)-এর শাসনামলের শেষার্ধে সমগ্র খিলাফাতে গোপন আন্দোলনের মাধ্যমে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করার মূল কারিগর ছিল এই লোকটি। আবদুল্লাহ ইবনু সাবা ছিল ইয়ামানী ইয়াহুদী। 'উমার (রা.)-এর আমলে সে বাহ্যিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করে। তবে ইসলামী রাষ্ট্রের ধ্বংস সাধনই ছিল তার একমাত্র ধ্যানজ্ঞান। ফিতনা ও অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির একমাত্র অনুঘটক সে ছিল না; সমাজে ফিতনাপ্রবণ কিছু মানুষ ছিল এবং অস্থিতিশীলতার প্রেক্ষাপট প্রস্তুত হয়েছিল, সুচতুর 'আবদুল্লাহ ইবনু সাবা সেই পরিবেশকে কাজে লাগিয়ে আন্দোলনের নামে এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল যে তাতে খালীফাকে প্রাণ দিতে হয়েছিল।

মুসলিম সমাজে প্রচলিত কিছু ধ্যানধারণা মনগড়া ব্যাখ্যার মাধ্যমে সাধারণের সামনে এমনভাবে সে উপস্থাপন করত যে লোকজন বিভ্রান্ত হত। এই লক্ষ্যে সে কিছু দর্শন

প্রচার করে; একটি ছিল পুনরাগমন তত্ত্ব (مذهب الرجعة) যেটি সে নিম্নরূপে ব্যাখ্যা করেছিল: 'মুসলিম বিশ্বাস কত অদ্ভুত, তাই না! তারা বিশ্বাস করে খ্রিস্টানদের নাবী 'ঈসা (আ) আবার দুনিয়ায় আসবেন, অথচ তাদের নিজেদের নাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুনিয়ায় আবার আসবেন না। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ "যিনি তোমার জন্য কুরআনকে করেছেন বিধান তিনি তোমাকে অবশ্যই ফিরিয়ে আনবেন জন্মভূমিতে [আলকুরআন ২৮:৮৫]।" কুরআনের এই আয়াত দ্বারা বুঝা যায়, মুহাম্মাদই (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবার দুনিয়ায় ফিরে আসবেন।'[১৬] মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য ইবনু সাবা কর্তৃক উদ্ভাবিত আরেকটি কৌশল ছিল অছি তত্ত্ব [نظرية الوصي]; এই দর্শনের সারকথা হল: 'প্রত্যেক নাবীর একজন অছি (প্রতিনিধি) থাকে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অছি হলেন আলী (রা.)।' সে আরো বলল, 'মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হলেন সর্বশেষ নাবী আর 'আলী (রা.) সর্বশেষ অছি।'[১৭] এই তত্ত্বের সমর্থনে সে আরো একটি দর্শন হাজির করল, এটি হচ্ছে খোদায়ী অধিকার তত্ত্ব: 'আলী (রা.)-ই হলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরবর্তী খালীফা। আল্লাহ্‌র কাছ থেকে তিনি এই অধিকার লাভ করেছেন। স্বাভাবিকভাবেই প্রথম তিন খালীফা আবূ বাকর (রা.), 'উমার (রা.) ও 'উসমান (রা.) অবৈধ ক্ষমতা দখলকারী।'[১৮]

এভাবে মুসলিম সমাজে প্রতিষ্ঠিত ধ্যানধারণার বিরুদ্ধে সুকৌশলে অপপ্রচার চালিয়ে সে একদল সমর্থক যোগাড় করল। কিছু সরলমনা মুসলিমও তার প্রচারণায় বিভ্রান্ত হয়ে দলে যোগ দিল। এরপর সে আসল উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন তথা খালীফাকে অপসারণের মাধ্যমে খিলাফাত ব্যবস্থাকে অস্থিতিশীল করার লক্ষ্যে তৎপর হল। এবার সে বলল, 'তার চাইতে বড় যালিম আর কে হতে পারে যে রাসূলের অছিকে তাঁর প্রাপ্য হতে বঞ্চিত করে? আলী (রা.)-ই খালীফা হওয়ার জন্য অধিক উপযুক্ত। তোমরা এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে কাজে নেমে পড়। তবে প্রথমেই খালীফার অপসারণ দাবি করা যাবে না। প্রথমে গভর্ণরদের বিভিন্ন কাজের সমালোচনা করে তাদের অপসারণ দাবি করতে হবে। 'সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে বারণ'-এই শ্লোগানের ছদ্মাবরণে তোমরা জনগণকে আকৃষ্ট করা ও দলে ভেড়ানোর জন্য কাজ করবে।'[১৯]

'আবদুল্লাহ ইবনু সাবা– যাকে আরব ঐতিহাসিকরা 'ইবনুস সাওদা' বলে অভিহিত করেছেন– খিলাফাতের আওতাধীন বিভিন্ন শহরে গোপন প্রচারক প্রেরণ করে কিছু সমর্থক যোগাড় করতে সক্ষম হল। তারপর এদেরকে গোপন আন্দোলনের নির্দেশনা

১৬. আত-তাবারী, ৪:৩৪০; হাসান ইবরাহীম হাসান, ২৯৪।
১৭. আত-তাবারী, ৪:৩৪০; হাসান ইবরাহীম হাসান, ২৯৪।
১৮. আত-তাবারী, ৪:৩৪১; হাসান ইবরাহীম হাসান, ২৯৫।
১৯. প্রাগুক্ত।

সম্বলিত পত্র প্রেরণ করল। সবার প্রতি একই নির্দেশ ছিল যে, তারা নিজেদের 'সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ হতে বারণ'-এই শ্লোগানের নিশানবরদার হিসেবে প্রচার চালাবে। কোন্ শহরের গভর্ণরের বিরুদ্ধে কোন্ অভিযোগ উত্থাপন করতে হবে ইবনু সাবা তাও জানিয়ে দিল।

ইবনু সাবা'র কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা করলে বুঝা যায়, তার প্রথম লক্ষ্য ছিল মুসলিম উম্মাহ্‌র অখণ্ড ঐক্যে ফাটল সৃষ্টি করা। এই লক্ষ্যে সে 'আলী (রা.)-কে অধিকারবঞ্চিত ও 'উসমান (রা.)-কে অধিকার হরণকারী হিসেবে প্রচার করতে লাগল। তারপর বিভিন্ন শহরের বিশেষত কূফার বাসিন্দাদেরকে গভর্ণর ও খালীফার বিরুদ্ধে উস্কিয়ে দিল। তার প্রচারণার লক্ষ্য অর্জনের জন্য সে টার্গেট দল নির্ধারণ করল। পর্যবেক্ষণে সে দেখতে পেল গভর্ণরের বিরুদ্ধে অসন্তুষ্ট একদল লোক রয়েছে। দুষ্টপ্রকৃতির এই লোকগুলো বিভিন্ন সময় তাদের অপরাধের কারণে শাস্তিপ্রাপ্ত হয়েছে। এদেরকে সে দলে ভেড়াল। গভর্ণরের সামান্যতম কোন ত্রুটি দেখতে পেলে এরা হুলস্থুল কাণ্ড বাঁধিয়ে দিত। বেদুইনদের মাঝে কুর্‌রা নামে এক শ্রেণির লোক ছিল। ধর্মীয় বিষয়ে এদেরকে উত্তেজিত করা সহজ ছিল। খালীফার বিরুদ্ধে নানা অপপ্রচার চালিয়ে এদেরকে 'আবদুল্লাহ ইবনু সাবা নিজের দলভুক্ত করল।

বিভিন্ন শহরে কিছুদিন গোপন কর্মকাণ্ড চালানোর পর সাবাঈ গোষ্ঠী বেশ কিছু সমর্থক যোগাড় করতে সক্ষম হল। নানা পন্থায় অপপ্রচার চালিয়ে এরা বিরাট এক জনগোষ্ঠীর মনে এই ধারণা দিতে সক্ষম হল যে, রাষ্ট্রের অবস্থা যারপরনেই খারাপ। জনমনে অস্থিরতার এই বিষয়টি 'উসমান (রা.) আঁচ করতে পেরেছিলেন। তাই তিনি গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোতে অনুসন্ধান দল প্রেরণ করেন। অনুসন্ধান দল ফিরে এসে খালীফাকে জানান যে, অস্থিরতার কোন কারণ নেই, জনগণ সুখে শান্তিতে আছে। তবে কিছু স্বার্থান্বেষী মহল পরিকল্পিতভাবে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির পাঁয়তারা চালাচ্ছে। 'উসমান (রা.) সিদ্ধান্ত নিলেন, ফিতনার ঘূর্ণায়মান চাকা তিনি বন্ধ করার চেষ্টা করবেন। ঐ চাকা তিনি নিজে ঘোরাবেন না।[২০]

কূফায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জনের পর ইবনু সাবা মিসরে পাড়ি জমায়। সেখানে সে খালীফা ও তাঁর গভর্ণরদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালায়। বিশিষ্ট সাহাবীদের নামে সে বেশকিছু জাল চিঠি প্রচার করে খালীফার বিরুদ্ধে জনগণকে উত্তেজিত করে। পরবর্তীতে বিদ্রোহীরা মাদীনায় এলে সাহাবীগণ কোন পত্র লেখার কথা অস্বীকার করেন। ফলে বিদ্রোহীদের অনেকে তাদের কর্মকাণ্ডের ভিত্তি নিয়ে দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ে। সে যাই হোক ইবনু সাবা তার ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নে সফল হয় এবং খালীফাকে হত্যা করতে সক্ষম হয়।

---

২০. আত-তাবারী, ৫:৩৫০।

যে পরিস্থিতিতে 'উসমান (রা.) শাহাদাত বরণ করেন সেটি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার মত কোন পরিস্থিতি ছিল না। জনগণের মৌলিক প্রয়োজন তথা- খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের প্রয়োজন পূরণে রাষ্ট্র সক্ষম ছিল। গভর্ণরদের বিরুদ্ধে বড় ধরনের কোন অনিয়মের অভিযোগ ছিল না। কারো বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উত্থাপিত হলে খালীফা তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। 'উসমান (রা.) কোন প্রকার অযোগ্যতা বা অসততা বা শারী'আহ লঙ্ঘনের কোন দৃষ্টান্ত পেশ করেননি যে তাকে অপসারণের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। এক শ্রেণির দুষ্টপ্রকৃতির শাস্তিপ্রাপ্ত লোকের মাঝে অসন্তোষ বিরাজ করছিল। দুষ্ট লোকেরা সুশাসন পছন্দ করবে না এটাই স্বাভাবিক। তাই তাদের অসন্তোষ ব্যাপক জনগোষ্ঠীর মাঝে সংক্রমিত হয়নি। খালীফার বিরুদ্ধে কিছু অপপ্রচার ছিল। আবদুল্লাহ ইবনু সাবা বিচ্ছিন্ন বিষয়গুলোকে একসূত্রে গেঁথে পরিকল্পিতভাবে বিদ্রোহাত্মক পরিবেশ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। 'উসমান (রা.)-এর আমলে সৃষ্ট অস্থিতিশীলতা ও বিদ্রোহের নেপথ্যে আবদুল্লাহ ইবনু সাবা'র যে ভূমিকা ছিল তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

বারঃ বিদ্রোহ দমনে অস্ত্রধারণ করতে খালীফার অস্বীকৃতিঃ

অনেক ইতিহাস বিশ্লেষক মনে করেন শক্তি প্রয়োগে বিদ্রোহ দমন করা হলে পরিস্থিতি ভিন্ন হতে পারত। কিন্তু খালীফা বারবার অস্ত্রধারণে অসম্মতি জ্ঞাপন করেছেন। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদেরকে তিনি মুসলিম মনে করতেন। তাই মৃত্যুদণ্ডোপযোগী কোন অপরাধ ব্যতীত তাদের ওপর শক্তি প্রয়োগ করতে সম্মত হননি। তাছাড়া নিজের জান বাঁচাতে কোন মুসলিমের রক্ত ঝরাতে তিনি রাজি ছিলেন না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
ষড়যন্ত্রের সূচনা ও বিস্তার

প্রতিহিংসাপরায়ণ ও ষড়যন্ত্রে পটু একদল লোক কূফার গভর্ণরী হতে আল-ওয়ালীদ ইবনু 'উকবাকে অপসারণ করতে সক্ষম হল। নতুন গভর্ণর হিসেবে 'উসমান (রা.) নিয়োগ দিলেন সা'ঈদ ইবনুল 'আসকে। তিনি বিদ্রোহপ্রিয় কূফার পরিস্থিতি সম্পর্ক সজাগ ও সাবধান ছিলেন। শহরে পৌঁছেই তিনি মাসজিদে প্রবেশ করে মিম্বারে আরোহন করলেন আর জনমণ্ডলীর উদ্দেশে নিম্নরূপ ভাষণ দিলেন:

والله لقد بعثت إليكم وإني لكاره، ولكني عندما أمرني عثمان، لم أجد بدا من التنفيذ، ألا وإن الفتنة قد أطلعت رأسها فيكم، والله لأضربنّ وجهها حتى أقمعها، أو تغلبني وإني رائد نفسي اليوم.

আল্লাহর শপথ! আমাকে তোমাদের কাছে (শাসকরূপে) প্রেরণ করা হয়েছে, অথচ আমি মোটেও ইচ্ছুক ছিলাম না। কিন্তু 'উসমান (রা.) যখন আমাকে নির্দেশ দিলেন তখন আমি বাস্তবায়ন না করে কোন উপায় পেলাম না। সাবধান! তোমাদের মাঝে ফিতনার বীজ অঙ্কুরিত হয়েছে, আল্লাহর শপথ তার (ফিতনার) মুখে আঘাত করে আমি তা দমন করব অথবা সে আমাকে পরাস্ত করবে। আল্লাহর শপথ! আজ আমিই আমার পথ প্রদর্শক।[২১]

কূফার হাল-হাকিকত অনুসন্ধান করে সা'ঈদ পরিস্থিতির ভয়াবহতা উপলব্ধি করতে পারলেন। তিনি বিদ্রোহীদের তৎপরতা সম্পর্কে গোয়েন্দা কার্যক্রম পরিচালনা করলেন। তিনি দেখতে পেলেন, এই শহরে নিম্নশ্রেণি ও উচ্ছৃঙ্খল লোকদের দাপটে সম্ভ্রান্তরা কোণঠাসা। পুরো ব্যাপারটি খালীফাকে অবহিত করার জন্য সা'ঈদ পত্র লিখলেন:

إن أهل الكوفة قد اضطرب أمرهم، وقد غلب فيها أهل الشرف، والسابقة والقدمة والغالب على تلكَ البلاد روادف ردفت، وأعراب لحت حتى ما ينظر فيها إلى ذي شرف وبلاء...

কূফাবাসীদের মাঝে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে; এখানে মান-মর্যাদার ভিত্তি পাল্টে গেছে: মর্যাদাবান, সম্মানীয় ও অগ্রবর্তীরা এখানে অবাঞ্ছিত-উপেক্ষিত। পক্ষান্তরে নবীন বেদুইনরা এখানে দাপটের সাথে অবস্থান করছে। ব্যাপারটি এতদূর গড়িয়েছে যে, এখানে যেন সম্মানিত ও মর্যাদাবানদের দেখাই যায় না।[২২]

---

২১. আত-তাবারী, ৪:২৭৯।
২২. আত-তাবারী, ৪:২৭৯; ইবনুল আসীর, ২:৩৯৭।

'উসমান (রা.) ত্বরিত জবাব দিলেন, মানমর্যাদা ও অগ্রাধিকার প্রদানের মাপকাঠি নির্ধারণ করে তিনি বললেন,

فضل أهل السابقة والقدمة، ممن فتح الله على أيديهم تلك البلاد، واجعل الذين نزلوا البلاد بعد فتحها من الأعراب تبعا لأولئك السابقين المجاهدين، إلا أن يكون السابقون تثاقلوا عن الجهاد والحق، وتركوا القيام به، وقام به من بعدهم. واحفظ لكل إنسان منهم منزلته، وأعطهم جميعا قسطهم بالحق، فإن المعرفة بالناس يتحقق بها العدل بينهم.

যাদের হাতে আল্লাহ ওই অঞ্চলের বিজয় প্রদান করেছেন সেই অগ্রবর্তীদেরকে যথোচিত মর্যাদা প্রদান কর। বিজয়ের পর যেসব বেদুইন তথায় অবতরণ করেছে তারা যেন পূর্ববর্তী মুজাহিদদের অনুগামী হয়। তবে অগ্রবর্তীরা যদি সত্য প্রতিষ্ঠায় জিহাদের দায়িত্ব পালনে অলসতা করে এবং পরবর্তীরা সেই দায়িত্ব পালন করে তবে ভিন্ন কথা। প্রতিটি মানুষের মর্যাদা সংরক্ষণ কর, ন্যায্যতার ভিত্তিতে সবার অংশ প্রদান কর; আর জেনে রেখো, মানুষের মর্যাদাগত অবস্থান সম্পর্কে জানা ইনসাফ প্রতিষ্ঠায় সহায়ক।[২৩]

খালীফার নির্দেশনামত সা'ঈদ ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। ওদিকে 'উসমান (রা.) মাদীনায় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে পরামর্শ সভায় ডেকে কূফার অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করলেন। সম্ভাব্য বিদ্রোহ প্রতিরোধে গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কেও খালীফা তাদেরকে অবহিত করলেন। পরামর্শ সভার সদস্যবৃন্দ গৃহীত পদক্ষেপে সন্তোষ প্রকাশ করলেন। তাঁরা খালীফাকে অধিকতর সাবধানতার জন্য আরো পরামর্শ দিলেন, 'ফিতনাবাজরা যেন কিছুতেই আস্কারা না পায়, তারা যেন অন্য মানুষের ওপর অগ্রাধিকার না পায় এবং অন্যায্য কোন প্রাপ্তির আশায় তাদের মনে যেন লোভ সৃষ্টি না হয়, আপনি সেই ব্যবস্থা করুন। কারণ অযোগ্যরা যখন ক্ষমতার মালিক হয় বা দায়িত্বপ্রাপ্ত হয় তখন তারা তা পালন না করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে।' খালীফা এঁদের পরামর্শ গ্রহণ করে বললেন, 'হে মাদীনাবাসী! কিছু লোক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অপচেষ্টা করছে, তা প্রতিরোধে তোমরা প্রস্তুত হও, সত্যকে আঁকড়ে ধরো; আমি যখনই যে খবর পাই তা তোমাদেরকে জানাবো।'[২৪]

কূফাকেন্দ্রিক যে বিশৃঙ্খলার সূচনা হয় তা পরবর্তীতে পুরো খিলাফাত ব্যবস্থাকে তছনছ করে দেয়। এখানে বিশৃঙ্খলা ও বিদ্রোহের ধারাবাহিক বিবরণ উপস্থাপন করা হচ্ছেঃ

---

২৩. ইবনুল আসীর, ২:৩৯৭; আত-তাবারী, ৪:২৭৯।
২৪. আত-তাবারী, ৪:২৭৯।

এক. সংস্কার পদক্ষেপের বিরুদ্ধে সুযোগসন্ধানীদের অসন্তোষ:

বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী ও সুযোগসন্ধানী কিছু নব্য মুসলিম সব সময় উপযাচক হয়ে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করত। 'উসমান (রা.)-এর পরামর্শ অনুযায়ী সা'ঈদ এদেরকে বর্জন করা শুরু করেন। যারা কূফা শহরের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে জিহাদের ময়দানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন সা'ঈদ তাঁদেরকে অগ্রাধিকার দিতে শুরু করলেন; প্রদেশ পরিচালনার বিভিন্ন বিষয়ে তাঁদেরকে সম্পৃক্ত করলেন এবং তাঁদের পরামর্শক্রমে দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা করতে লাগলেন। এতে সুযোগসন্ধানী ও স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীটি ক্ষুব্ধ হল। তারা খোদ খিলাফাতের বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্র শুরু করল। খালীফার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপনের অজুহাত সৃষ্টির জন্য তারা গভর্ণর সাঈদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অপপ্রচার চালাতে শুরু করল।

কিন্তু কূফার সাধারণ নাগরিকরা কুচক্রীদের কর্মকাণ্ড সমর্থন করল না; ফলে বাধ্য হয়ে তারা কিছু দিনের জন্য অপপ্রচার বন্ধ করল। তবে তাদের কর্মকাণ্ড বন্ধ করল না; বরং ভিন্ন কৌশলে এগোতে লাগল। প্রকাশ্যে কার্যক্রম চালানোর পরিবর্তে তারা গোপনে কাজ চালাতে শুরু করল। স্বার্থান্বেষী, অর্থলোলুপ ও বিশৃঙ্খল একদল মানুষকে তারা নিজেদের পক্ষভুক্ত করতে সক্ষম হল। এই কুচক্রীদলের হোতারা বাহ্যিকভাবে মুসলিম ছিল; তবে তাদের অন্তর ছিল ইসলামের প্রতি ঘৃণায় বিদ্বিষ্ট। ইসলামী খিলাফাতের সম্প্রসারণে তাদের পূর্বতন ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিলোপ সাধন হয়েছিল বলে এরা খিলাফাত ব্যবস্থা ধ্বংসের চক্রান্তে মেতে ওঠে। তারা খালীফা ও তাঁর গভর্ণরদের বিরুদ্ধে গোপনে অপপ্রচার চালাতে থাকে। শাসকদের ছোটখাট কোন ত্রুটি খুঁজে পেলে তারা তা ফাঁপিয়ে-ফুলিয়ে বড় করে প্রচার করে। মুসলিমদের মধ্য থেকে একদল সমর্থকও তারা জোগাড় করতে সক্ষম হয়। অপরাধপ্রবণ কিছু মানুষ, যারা বিভিন্ন সময় শাস্তিপ্রাপ্ত হয়েছে, তারা প্রতিশোধ স্পৃহায় কুচক্রীদের সাথে মিলিত হল। এভাবে একটি গোপন সংগঠন গড়ে ওঠল। পারস্পরিক গোপন যোগাযোগের মাধ্যমে তারা বিভিন্ন শহর ও অঞ্চলে এর শাখা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হল। এই খবিচ সংগঠনের শক্তিশালী শাখা ছিল, কূফা, বাসরা ও মিসরে; মাদীনা ও সিরিয়ায় এদের কিছু সমর্থক ছিল।

দুই. ধ্বংসাত্মক সংগঠনটির নেতৃত্বে ছিল ইয়াহুদী আবদুল্লাহ ইবনু সাবা:

ইয়ামানী ইয়াহুদী 'আবদুল্লাহ ইবনু সাবা ধ্বংসাত্মক সংগঠনটির পুরোধা ছিল। পত্র যোগাযোগের মাধ্যমে সে বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অনুসারীদেরকে কুপরামর্শ ও ধ্বংসাত্মক কাজে ইন্ধন জোগাত; একবার সে লিখল, 'এই কাজের জন্য তোমরা প্রস্তুতি গ্রহণ কর, আন্দোলনে গতি সঞ্চার কর, খালীফা কর্তৃক নিযুক্ত গভর্ণর ও শাসকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কর; তবে বাহ্যিকভাবে এই ভাব দেখাবে যে

তোমরা সৎকাজের আদেশ দেবে এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে। যাতে মানুষ তোমাদের আহ্বানে সাড়া দেয়, আর জনগণের মাঝে তোমাদের আহবান ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে।'[২৫]

ইবনু সাবা'র নির্দেশে তার গোপন সংগঠনের সদস্যরা ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ শুরু করল। তারা মানুষকে সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজ হতে বারণ করার ভান করত। আবার এই সূত্র ধরেই গভর্ণর ও শাসকদের সমালোচনা করত যে এরা শিষ্টের লালন ও দুষ্টের দমন করে না। বিপুল মিথ্যাচারের আশ্রয় নিয়ে তারা খালীফার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাত। ইবনু সাবার নির্দেশ মুতাবিক এক প্রদেশের কুচক্রী অন্য প্রদেশে চিঠি লিখত, এই পত্রগুলোতে তারা নিজ নিজ প্রদেশের শাসনকর্তা ও গভর্ণরদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার ও অপবাদ রটনা করত। উদ্দেশ্যমূলক অপপ্রচারের মাধ্যমে খিলাফাতের বিভিন্ন প্রান্তে তারা নিজেদের কিছু সমর্থক জোগাড় করতে সমর্থ হল, যারা মনে করত খালীফা ও তার গভর্ণররা সঠিক পন্থায় কাজ করছে না। অতএব এদেরকে অপসারণ করতে হবে।

৩৩ হিজরীতে 'আবদুল্লাহ ইবনু সাবা বাসরা অভিমুখে রওয়ানা হয়। তার সফরের উদ্দেশ্য ছিল বিপথগামী, ও উচ্ছৃঙ্খল অনুসারীদেরকে রসদ জোগানো। বাসরায় পৌঁছে সে শহরের এক কুখ্যাত চোর হুকাইম ইবনু জাবালার বাড়িতে আতিথেয়তা গ্রহণ করল।[২৬]

বাসরার গভর্ণর আবদুল্লাহ ইবনু কুরাইয ছিলেন একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক। শুধু তাই নয়, বিদ্রোহ দমনে তিনি ছিলেন কৃতসংকল্প। তিনি হুকাইম ইবনু জাবালা সম্পর্কে পূর্বেই সম্যক ওয়াকিবহাল ছিলেন। ইতোপূর্বে এই লোকটি ফার্সের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিভ্রমণ করে জিম্মীদেরকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে উস্কিয়েছিল। তার বিরুদ্ধে খালীফার কাছে অভিযোগ উত্থাপিত হলে তিনি বাসরার গভর্ণরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন এই কুচক্রী যেন শহরটির বাইরে না যেতে পারে।[২৭] আবদুল্লাহ ইবনু 'আমির তাকে বাসরার বাড়িতে গৃহবন্দী করে রেখেছিলেন। ওই বাড়িতে আবদুল্লাহ ইবনু সাবা হুকাইম ইবনু জাবালার আতিথেয়তা গ্রহণ করল। গভর্ণর ও খালীফার বিরুদ্ধে ইবনু জাবালার মনে যে ক্ষোভ ও দ্বেষ ছিল ইবনু সাবা সেটিকে জাগিয়ে তুলল। এই চোরটি সেই গোপন সংগঠনের স্থানীয় এজেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করল। পাশাপাশি নিজের সমর্থক দুষ্ট প্রকৃতির কিছু লোককেও যোগাড় করল ইবনু জাবালা। আবদুল্লাহ ইবনু সাবা বাসরায় তার বিশ্বস্ত অনুসারী পেয়ে গেল এবং এদেরকে নিজের ষড়যন্ত্রমূলক পরিকল্পনা বুঝিয়ে দিল।

গভর্ণর আবদুল্লাহ ইবনু 'আমির কুচক্রীদের গোপন তৎপরতার কথা জানতে পেরে আবদুল্লাহ ইবনু সাবাকে ডেকে পাঠিয়ে তার পরিচয় জানতে চাইলেন। ইবনু সাবা বলল,

---

২৫. আত-তাবারী, ৪:৩৪১।
২৬. আত-তাবারী, ৪:৩২৬।
২৭. প্রাগুক্ত।

সে ইয়াহুদী ছিল, ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ধর্মান্তরিত হয়েছে। ইবনু 'আমির গোপন কার্যকলাপের জন্য তাকে তিরস্কার করলেন এবং বাসরা থেকে তাকে বহিষ্কার করলেন। বাসরা ত্যাগের পূর্বে আবদুল্লাহ ইবনু সাবা সেখানে বিশ্বস্ত কিছু অনুচর রেখে গেল।[২৮]

বাসরা থেকে বিতাড়িত হয়ে ইবনু সাবা কূফায় পৌঁছল। এখানেও সে কলহপ্রিয় ও ষড়যন্ত্রে পটু একদল সমর্থক পেয়ে গেল। এদেরকে সে তার গোপন সংগঠনের সদস্য বানাল এবং তাদের মনমস্তিষ্কে ষড়যন্ত্রের বীজ রোপন করল। গভর্ণর সা'ঈদ, ইবনু সাবা'র গোপন তৎপরতার খবর পেয়ে তাকে শহর থেকে বের করে দিলেন। এবার সে মিসরের উদ্দেশে রওয়ানা করল। এখানেও সে একদল উচ্ছৃঙ্খল ও দুষ্ট প্রকৃতির লোকের সহায়তা পেল। এদের সে নিজের গোপন সংগঠনের সদস্য বানাল ও কর্মপরিকল্পনা বুঝিয়ে দিল। তুলনামূলক বিচারে মিসরে তার অবস্থান দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। এখান থেকে সে পত্র বিনিময়ের মাধ্যমে কূফা, বাসরা ও মাদীনার বিদ্রোহীদের সাথে যোগাযোগ করত। আবদুল্লাহ ইবনু সাবা'র নেতৃত্বে সাবাঈদের অপতৎপরতার শুরু হয়েছিল ত্রিশ হিজরীতে। খালীফাকে হত্যার মাধ্যমে প্রায় ছয় বছর পর এরা লক্ষ্য অর্জনে সফল হয়। তবে ফিতনার সূচনা হয়েছিল কূফা থেকে।

তিন. ফিতনাবাজদের প্রথম প্রকাশ্য তৎপরতা: কূফার গভর্ণরের বৈঠক ভণ্ডুল:

৩৩ হিজরীর কোন এক দিনে কূফার গভর্ণর সা'ঈদ ইবনুল 'আস একটি লঘু সভায় সর্বসাধারণের সাথে বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন। প্রাদেশিক শাসক ও উপস্থিত জনতা বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করছিলেন। কয়েকজন সাবাঈ ওই সভায় প্রবেশ করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার মাধ্যমে ফিতনার আগুন ছড়িয়ে দেয়।

ঘটনার বিবরণ নিম্নরূপ: গভর্ণর আহূত ওই লঘু বৈঠকে 'আবদুল্লাহ ইবনু সাবার কয়েকজন অনুসারী উপস্থিত ছিল: আল-আশতার, ,ইবনু যিল হাবাকাহ্, জুন্দুব, সা'সা'আ, ইবনুল কাওওয়াহ, কুমাইল ইবনু যিয়াদ, 'উমাইর ইবনু দাবি। আলাপচারিতার এক পর্যায়ে হুবাইশ ইবনু ফুলান আল-আসাদী নামক এক ব্যক্তি বলল: 'তালহা ইবনু 'উবাইদিল্লাহ (রা.) কত বড় দানবীর!' সা'ঈদ বললেন, 'যার মালিকানায় নাশাসতাজ[২৯]-এর মত ভূসম্পত্তি আছে তিনি তো দানবীরই হবেন। আল্লাহ্র শপথ! আমার যদি অনুরূপ সম্পদ থাকত তাহলে আল্লাহ্ তোমাদেরকে প্রাচুর্যময় করতেন।' একথা শুনে হুবাইশপুত্র আবদুর রহমান (সে বয়সে তরুণ ছিল) বলল, 'আমি কামনা করি আপনি ফোরাত তীরে

---

২৮. প্রাগুক্ত।

২৯. ফোরাত তীরবর্তী অত্যন্ত উর্বর ফসলি জমি। হিজাযে বসবাসকারী কয়েকজন কূফাবাসীর কাছ থেকে তালহা ইবনু 'উবাইদিল্লাহ্ (রা) খাইবারের কিছু জমির বিনিময়ে এটি কিনেছিলেন [ইয়াকূত, ৮:২৮৮]।

অবস্থিত পারস্যের সাবেক রাজাদের অনুরূপ সম্পদের মালিক হউন।' অল্পবয়সী ছেলেটির এই সরলোক্তি শুনে ইবনু সাবা'র অনুসারীরা তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠল। তারা বলল, 'আল্লাহ্ তোমার মুখ ছিদ্র করে দিন! আল্লাহ্‌র কসম! আমরা তো তোমাকে পছন্দ করতাম!' ছেলেটির পিতা বলল, 'বাচ্চা ছেলে, কি বলতে কি বলে ফেলেছে, তোমরা এটা নিয়ে বাড়াবাড়ি করো না।' ওরা বলল, 'আমাদের ভূসম্পদ গভর্ণরের মালিকানাধীন হোক, এটা কিভাবে সে কামনা করল!' লোকটি বলল, 'সে তোমাদের জন্য বহুগুণ সম্পদ কামনা করেছে।' ছেলেটির পিতা ইবনু সাবা'র অনুসারীদেরকে শান্ত করার জন্য এতসব চেষ্টা সত্ত্বেও ওরা নিবৃত্ত হল না; তারা একযোগে পিতা-পুত্রের ওপর হামলে পড়ল, মারের চোটে পিতা-পুত্র দু'জনেই সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ল। ওদিকে সংবাদ পেয়ে হুবাইশের গোত্র বানূ আসাদের লোকজন ছুটে এসে প্রতিশোধ গ্রহণে উদ্যত হল। অনেক কষ্টে সা'ঈদ পরিস্থিতি সামাল দিলেন। শেষ পর্যন্ত রক্তারক্তি এড়ানো সম্ভব হয়েছিল। এই ঘটনার পর সা'ঈদ লঘু বৈঠকের রেওয়াজ ত্যাগ করেন। পুরো বিষয়টি খালীফাকে জানানো হলে তিনি গভর্ণরকে ধৈর্য ও কৌশলের সাথে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার নির্দেশনা দেন।[৩০]

'আবদুল্লাহ ইবনু সাবার অনুসারী কুচক্রীরা কূফার গভর্ণরকে জনগণের মুখোমুখি দাঁড় করানোর চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে অপপ্রচারের আশ্রয় নিল। তারা খিলাফাত, খালীফা ও গভর্ণরের বিরুদ্ধে ব্যাপক অপপ্রচার চালাতে লাগল। তবে কূফার জনগণের মূল স্রোতকে তারা অপপ্রচারে বিভ্রান্ত করতে পারল না; বরং এই অপপ্রচারে উল্টো ফল হয়। এদের আচরণে ত্যক্তবিরক্ত হয়ে কূফাবাসী বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য গভর্ণরকে অনুরোধ করল। বিষয়টি সরাসরি খালীফাকে অবহিত করার জন্য সা'ঈদ তাদেরকে পরামর্শ দিলেন। তখন কূফার এক দল অভিজাত খালীফার প্রতি প্রেরিত এক পত্রে ঐসব কুচক্রীদেরকে কূফা থেকে বের করে দেওয়ার অনুরোধ জানালেন। অনুরুদ্ধ হয়ে 'উসমান (রা.) গভর্ণর সা'ঈদকে নির্দেশ দিলেন ঐ কুচক্রী দলকে কূফা থেকে বহিষ্কার করে যেন সিরিয়ায় মু'আবিয়া (রা.)-এর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সা'ঈদ অন্যূন দশ জনের এই দলটিকে কূফা থেকে বহিষ্কার করে সিরিয়ায় পাঠিয়ে দিলেন। অন্যদিকে খালীফা এদের ব্যাপারে সিরিয়ার গভর্ণর মু'আবিয়া (রা.)-কে লিখলেন, 'কূফাবাসী এমন কয়েকজন লোককে তোমার কাছে পাঠিয়েছে যাদেরকে সৃষ্টিই করা হয়েছে ফিতনার জন্য; তুমি তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখবে, তাদেরকে ভয় দেখাবে এবং আদব-কায়দা শিক্ষা দেবে, যদি তাদের সুবুদ্ধির উদয় হয় তবে তাদের ওপর আস্থা স্থাপন করবে।'[৩১] কূফা থেকে বহিষ্কার করে যাদেরকে সিরিয়ায় পাঠানো হয়েছিল তারা হল: মালিক ইবনুল হারিস আল-আশতার আন্-নাখা'ঈ, সাবিত ইবনু কায়স ইবনু মুকনা'

৩০. আত-তাবারী, ৪:৩১৮; ইবনুল আসীর, ২:৪১৮-১৯।
৩১. আত-তাবারী, ৪:৩১৮-১৯; ইবনুল আসীর, ২:৪১৯।

আন্-নাখা'ঈ, জুনদুব ইবনু যুহাইর আল-গামিদী, জুনদুব ইবনু কা'ব আল-আযদী, 'উরওয়া ইবনুল জা'দ, 'আমর ইবনুল হামিক আল-খুযা'ঈ, সা'সা'আ ইবনু সুহান, কুমাইল ইবনু যিয়াদ আন্-নাখা'ঈ।[৩২]

চার. সিরিয়ায় নির্বাসিত ফিতনাবাজদের সংশোধনে মু'আবিয়ার প্রচেষ্টা:

সিরিয়ার গভর্ণর মু'আবিয়ার (রা.) ধৈর্য, কৌশল, বুদ্ধিমত্তা, ধীশক্তি ও বাকপটুতা সম্পর্কে খালীফা 'উসমান (রা.) পূর্ণরূপে ওয়াকিফহাল ছিলেন। তিনি জানতেন, কৌশলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে মু'আবিয়া পারঙ্গম। তাই ফিতনাবাজদেরকে নিয়ন্ত্রণ ও সুপথে আনয়নের জন্য তিনি মু'আবিয়াকে দায়িত্ব দিলেন। বহিষ্কৃত দলটি সিরিয়ায় পৌঁছলে গভর্ণর তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করলেন, সিরিয়ায় স্বাগত জানিয়ে তাদেরকে মারইয়াম নামে একটি গির্জায় থাকতে দিলেন। মু'আবিয়া (রা.) প্রায়শ তাদের সাথে আহার গ্রহণ করতেন, বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলে তাদের প্রকৃত মনোভাব জানার চেষ্টা করলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, তাদের বক্রতার মূল কারণ গোত্রীয় অহমিকা ও ক্ষমতা লাভের লালসা। কুরাইশের নেতৃত্ব ও সর্বব্যাপী কর্তৃত্ব তারা মেনে নিতে পারছিল না। এই মনোভাবে পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে মু'আবিয়া (রা.) তাদের সামনে দু'টি বিষয় তুলে ধরলেন: আরবদের নেতৃত্ব লাভে ইসলামের ভূমিকা ও ইসলামের প্রচার-প্রসারে কুরাইশের ভূমিকা। তিনি বললেন, 'তোমরা আরবের একটি দল, তোমাদের দাঁত আছে, জিহ্বা আছে। ইসলামের বদৌলতে তোমরা মর্যাদাবান হয়েছো এবং জাতিসমূহের ওপর বিজয়ী হয়েছ, তাদের মর্যাদা ও সম্পদরাজির অধিকারী হয়েছো। আমি জানতে পেরেছি তোমরা কুরাইশের বিরুদ্ধে শত্রুতা পোষণ কর, অথচ প্রকৃত বিষয় হল এই যে কুরাইশ না হলে তোমরা আগের মত দুর্বল থেকে যেতে।'[৩৩]

ওই বৈঠকে মু'আবিয়ার সাথে কূফার ফিতনাবাজদের দীর্ঘ আলোচনা হয়। তাদের মূল যুক্তি ছিল এই যে, জাহিলী যুগে কুরাইশ নিতান্ত দুর্বল ও উপেক্ষিত একটি গোত্র ছিল। বর্তমানে তারা গোটা আরবের ওপর কর্তৃত্ব প্রদর্শন করছে যা কোনভাবেই মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। মু'আবিয়া (রা.) তাদের সামনে যে বক্তব্য ও যুক্তি উপস্থাপন করেন তার সারমর্ম নিম্নরূপ:[৩৪]

মু'আবিয়া (রা.) বলেন, 'আজ পর্যন্ত তোমাদের নেতৃবৃন্দ (অর্থাৎ খালীফা ও গভর্ণরগণ) ঢাল হিসেবে কাজ করেছেন, তোমরা ঢালের আশ্রয় হতে বের হয়ে যেও না। তোমাদের নেতৃবৃন্দ আজ অবধি তোমাদের বাড়াবাড়ি ও অপরাধ ধৈর্যের সাথে মুকাবিলা

---

৩২. আত-তাবারী, ৪:৩২৬।
৩৩. আত-তাবারী, ৪:৩১৯।
৩৪. ফিতনাবাজদের সাথে মু'আবিয়া (রা)-এর আলাপের বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন আত-তাবারী, ৪:৩১৯-২১ ও ইবনুল আসীর, ২:৪১৯-২১।

করেছেন এবং তোমাদের পক্ষ হয়ে বোঝা বহন করেছেন; আল্লাহ্‌র দোহাই! তোমরা অবাধ্যতা ত্যাগ করো, অন্যথায় আল্লাহ্ তোমাদের ওপর নিপীড়ক শাসক চাপিয়ে দেবেন যে ধৈর্যধারণ করার জন্য তোমাদের প্রশংসা করবে না।'

এই পর্যন্ত বলার পর ঐ দলটির একজন বলল, 'কুরাইশের ব্যাপারে আপনার বক্তব্যের জবাবে বলছি, আরবদের মাঝে এ গোত্রটি ধনে-জনে শ্রেষ্ঠ ছিল না, জাহিলী যুগে আমাদেরকে ভয় দেখানোর মত প্রভাব-প্রতিপত্তিও তাদের ছিল না। আর 'ঢালে'র ব্যাপারে বলছি, ঢাল ছিদ্র হয়ে তরবারি আমাদের শরীর পর্যন্ত পৌঁছেছে।'

মু'আবিয়া (রা.) বললেন, 'এখন আমি তোমাদেরকে চিনতে পারলাম, বুঝতে পারলাম তোমাদের প্ররোচনার মূল কারণ হল নির্বুদ্ধিতা। তুমি হলে দলের মুখপাত্র, আর তোমার বুদ্ধির দৌড় এতটুকু! আমি তোমার সামনে ইসলামের সুমহান অবদান উপস্থাপন করছি, আর তুমি আমাকে নিয়ে যাচ্ছো জাহিলিয়াতের অন্ধকারে! আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, আর তুমি মনে করছ তোমাকে আশ্রয়দানকারী ঢাল নিজেই বিদীর্ণকারী। যে লোকেরা তোমাদের মত তুচ্ছ-নিচ ব্যক্তিদের কার্যকলাপ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে খালীফার কাছে উপস্থাপন করেছে আল্লাহ তাদেরকে লাঞ্ছিত করুন।'

মু'আবিয়া (রা.) উপলব্ধি করতে পারলেন যে, ইঙ্গিতমূলক বক্তব্য অনুধাবনে এরা অপারগ। তাই এবার তিনি ব্যাখ্যা করে বললেন, 'আমার মনে হয় উপলব্ধি করার মত বোধশক্তি তোমাদের নেই; তবু বলছি, বুঝার চেষ্টা কর, জাহিলী ও ইসলামী যুগে কুরাইশ গোত্র আল্লাহর মেহেরবানীর বদৌলতেই সম্মানিত হয়েছে, মর্যাদাপ্রাপ্ত হয়েছে, যদিও তারা ধনে-জনে, শক্তিমত্তা ও প্রভাব-প্রতিপত্তিতে আরবদের মাঝে শ্রেষ্ঠ গোত্র ছিল না। তবে তারা ছিল বংশমর্যাদায় খাঁটি ও সম্ভ্রান্ত, পৌরুষত্বে পরিপূর্ণ। সেই জাহিলী যুগে যখন এক গোত্র অপর গোত্রকে খেয়ে ফেলত তখনও কুরাইশ নিরাপদ ছিল, আর তা সম্ভব হয়েছিল কেবল আল্লাহর কারণে; কারণ তিনি যাকে মর্যাদাবান করেন সে অপমানিত হয় না, তিনি যার মর্যাদা বুলন্দ করেন তাকে কেউ নিচু করতে পারে না। তোমরা কি আরব-অনারব-সাদা-কালো গোত্রের মাঝে এমন কাউকে জান যারা নিজ শহরে যুগের দুর্বিপাকে পড়েছে অথচ বিদেশে সম্মানিত হয়েছে। অথচ কুরাইশদের ক্ষেত্রে এমনটি ঘটেছে; কেউ এই গোত্রটির সাথে ষড়যন্ত্র করতে চাইলে আল্লাহ্ তাদের চিবুক অবনত করে দিয়েছেন। এক পর্যায়ে তিনি তাঁর দীনের অনুসারী সম্মানিতদেরকে দুনিয়ার লাঞ্ছনা ও আখিরাতের মন্দ পরিণতি হতে পরিত্রাণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং এই কার্যসিদ্ধির জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকে বাছাই করলেন; তারপর তাঁর জন্য একদল সাহাবী নির্ধারণ করলেন, যাঁদের শ্রেষ্ঠরা ছিল কুরাইশ বংশোদ্ভূত। তারপর এই সাম্রাজ্য নির্মাণ করলেন এবং কুরাইশদের ওপর খিলাফাতের দায়িত্ব অর্পণ করলেন। তারা (কুরাইশ) ব্যতীত অন্য কেউ এই দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত ছিল না। তাঁরা দীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত আছে এবং আল্লাহ্ও তাদেরকে বেষ্টন করে রেখেছেন। যে সম্রাটরা জাহিলী যুগে

তোমাদেরকে পদানত করেছিল আল্লাহ্ তাদের হাত থেকে কুরাইশকে রক্ষা করেছিলেন। তুমি ও তোমার সাথীদেরকে ধিক! তুমি ছাড়া অন্য কেউ কথা বললে এক ধরনের ব্যাপার ছিল। কিন্তু তুমিই শুরু করলে কুরাইশের সমালোচনা দিয়ে। হে সা'সা'আ! আমি তো জানি তোমার গ্রাম ছিল সমগ্র আরবের মাঝে সর্বনিকৃষ্ট গ্রাম, যার উদ্ভিদ ছিল পচা, উপত্যকা ছিল গভীর; ওই জনপদটি ছিল প্রতিবেশীর জন্য কষ্টদায়ক, খারাবির জন্য কুখ্যাত; ইতর-ভদ্র নির্বিশেষে ঐ গ্রামের সকল বাসিন্দা গালিগালাজের শিকার হত, তোমরা ছিলে আরবদের মাঝে সর্বাধিক কুৎসিত উপাধিধারী, আত্মীয়দেরকে কষ্টদাতা; এই ধরনের একটি নিকৃষ্ট গ্রামেও নবীর দাওয়াত পৌছল; তুমি তো ছিলে অচেনা অজানা এক লোক, ওমানের বাসিন্দা, কখনো বাহরাইনে বসবাস করোনি, দীনের দাওয়াত তোমাকে শামিল করল এবং ইসলাম তোমাকে উন্মোচিত করল, মানুষের সাথে মেলামেশার সুযোগ দিল, আর তোমাকে নেতা বানাল। সেই তুমি আজ এসেছ আল্লাহ্র দীনে বক্রতা অনুসন্ধানের জন্য! তোমার এই প্রচেষ্টা কুরাইশকে অবনমিত করতে পারবে না, তাদের কোন ক্ষতিও করতে পারবে না এবং তাদেরকে দায়িত্ব পালনে বিমুখও করতে পারবে না। তোমাদের ব্যাপারে শাইতান গাফেল নয়, তোমাদের জাতির মাঝে তোমরাই সর্বনিকৃষ্ট ও মন্দ তা সে জানতে পেরেছে; আর তাই সে মানুষকে উত্তেজিত করার জন্য তোমাদেরকে বেছে নিয়েছে। শাইতানই তোমাদেরকে আছাড় মারবে, সে ভালভাবেই জানে যে তোমাদের মাধ্যমে সে আল্লাহ্র সিদ্ধান্ত পাল্টাতে পারবে না, মন্দ উপায়ে যদি তোমরা কোন কিছু অর্জন কর তবে আল্লাহ্ আরেকটি মন্দ দ্বার খুলে দেবেন এবং তোমাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন।'[৩৫]

দীর্ঘ এই বক্তব্যের পর মু'আবিয়া (রা.) তাদেরকে ছেড়ে ওঠে গেলেন, তারা একে অপরকে গালিগালাজ করতে লাগল, নিজেদের চোখে তারা ছোট হয়ে গেল।

এই দীর্ঘ বক্তব্যে মু'আবিয়া বিদ্রোহীদের গোত্রীয় অহমিকা দূর করার চেষ্টা করেছেন; প্রথমে তিনি ইসলাম প্রচারে কুরাইশের ভূমিকা বর্ণনা করেছেন, জাহিলী যুগে সমগ্র আরবের মাঝে কুরাইশের যে সম্মান ছিল তাও উল্লেখ করেছেন। তারপর বিদ্রোহীদের নেতা সা'সা'আ'র গোত্রের দুর্গতির কথা বলেছেন, ইসলাম কিভাবে তাদেরকে দুরবস্থা থেকে মুক্তি দিয়েছে তার বর্ণনাও দিয়েছেন। সর্বশেষে শাইতান এদেরকে কিভাবে বিভ্রান্ত করেছে তার ইঙ্গিতও রয়েছে মু'আবিয়ার বক্তৃতায়। ঐতিহাসিক ঘটনাবলী পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় এই বক্তব্য বিদ্রোহীদের বক্রতা দূর করার কাজে খুব একটা ফলদায়ক হয়নি।

মু'আবিয়ার (রা.) সর্বশেষ প্রচেষ্টা: পরদিন মু'আবিয়া (রা.) ফিতনাবাজ বিদ্রোহীদের সাথে আবার বৈঠকে মিলিত হন। দীর্ঘ বক্তব্যের পর মু'আবিয়া (রা.) বললেন, 'তোমরা ভাল জবাব দাও নচেৎ চুপ থাক এবং চিন্তা-ভাবনা কর, তোমরা দেখ

---

৩৫. আত-তাবারী, ৪:৩১৯-২০।

কিসে তোমাদের, তোমাদের পরিজনের, তোমাদের সম্প্রদায়ের ও মুসলিম জনগোষ্ঠীর কল্যাণ নিহিত আছে। তোমরা সেটিই তালাশ কর, নিজেরা বেঁচে থাকো, আমাদেরকে বেঁচে থাকতে দাও; আমরা তোমাদের সাথে বেঁচে থাকতে চাই।'

সা'সাআ বলল, 'তুমি আমাদের আনুগত্যের হকদার নও, আল্লাহর অবাধ্যতা হয় এমন বিষয়ে তোমার আনুগত্যে কোন সম্মান নেই।' মু'আবিয়া (রা.) বললেন, 'আমি কি বক্তব্যের শুরুতে তোমাদেরকে তাকওয়া ও আল্লাহ-রাসূলের আনুগত্যের উপদেশ দিইনি? আমি তোমাদেরকে আরো নির্দেশ দিয়েছি আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরার জন্য এবং বিচ্ছিন্ন না হওয়ার জন্য। তাহলে আমার আনুগত্যে আল্লাহর অবাধ্যতার কি দেখলে?' তারা বলল, 'তুমি বরং বিভেদের নির্দেশ দিয়েছ এবং রাসূলকে অমান্য করতে বলেছ।' মু'আবিয়া (রা.) বললেন, 'আমি যদি তা করে থাকি তবে আল্লাহর কাছে তাওবা করছি। এখন আমি তোমাদেরকে তাকওয়া, আল্লাহ-রাসূলের আনুগত্য, উম্মাহ্র ঐক্য বজায় রাখা ও বিভেদ মুছে ফেলার নির্দেশ দিচ্ছি। তোমাদের নেতৃবৃন্দকে সম্মান কর, সাধ্যানুযায়ী তাদের কল্যাণ কামনা কর, কোমলতার সাথে তাদেরকে উপদেশ দাও।' একথা শুনে সা'সা'আ বলল, 'আমরা তোমাকে পদত্যাগের নির্দেশ দিচ্ছি; কারণ মুসলিমদের মাঝে তোমার চেয়ে উপযুক্ত লোক আছে।' মু'আবিয়া (রা.) বললেন, 'কে?' সে জবাব দিল, 'যার পিতা ইসলাম গ্রহণে তোমার পিতার চেয়ে অগ্রগামী, যে নিজে তোমার চেয়ে অগ্রগণ্য।' মু'আবিয়া (রা.) বললেন, 'আল্লাহ্র শপথ! ইসলামে আমার অগ্রগণ্যতা রয়েছে, হ্যাঁ, আমি স্বীকার করি আমার চাইতে অগ্রগণ্য মুসলিম ছিলেন। তবে বর্তমান সময়ে এই দায়িত্ব পালনে আমার চাইতে শক্তিশালী কেউ নেই। 'উমার (রা.) আমার এই যোগ্যতা পর্যবেক্ষণ করেছেন, আমার চেয়ে অন্য কেউ যোগ্য থাকলে তিনি আমাকে এই পদে নিয়োগ করতেন না। দায়িত্ব পালনকালে এমন কোন পদস্খলনও সংঘটিত হয়নি যে আমাকে পদত্যাগ করতে হবে। আমীরুল মু'মিনীন ও মুসলিম জনতা যদি মনে করে আমার পদত্যাগ করা উচিত তাহলে তিনি স্বহস্তে আমাকে লিখবেন এবং আমিও পদত্যাগ করব। তোমরা থামো! এইসব প্রস্তাব শাইতানের প্ররোচনা ও আদেশে উত্থাপন করা হয়। আমার জীবনের শপথ! তোমাদের মর্জি অনুযায়ী কাজ করা হলে মুসলিমদের কোন কাজই সুসম্পন্ন হবে না। কিন্তু আমাদের জন্য আশার বিষয় হল এই যে, আল্লাহ্র ফায়সালা অনুসারেই কার্যাদি সম্পন্ন হয়, অতএব তোমরা কল্যাণের দিকে প্রত্যাবর্তন করো এবং কল্যাণের কথা বলো।' মু'আবিয়ার দীর্ঘ এই বক্তব্যের জবাবে তারা বলল, 'তুমি এটির হকদার নও।' মু'আবিয়া বললেন, 'আল্লাহর শপথ! আল্লাহ্ নিরঙ্কুশ কর্তৃত্বের মালিক, তিনি শাস্তির মালিক। তোমাদের ব্যাপারে আমার ভয় হচ্ছে তোমরা অব্যাহতভাবে শাইতানের আনুগত্য করতে থাকবে, শাইতানের আনুগত্য ও দয়াময়ের অবাধ্যতার কারণে তোমাদের ওপর আল্লাহর ক্রোধ নেমে আসবে এবং তোমরা দুনিয়াতে শাস্তি পাবে এবং আখিরাতে চিরস্থায়ী লাঞ্ছনা ভোগ করবে।' মু'আবিয়ার একথা শুনে ওরা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার চুল-দাড়ি টানতে লাগল। মু'আবিয়া বললেন, থামো, এটি কূফা নয়, সিরিয়াবাসী যদি তাদের গভর্ণরের সাথে তোমাদের এই ব্যবহার

দেখতে পায় তবে তোমাদের হত্যা না করে ছাড়বে না। আল্লাহর শপথ! তোমাদের কাজগুলো সাদৃশ্যপূর্ণ।' এই কথা বলে মজলিস থেকে চলে যেতে যেতে মু'আবিয়া বললেন, 'আমার জীবনের শপথ! আজীবন আমি তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ করব না, কথাও বলব না।'[৩৬]

উপর্যুক্ত বর্ণনায় আমরা দেখতে পেলাম মুআবিয়া (রা.) বিদ্রোহীদের সাথে আলোচনায় ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন। তিনি বারবার তাদেরকে ঐক্য বজায় রাখা ও বিভেদ ত্যাগ করার আহবান জানিয়েছেন। কিন্তু খালীফা ও তাঁর গভর্ণরদের অবাধ্য হওয়ার ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বিদ্রোহীদের মনোভাবে তিনি পরিবর্তন আনতে পারেননি। তারা মু'আবিয়ার পদত্যাগ দাবি করে বসে। এতে তাদের উদ্দেশ্য পরিষ্কার হয়ে যায়। সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজ হতে বারণ করা তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল না; তাদের লক্ষ্য ছিল খালীফা ও গভর্ণরদের বিরুদ্ধে অসন্তোষ সৃষ্টি করে খিলাফাতের বিনাশ সাধন। মু'আবিয়ার পদত্যাগের দাবির পক্ষে তাদের কেবল একটিই যুক্তি ছিল; তা হল তার চেয়ে অগ্রগণ্য মুসলিম রয়েছে। মু'আবিয়া তাদের যুক্তি মেনে নিয়ে বলেন, তিনি সর্বাগ্রে ইসলাম গ্রহণকারী নন; তবে গভর্ণরের দায়িত্ব পালনে তিনি অবশ্যই উপযুক্ত; কারণ উমার (রা.)-এর মত বিচক্ষণ খালীফা তাঁকে গভর্ণর নিয়োগ করেছেন। তাছাড়া কোন গোষ্ঠীর মর্জিমত একজন গভর্ণর দায়িত্ব ত্যাগ করতে পারেন না। খালীফা চাইলে তাঁকে অপসারণ করতে পারেন যদি তিনি কোন অযোগ্যতা প্রদর্শন করেন বা অনিয়ম করেন। পরিশেষে মু'আবিয়া তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে লাঞ্ছনা ও অপমান হতে মুক্তি লাভের জন্য বক্রপথ ত্যাগের আহবান জানান।

মু'আবিয়ার (রা.) সর্বশেষ এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ফিতনাবাজরা তাঁর সামনে সীমাহীন ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে, তারা মু'আবিয়ার চুল দাড়ির টানার মত দুঃসাহস দেখায়। কিন্তু মু'আবিয়া শুধু ধমক দিয়েই তাদেরকে নিরস্ত করেন। তাদের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। তবে তিনি বুঝতে পারেন যে, এদের স্বৈচ্ছিক বক্রতা দূর করা যাবে না। এখন আশু কর্তব্য হল এদের অভিসন্ধি সম্পর্কে খালীফাকে অবহিত করা।

খালীফার উদ্দেশ্যে মু'আবিয়ার (রা.) পত্র: কূফার বিশৃঙ্খলাকারীদের সংশোধন-প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর মু'আবিয়া খালীফাকে লিখলেন,

أما بعد يا أمير المؤمنين، فإنك بعثت إليّ أقواما يتكلمون بألسنة الشياطين وما يملون عليهم، ويأتون الناس-زعموا- من قبل القرآن، فيشبهون على الناس، وليس كل الناس يعلم ما يريدون؛ وإنما يريدون فرقة، ويقربون فتنة؛ قد أثقلهم الإسلام وأضجرهم، وتمكنت رقى الشيطان من قلوبهم، فقد أفسدوا كثيرا من

৩৬. আত-তাবারী, ৪:৩২৪-২৫।

الناس ممن كانوا بين ظهرانيهم من أهل الكوفة؛ ولست آمن إن أقاموا وسط أهل الشأم أن يغروهم بسحرهم وفجورهم؛ فارددهم إلى مصرهم؛ فلتكن دارهم في مصرهم الذي نجم فيه نفاقهم؛ والسلام.

আমীরুল মু'মিনীন! আপনি আমার কাছে কয়েকজন লোক পাঠিয়েছিলেন, এরা শাইতানের ভাষায় কথা বলে। 'কুরআনের পক্ষ থেকে এসেছে' এমন ধারণার সৃষ্টি করে তারা মানুষকে সন্দেহে নিমজ্জিত করে। তাদের মতলব সম্পর্কে সব মানুষ অবগত নয়। এরা বিভেদ সৃষ্টি করতে চায় আর ফিতনাকে কাছে আনতে চায়। ইসলামের জন্য এরা বোঝা, শাইতানি মন্ত্র এদের অন্তরে আসন গেড়ে বসেছে, তাদের নিজ শহর কূফার অনেক মানুষকে তারা বিভ্রান্ত করেছে। আমার আশঙ্কা-সিরিয়ায় এরা অবস্থান করলে নিজেদের যাদুমন্ত্র ও গোমরাহী দ্বারা স্থানীয়দেরকে গোমরাহ্ করবে। আপনি তাদেরকে নিজ শহরে ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করেন যেখানে তাদের শঠতা প্রকাশ পেয়েছিল। ওয়াস-সালাম।[৩৭]

পাঁচ. ফিতনাবাজদেরকে হিম্সে নির্বাসন:

মু'আবিয়ার পত্র পেয়ে 'উসমান (রা.) ফিতনাবাজদেরকে কূফায় ফেরত পাঠান। কিন্তু তারা পূর্ববৎ প্রোপাগান্ডা চালিয়ে যেতে থাকলে সা'ঈদ ওদের ব্যাপারে খালীফাকে আবার লিখতে বাধ্য হন। উসমান (রা.) নির্দেশ দেন ফিতনাবাজদেরকে যেন হিম্সের গভর্ণর আবদুর রহমান ইবনু খালিদ ইবনিল ওয়ালীদের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয়। হিম্সে পৌঁছে কূফার বিদ্রোহীরা ভিন্ন ব্যবহার পেল। গভর্ণর আবদুর রহমান তাদেরকে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় তিরস্কার করে বললেন, 'ওহে শাইতানের দাবার ঘুঁটি! এখানে তোমাদেরকে স্বাগত জানানো হচ্ছে না! ইতোমধ্যে শাইতান ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে গেছে আর তোমরা এখনো বাতিলের পথে তৎপরতা চালাচ্ছো! আবদুর রহমান যদি তোমাদেরকে আদব-কায়দা শিক্ষা না দেয় তবে আল্লাহ্ যেন তার ক্ষতিসাধন করেন। আমি জানি না তোমরা কে। তোমরা কি আরব না অনারব? সা'ঈদ ও মু'আবিয়ার সাথে যে ভাষায় কথা বলেছ আমার সাথে অনুরূপ কথা বলার দুঃসাহস প্রদর্শন করো না। আমি খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের সন্তান; আমার পিতা ছিলেন পোড় খাওয়া যোদ্ধা যিনি ধর্মত্যাগীদের দমন করেছিলেন। আল্লাহর কসম! আমি তোমাদেরকে লাঞ্ছিত করব।'

'আবদুর রহমান ইবনু খালিদের কাছে তারা দশ মাস অবস্থান করেছিল; এই সময় তিনি বিদ্রোহীদের সাথে অত্যন্ত কঠোর ব্যবহার করেন। মু'আবিয়া ও সা'ঈদের সদ্ব্যবহার ছিল দূর কল্পনা। আবদুর রহমান যেখানে যেতেন সেখানেই তাদেরকে নিয়ে যেতেন; এমনকি যুদ্ধের ময়দানেও তাদের সঙ্গত্যাগ করতেন না। তাদেরকে লাঞ্ছিত করার কোন সুযোগ তিনি নষ্ট করেননি। বিদ্রোহীদের নেতা সা'সা'আ ইবনু সুহানকে তিনি

---

৩৭. আত-তাবারী, ৪:৩২৫।

বলতেন, 'ওহে পাপের সন্তান! তুমি কি জান, ভাল ব্যবহারে যে শোধরায় না তার সংশোধনের জন্য দরকার মন্দ আচরণ।' বিশৃঙ্খল দলটির উদ্দেশে তিনি বলতেন, 'কি ব্যাপার, সা'ঈদ ও মু'আবিয়ার কথার জবাব যেভাবে দিতে আমার কথার জবাব কেন সেভাবে দাও না?'

'আবদুর রহমান ইবনু খালিদের কঠোর আচরণ বিদ্রোহীদের আচরণগত সংশোধনের ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছিল। কয়েক মাস পর তারা ঘোষণা দেয় যে, তারা তাওবা করেছে এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছে। আবদুর রহমান বিদ্রোহীদের অন্যতম নেতা আল-আশতার আন্-নাখা'ঈকে মাদীনায় 'উসমান (রা.)-এর কাছে প্রেরণ করেন। আল-আশতার খালীফার কাছে গিয়ে নিজেদের সংশোধনের ঘোষণা দেয় এবং অতীত কর্মকাণ্ডের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। জবাবে 'উসমান (রা.) বলেন, 'আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি; তোমরা যেখানে ইচ্ছা সেখানে বসবাস করতে পার।' আল-আশতার বলল, 'আমরা আবদুর রহমানের কাছেই থাকব।' তারপর আল-আশতার হিম্‌সে ফিরে যায় এবং দলবলসহ কিছু দিন আবদুর রহমানের কাছে অবস্থান করে।[৩৮] কূফার হোতারা হিম্‌সে নির্বাসন জীবন কাটানোর সময় তাদের স্থানীয় সাঙ্গপাঙ্গরা কিছু সময়ের জন্য হলেও নিরবতা বজায় রাখে।

ছয়. বাসরার ফিতনাবাজ কর্তৃক আশাজ্জ আবদিল কায়সের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা:

'আবদুল কায়স গোত্রের নেতা ছিলেন 'আমির ইবনু আবদিল কায়স। এই গোত্রের প্রতিনিধিরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে ইসলাম গ্রহণ করার জন্য যখন গমন করেন তখন 'আমির তাদের নেতা ছিলেন। তাঁর প্রশংসায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, 'তোমার মাঝে দু'টি খাসলত আছে যা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল পছন্দ করেন: সহনশীলতা ও স্থৈর্য।' কাদিসিয়ার যুদ্ধে 'আমিরের বিপুল অবদান ছিল। অত্যন্ত সম্মানিত এই ব্যক্তি বাসরায় বসবাস করতেন। হুকাইম ইবনু জাবালার নেতৃত্বে বাসরার ফিতনাবাজরা সম্মানিত লোকদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনার কার্যক্রম হাতে নেয়। এরই অংশ হিসেবে হুমরান ইবনু আবান নামে বাসরার জনৈক কুচক্রী 'আমির ইবনু আবদিল কায়সের বিরুদ্ধে অপবাদ রটনা করে। এই অভিযোগকারী ছিল অপরাধপ্রবণ, দৈনন্দিন কার্যকলাপে সে দীন-ধর্মের কোন তোয়াক্কা করত না। সে এক রমণীকে ইদ্দতকালে বিয়ে করেছিল। বিষয়টি জানাজানি হয়ে গেলে 'উসমান (রা.) বিয়ে ভেঙ্গে দেন এবং তাকে মাদীনা হতে বাসরায় নির্বাসন দেন। হুমরান, 'আমির ইবনু আবদিল কায়সের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করল; সে প্রথমে এই অভিযোগ আরোপ করে যে, 'আমির ইবনু আবদিল কায়স, ইবরাহীম (আ)-এর পরিবারের মর্যাদা স্বীকার করে না। বাসরার গভর্ণর 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমির এই বিষয়ে

---

৩৮. প্রাগুক্ত, ৪:৩২২।

সরেজমিন তদন্তের জন্য 'আমির ইবনু 'আবদিল কায়সের বাড়িতে গিয়ে দেখেন তিনি ইবরাহীম (আ)-এর পরিবারের মর্যাদা ঘোষণাকারী সূরা আলে 'ইমরানের ৩৩ নং আয়াত তিলাওয়াত করছেন।[৩৯]

ওদিকে কিছুদিন পর হুমরানকে মাদীনায় প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দেন খালীফা। এখানে এসে সে ও তার দলবল 'আমিরের বিরুদ্ধে আরো তিনটি অভিযোগ উত্থাপন করে: তিনি গোশ্‌ত ভক্ষণ করেন না, তাকে জুমু'আর সালাতে উপস্থিত হতে দেখা যায় না এবং তিনি বিয়ে-শাদীতে বিশ্বাসী নন।[৪০]

বিব্রতকর পরিস্থিতি হতে বাচাঁনোর জন্য খালীফা 'আমিরকে সিরিয়ায় মু'আবিয়ার কাছে পাঠিয়ে দেন। 'আমিরের সাথে খাবার গ্রহণ করতে গিয়ে মু'আবিয়া (রা.) জানতে পারেন যে, তিনি গোশ্‌ত খেতে পছন্দ করেন। পরবর্তী আলাপচারিতায় মু'আবিয়া (রা.) আরো জানতে পারেন যে, 'আবদুল কায়স গোত্রের সম্ভ্রান্ত সর্দার 'আমির সম্পূর্ণ নির্দোষ ও অপপ্রচারের শিকার। 'আমির বলেন, তিনি জুমু'আর সালাতে পেছনের কাতারে দাঁড়ান এবং তাড়াতাড়ি প্রত্যাবর্তন করেন। বিয়ের ব্যাপারে তিনি বলেন, 'বাসরা হতে বের হওয়ার সময় আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। আমি গোশত ভক্ষণ করি; তবে নির্মম কসাইয়ের হাতে জবাইকৃত পশুর গোশত খাই না।'[৪১]

সাত. প্রকাশ্য বিদ্রোহের পরিকল্পনা:

ফিতনাবাজ ও বিদ্রোহীদের মূল নেতা ইয়াহুদী 'আবদুল্লাহ ইবনু সাবা মিসরে অবস্থান করছিল। সে মিসর থেকে মাদীনা, বাসরা ও কূফার ফিতনাবাজদের সাথে পত্র যোগাযোগের মাধ্যমে বিদ্রোহের পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে। কূফার ফিতনাবাজদের মূল হোতাদের নির্বাসনের পর তাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিল আরেক পাপিষ্ঠ ইয়াযীদ ইবনু কায়স। ইবনু সাবার সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে ৩৪ হিজরীতে প্রকাশ্য বিদ্রোহের পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়। ঘটনাচক্রে ৩৪ হিজরীতে কূফা নেতৃত্বশূন্য হয়ে পড়ে; নেতৃস্থানীয় সবাই জিহাদের ময়দানে ব্যস্ত থাকায় ফিতনাবাজদের পক্ষে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করা সহজ হয়ে পড়ল।

আট. ৩৪ হিজরী সনে কূফার পরিস্থিতি:

৩৪ হিজরীতে বিদ্রোহের পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়। ঐ সময়টাতে কূফা কিভাবে নেতৃত্বশূন্য হয়ে পড়ে তার বিবরণ দিয়েছেন আত-তাবারী। তিনি লিখেছেন,

---

৩৯. ইবনুল আসীর, ২:৪২৩; আত-তাবারী, ৪:৩২৭।
৪০. ইবনুল আসীর, ২:৪২৩।
৪১. প্রাগুক্ত।

'উসমান (রা.)-এর খিলাফাতের একাদশ বছরে অর্থাৎ ৩৪ হিজরীতে সা'ঈদ ইবনুল 'আস মাদীনায় খালীফার সাথে দেখা করতে যান। ইতোপূর্বে কূফার নেতৃস্থানীয় অনেক ব্যক্তিকে তিনি বিভিন্ন জায়গায় প্রেরণ করেন: আল-আশ'আছ ইবনু কায়সকে আজারবাইজানে, সা'ঈদ ইবনু কায়সকে রাই-এ, নুসাইর আল-'ইজ্‌লীকে হামাযানে, আস-সাইব ইবনুল আকরা'কে ইস্পাহানে, মালিক ইবনু হাবীব আল-ইয়ারবু'ঈকে মাহ-এ, হাকীম ইবনু সালামা আল-হিযামীকে মুসেলে, জারীর ইবনু আবদিল্লাহকে কারকিসিয়ায়, সালমান ইবনু রাবী'আহকে আল-বাবে, 'উতাইবা ইবনুন নাহাসকে হালাওয়ানে প্রেরণ করা হয়। প্রতিরক্ষা বিভাগের দায়িত্ব অর্পণ করা হয় আল-কা'কা' ইবনু 'আমর আত-তামীমীর ওপর, কূফার ভারপ্রাপ্ত গভর্ণর ছিলেন 'আমর ইবনু হুরাইছ। এভাবে কূফা নেতৃত্বশূন্য হয়ে পড়ে।[৪২] ফলে কূফার নিয়ন্ত্রণ বিভ্রান্ত ফিতনাবাজদের হাতে চলে যায়। এই ধরনের সুবর্ণ সুযোগ কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত নেয় কূফার সাবাঈ নেতা ইয়াযীদ ইবনু কায়স। ইবনু সাবার পরামর্শক্রমে সে ও তার অনুসারীরা বিদ্রোহী কর্মকাণ্ডের সূচনা করে।

নয়. আল-কা'কা' ইবনু 'আমর বিদ্রোহের প্রথম প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিলেন (৩৪ হিজরী):

কূফার সাবাঈ নেতা ইয়াযীদ ইবনু কায়স খালীফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার মানসে সমর্থক-অনুচর নিয়ে কূফার মাসজিদে প্রবেশ করল। কূফার প্রতিরক্ষা বিভাগের প্রধান আল-কা'কা' ইবনু 'আমর বিষয়টি জানতে পেরে কালবিলম্ব না করে মাসজিদে উপস্থিত হয়ে বিদ্রোহীদেরকে আটক করলেন। উপায়ান্তর না দেখে ইয়াযীদ সুর পাল্টে বলল, 'আমরা খালীফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে একত্র হইনি; আমরা কেবল গভর্ণরের পরিবর্তন চাই; সাঈদের স্থলে অন্য কোন গভর্ণর নিয়োগ দেওয়া হোক।' তার বক্তব্য শুনে আল-কা'কা' তাকে ছেড়ে দিলেন, তবে তাকে সাবধান করে দিলেন এই বলে, 'এই উদ্দেশ্যে কখনো মাসজিদে বসবে না, তোমার সাথে যেন কেউ বৈঠকে মিলিত না হয়। তোমার কিছু চাওয়ার থাকলে খালীফার কাছে চাও, তোমার ন্যায্য দাবি নিশ্চয় পূরণ করা হবে।'[৪৩]

দশ. বহিষ্কৃতরা যোগ দিল ষড়যন্ত্রে:

বিদ্রোহের প্রথম পরিকল্পনা নস্যাৎ হওয়ার পর ইয়াযীদ ইবনু কায়স নতুন পরিকল্পনা আঁটল। সে চিন্তা করল বহিষ্কৃত ফিতনাবাজদের সহযোগিতা তার প্রয়োজন।

---

৪২. আত-তাবারী, ৪;৩৩০-৩১; ইবনুল আসীর, ২:৪২৫।
৪৩. আত-তাবারী, ৪:৩৩১।

এক লোক ভাড়া করে মুদ্রা ও খচ্চর দিয়ে তাকে হিম্‌সে বহিষ্কৃত বিদ্রোহীদের কাছে একটি চিঠি পাঠাল। চিঠিতে সে লিখল, 'এই চিঠি তোমাদের হাতে পৌঁছামাত্র তোমরা কূফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করবে। আমি মিসরে আমাদের ভাইদের সাথে যোগাযোগ করেছি, আমরা বিদ্রোহের ব্যাপারে একমত হয়েছি।' পত্রটি পাওয়ামাত্র আল-আশতার দলবলসহ কূফার উদ্দেশ্যে দ্রুত রওয়ানা করল। 'আবদুর রহমান পেছন পেছন লোক পাঠালেন, কিন্তু তারা কূফার বিদ্রোহীদেরকে পাকড়াও করতে পারল না। কূফায় পৌঁছে আল-আশতার, ইয়াযীদ ইবনু কায়সের সাথে মিলিত হল এবং একদল উচ্ছৃঙ্খল জনতাসহ মাসজিদে প্রবেশ করল। আল-আশতার চরম মিথ্যা বক্তব্য দিয়ে জনগণকে উত্তেজিত করল; সে বলল, 'আমি খালীফার কাছ থেকে এসেছি, ওখানে তোমাদের গভর্ণর সা'ঈদ ইবনুল 'আসকে রেখে এসেছি। আমি জেনেছি উসমান (রা.) ও সা'ঈদ মিলে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, তারা তোমাদের ভাতা কমিয়ে দেবেন। সা'ঈদ আরো মনে করে যে, তোমাদের ভূমি হল কুরাইশদের বাগান।' আল-আশতারের এই বক্তৃতা ছিল ডাহা মিথ্যা। সে তো মাদীনায় যায়নি। 'উসমান ও সা'ঈদের সাথে সাক্ষাৎ তো পরের কথা। এভাবে মিথ্যা তথ্য দিয়ে সে জনগণকে উত্তেজিত করল। মাসজিদে মহা শোরগোল শুরু হয়ে গেল। সৎকর্মশীল ও নেতৃস্থানীয়দের মাঝে কয়েকজন সেখানে উপস্থিত ছিলেন, যেমন, আবূ মূসা আল-আশ'আরী, আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ ও কা'কা' ইবনু 'আমর। তাঁরা লোকজনকে বুঝানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু কে শোনে কার কথা। চারদিকে বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হল।[৪৪]

শোরগোলের মাঝে ইয়াযীদ ইবনু কায়স চিৎকার দিয়ে বলল, 'আমি মাদীনার পথে রওয়ানা করলাম, গভর্ণর সা'ঈদকে কিছুতেই কূফায় ঢুকতে দেব না। তদস্থলে আমরা নতুন গভর্ণর দাবি করব। কে আছো যে আমার সাথে যাবে?' সাবাঈ ও উচ্ছৃঙ্খল জনতা তার আহবানে সাড়া দিল, হাজারখানেক লোক তার অনুসরণ করে কূফা হতে মাদীনার রাস্তা ধরে বেরিয়ে গেল।[৪৫]

বিদ্রোহীরা মাসজিদ হতে বের হয়ে যাওয়ার পর নেতৃস্থানীয় ও অভিজাত মুসলিমদের কয়েকজন মাসজিদে ছিলেন; ভারপ্রাপ্ত গভর্ণর তাদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বক্তব্যে একতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ বজায় রাখার আহবান জানালেন। কা'কা' ইবনু 'আমর শক্তি প্রয়োগের প্রস্তাব করলেও ঐ সময় পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ ছাড়া আর কিছু করার উপায় ছিল না।

---

৪৪. আত-তাবারী, ৪: ৩৩১; ইবনুল আসীর, ২:৪২৫।
৪৫. আত-তাবারী, ৪: ৩৩২।

এগার. বিদ্রোহীরা সা'ঈদকে কূফায় প্রবেশ করতে দিল নাঃ

ইয়াযীদ ইবনু কায়স ও আল-আশতার আন্-নাখা'ঈ-এর নেতৃত্বে হাজার খানেক লোক কূফা হতে বের হয়ে মাদীনার পথে জারা'আ নামক জায়গায় অবস্থান নিল। ওদিকে সা'ঈদ ইবনুল 'আসও কূফার দিকে আসছিলেন। তাকে দেখতে পেয়ে বিদ্রোহীরা বলল, 'আমরা তোমাকে চাই না, তোমাকে কূফায় প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। তুমি যেখান থেকে এসেছ সেখানে ফিরে যাও। খালীফাকে গিয়ে বল আমরা তোমার স্থলে আবূ মূসা আল-আশ'আরীকে গভর্ণর হিসেবে পেতে চাই।' জবাবে সা'ঈদ বললেন, 'কি আশ্চর্য! এই কথাটুকু আমাকে বলার জন্য তোমরা এক হাজার লোক এসেছ? তোমাদের দাবি নিয়ে আমীরুল মু'মিনীনের কাছে একজন লোক পাঠানোই যথেষ্ট ছিল। বিষয়টি আমাকে জানানোর জন্য আরেকজনকে নিয়োগ দিলেই হত। একজনকে প্রতিরোধ করার জন্য তোমরা এক হাজার লোক রাস্তায় নামলে– সুস্থ বিবেক কি এটি সমর্থন করে?'[৪৬]

সা'ঈদ চিন্তা করলেন, এদের মুকাবিলা করা উচিত হবে না এবং তা সম্ভবও নয়; বরং ফিতনার আগুন নিভিয়ে ফেলা উচিত। তাই বিদ্রোহীদের সাথে তর্কে লিপ্ত না হয়ে তিনি মাদীনায় ফিরে গেলেন। খালীফা জিজ্ঞেস করলেন, 'ওরা কি আনুগত্য ত্যাগ করেছে? ওরা কি খালীফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে?' সা'ঈদ বললেন, 'না, তারা আমাকে গভর্ণর হিসেবে দেখতে চায় না।' উসমান (রা.) বললেন, 'তারা কাকে চায়?' সাঈদ বললেন, 'তারা আবূ মূসা আল-আশ'আরীকে গভর্ণর হিসেবে পেতে চায়।' খালীফা বললেন, 'আমি কূফার গভর্ণর হিসেবে আবূ মূসাকে নিয়োগ দিলাম। আল্লাহর শপথ! আমি কারো ওজর অবশিষ্ট রাখব না, কারো কোন দাবি অপূরণ রাখব না, যথাসাধ্য ধৈর্যধারণ করব, আমাকে জানতে হবে তাদের দাবির প্রকৃত রহস্য কি।' আবূ মূসাকে কূফার গভর্ণর হিসেবে নিয়োগ করে উসমান (রা.) পত্র দিলেন।[৪৭]

বার. বিশৃঙ্খলা প্রতিরোধে আবূ মূসার (রা.) পদক্ষেপঃ

'উসমান (রা.)-এর পত্র প্রাপ্তির পর আবূ মূসা জনগণের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেনঃ 'এভাবে বেরিয়ে পড় না, অনুরূপ অবাধ্যতায় পুনরায় ফিরে যেও না, তোমাদের দল ও আনুগত্য আঁকড়ে ধরো। তোমরা তাড়াহুড়া করো না, বরং ধৈর্যধারণ কর। এখন তো তোমাদের পছন্দনীয় আমীর রয়েছে।' লোকজন বলল, 'তাহলে আপনি আমাদেরকে সাথে নিয়ে সালাত আদায় করুন।' আবূ মূসা (রা.) বললেন, 'না, আগে তোমরা উসমান (রা.)-এর আনুগত্য করার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দাও।' তারা বলল, 'আমরা উসমান (রা.)-এর আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি দিলাম।'[৪৮]

---

৪৬. প্রাগুক্ত।
৪৭. প্রাগুক্ত।
৪৮. প্রাগুক্ত।

মুখে মুখে তারা আনুগত্যের ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দিলেও অন্তরে অন্তরে হিংসা-দ্বেষ পোষণ করেছিল। আবূ মূসা গভর্ণর হওয়ার পর কিছুদিনের জন্য কূফার পরিস্থিতি শান্ত ছিল। জিহাদের ময়দানে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান আজারবাইজানে ফিরে গেলেন; অন্যান্য প্রশাসক প্রদেশের বিভিন্ন প্রান্তে চলে গেলেন।

তের. কূফার বিদ্রোহীদের প্রতি 'উসমান (রা.)-এর চিঠি:

কূফার বিদ্রোহীদের প্রতি 'উসমান (রা.) একটি পত্র দিলেন। এই পত্রে তিনি নতুন গভর্ণর নিয়োগের ঘোষণা দেন। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পত্র যাতে ফিতনা মুকাবিলায় 'উসমান (রা.)-এর কর্মধারা ফুটে ওঠেছে। 'উসমান (রা.) লিখেন,

أما بعد، فقد أمرت عليكم من اخترتم، وأعفيتكم من سعيد، والله لأفرشنّ لكم عرضي، ولأبذلنّ لكم صبري، ولأستصلحنكم بجهدي، واسألوني كل ما أحببتم، مما لا يعصي الله فيه، فسأعطيه لكم، و لا شيئا كرهتموه لا يعصى الله فيه إلا استعفيتم منه، أنزل فيه عند ما أحببتم، حتى لا يكون لكم علي حجة

হামদ ও সালাতের পর, আমি তোমাদের পছন্দনীয় আমীর নিয়োগ দিয়েছি, সা'ঈদকে অব্যাহতি দিয়েছি। আল্লাহর শপথ! আমি তোমাদের জন্য আমার সম্মান বিছিয়ে দেব, তোমাদের জন্য আমি ধৈর্যধারণ করব এবং সাধ্যানুযায়ী তোমাদের কল্যাণ কামনা করব। আল্লাহর অবাধ্যতা নেই এমন পছন্দনীয় বিষয় আমার কাছে দাবি কর, আমি তোমাদের দাবি পূরণ করব। তেমনিভাবে তোমাদের অপছন্দের বিষয় আমাকে জানাও, আমি তা সরিয়ে নেব, তোমাদের পছন্দের কাছে আমি নেমে আসব, যাতে আমার বিরুদ্ধে তোমাদের কোন হুজ্জত না থাকে।[৪৯]

---

৪৯. আত-তাবারী, ৪:৩৩৬।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতি মুকাবিলায় 'উসমান (রা.) কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ

প্রকৃতিগতভাবে 'উসমান (রা.) দয়ালু ও কোমল স্বভাবের ছিলেন। কোন পরিস্থিতিতে তিনি কঠোর ভূমিকা ও পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। সর্বদা আলাপ-আলোচনা ও দাবি পূরণের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছেন। তাঁর খিলাফাতের শেষ দিকে ফিতনাবাজরা বিদ্রোহ করলে তিনি ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতি মুকাবিলার চেষ্টা করেন। তাঁর গৃহীত পদক্ষেপ পর্যালোচনায় দেখা যায় তিনি সর্বদা দু'টো বিষয়কে প্রাধান্য দিয়েছেন, এক: শক্তি প্রয়োগ না করা, দুই: সকল বৈধ দাবি পূরণ করা। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য এই যে, বিদ্রোহীদের দাবি-দাওয়া ছিল খালীফাকে অপসারণের অজুহাত সৃষ্টির অংশ। খালীফা কোন দাবি পূরণ না করলে সেই সূত্র ধরে অপসারণের দাবি উত্থাপন করাই ছিল বিদ্রোহীদের দাবি-দাওয়ার মূল লক্ষ্য। দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতি মুকাবিলায় 'উসমান (রা.) যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন তা উল্লেখ করা হচ্ছে:

এক. গভর্ণরদের সম্মেলন:

খিলাফাতের বিভিন্ন স্থানে বিশৃঙ্খলাকারীদের তৎপরতার বিষয়ে করণীয় নির্ধারণের জন্য 'উসমান (রা.) ৩৪ হিজরীতে গভর্ণরদের বিশেষ সম্মেলন আহ্বান করলেন। গভর্ণরদের মাঝে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বাসরার গভর্ণর 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমির, সিরিয়ার গভর্ণর মু'আবিয়া ইবনু আবি সুফইয়ান, মিসরের গভর্ণর আবদুল্লাহ ইবনু সা'দ ইবনু আবি সারহ ও কূফার গভর্ণর সা'ঈদ ইবনুল 'আস; আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে বৈঠকে যোগ দেন মিসরের সাবেক গভর্ণর 'আমর ইবনুল 'আস[৫০]। রুদ্ধদ্বার এই বৈঠকে সেই পরিস্থিতিতে করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। উদ্বোধনী বক্তব্যে 'উসমান (রা.) বলেন, 'প্রত্যেক শাসকের মন্ত্রী ও উপদেষ্টা থাকে; আমার মন্ত্রী বল, উপদেষ্ট বল– সবই তোমরা। মানুষের কর্মকাণ্ড তোমরা দেখতেই পাচ্ছো। ওরা একের পর এক গভর্ণরের পদত্যাগ দাবি করছে। ওরা চায় তাদের অপছন্দের কাজ ত্যাগ করে আমি ওদের মর্জিমত চলি। তোমরা ভেবেচিন্তে আমাকে পরামর্শ দাও।'[৫১]

বাসরার গভর্ণর 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমির বললেন, 'আপনি এদেরকে বিভিন্ন বাহিনীতে প্রেরণ করে জিহাদে মশগুল রাখুন; তাহলে ওরা নিজেদের মাথার উকুন নিয়ে

---

৫০. ইবনু কাসীর উল্লেখ করেছেন যে, ওই সময় 'আমর ইবনুল 'আস মিসরের গভর্ণর ছিলেন [৭:১৬৭]। তাঁর মত তথ্যানুসন্ধানী ঐতিহাসিকের কাছ থেকে এ ধরনের তথ্যপ্রাপ্তি একেবারেই অপ্রত্যাশিত। 'আমর (রা) কয়েক বছর আগে মিসরের গভর্ণরী হতে অপসারিত হয়েছিলেন।

৫১. আত-তাবারী, ৪:৩৩৩; ইবনুল আসীর, ২:৪২৬।

ব্যস্ত থাকবে, নিজের বাহন পরিচালনায় মশগুল থাকবে এবং আপনার বিরুদ্ধে গুজব ছড়ানোর অবকাশ পাবে না।'

'উসমান (রা.) এবার কূফার গভর্ণরের পরামর্শ চাইলেন। সা'ঈদ ইবনুল 'আস বললেন, 'আমার পরামর্শ গ্রহণ করলে আপনার রোগ নিরাময় হবে এবং বিপদ কেটে যাবে।' খালীফা বললেন, 'পরামর্শটি কি সেটি বল।' সা'ঈদ বললেন, 'প্রত্যেক সম্প্রদায়ের কয়েকজন নেতা থাকে, যারা ধ্বংস হয়ে গেলে অনুসারীরা বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। আপনি এদের নেতাদেরকে নির্মূল করুন।'

মু'আবিয়া (রা.) বললেন, 'প্রত্যেক গভর্ণরকে নিজ নিজ প্রদেশকে সামলাতে বলুন। আমি সিরিয়দেরকে সামলাব।' 'আবদুল্লাহ ইবনু সা'দ ইবনু আবি সারহ বললেন, 'এরা লোভের বশবর্তী হয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে, অর্থের বিনিময়ে তাদেরকে বশীভূত করার চেষ্টা করুন, আশা করি তাদের মন প্রসন্ন হবে।'

তারপর 'উসমান (রা.) 'আমর ইবনুল 'আসের মতামত জানতে চাইলেন। তিনি বললেন, 'আমি মনে করি আপনি সন্তুষ্ট হয়ে তাদের সাথে কোমল আচরণ করছেন এবং 'উমার (রা.)-এর চেয়ে বেশি দান করছেন। আমার পরামর্শ আপনি আপনার পূর্বসূরির (উমারের) পন্থা অনুসরণ করুন; যেখানে কঠোর হওয়া প্রয়োজন সেখানে কঠোর হোন, আবার কোমল আচরণ প্রদর্শনের প্রয়োজন হলে তাই করুন। যারা নিজেদের অনিষ্ট হতে মানুষকে রেহাই দেয় না তাদের বিরুদ্ধে কঠোরতা প্রদর্শন করুন, যারা মানুষের কল্যাণকামী তারা কোমল আচরণ পাওয়ার যোগ্য। আপনি তো সবার প্রতি কোমলতা প্রদর্শন করেন।'[৫২]

'উসমান (রা.)-এর সিদ্ধান্ত: গভর্ণরদের সাথে পরামর্শের পর খালীফা এমন একটি সিদ্ধান্ত নিলেন যাতে সবার পরামর্শ ধারণ করার চেষ্টা ছিল। বিশেষ নির্দেশনাসহ সবাইকে নিজ নিজ প্রদেশে পাঠিয়ে দিলেন: সীমান্তে বাহিনী প্রেরণ, জনগণকে প্রদত্ত রাষ্ট্রীয় ভাতা অব্যাহত রাখা, বিদ্রোহীদের ওপর কঠোরতা আরোপ করা।[৫৩]

দুই. বিভিন্ন প্রদেশে অনুসন্ধান দল প্রেরণ:

মাদীনায় বসবাসরত সাহাবীগণ বিভিন্ন সূত্রে নানা প্রদেশে অস্থিরতার সংবাদ পেতেন। তাঁদের কেউ কেউ খালীফাকে পরামর্শ দিতেন। মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামা ও তালহা ইবনু 'উবাইদিল্লাহ (রা.) ও অন্যরা একবার ত্রস্তপদে 'উসমান (রা.)-এর কাছে গিয়ে বললেন, 'আমীরুল মু'মিনীন! বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আমরা যে সংবাদ পাচ্ছি তা কি আপনার কাছে পৌঁছেছে?' তিনি জবাব দিলেন, 'আমি তো শান্তি ছাড়া অন্য কোন খবর

---

৫২. আত-তাবারী, ৪:৩৩৪।
৫৩. আত-তাবারী, ৪:৩৩৫; ইবনুল আসীর, ২:৪২৭; ইবনু কাসীর, ৭:১৬৭।

জানি না।' তখন সাহাবীগণ বিদ্রোহীদের তৎপরতা সম্পর্কে খালীফাকে অবহিত করলেন। খালীফা তাঁদের কাছে পরামর্শ চাইলে তারা বললেন, 'আপনি আস্থাভাজন ব্যক্তিদের সমন্বয়ে কয়েকটি তদন্ত দল গঠন করুন এবং তাদেরকে বিভিন্ন শহরে প্রেরণ করুন; ওরা আপনার কাছে সঠিক সংবাদ নিয়ে আসবে।'[৫৪]

'উসমান (রা.) চার বিশিষ্ট সাহাবীর নেতৃত্বে চারটি অনুসন্ধান দল গঠন করে তাদেরকে গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশসমূহের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য প্রেরণ করলেন; মুহাম্মদ ইবনু মাসলামা (রা.)-কে কূফায়, উসামা ইবনু যায়িদ (রা.)-কে বাসরায়, 'আম্মার ইবনু ইয়াসির (রা.)-কে মিসরে ও আবদুল্লাহ্ ইবনু 'উমার (রা.)-কে সিরিয়ায় প্রেরণ করলেন। এই সাহাবীগণ তাঁদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে মাদীনায় ফিরে এলেন; আম্মার অবশ্য কিছুটা দেরি করে ফিরলেন। তাঁরা বিভিন্ন প্রদেশের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে এবং স্থানীয়দের সাথে আলাপচারিতার আলোকে উসমান (রা.)-এর কাছে রিপোর্ট করলেন। তাঁরা জানালেন, জনগণ সুখে-শান্তিতে দিনযাপন করছে, গভর্ণররাও ন্যায়পরায়ণতার সাথে শাসনকাজ পরিচালনা করছেন, অতএব কোন গভর্ণর বা প্রশাসককে অপসারণের কোন কারণ সৃষ্টি হয়নি। গভর্ণরদের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে তা মিথ্যা বৈ আর কিছু নয়। 'উসমান (রা.) তাঁদের এ রিপোর্ট পেয়ে সন্তোষ প্রকাশ করলেন এবং জনসাধারণের উদ্দেশ্যে প্রত্যেক প্রদেশে পত্র প্রেরণ করলেন।[৫৫]

তিন. প্রদেশসমূহে পত্র প্রেরণ:

তদন্ত দলের প্রতিবেদন পাওয়ার পর 'উসমান (রা.) জনগণের উদ্দেশ্যে লিখলেন:

أما بعد، فإني آخذ العمال بموافاتي في كل موسم، وقد سلطت الأمة منذ وليت على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا يرفع عليّ شيئ ولا على أحد من عمالي إلا أعطيته، وليس لي ولعيالي حق قبل الرعية إلا متروك لهم. وقد رفع إليّ أهل المدينة أن أقواما يشتمون، وآخرون يضربون، فيا من ضرب سرا وشتم سرا، ومن ادعى شيئا من ذلك فليواف الموسم فليأخذ بحقه حيث كان، مني أو من عمالي؛ أو تصدقوا فإن الله يجزي المتصدقين.

হামদ ও সালাতের পর, প্রতি বছর মৌসুমী সাক্ষাতের সময় আমি গভর্ণরদের জিজ্ঞাসাবাদ করে থাকি; যেদিন দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছি সেদিন থেকে

৫৪. আত-তাবারী, ৪:৩৪১; ইবনুল আসীর, ২:৪৩০।
৫৫. ইবনুল আসীর ২:৪৩০; আত-তাবারী, ৪:৩৪১।

আমি উম্মাহকে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ হতে বারণ করেছি। আমার ও আমার গভর্ণরদের কাছে কোন দাবি উত্থাপন করা হলে তা পূরণ করা হয়েছে। প্রজাদের অধিকার আদায়ের জন্য আমার ও আমার পরিবারের অধিকার বর্জিত। মাদীনাবাসী আমার কাছে অভিযোগ পেশ করেছে যে, কিছু লোক নিন্দা করছে, আর কিছু লোক অপপ্রচার চালাচ্ছে যারা গোপনে নিন্দা করছে বা গোপনে অপপ্রচার করছে তাদেরকে বলছি, কারো কোন দাবি থাকলে সে যেন (হাজ্জ) মৌসুমে তা আমার বা আমার গভর্ণরের কাছ থেকে যথাযথভাবে আদায় করে নেয়। অবশ্য কেউ চাইলে সাদাকাহ করে দিতে পারে; আল্লাহ নিশ্চয় সাদাকাহকারীদেরকে ভালোবাসেন।

পত্রটি বিভিন্ন প্রদেশে জনগণ-মাঝে প্রচারিত হলে তারা সাশ্রু নয়নে ও ভক্তিময় কণ্ঠে খালীফার জন্য দু'আ করল।[৫৬]

চার. গভর্ণরদের সাথে দ্বিতীয় দফা[৫৭] পরামর্শ:

খিলাফাতের বিভিন্ন স্থানে বিশৃঙ্খলাকারীদের তৎপরতার বিষয়ে করণীয় নির্ধারণের জন্য 'উসমান (রা.) ৩৪ হিজরীর হাজ্জ মৌসুমে আবার গভর্ণরদের সাথে বৈঠকে মিলিত হলেন। গভর্ণরদের মাঝে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বাসরার গভর্ণর 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমির, সিরিয়ার গভর্ণর মু'আবিয়া ইবনু আবি সুফইয়ান, মিসরের গভর্ণর আবদুল্লাহ ইবনু সা'দ ইবনি আবি সারহ। আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে যোগ দেন দুই সাবেক গভর্ণর: সা'ঈদ ইবনুল 'আস ও 'আমর ইবনুল 'আস। রুদ্ধদ্বার এই বৈঠকে সেই পরিস্থিতিতে করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। উদ্বোধনী বক্তব্যে 'উসমান (রা.) বলেন, 'কিসের অভিযোগ শোনা যাচ্ছে? এই অপপ্রচার কেন? আল্লাহর শপথ, আমার ভয় হয় বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা তোমাদের কার্যকালে সত্যে পরিণত হবে এবং তা আমাকেই বেড়াজালে বন্দী করবে।' গভর্ণরগণ বললেন, 'আপনি কি অনুসন্ধান দল প্রেরণ করেননি? তারা কি জনগণের মনোভাব আপনাকে জানায়নি? আপনি তো জানেন তাদের কাছে কেউ কোন অভিযোগ উত্থাপন করেনি। আল্লাহর শপথ, যারা অপপ্রচার চালাচ্ছে তারা সত্য

---

৫৬. আত-তাবারী, ৪:৩৪২; ইবনুল আসীর, ২:৪৩১।

৫৭. আত-তাবারী ও ইবনুল আসীর– এঁদের প্রত্যেকে গভর্ণরদের সাথে 'উসমান (রা)-এর দু'টি বৈঠকের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথমটি ৩৪ হিজরীতে এবং দ্বিতীয়টি ৩৫ হিজরীতে। গভর্ণরদের পরামর্শের বিবরণও ভিন্নরকম এসেছে। এতে প্রতীয়মান হয় গভর্ণরদের সাথে 'উসমান (রা) দুই দফা পরামর্শ করেছিলেন। প্রথমটি ৩৪ হিজরীর প্রারম্ভে তদন্ত দল প্রেরণের পূর্বে, দ্বিতীয় বৈঠকটিকে তাবারী ও ইবনুল আসীর ৩৫ হিজরীর ঘটনা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তবে আমাদের ধারণা ওটি ৩৪ হিজরীর হাজ্জ মৌসুমে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কারণ ইবনুল আসীর দ্বিতীয় বৈঠকটিকে ৩৫ হিজরীর মৌসুমী বৈঠকের বিবরণ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। এটি একেবারেই পরিষ্কার যে, ৩৫ হিজরীতে কোন মৌসুমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়নি। কারণ ওই বছর 'উসমান (রা) হাজ্জে যেতে পারেননি। অতএব দ্বিতীয় বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ৩৪ হিজরীর হাজ্জ মৌসুমে।

বলছে না, তাদের কাজে কোন পুণ্য নেই, আমরা এই অপপ্রচারের কোন ভিত্তি আছে বলে জানি না। এটি আমলযোগ্যও নয়।' 'উসমান (রা.) বললেন, 'তাহলে তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও।' সা'ঈদ ইবনুল 'আস বললেন, 'এই অপপ্রচার গোপন পরিকল্পনার অংশ; অজ্ঞ লোকদের মাঝে এগুলো ছড়িয়ে দেওয়া হয়, পরবর্তীতে বিভিন্ন মাজলিসের আলাপ-আলোচনায় এটির প্রসার ঘটে।' 'উসমান (রা.) বললেন, 'এটি প্রতিরোধের উপায় কি?' সা'ঈদ জবাব দিলেন, 'বিশৃঙ্খলায় উস্কানিদাতা অপপ্রচারকারীদেরকে তলব করুন, তারপর তাদেরকে মৃত্যুদণ্ড দিন।'

'আবদুল্লাহ ইবনু সা'দ বললেন, 'মানুষের অধিকার প্রদানের পাশাপাশি তাদের কাছ থেকে রাষ্ট্রের পাওনা আদায় করুন। তাদেরকে ছেড়ে দেওয়ার চেয়ে এটা করা ভাল।' মু'আবিয়া (রা.) বললেন, 'আপনি আমাকে গভর্ণর হিসেবে নিয়োগ করেছেন, আমার এলাকার লোকদের দিক থেকে ভাল খবর বৈ মন্দ কিছু শুনতে পাননি। অন্য দু'গভর্ণর তাদের এলাকা সম্পর্কে ভাল জানেন।' খালীফা বললেন, 'তোমার অভিমত বল।' তিনি বললেন, 'শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া।' তারপর 'উসমান (রা.) 'আমর ইবনুল 'আসের মতামত জানতে চাইলেন। তিনি বললেন, 'আমি মনে করি আপনি সন্তুষ্ট হয়ে তাদের সাথে কোমল আচরণ করছেন এবং 'উমার (রা.)-এর চেয়ে বেশি দান করছেন। আমার পরামর্শ হল আপনি আপনার পূর্বসূরির (উমারের) পন্থা অনুসরণ করুন; যেখানে কঠোর হওয়া প্রয়োজন সেখানে কঠোর হোন, আবার কোমল আচরণ প্রদর্শনের প্রয়োজন হলে তাই করুন। যারা নিজেদের অনিষ্ট হতে মানুষকে রেহাই দেয় না তাদের বিরুদ্ধে কঠোরতা প্রদর্শন করুন, যারা মানুষের কল্যাণকামী তারা কোমল আচরণ পাওয়ার যোগ্য। আপনি তো সবার প্রতি কোমলতা প্রদর্শন করেন।'

গভর্ণরদের পরামর্শ গ্রহণের পর 'উসমান (রা.) বললেন, 'তোমাদের পরামর্শ আমি শুনলাম, প্রতিটি কাজ সম্পাদনের নির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে; এই উম্মাহর ওপর যে বিপদ আপতিত হওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে তার আগমন অবশ্যম্ভাবী; তবে আমি কোমলতার সাথে পরিস্থিতি মুকাবিলা করব। তারপরও যদি দুর্যোগের দ্বার উন্মোচিত হয় তবে আমার বিরুদ্ধে কারো কোন হুজ্জত থাকবে না। আল্লাহ জানেন যে আমি জনগণের কল্যাণ কামনায় কোনদিন কসুর করিনি। তবুও ফিতনার চাকা ঘুর্ণায়মান; 'উসমান (রা.)-এর জন্য সুসংবাদ সে যদি নিজে ওই চাকা না ঘুরিয়েই মারা যায়। তোমরা জনগণকে শান্ত কর, তাদের অধিকার প্রদান কর, তাদেরকে ক্ষমা কর।'[৫৮]

মু'আবিয়ার (রা.) বিকল্প প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান: মু'আবিয়া আসন্ন ফিতনার উদ্গীরন সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। সিরিয়ায় ফিরে যাওয়ার পূর্বে তিনি খালীফার নিরাপত্তার কথা ভেবে দু'টো বিকল্প প্রস্তাব দিলেন।

---

৫৮. আত-তাবারী, ৪:৩৪৩; ইবনুল আসীর, ২:৪৩১।

এক: 'হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনার ওপর অচিন্তনীয় বিপদ আপতিত হওয়ার আগেই আপনি আমার সাথে সিরিয়ায় চলুন।' 'উসমান (রা.) বললেন, 'আমি পৃথিবীর কোন কিছুর বিনিময়ে রাসূলুল্লাহর প্রতিবেশিত্ব বিক্রি করতে পারব না, এতে আমার ঘাড়ের রগ কাটা গেলে যাবে।'

দুই: আমাকে সিরিয়া হতে একটি বাহিনী প্রেরণ করার অনুমতি দিন; তারা মাদীনায় অবস্থান করে সম্ভাব্য বিপদ ও দুর্যোগ থেকে আপনাকে ও মাদীনাবাসীকে রক্ষা করবে।' উসমান (রা.) বললেন, 'না, তোমার বাহিনী নিয়োগ দিয়ে আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতিবেশীদের রিয্ক সংকুচিত করতে পারব না আর না আমি হিজরাত ও বিজয়ী যোদ্ধাদের সংকটে ফেলতে পারি।'

বিকল্প প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় খালীফার নিরাপত্তার ব্যাপারে মু'আবিয়া (রা.) আতঙ্কিত হয়ে বললেন, 'আমীরুল মু'মিনীন! আল্লাহর শপথ! আত্মরক্ষার্থে প্রতিরোধ লড়াই না করলে ওরা আপনাকে হত্যা করবে।' খালীফা জবাব দিলেন, 'আল্লাহ্ই আমার জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কতইনা উত্তম কর্মবিধায়ক।'[৫৯]

পাঁচ. ফিতনা মুকাবিলায় উসমান (রা.)-এর পদক্ষেপের মূলনীতি:

ফিতনা মুকাবিলায় পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে 'উসমান (রা.) কিছু মূলনীতি অবলম্বন করেছিলেন। নিম্নে সেগুলো বিধৃত করা হল:

১. স্থিরতা: ফিতনা মুকাবিলায় পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে 'উসমান (রা.) তাড়াহুড়া করেননি। বরং তিনি ধীরস্থিরভাবে সব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। অনুসন্ধান দল প্রেরণ করে পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করেছেন। ক্ষেত্রবিশেষে সংস্কার ও সংশোধনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।

২. ইনসাফ অবলম্বন: শত উস্কানির মধ্যেও 'উসমান (রা.) ইনসাফ পরিত্যাগ করেননি। ফিতনার উন্মেষের প্রাক্কালে তিনি জনগণের উদ্দেশ্যে যে পত্র দেন তাতে ইনসাফের বাণী উচ্চারণ করেছেন, নায্যতা ও সমতার ভিত্তিতে সকলের দাবি পূরণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

৩. ধৈর্য ও স্থৈর্য: 'উসমান (রা.) ছিলেন ধৈর্য ও স্থৈর্যের মূর্ত প্রতীক। বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি মুকাবিলায় তিনি সর্বদা ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন। কূফাবাসী সা'ঈদ ইবনুল 'আস-এর অপসারণের দাবি করলে তিনি তা মেনে নেন এবং তাদের পছন্দ অনুযায়ী আবূ মূসা আল-আশ'আরীকে গভর্ণর নিযুক্ত করেন। ওই সময় কূফাবাসীর উদ্দেশ্যে যে পত্র প্রদান করেন তাতে তিনি লিখেন, 'আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের জন্য স্বীয় সম্মান বিছিয়ে দেব, তোমাদের জন্য ধৈর্য সহকারে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখব, সাধ্যানুযায়ী তোমাদের কল্যাণে কাজ করে যাব, আল্লাহর অবাধ্যতা হয় না এমন যা কিছু তোমরা

---

৫৯. আত-তাবারী, ৪:৩৪৫।

পছন্দ কর তা আমার কাছে দাবি করতে পারো; তেমনিভাবে আল্লাহর অবাধ্যতা হয় না এমন যা কিছু তোমরা অপছন্দ কর তা অপসারণের জন্য আমাকে অনুরোধ করতে পার।'

৪. ঐক্য বজায় রাখা ও বিভেদ দূর করা: ফিতনা ও বিশৃঙ্খলার মুকাবিলায় উসমান (রা.) উম্মাহর ঐক্য বজায় রাখার বিষয়ে সবিশেষ নজর রাখতেন। তিনি কখনো এমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন না যাতে বিভেদ সৃষ্টি হয় এবং উম্মাহর ঐক্যে ফাটল সৃষ্টি হয়। উম্মাহর একতা ধরে রাখার জন্য 'উসমান (রা.) যে পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করেছিলেন তার একটি উদাহরণ হল কুরআন একত্রীকরণ। আলকুরআন পঠনের ক্ষেত্রে বিভিন্নতা দেখা দিলে তিনি আবূ বাকর (রা.) কর্তৃক সংকলিত কুরআন অনুযায়ী এক কিরাআতের ওপর কপি তৈরি করে বিভিন্ন প্রদেশে প্রেরণ করেন; ফলে কুরআন পাঠে বিভিন্নতা দূর হয়।

আল-আশতার নাখা'ঈ যখন উসমান (রা.)-এর কাছে পদত্যাগের দাবি জানান তখনও 'উসমান (রা.) উম্মাহর ঐক্য বজায় রাখার চিন্তায় বিভোর। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদেরকে তাদের দাবি প্রত্যাহারের আহবান জানিয়ে তিনি বলেন, 'তোমরা আমাকে হত্যা করতে চাও? আমি তো মৃত্যুদণ্ড পাওয়ার মত কোন অপরাধ করিনি। আল্লাহর শপথ! তোমরা যদি আমাকে হত্যা কর তাহলে আমার পরে তোমরা কখনো পরস্পরকে ভালবাসতে পারবে না, আমার পরে তোমরা কখনো একত্রে সালাত আদায় করতে পারবে না, আমার পরে তোমরা কখনো শত্রুর বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ হয়ে লড়াই করতে পারবে না।[৬০]

৫. নিরবতা অবলম্বন ও অধিক বাক্যালাপ পরিহার: উসমান (রা.)-এর চরিত্রের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি কম কথা বলতেন এবং নিরবতা অবলম্বন করতেন। ফিতনার সময়ও আমরা তাঁকে অত্যধিক কথা বলতে দেখিনি।

৬. বিশিষ্ট সাহাবীদের পরামর্শ গ্রহণ: খিলাফাত পরিচালনায় 'উসমান (রা.) সদাসর্বদা বিশিষ্ট সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করতেন। সংকটকালে এই বক্তব্যটি আরো সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। সেই সময় মাদীনায় যেসব বিশিষ্ট সাহাবী ছিলেন তাঁদের সাথে 'উসমান (রা.) পরামর্শ করেছেন, যথা: আলী (রা.), তালহা (রা.), আয-যুবাইর (রা.), মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামা (রা.), ইবনু 'উমার (রা.), আবদুল্লাহ ইবনু সালাম (রা.) প্রমুখের সাথে তিনি পরামর্শ করেছেন।

---

৬০. ইবনু কাসীর, ৭:১৮৪।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
শাহাদাতের ঘটনাপঞ্জি

এক. গভর্ণরদের অনুপস্থিতিতে বিশৃঙ্খলার পরিকল্পনাঃ

মিসরে অবস্থান করে আবদুল্লাহ্ ইবনু সাবা' পত্র যোগাযোগের মাধ্যমে কূফা ও বাসরার বিশৃঙ্খলাকারীদেরকে একটি কর্মপরিকল্পনা দিয়েছিল, তা হলঃ গভর্ণরদের অনুপস্থিতিতে বিদ্রোহ করা। কিন্তু কূফা ব্যতীত অন্য কোন প্রদেশে এটি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি; ৩৪ হিজরীতে গভর্ণর সা'ঈদ যখন মাদীনায় খালীফার সাথে বৈঠকরত তখন কূফার সাবাঈ নেতা ইয়াযীদ ইবনু কায়স বিদ্রোহের ডাক দেয়। কিন্তু কূফার সেনাপতি কা'কা'র ত্বরিৎ পদক্ষেপে ঘটনা বেশিদূর এগোয়নি। ইয়াযীদ মতলব গোপন রেখে এই ঘোষণা দিতে বাধ্য হয় যে, সে খালীফার আনুগত্য ত্যাগ করেনি, তবে সে গভর্ণরের অপসারণ চায়। যা হোক বিশৃঙ্খলাকারীরা খুব বেশি নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে পারেনি। তারা জারা'আ নামক স্থানে অবস্থান নিয়ে সা'ঈদকে কূফায় প্রবেশে বাধা দেয়।[৬১] 'উসমানও (রা.) তাদের দাবি মেনে নিয়ে সা'ঈদকে অপসারণ করে তাদের পছন্দ অনুযায়ী আবূ মূসা আল-আশ'আরীকে (রা.) কূফার গভর্ণর হিসেবে নিয়োগ দেন। নতুন গভর্ণর কূফায় এসে জনগণের আনুগত্য ও বাই'আত নবায়ন করেন।[৬২]

দুই. মিসরীয় ফিতনাবাজদের প্রথমবার মাদীনায় আগমন (রজব ৩৫ হিজরী):

গভর্ণরদের অনুপস্থিতিতে বিদ্রোহ পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ার পর 'আবদুল্লাহ্ ইবনু সাবা নতুন পরিকল্পনা করল। ৩৫ হিজরীর রজব মাসে ৫০০ লোক নিয়ে মিসরীয়রা মাদীনায় আসল। জনগণকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য তারা 'উমরাহ্‌র ইহরাম বেঁধে বের হয়েছিল। এদের নেতা ছিল 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উদাইস আল-'আদাবি। মুহাম্মাদ ইবনু আবি বাক্‌রও মিসরীয় দলটির সাথে ছিল। ফিতনাবাজরা মাদীনার উপকণ্ঠে এসে অবস্থান নিল।

ওদিকে মিসরের গভর্ণর 'আবদুল্লাহ্ ইবনু সা'দ বিদ্রোহীদের মাদীনা যাত্রার খবর পেয়েছিলেন। তিনি দূত মারফত খালীফাকে জানিয়ে দেন যে, ফিতনাবাজরা 'উমরাহ্‌র বেশে মাদীনার দিকে রওয়ানা হয়েছে, বাহ্যিকভাবে ওরা বিভিন্ন দাবি-দাওয়ার কথা বললেও তাদের মূল লক্ষ্য হল খালীফার অপসারণ বা হত্যা।'[৬৩]

---

৬১. আত-তাবারী, ৪:৩৪৫; ইবনুল আসীর, ২:৪৩৩।
৬২. আত-তাবারী, ৪:৩৩২।
৬৩. আত-তাবারী, ৪:৩৪৬, ৩৫৮-৫৯; ইবনুল আসীর, ২:৪৩৫।

তিন. খালীফা কর্তৃক বিদ্রোহীদের মনোভাব জানার চেষ্টা:

মাদীনার উপকণ্ঠে বিদ্রোহীদের উপস্থিতির খবর পেয়ে 'উসমান (রা.) তাদের মনোভাব জানার চেষ্টা করলেন। তিনি বিদ্রোহীদের কাছে দু'জন লোক পাঠালেন। এঁদের একজন ছিলেন বানূ মাখযূমের, অপরজন বানূ যুহরার। কোন কারণে এরা খালীফার নির্দেশে শাস্তিপ্রাপ্ত হয়েছিল। তাই বিদ্রোহীদের কাছে পাঠানোর জন্য 'উসমান (রা.) এঁদেরকে বাছাই করলেন। খালীফা কর্তৃক দণ্ডপ্রাপ্ত দু'ব্যক্তিকে আসতে দেখে বিদ্রোহীরা নিশ্চিন্তে তাদের পরিকল্পনা প্রকাশ করল; তারা খালীফাকে অপসারণ বা হত্যা করতে চায়। মাদীনাবাসী লোকদ্বয় বলল,

'তোমাদের সাথে মাদীনার কেউ আছে কি?'

ওরা বলল, 'তিনজন আছে।'

'আর কেউ?'

'না।'

'তাহলে তোমরা কিভাবে তোমাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করবে?'

এই প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে বিদ্রোহীরা তাদের পরিকল্পনার ছক প্রকাশ করল: 'খালীফার কিছু পদক্ষেপের ব্যাপারে আমরা ইতোমধ্যে জনগণকে উত্তেজিত করেছি, সেগুলো পরিবর্তনের লক্ষ্যে আমরা খালীফার কাছে কিছু দাবি উত্থাপন করব। তিনি যদি তা মেনে না নেন তাহলে আমরা তাকে পদত্যাগ করতে চাপ দেব, অন্যথায় তাকে হত্যা করব।'

প্রেরিত ব্যক্তিদ্বয় বিদ্রোহীদের এই মনোভাব ও পরিকল্পনা খালীফাকে জানাল। 'উসমান (রা.) একটু মুচকি হাসলেন, তারপর বললেন, 'আল্লাহ! আপনি এদেরকে গোমরাহী থেকে বাঁচান, অন্যথায় এঁরা হতভাগ্য হবে।'[৬৪]

চার. শক্তি প্রয়োগের পরামর্শ প্রত্যাখ্যান:

এরপর সালাতের ঘোষণা দেয়া হল; 'উসমান (রা.) মাসজিদে গিয়ে মিম্বারের কাছে দাঁড়ালেন। চারপাশে বিশিষ্ট সাহাবীগণ একত্রিত হলেন। ওই দু'ব্যক্তি বিদ্রোহীদের মনোভাব ও পরিকল্পনার কথা জানাল। উপস্থিত সবাই একই পরামর্শ দিল: 'হে আমীরুল মু'মিনীন, আপনি এদেরকে হত্যা করুন। কারণ এরা খালীফাকে হত্যা করতে চায় এবং মু'মিনদের মাঝে বিভেদ, অনৈক্য ও ফাটল সৃষ্টি করতে চায়।'

সাহাবীদের পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করলেন খালীফা 'উসমান (রা.)। তিনি বিদ্রোহীদের হত্যা করার নির্দেশ দিলেন না, কারণ এরা মুসলিম (অন্তত বাহ্যিকভাবে)। মুসলিমের রক্তে 'উসমান (রা.) নিজ হাত রঞ্জিত করতে পারবেন না। তিনি বললেন, 'আমি এদেরকে হত্যা করব না। বরং আমি ওদেরকে ক্ষমা করে দেব। সাধ্যানুযায়ী

---

৬৪. আত-তাবারী, ৪:৩৪৬।

ধৈর্যধারণ করব। আমি কোন মুসলিমকে হত্যা করতে পারি না, যদি না সে মৃত্যুদণ্ডোপযোগী কোন অপরাধ করে বা মুরতাদ হয়ে যায়।'[৬৫]

পাঁচ. বিদ্রোহীদের অভিযোগ খণ্ডন:

অতঃপর খালীফা সাবাঈ বিদ্রোহীদের সন্দেহ-সংশয় দূর করার চেষ্ট করলেন এবং তাদের অপপ্রচারের জবাব দিলেন। তাদের প্রতিনিধিদেরকে মাসজিদে আহবান করা হল এবং প্রকাশ্য মাজলিসে সাহাবায়ে কিরাম ও সাধারণ নাগরিকদের উপস্থিতিতে তিনি তাদের বক্তব্য শুনলেন। ওরা নিজেদের ধারণানুযায়ী উসমান (রা.)-এর দোষত্রুটি ও ভুলগুলো উত্থাপন করল। এরপর 'উসমান (রা.) জবাব দিতে শুরু করলেন, প্রতিটি অভিযোগ পুনর্বার উল্লেখ করে তার জবাব দিতে লাগলেন। উপস্থিত জনমণ্ডলী অভূতপূর্ব এই সেশন অতি আগ্রহের সাথে অবলোকন করছিলেন যেখানে একজন খালীফা জনগণের প্রকাশ্য সমাবেশে জবাবদিহি করছিলেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ খণ্ডন করছিলেন।

উসমান (রা.) বক্তব্য শুরু করলেন:

ওরা বলে, 'আমি সফরে পূর্ণরূপে সালাত আদায় করেছি; ইতোপূর্বে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম), আবূ বাকর (রা.) ও 'উমার (রা.) অনুরূপ করেননি।' [আমি বলি] আমি মাদীনা হতে মাক্কায় গিয়ে সালাত পূর্ণরূপে আদায় করেছি (অন্য কোন সফরে সালাত পূর্ণরূপে আদায় করিনি); কারণ মাক্কায় আমার পরিবারের সদস্যরা বসবাস করে, অতএব ওই শহরে আমি পরিবারের মাঝে মুকীম হিসেবে অবস্থান করি। তাই নয় কি?' সাহাবীগণ বললেন, 'হ্যাঁ, তাই।'

লোকেরা বলে, 'আমি বিস্তীর্ণ চারণভূমি আমার নিজের উট চরার জন্য সংরক্ষণ করে মুসলিমদের ওপর সংকীর্ণতা আরোপ করেছি।' [আমি বলি] 'আমার পূর্বেও জিহাদ ও সাদাকাহ'র উট চরার জন্য চারণভূমি সংরক্ষিত ছিল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম), আবূ বাক্‌র (রা.) ও 'উমার (রা.)- এঁদের প্রত্যেকে জিহাদ ও সাদাকা'র উটের জন্য চারণভূমি সংরক্ষণ করেছেন। আমার আমলে সাদাকাহ ও জিহাদের উট বেড়ে যাওয়ার চারণভূমি সম্প্রসারণ করি। কিন্তু সরকারী চারণভূমিতে গরিব মুসলিমদের পশুচারণে আমি কখনো বাধা দেইনি। আমি কখনো আমার পশুর জন্য চারণভূমি সংরক্ষণ করিনি। আমি যখন খালীফা হই তখন আমি ছিলাম মুসলিমদের মাঝে অন্যতম সেরা উট ও ভেড়ার মালিক। এর সবগুলোই আমি আল্লাহর পথে ব্যয় করেছি। এখন আমার কোন ছাগল বা উট নেই; আছে মাত্র দু'টি উষ্ট্রী; এগুলোকেও আমি রেখেছি হাজ্জ পালনের জন্য। তাই নয় কি?' সাহাবীগণ বললেন, 'হ্যাঁ, তাই।'

---

৬৫. প্রাগুক্ত।

নিন্দুকেরা বলে, 'আমি কুরআনের একটি সংস্করণ রেখে বাকিগুলো জ্বালিয়ে দিয়েছি, এক পঠনপদ্ধতির ওপর লোকদেরকে একত্র করেছি।' [আমি বলি] 'আল্লাহ্র বাণী আলকুরআন আল্লাহর কাছ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। এটি একাধিক নয়, আমি তো আলকুরআনের ব্যাপারে মুসলিমদেরকে একতাবদ্ধ করেছি এবং মতভেদ করা হতে বারণ করেছি মাত্র। এই কাজে আমি আবূ বাক্র (রা.)-এর অনুসারী। তাই নয় কি?' সাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ্ সাক্ষী, হ্যাঁ তাই।'

সমালোচকরা বলে, 'আমি আল-হাকাম ইবনু আবিল 'আসকে মাদীনায় ফিরিয়ে এনেছি, অথচ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহূ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে তায়েফে নির্বাসিত করেছিলেন।' [আসল ব্যাপার হল এই যে] 'আল-হাকাম ইবনু আবিল 'আস মাক্কাবাসী ছিলেন, তিনি মাদীনাবাসী ছিলেন না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহূ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে মাক্কা হতে তায়েফে বহিষ্কার করেছিলেন। পরবর্তীতে তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তিনি তাকে মাক্কায় ফিরিয়েও এনেছিলেন। অতএব রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহূ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-ই তাকে তায়েফে নির্বাসন দিয়েছিলেন, আবার তিনিই তাকে ফিরিয়ে এনেছিলেন। তাই নয় কি?' সাহাবীগণ বললেন, 'হ্যাঁ, তাই।'

ওরা বলে, 'আমি তরুণদেরকে সরকারী পদে নিয়োগ দিয়েছি; যুবকদেরকে গভর্ণর বানিয়েছি।' [আমি বলি] আমি অযোগ্য কাউকে সরকারী পদে নিয়োগ দিইনি, এঁরা (সাহাবীগণ) তাদের কাজ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল, আমার নিয়োগকৃত গভর্ণরদের ব্যাপারে জানতে চাইলে এঁদেরকে জিজ্ঞেস করতে পার। আমার পূর্বসূরিগণ আরো কম বয়সীদের সরকারী দায়িত্বে নিয়োগ করেছেন; রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহূ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উসামা ইবনু যায়িদ (রা.)-কে সেনাপতি নিয়োগ করেছিলেন। তিনি (উসামা) আমার তরুণ গভর্ণরদের চেয়ে কম বয়সী ছিলেন। আমি যে পরিমাণ সমালোচনার শিকার, ওই নিয়োগ দেওয়ার কারণে তার চেয়ে বেশি সমালোচনার শিকার হয়েছিলেন খোদ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহূ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। তাই নয় কি?' সাহাবীগণ বললেন, 'হ্যাঁ, তাই। এই লোকগুলো মানুষের সমালোচনা করে, মানুষকে দোষারোপ করে, অথচ এর কারণ পরিষ্কার করে না।'

লোকেরা বলে, 'আমি আবদুল্লাহ্ ইবনু সা'দকে গানীমতের সম্পদ দান করেছি।' 'হ্যাঁ, আমি আফ্রিকার গানীমতের এক পঞ্চমাংশের এক পঞ্চমাংশ তাকে দিয়েছিলাম, এর পরিমাণ ছিল এক লাখ দিরহাম, তার জিহাদের প্রতিদানস্বরূপ তা আমি তাকে দিয়েছিলাম। কারণ যুদ্ধের আগেই আমি তাকে বলেছিলাম, 'আল্লাহ যদি তোমার হস্তে আফ্রিকার বিজয় দেন, তাহলে আমি তোমাকে গানীমতের সম্পদের এক পঞ্চমাংশের এক পঞ্চমাংশ নাফ্ল (বিজয়ী যোদ্ধাদের নির্দিষ্ট প্রাপ্যের অতিরিক্ত) হিসেবে প্রদান করব। অনুরূপ নাফ্ল আমার পূর্বে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহূ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম), আবূ বাকর (রা.) ও 'উমার (রা.)ও প্রদান করেছিলেন। পরবর্তীতে এই দানের ব্যাপারে মুজাহিদরা

আমার কাছে আপত্তি জানালে– যদিও খালীফার ঘোষণার ব্যাপারে তাদের আপত্তি জানানোর কোন অধিকার ছিল না– আমি ইবনু সা'দ-এর কাছ থেকে ওই সম্পদ ফিরিয়ে নিয়ে সৈনিকদের মাঝে বন্টন করেছি। ফলে ইবনু সা'দ গানীমাতের সম্পদ হতে অতিরিক্ত কিছুই গ্রহণ করেনি। তাই নয় কি?' সাহাবীগণ বললেন, 'হ্যাঁ, তাই।'

ওরা বলে, 'আমি আত্মীয়দেরকে ভালবাসি ও তাদেরকে দান করি।' [আমি বলি] নিকটাত্মীয়দের ভালোবাসা আমাকে কোন অন্যায় কাজ বা যুল্ম করতে প্ররোচিত করেনি। বরং তাদের ওপর দায়িত্ব অর্পণ করি ও তাদের কাছ থেকে রাষ্ট্রীয় প্রাপ্য আদায় করি। আর আমি তাদেরকে আমার ব্যক্তিগত সম্পদ হতে দান করি, আমি মুসলিমদের সম্পত্তি আমার জন্য বা অন্য কারো জন্য হালাল মনে করি না। আমি তো সেই ব্যক্তি যে কিনা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম), আবূ বাক্র ও 'উমার (রা.)-এর যুগে বিরাট অঙ্কের দান করেছে, আজ এই বয়সে যখন আমার জীবন শেষ প্রায়, এই বয়সে কি আমি ব্যয়কুণ্ঠ ও লোভী হয়ে গেলাম?! অবিশ্বাসীরা যা বলার বলুক। আমি মুসলিমদের কোন শহর হতে কোন সম্পদ গ্রহণ করিনি। ওইসব শহরের সম্পদ আমি সংশ্লিষ্ট জনগণের কল্যাণে ব্যয় করার নির্দেশ দিয়েছি। শহরগুলো হতে মাদীনায় কেবল গানীমাতের এক পঞ্চমাংশের এক পঞ্চমাংশ আনা হয়। মুসলিমরাই গানীমাতের সম্পদ যোগ্য হকদারদের মাঝে বন্টনের দায়িত্ব পালন করে। আল্লাহর শপথ! আমি গানীমাতের পঞ্চমাংশ বা অন্য কোন রাষ্ট্রীয় সম্পদ হতে কখনও এক কপর্দকও গ্রহণ করিনি। আমি ব্যক্তিগত সম্পদ হতে ব্যয় নির্বাহ করি, আত্মীয়-স্বজনকেও ব্যক্তিগত সম্পদ হতে প্রদান করি।

ওরা বলে, 'আমি বিজিত ভূমি নির্দিষ্ট কয়েকজন ব্যক্তিকে প্রদান করেছি।' [আমি বলি] 'বিভিন্ন অঞ্চল বিজয়ের ক্ষেত্রে আনসার, মুহাজির ও অন্যান্য মুজাহিদরা অংশগ্রহণ করেছে। বিজয়ীদের মাঝে যখন বিজিত ভূমি বন্টন করা হল তখন তাদের কেউ কেউ বিজিত ভূখণ্ডে বসবাস শুরু করলেন, কেউ কেউ ওই সম্পত্তির মালিকানা বজায় রেখে মাদীনায় ফিরে যান, কেউবা বিজিত ভূমির ওই ভূসম্পদ বিক্রি করে দেন। এটা তাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও সিদ্ধান্তের ব্যাপার। এ ব্যাপারে খালীফার হস্তক্ষেপের কোন সুযোগ নেই।'[৬৬]

এভাবে 'উসমান (রা.) তাঁর ওপর আরোপিত গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগসমূহের জবাব দিলেন। উপস্থিত সাহাবায়ে কিরাম তাঁর অবস্থান সমর্থন করেন।

মিম্বারের পাশে দাঁড়িয়ে 'উসমান (রা.) যখন বক্তৃতা করছিলেন তখন সাহাবায়ে কিরাম ও সাধারণ জনগণের পাশাপাশি বিদ্রোহীদের প্রতিনিধিরা তা শুনছিল। মুসলিমগণ 'উসমান (রা.)-এর বক্তব্যে প্রভাবিত হয়েছিলেন, তারা তাঁর কথা সত্যায়ন করেছিল;

---

৬৬. আত-তাবারী, ৪:৩৪৬-৪৮।

কিন্তু ষড়যন্ত্রকারী সাবাঈ বিদ্রোহীদের মনে কোন ভাবান্তরের উদয় হল না। কারণ ওরা সত্য জানার জন্য আসেনি; ওরা এসেছিল সত্যকে অস্বীকার করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য। সাহাবায়ে কিরাম এটি বুঝতে পেরেছিলেন; তাই তাঁরা শক্তি প্রয়োগে বিদ্রোহীদের দমনের পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু 'উসমান (রা.) তাঁদের পরামর্শ গ্রহণ করেননি, তিনি মুসলিম নামধারী কারো বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে রাজি ছিলেন না। তাদেরকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে নিজ নিজ প্রদেশে পাঠিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেন।

ছয়. আলী (রা.)-এর প্রচেষ্টা ও বিদ্রোহীদের স্বদেশ যাত্রা:

'উসমান (রা.)-এর বক্তব্যের পরও বিদ্রোহীরা শান্ত হল না; তারা যি- মারওয়া নামক স্থানে অবস্থান করছিল। তখন 'উসমান (রা.) তাঁদের সাথে আলাপ-আলোচনা করার জন্য 'আলী (রা.)-কে বিশেষভাবে অনুরোধ করলেন। 'আলী (রা.), প্রায় ত্রিশ জন আনসার ও মুহাজির সাহাবীকে[৬৭] নিয়ে মিসরীয় বিদ্রোহীদের অবস্থানস্থলে গেলেন। 'আলী (রা.) তাদের সাথে মিলিত হয়ে বললেন, 'আল্লাহর কিতাবের বিধানের আলোকে তোমাদের ক্ষোভ প্রশমনের ব্যবস্থা করা হবে, এই শর্তের ভিত্তিতে তোমরা ঐকমত্যে পৌঁছ।' আরেক বর্ণনায় দেখা যায়, তারা আলী (রা.)-এর সাথে বাগ্‌যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তাদের কয়েকজন বলল, 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চাচাতো ভাই ও আমীরুল মু'মিনীনের দূত আমাদের সামনে আলকুরআন উপস্থাপন করছেন, চল আমরা তাঁর প্রস্তাব মেনে নেই। আলাপ-আলোচনার পর তারা পাঁচ শর্তে ঐকমত্যে পৌঁছল: বহিষ্কৃতদেরকে ফিরিয়ে আনা হবে, বঞ্চিতদেরকে প্রদান করা হবে, ইনসাফের সাথে গানীমাতের সম্পদ বণ্টন করা হবে, বিশ্বস্ত ও শক্তিশালী শাসক নিয়োগ করা হবে এবং আবূ মূসা (রা.)-কে কূফার গভর্ণর হিসেবে বহাল রাখা হবে।' এরপর মিসরীয়রা স্বদেশে ফিরে গেল।[৬৮]

সাত. 'উসমান (রা.) তাওবা-এর ঘোষণা দিলেন:

মিসরীয়দের স্বদেশ যাত্রার মাধ্যমে আপাতত দুর্যোগ কেটে গেল। তবে 'আলী (রা.) আশঙ্কা করলেন মিসরীয়দের মত অন্য প্রদেশ থেকেও বিদ্রোহী বাহিনী মাদীনায় আসতে পারে। তাই মাদীনায় ফিরে এসে 'আলী (রা.), খালীফাকে অনুরোধ করলেন,

---

৬৭. 'আলী (রা)-এর সাথে যারা মিসরীয়দের কাছে গিয়েছিলেন তাঁদের মাঝে ছিলেন: মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামা, সা'ঈদ ইবনু যায়িদ, আবূ জাহম আল-'আদাবী, জুবাইর ইবনু মুত'ইম, হাকীম ইবনু হিযাম, মারওয়ান ইবনুল হাকাম, সা'ঈদ ইবনুল 'আস, 'আবদুর রহমান ইবনু 'আত্তাব ইবনু আসীদ, আবূ উসাইদ আস-সা'ইদী, আবূ হুমাইদ আস-সা'ইদী, যায়িদ ইবনু সাবিত, কা'ব ইবনু মালিক (রা) প্রমুখ [আত-তাবারী ৪:৩৫৯; ইবনুল আসীর, ২:৪৩৬]।

৬৮. আত-তাবারী, ৪:৩৫৮-৫৯; ইবনুল আসীর, ৪:৪৩৫-৩৬; ইবনু কাসীর, ৭:১৭০-৭১।

তিনি যেন জনগণের উদ্দেশ্য কর্মনীতি সংশোধনের ঘোষণা সম্বলিত বক্তব্য দেন– বিশেষত আত্মীয়-স্বজনকে প্রাধান্য দেওয়ায় জনমনে যে ক্ষোভ রয়েছে তা প্রশমনের ব্যবস্থা করেন, যাতে খালীফার কোন পদক্ষেপকে পুঁজি করে বিদ্রোহীরা জনগণকে বিভ্রান্ত করতে না পারে।

'আলী (রা.)-এর পরামর্শ অনুযায়ী খালীফা মাসজিদে ভাষণ দিলেন। রাষ্ট্রপরিচালনায় কোন ভুলত্রুটি হয়ে থাকলে তা সংশোধনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে আল্লাহ্র কাছে তাওবা করলেন। খালীফার বক্তব্যে জনমনে আস্থা ফিরে এল; তাঁর বক্তব্যে উপস্থিত জনতা এতটা প্রভাবিত হয়েছিল যে তারা কান্না সংবরণ করতে পারেনি।[৬৯]

আট. মারওয়ানের প্ররোচনা ও 'আলী (রা.)-এর বিরক্তি:

মাসজিদে তাওবার ঘোষণা সম্বলিত ভাষণ দেওয়ার পর খালীফা বাড়ি এলে তার দোরে কিছু লোক ভিড় করে। মারওয়ান এদের সাথে দুর্ব্যবহার করেন এবং কটু কথা বলেন। তাঁর আচরণে উপস্থিত লোকজন যারপরনেই বিরক্ত হয়ে 'আলী (রা.)-এর কাছে অভিযোগ করেন। আলী (রা.) অত্যন্ত বেজার হন এবং খালীফাকে বলেন, তিনি কোনদিন তাঁর সাহায্যে এগিয়ে আসবেন না।[৭০] এটি ছিল মারওয়ানের আচরণের বিরুদ্ধে ক্ষোভের প্রকাশ। 'আলী (রা.) কখনো খালীফাকে ত্যাগ করেননি। পরবর্তীতে বিদ্রোহীরা মাদীনা অবরোধ করলে খালীফাকে রক্ষায় 'আলী (রা.) সর্বোতভাবে প্রচেষ্টা চালিয়েছেন।

নয়. বিদ্রোহীদের দ্বিতীয়বার মাদীনায় আগমন (শাওয়াল ৩৫ হিজরী):

মিসরে অবস্থান করে 'আবদুল্লাহ ইবনু সাবা' বিদ্রোহের কলকাঠি নাড়ছিল। এবার সে সাহাবায়ে কিরামের নামে জাল চিঠি প্রচার করে জনগণকে উস্কিয়ে দিল। 'আলী, তালহা, যুবাইর ও 'আয়িশা (রা.)-এর নামে সে কিছু জাল চিঠি ছড়িয়ে দিল, যেগুলোতে খালীফাকে হত্যার উদ্দেশ্যে জনগণকে মাদীনা গমনের আহবান জানানো হয়। প্ররোচনামূলক পত্র বিনিময়ের মাধ্যমে 'আবদুল্লাহ্ ইবনু সাবা কূফা, বাসরা ও মিসর হতে মাদীনায় আগমনের জন্য তিনটি দল প্রস্তুত করে। তারা সিদ্ধান্ত নেয়, হাজ্জযাত্রীদের সাথে ইহরামের বেশে তারা বের হবে; পাছে কেউ যেন তাদেরকে সন্দেহ না করে, মাদীনায় এসে তারা হাজ্জযাত্রীদেরকে ত্যাগ করবে। মাদীনার হাজ্জযাত্রীরা শহর ত্যাগের পর তারা কার্যসিদ্ধিতে নেমে পড়বে; পদত্যাগে বাধ্য করা বা হত্যা করার জন্য তারা খালীফাকে অবরুদ্ধ করবে।

৩৫ হিজরীর শাওয়াল মাসে বিদ্রোহীরা মাদীনার উপকণ্ঠে উপস্থিত হল।

---

৬৯. আত-তাবারী, ৪:৩৬১; ইবনুল আসীর, ২:৪৩৭; ইবনু কাসীর, ৭:১৭২।
৭০. আত-তাবারী, ৪:৩৬২-৬৪; ইবনুল আসীর, ২:৪৩৭-৩৮; ইবনু কাসীর, ৭:১৭২-৭৩।

মিসরের বিদ্রোহীরা চারটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে এসেছিল; প্রতিটি গ্রুপে একজন করে দলনেতা ছিল, আবার একজন ছিল নেতাদের নেতা। চার গ্রুপের চার নেতা ছিল: আবদুর রহমান ইবনু 'উদাইস আল-বালাবী, কিনানা ইবনু বিশর আত-তুজিবী, সুদান ইবনু হুমরান আস-সাকুনী, কুতাইরা ইবনু ফুলান আস-সাকুনী; এদের শীর্ষ নেতা ছিল আল-গাফিকী ইবনু হার্‌ব আল-'আক্কী; সাবাঈ দলের প্রতিষ্ঠাতা ইয়াহুদী আবদুল্লাহ ইবনু সাবাও এই দলের সাথে ছিল। মিসরীয় দলে হাজার খানেক বিদ্রোহী ছিল। কূফা হতেও প্রায় হাজার খানেক বিদ্রোহী চার দলে বিভক্ত হয়ে বের হয়; এদের চার দলের নেতা ছিল: যায়িদ ইবনু সুহান আল-'আবদী, আল-আশতার আন্‌-নাখা'ঈ, যিয়াদ ইবনুন্‌ নাদর আল-হারিসী ও আবদুল্লাহ ইবনুল আসাম্ম; এদের শীর্ষ নেতার নাম 'আমর ইবনুল আসাম্ম।

বাসরা হতে আগত বিদ্রোহীদের সংখ্যাও ছিল প্রায় এক হাজার, এরাও চারটি দলে বিভক্ত হয়ে এসেছিল; এদের নেতাদের নাম: হুকাইম ইবনু জাবালা আল-'আবদী, বিশর ইবনু শুরাইহ আল-কায়সী, ইবনুল মুহার্‌রিস ইবনু আবদিল হানাকী, এদের শীর্ষনেতা হল হুরকূস ইবনু যুহায়র আস-সা'দী। প্রতিটি দল খালীফা হিসেবে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করে, মিসরীয়রা আলী ইবনু আবি তালিবের (রা.) নাম প্রস্তাব করল, কূফার বিদ্রোহীরা আয-যুবাইর ইবনুল আওয়ামের (রা.) নাম প্রস্তাব করল আর বাসরার বিদ্রোহীরা তালহা ইবনু 'উবাইদিল্লাহকে খালীফা বানাতে চাইল।[৭১] ব্যাপারটা এমন নয় যে, বিদ্রোহীরা বিশিষ্ট এই তিন সাহাবীর সমর্থক ছিল, কিম্বা এদের দাবিতে তাঁদের সমর্থন ছিল। বস্তুতঃ বিদ্রোহীরা জনগণকে বিভ্রান্ত করতেই এই দাবি তুলেছিল। তারা ভিন্ন ভিন্ন সাহাবীর নাম খালীফা হিসেবে প্রস্তাব করেছিল; কারণ তারা জনগণকে এই ধারণা দিতে চেয়েছিল যে, মাদীনায় তাদের আগমন পরিকল্পিত নয়, বরং খিলাফাতের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ শহরের বিক্ষুব্ধ নাগরিকদের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ হল তাদের এই বিদ্রোহ। পূর্বের আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, এটি ছিল জনবিচ্ছিন্ন একটি বিদ্রোহ•যা দীর্ঘদিনের ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়েছিল।

দশ. তিন শীর্ষ সাহাবী বিদ্রোহীদের প্রতিনিধিদেরকে তাড়িয়ে দিলেন:

তিন প্রদেশের বিদ্রোহী দলগুলো মাদীনার উপকণ্ঠে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থান করছিল: বাসরার বিদ্রোহীরা ছিল যু-খুশুব-এ, কূফার বিদ্রোহীরা ছিল আল-আ'ওয়াস-এ এবং মিসরীয়রা অবতরণ করেছিলেন যু-মারওয়ায়। প্রথমে তারা দু'জন লোক পাঠাল; কিন্তু কোন সাহাবী এদের সাথে কথা বললেন না।

বিদ্রোহীদের মাদীনায় আগমনের খবর পেয়ে 'আলী (রা.), খালীফার নিরাপত্তার

---

৭১. আত-তাবারী, ৪:৩৪৮-৪৯

জন্য ব্যক্তিগত উদ্যোগ গ্রহণ করেন; পুত্র আল-হাসান (রা.)-কে তিনি 'উসমান (রা.)-এর কাছে প্রেরণ করেন। অন্যদিকে নিজে কিছু সৈনিকসহ 'আহজারুয যায়ত'-এ অবস্থান নেন। মিসরীয় বিদ্রোহীদের একটি প্রতিনিধিদল 'আলী (রা.)-এর সাথে দেখা করে জানাল যে, তারা তাঁকে খালীফা বানাতে চায়। 'আলী (রা.) চিৎকার দিয়ে বললেন, 'সৎকর্মশীলগণ জানেন যে, যু-মারওয়া (অর্থাৎ মিসরীয় বিদ্রোহীরা) ও যু-খুশুব এর বাহিনী (অর্থাৎ বাসরার বিদ্রোহীরা) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মুখের ভাষায় অভিশপ্ত, তোমরা ফিরে যাও, আল্লাহ যেন তোমাদের প্রভাত শুভ না করেন।' 'আলী (রা.)-এর কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে মিসরীয় বিদ্রোহীরা তাঁবুতে ফিরে গেল।

অপরদিকে বিশিষ্ট সাহাবী তালহা (রা.)ও তাঁর দুই পুত্রকে 'উসমান (রা.)-এর কাছে প্রেরণ করেছিলেন। বাসরার বিদ্রোহীদের প্রতিনিধি তাঁর কাছে এলে তিনিও 'আলী (রা.)-এর অনুরূপ বক্তব্য শুনিয়ে তাদেরকে তাড়িয়ে দেন। কূফার একটি প্রতিনিধিদল আয-যুবাইর (রা.)-এর কাছে এল। তিনিও তাদেরকে ফিরিয়ে দিলেন।[৭২]

এগার. স্বদেশ যাত্রার ভান করে বিদ্রোহীদের আচানক মাদীনায় আগমন:

বিশিষ্ট সাহাবীদের কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে বিদ্রোহীরা নিজ নিজ প্রদেশ অভিমুখে রওয়ানা করল। পরবর্তী আলোচনায় দেখা যাবে এটি ছিল তাদের একটি কৌশল মাত্র; মাদীনাবাসীকে বিভ্রান্ত করার জন্য তারা স্বদেশ যাত্রার ভান করেছিল। সে যাই হোক ওদেরকে চলে যেতে দেখে মাদীনাবাসী হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। 'আলী, তালহা ও যুবাইর (রা.) নিজ নিজ বাসায় চলে গেলেন। খালীফার নিরাপত্তায় নিয়োজিত স্বেচ্ছাসেবক দলও চলে গেল। হঠাৎ একদিন দেখা গেল, তাকবীর ধ্বনি দিয়ে বিদ্রোহীরা একেবারে মাদীনার অভ্যন্তরে প্রবেশ করল। শহরের নিয়ন্ত্রণ নিয়েই তারা ঘোষণা দিল: 'কেউ অস্ত্রধারণ করলে তাকে হত্যা করা হবে, যে হস্ত সংবরণ করবে সে নিরাপদে থাকবে।'[৭৩]

আলী (রা.)-সহ বিশিষ্ট সাহাবীগণ তাঁদের ফিরে আসার কারণ জিজ্ঞেস করলে বিদ্রোহীরা একটি চিঠির গল্প ফাঁদল।

বার. জাল চিঠির কাহিনী:

মিসরের বিদ্রোহীরা বলল, 'মিসরের পথে বুওয়াইব নামক স্থানের পৌঁছার পর আমরা এক উষ্ট্রারোহী দেখতে পেলাম, সে একবার আমাদের দৃষ্টির আওতায় আসে,

---

৭২. আত-তাবারী, ৪:৩৫০; ইবনুল আসীর, ২:৪৩৪; ইবনু কাসীর, ৭:১৭৪।
৭৩. আত-তাবারী, ৪:৩৫০-৫১; ইবনুল আসীর, ২:৪৩৪; ইবনু কাসীর, ৭:১৭৪।

আরেকবার আড়ালে চলে যায়। আমরা তাকে পাকড়াও করলাম, দেখলাম সে হল 'উসমান (রা.)-এর গোলাম আবুল আ'ওয়ার ইবনু সুফইয়ান আস-সুলামী, তাঁর সাথে সিরিয়ার খাওলানের এক লোক ছিল। তারা দু'জন সাদাকাহ্র উষ্ট্রে চড়ে যাচ্ছিল। জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেল, সে 'উসমান (রা.)-এর পক্ষ হতে মিসরের গভর্ণরের কাছে একটি পত্র নিয়ে যাচ্ছে। আমরা তার শরীর তল্লাশি করে খালীফার মোহরাঙ্কিত চিঠিটি উদ্ধার করলাম। ওই পত্রে 'উসমান (রা.) মিসরের গভর্ণর 'আবদুল্লাহ ইবনু সা'দকে আমাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন: 'আবদুর রহমান ইবনু 'উদাইসকে একশ' বেত্রাঘাত করে তার মাথা ও দাড়ি মুণ্ডিয়ে দাও, 'আমর ইবনুল হামিক, সুদান ইবনু হুমরান ও 'উরওয়া ইবনুন্ নিবা'কেও অনুরূপ শাস্তি দাও।' এই পত্র পেয়ে আমরা মাদীনায় ফিরে এলাম।'[৭৪]

তের. চিঠি প্রেরণের বিষয় অস্বীকার করলেন 'উসমান (রা.):

বিদ্রোহীদের অভিযোগ সম্পর্কে আলোচনার জন্য 'আলী (রা.) কয়েকজন লোকসহ 'উসমান (রা.)-এর কাছে আসলেন। তিনি বললেন, 'আমি এই চিঠি লিখিনি, তা লেখার নির্দেশ দেইনি এবং এ বিষয়ে আমি কিছুই জানি না।' তখন তাঁকে বলা হল: 'আপনার মোহরাঙ্কিত চিঠিটির বাহক ছিল আপনার গোলাম, সে সাদাকাহ্র একটি উটে চড়ে মিসরে যাচ্ছিল।' 'উসমান (রা.) বললেন, 'উটটি চুরি করা হয়েছে, গোলামটি আমার নির্দেশে যায়নি এবং কারুকার্যের মাধ্যমে মোহরাঙ্কিত করা হয়েছে।' বিদ্রোহীরা খালীফার এই বক্তব্য মেনে নিতে অস্বীকার করলে তিনি নিজেকে একজন অভিযুক্ত হিসেবে দাঁড় করিয়ে আদালতের নিয়মানুযায়ী বিচার করতে বললেন। তিনি বললেন, 'আদালতের নিয়ম হচ্ছে বাদী প্রমাণ পেশ করবে আর বিবাদী শপথ করবে। বাদী হিসাবে তোমরা প্রমাণ পেশ করো যে আমি ওই চিঠি প্রেরণ করেছি।' তাঁর এই প্রস্তাবে বিদ্রোহীরা নিশ্চুপ রইল। তখন খালীফা বললেন, 'তাহলে তোমরা আমার শপথের বক্তব্য মেনে নাও; আমি শপথ করে বলছি যে, আমি কোন চিঠি লিখিনি, কাউকে নির্দেশ দেইনি এবং এ বিষয়ে আমি কিছুই জানি না।'[৭৫] বিদ্রোহীরা খালীফার এই বক্তব্য গ্রহণ না করে তাঁকে বাসভবনে অবরুদ্ধ করল।

জাল চিঠির প্রমাণ: ইতিহাসের গ্রন্থগুলোতে মিসরীয় বিদ্রোহী দলের চিঠি উদ্ধারের যে বিবরণ পাওয়া যায় তার আলোকে আমরা ঘটনাটি পর্যালোচনা করব। আমাদের বিশ্লেষণে এটি প্রমাণিত হবে যে, ওই চিঠি খালীফা 'উসমান (রা.) বা তাঁর দপ্তর থেকে ইস্যু করা হয়নি; বরং তা ছিল বিদ্রোহীদের সাজানো নাটক, যার মাধ্যমে তারা পুনরায় মাদীনায় এসে খালীফাকে হত্যার অজুহাত সৃষ্টি করেছিল।

---

৭৪. আত-তাবারী, ৪:৩৫৫, ৩৬৭, ৩৭৩-৭৪।
৭৫. আত-তাবারী, ৪:৩৬৮, ৩৭১, ৩৭৪; ইবনুল আসীর, ২:৪৪০; ইবনু কাসীর, ৭:১৭৪-৭৫।

চিঠিটি 'উসমান (রা.) লিখেননি, চিঠির বাহকও তাঁর দাস ছিল না। ওটি বিদ্রোহীরা লিখে একজন ভাড়াটের মাধ্যমে মিসরে প্রেরণ করেছিল, তাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল সে যেন মিসরীয় বিদ্রোহী দলের সাথে লুকোচুরি খেলে, কখনো তাদের দৃষ্টির আওতায় থাকে, কখনো দূরে চলে যায়। পত্র, পত্রবাহক এবং পত্র উদ্ধারের ঘটনার কুশীলবরা ছিল এই দলভুক্ত। এটি ছিল বিদ্রোহীদের একটি সাজানো নাটক। শীর্ষ সাহাবীদের প্রত্যাখ্যানে বিদ্রোহীদের পরিকল্পনা ভেস্তে গেলে তারা খালীফাকে হত্যার অজুহাত সৃষ্টির জন্য 'চিঠি নাটক' মঞ্চস্থ করে। আমাদের এই বিশ্লেষণের সপক্ষে 'চিঠি নাটকের' একটি পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হচ্ছে:

ওই জাল চিঠির বাহক একবার মিসরীয় বিদ্রোহীদের দৃষ্টিসীমার কাছ গিয়ে গমন করে, আবার দূরে চলে যায়, আবার সে কাছে আসে। সে তো এটা করেছে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য এবং তাদের মনে সন্দেহ সৃষ্টির জন্য। যেন সে বলছে: 'আমার কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ বস্তু আছে, তোমরা আমাকে ধরো।' যদি খালীফা তাকে প্রেরণ করতেন, তাহলে সে বিদ্রোহীদের দৃষ্টি থেকে যথাসম্ভব দূরে অবস্থান করে অতি দ্রুত মিসরে পৌছার চেষ্টা করত।

ইরাকী বিদ্রোহীরা কিভাবে একই সময়ে মাদীনায় ফিরে এল? দু'দল রওয়ানা করেছিল সম্পূর্ণ বিপরীত দু'টো রাস্তা ধরে; মিসরীয়রা পশ্চিমে আর ইরাকীরা পূর্বে। মিসরীয়রা চিঠি উদ্ধারের পর যদি ইরাকীদের কাছে খবর পাঠিয়ে থাকে এবং সেই সংবাদ পাওয়ার পর যদি তারা ফিরে আসত তাহলে মাদীনায় পৌছতে তাদের অনেক বেশি দিন সময় লাগার কথা। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার হল দল দু'টি একই সময়ে মাদীনায় ফিরে এল। তাহলে এই উপসংহার টানা খুবই সহজ যে, বিদ্রোহীরা মাদীনা ত্যাগের পূর্বেই 'চিঠি নাটক' মঞ্চায়ন ও সেই অজুহাতে মাদীনায় ফিরে আসার সময় নির্ধারণ করেছিল। পূর্ব নির্ধারিত সেই ক্ষণ অনুসারে মিসরী ও ইরাকী বিদ্রোহীরা একই সময়ে মাদীনায় ফিরে আসে। অথবা এমনও হতে পারে: মাদীনা হতে একই সাথে দু'উষ্ট্রারোহী প্রেরণ করা হয়েছিল; একজন জাল চিঠি নিয়ে মিসরীয় বাহিনীর হাতে ধরা দেওয়ার জন্য রওয়ানা করেছিল, একইসাথে আরেকজন উষ্ট্রারোহী ইরাকীদের কাছে গিয়ে জাল পত্রের কাহিনী শুনিয়েছিল। বিদ্রোহীদের কেউ মাদীনায় অবস্থান করে সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করেছিল। এই বিষয়টি আলী (রা.)-এর মত দূরদৃষ্টি ও প্রত্যুৎপন্নমতির দৃষ্টি এড়ায়নি, তিনি ইরাকীদেরকে বলেছিলেন, 'ওহে বাসরা ও কূফাবাসী! মিসরীয়দের ঘটনা তোমরা কিভাবে জানলে, অথচ তোমরা অনেক ক্রোশ দূরে চলে গিয়েছিলে? তারপর তোমরা একই সময়ে মাদীনায় ফিরে এলে?' 'আলী (রা.) নিশ্চিত ছিলেন যে, ফিরে আসার এই সিদ্ধান্ত মাদীনায়-ই নেওয়া হয়েছিল।[৭৬]

---

৭৬. আত-তাবারী, ৪:৩৫১; ইবনুল আসীর, ২:৪৩৪; ইবনু কাসীর, ৭:১৭৪।

হুকাইম ইবনু জাবালা ও আল-আশতার আন্-নাখা'ঈ'র মাদীনায় অবস্থান আমাদের বিশ্লেষণ ও অনুমানের সপক্ষে একটি প্রমাণ; বিদ্রোহীরা মাদীনা ত্যাগের পরও এই দুই জন রাজধানী শহরে অবস্থান করছিল।[৭৭] এটা খুব সহজেই অনুমান করা যায় যে, 'চিঠি নাটকের' মূল রূপকার ছিল এরা দু'জন। এরাই একই সাথে দু'জন উষ্ট্রারোহী প্রেরণ করেছিল, একজন মিসরীয় বাহিনীর কাছে জাল চিঠিসহ পরিকল্পিতভাবে ধরা দেয়। ফলে তারা মাদীনায় ফিরে আসে। অপরজন চিঠির কাহিনী ইরাকীদের কাছে পৌছে দেয়, ফলে তারাও একই সময়ে মাদীনায় প্রত্যাবর্তন করে।

'আবদুল্লাহ ইবনু সা'দ ইবনু আবি সার্হ'র উদ্দেশ্যে খালীফার চিঠি লেখার বিষয়টি অবাস্তবও বটে। বিদ্রোহীরা মিসর থেকে বের হওয়ার অব্যবহিত পর গভর্ণর ইবনু আবি সার্হ মাদীনায় আগমনের অনুমতি চেয়ে খালীফাকে পত্র দেন এবং আরীশ, ফিলিস্তিন ও আকাবার পথ ধরে মাদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানাও করেন। কারণ ইতোমধ্যে মুহাম্মাদ ইবনু আবি হুযাইফা মিসরের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছিলেন। বিদ্রোহীরা যখন মাদীনা ত্যাগ করছে তখন আবদুল্লাহ ইবনু সা'দ মিসরে ছিলেন না।[৭৮] অতএব খালীফা কর্তৃক আবদুল্লাহ ইবনু সা'দের উদ্দেশ্যে বিদ্রোহীদের হত্যার নির্দেশসম্বলিত চিঠি প্রেরণের অভিযোগ বাস্তবতা বিবর্জিত।

'উসমান (রা.) যখন বিদ্রোহীদের কাছে প্রমাণ চাইলেন তখন তারা নিশ্চুপ ছিল। তাদের অভিযোগ সত্য হলে তারা নিশ্চুপ থাকত না। ওরা দাবি করেছিল খালীফার গোলাম আবুল আ'ওয়ার ইবনু সুফইয়ান আস-সুলামীর কাছ থেকে চিঠিটি উদ্ধার করা হয়েছিল। প্রমাণ হিসেবে তারা গোলামটিকে হাজির করতে পারত। কিন্তু তারা সেটি করেনি। হয়ত সত্য প্রকাশের ভয়ে তারা তা করেনি অথবা তারা আদৌ খালীফার কোন গোলামকে আটক করেনি।

মু'আবিয়া (রা.) খালীফাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, তিনি যেন শক্তিপ্রয়োগের মাধ্যমে বিদ্রোহ দমন করেন। এজন্য সিরিয়া থেকে সৈনিক প্রেরণের প্রস্তাবও করেছিলেন তিনি, খালীফা এই প্রস্তাব গ্রহণ করেননি। বিদ্রোহীরা প্রথমবার মাদীনায় উপস্থিত হলে সাহাবীগণ শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে তাদের দমনের পরামর্শ দিয়েছিলেন, 'উসমান (রা.) তাও শুনেননি। তিনি কখনো শক্তিপ্রয়োগের পক্ষে ছিলেন না। বিদ্রোহীরা মাদীনা হতে ফিরে যাওয়ার পর তিনি তাদেরকে হত্যার নির্দেশ দেবেন এটি বড়ই অবান্তর।

চিঠি জাল করা ও বিভিন্ন ব্যক্তির নামে সেগুলো প্রচার করার অনেক দৃষ্টান্ত বিদ্রোহীরা স্থাপন করেছিল। এরা 'আয়িশা, 'আলী, তালহা ও আয-যুবাইরের (রা.) নামেও চিঠি জাল করেছিল। 'আয়িশার (রা.) নামে প্রচারিত জাল চিঠিতে ছিল তিনি নাকি

৭৭. আত-তাবারী, ৪:৩৭৫।
৭৮. আত-তাবারী, ৪:৩৭৮; ইবনুল আসীর, ২:৪৩৫; ইবনু কাসীর, ৭:১৭০।

জনগণকে 'উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে বলেছেন। আয়িশা (রা.) এমন কোন চিঠির লেখার কথা অস্বীকার করেন। বিদ্রোহীরা 'আলী (রা.)-এর নামেও অপবাদ দিয়েছিল। তিনি নাকি তাদেরকে মাদীনায় আসতে বলেছিলেন। 'আলী (রা.) আল্লাহর নামে শপথ করে বলেন, 'আমি তোমাদের উদ্দেশ্য কখনো কোন চিঠি লিখিনি।' অনুরূপভাবে মিসরের গভর্ণরের উদ্দেশ্যে লেখা 'উসমান (রা.)-এর চিঠিটিও জাল; নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ঐ জাল পত্র বিদ্রোহীরা 'উসমান (রা.)-এর নামে চালিয়ে দিয়েছিলেন; 'উসমান ওই চিঠি লেখেননি এবং লেখার নির্দেশও দেননি, তিনি এ বিষয়ে কিছুই জানতেন না।

চৌদ্দ. অবরোধের দিনলিপি:

ইরাক ও মিসরের বিদ্রোহীদের দ্বিতীয় দফা মাদীনা আগমনের পর খালীফার বাসবভন অবরোধ করা হয়। তবে ঠিক কখন কিভাবে অবরোধ শুরু হয় তা জানা যায় না। মোট চল্লিশ দিন অবরোধ অব্যাহত ছিল। অনুমান করা যায় শুরুর দিনগুলোতে 'উসমান (রা.) সালাত আদায়ের জন্য মাসজিদে যেতে পারতেন এবং তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করা যেত।

ক. খালীফার সাথে কটু ব্যবহার: খালীফা 'উসমান (রা.)-এর ব্যক্তিত্বের কারণে অবরোধকারীদের কেউ তাঁর সাথে কটু ব্যবহারের দুঃসাহস প্রদর্শন করেনি। সর্বপ্রথম তাঁর সাথে দুর্ব্যবহার করেন জাবালা ইবনু 'আম্‌র আস-সা'ইদী; সে একদল সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে আড্ডা দিচ্ছিল, তার হাতে ছিল একটি বেড়ি, পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় 'উসমান (রা.) তাদেরকে সালাম দেন। লোকেরা তাঁর সালামে জবাব দিলে জাবালা বলল, 'তোমরা কেন এই লোকের সালামের জবাব দিলে, সে তো এই এই কাজ করেছে?' তারপর সে 'উসমান (রা.)-এর কাছে এসে বলল, 'হয় আপনি ওই অশুভ চক্রের বন্ধুত্ব ত্যাগ করবেন অথবা আমি আপনার গলায় এই বেড়ি পরাব।' 'উসমান (রা.) বললেন, 'আল্লাহ্‌র শপথ, বন্ধু নির্বাচনের অধিকার আমার আছে।' জাবালা বলল, 'আপনার বন্ধু কারা? মারওয়ান, মু'আবিয়া, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমির, আবদুল্লাহ ইবনু সা'দ–এরা আপনার বন্ধু? এদের কারো কারো নিন্দায় কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে, কারো রক্ত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হালাল করেছেন, আর আপনি তাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছেন?!' কথা না বাড়িয়ে খালীফা ওদেরকে এড়িয়ে গেলেন। এই ঘটনার পূর্বে কেউ খালীফার সাথে বাচনিক দুর্ব্যবহারের সাহস করেনি।[৭৯]

খ. জাহ্‌জাহ কর্তৃক খালীফার লাঠি ভেঙ্গে ফেলা: অবরোধের প্রথম দিকে 'উসমান (রা.) মাসজিদে যেতে পারতেন। একদিন তিনি লাঠিতে ভর দিয়ে মিম্বারে

৭৯. আত-তাবারী, ৪:৩৬৬; ইবনুল আসীর, ২:৪৩৯; ইবনু কাসীর, ৭:১৭৬।

দাঁড়িয়ে ভাষণ দিচ্ছিলেন। হঠাৎ জাহজাহ আল-গিফারী নামে এক কুচক্রী তাঁর হাত থেকে লাঠি কেড়ে নিয়ে নিজের ডান হাঁটুতে চাপ দিয়ে সেটি ভেঙ্গে ফেলল। এটি ছিল একটি ঐতিহাসিক লাঠি, যার ওপর ভর দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহূ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম), আবূ বাক্‌র ও 'উমার (রা.) মাসজিদে খুতবা দিতেন। এহেন অনাচারের পরিণতি ভাল হয়নি; লাঠিটির একটি ভাঙ্গা অংশ জাহজাহ-এর হাঁটুতে ঢুকলে সেখানটায় ক্ষতের সৃষ্টি হয়, পরবর্তীতে তা ক্যান্সারে রূপ নেয়। শেষে ওই রোগে তার মৃত্যু হয়।[৮০]

গ. ভাষণরত খালীফার ওপর নুড়ি নিক্ষেপ: অবরোধ শুরু হওয়ার পর এক জুমু'আর দিনে 'উসমান (রা.) মাসজিদে নববীর মিম্বারে দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছিলেন। এক পর্যায়ে তিনি বললেন, 'হে ভিনদেশিরা! আল্লাহ্‌র দোহাই! মাদীনাবাসীরা নিশ্চিতভাবে জানে যে, তোমরা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহূ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মুখের ভাষায় অভিশপ্ত। অতএব, তোমরা সঠিকতার মাধ্যমে ভুল মুছে ফেল; কারণ আল্লাহ্ নেক আমল ছাড়া বদ আমল মোচন করেন না।' একথা শুনে মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামা (রা.) দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি সত্য বলেছেন।' তখন হুকাইম ইবনু জাবালা তাঁকে বসিয়ে দিল। ওদিকে যায়িদ ইবনু সাবিত (রা.) খালীফার বক্তব্য সমর্থন করতে চাইলে মুহাম্মাদ ইবনু আবি মুরাইরা তাঁকে বসিয়ে দিল। তারপর বিদ্রোহীরা নুড়ি নিক্ষেপে মুসল্লিদেরকে বের করে দিল এবং মিম্বারে দণ্ডায়মান বৃদ্ধ খালীফার ওপর এমনভাবে পাথরকুচি নিক্ষেপ করল যে তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলেন। লোকজন ধরাধরি করে 'উসমান (রা.)-কে বাড়ি পৌঁছে দেয়। 'আলী, তাল্‌হা ও আয-যুবাইরসহ বিশিষ্ট সাহাবীগণ খালীফাকে দেখতে যান। অন্যদিকে আবূ হুরাইরা, ইবনু 'উমার ও যায়িদ ইবনু সাবিতসহ অনেকে খালীফার পক্ষে প্রতিরোধ করার অনুমতি প্রার্থনা করেন। 'উসমান (রা.) আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে তাঁদেরকে সরিয়ে দেন।[৮১] এই ঘটনার পর খালীফার মাসজিদে গমন বন্ধ হয়ে যায়।

ঘ. অবরোধে কড়াকড়ি: খালীফাকে মাসজিদে গমনে বারণ: 'উসমান (রা.) মোট চল্লিশ দিন অবরুদ্ধ ছিলেন। প্রথম বিশ দিন তিনি মাসজিদে গমন করতে পারতেন। অতঃপর তাঁকে মাসজিদে গমনে বারণ করা হয় এবং তাঁর সাথে লোকজনের সাক্ষাতেও নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়। এই সময় মাদীনাবাসীদের অনেকে তাঁদের বাগানে আশ্রয় নেন। কেউ বাড়ি থেকে বের হলে নিরাপত্তার জন্য উন্মুক্ত তরবারি হাতে বের হত। অবরোধের শেষ দিনগুলোতে বিদ্রোহীদের নেতা আল-গাফিকী ইবনু হার্‌ব আল-'আক্কী সালাতে ইমামতি করত।[৮২] 'উবাইদুল্লাহ ইবনু 'আদী ইবনিল খিয়ারের বিষয়টি পছন্দ হল

---

৮০. আত-তাবারী, ৪:৩৬৬-৬৭; ইবনুল আসীর, ২:৪৩৯; ইবনু কাসীর, ৭:১৭৫।
৮১. ইবনু কাসীর, ৭:১৭৬; আত-তাবারী,৪:৩৫৩, ৩৬৪।
৮২. আত-তাবারী, ৪:৩৫৪।

না। এ ব্যাপারে তিনি খালীফার সাথে পরামর্শ করলেন। জবাবে খালীফা যা বললেন তা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল:

الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم.

মানুষ যে আমল করে তার মধ্যে সর্বাধিক সুন্দর ও উত্তম আমল হল সালাত, মানুষ যদি ভাল কাজ করে তার সাথে ভাল কাজ কর, আর সে যদি খারাপ কাজ করে তবে সে খারাবি হতে দূরে থাক।

আল-ওয়াকিদী বর্ণনা করেছেন, অবরোধের শুরুর দিকে 'আলী (রা.)-এর পরামর্শে আবূ আইউব আল-আনসারী সালাতে ইমামতি করতেন। পরবর্তীতে 'আলী (রা.) 'ঈদসহ অন্যান্য সালাতে ইমামতি করেছেন। আল-ওয়াকিদী'র এই বর্ণনা ভিত্তিহীন; কারণ 'আলী বা আবূ আইউব আল-আনসারীর ইমামতিত্বে সালাত আদায়ে 'উবাইদুল্লাহ ইবনু 'আদী ইবনুল খিয়ারের কোন আপত্তি থাকার কথা ছিল না।

'উসমান (রা.)-এর নির্মম দুর্ভাগ্য ছিল এই যে, স্বীয় অর্থ ব্যয়ে যে মাসজিদের জমি তিনি খরিদ করেছিলেন সে মাসজিদে যেতে তাঁকে বারণ করা হয়। অবরুদ্ধ অবস্থায় উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে তিনি একবার বলেছিলেন, 'আল্লাহ্‌র দোহাই! তোমাদের কেউ কি জান আমি এই এই পরিমাণ জমি কিনে মাসজিদ সম্প্রসারণের জন্য দান করেছি?' শ্রোতাদের কাছ থেকে ইতিবাচক জবাব এলে খালীফা নির্মম এক প্রশ্ন করেছিলেন: 'তোমরা কি জান আমার পূর্বে আর কাউকে এই মাসজিদে যেতে বাধা দেওয়া হয়েছে?'[৮৩]

ঙ. অমানবিক আচরণ: পানি সরবরাহে বাধা: অবরোধে কড়াকড়ি আরোপের অংশ হিসেবে বিদ্রোহীরা খালীফার বাসায় পানি সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। ফলে পানির তীব্র সংকটের কারণে গৃহবাসী নিদারুণ কষ্টে নিপতিত হয়। পানির সরবরাহে বাধা দেওয়ার পর 'উসমান (রা.) তাঁর প্রতিবেশী 'আমর ইবনু হাযম আল-আনসারীকে 'আলী (রা.)-এর কাছে প্রেরণ করে পানি সরবরাহে সচেষ্ট হওয়ার অনুরোধ করেন। একই সংবাদ তালহা, আয-যুবাইর, 'আয়িশা (রা.)সহ অন্য উম্মাহাতুল মু'মিনীনের কাছে পাঠানো হয়।[৮৪]

চ. সাহাবায়ে কিরামের পানি সরবরাহের প্রচেষ্টা: সাহাবায়ে কিরাম খালীফার বাসগৃহে পানি পাঠানোর চেষ্টা করলেন, কিন্তু বিদ্রোহীদের অমানবিক কঠোরতায় তাঁদের প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হয়নি।

১. উম্মু হাবীবা বিনতু আবি সুফইয়ান: পানি সরবরাহে খালীফার আবেদনে সর্বপ্রথম সাড়া দেন উম্মুল মু'মিনীন উম্মু হাবীবা বিনতু আবি সুফইয়ান (রা.)। তিনি একটি খচ্চরে চড়ে

৮৩. আত-তাবারী, ৪:৩৭৩।
৮৪. আত-তাবারী, ৪:৩৮৫।

খালীফার বাসগৃহের কাছাকাছি এলে বিদ্রোহীরা তাঁর বাহনের মুখে আঘাত করে। তিনি বললেন, 'আমি বানূ উমাইয়ার ওয়াসিয়াত নিয়ে খালীফার সাথে দেখা করতে চাই; আমি এ বিষয়ে তাঁর সাথে কথা বলব, যেন ইয়াতিম ও বিধবার সম্পদ নষ্ট না হয়।' ওরা বলল, 'আপনি মিথ্যাবাদী।' তারপর তারা তরবারির আঘাতে তাঁর খচ্চরের রশি কেটে ফেললে বাহনটি ছুটে পালায়, অবস্থা এতটা সঙ্গীন ছিল যে উম্মু হাবীবা খচ্চরের পিঠ থেকে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিলেন। লোকজন তাঁকে নিরাপদে বাড়ি পৌঁছে দেয়।[৮৫] পানি সরবরাহ করে সাহায্য করতে না পেরে উম্মু হাবীবা তাঁর গোলাম ইবনুল জার্‌রাহকে নির্দেশ দেন তিনি যেন সার্বক্ষণিকভাবে খালীফার সেবায় নিয়োজিত থাকেন। শাহাদাতের দিনও ইবনুল জার্‌রাহ খালীফার বাসগৃহে ছিলেন।

২. 'আলী ইবনু আবি তালিব (রা.): এক প্রত্যুষে 'আলী (রা.) খালীফার গৃহদোরে পানি নিয়ে উপস্থিত হলেন। বিদ্রোহীরা তাঁকে বাধা দিলে তিনি বললেন, 'ওহে, তোমাদের কর্মকাণ্ড মুমিন বা কাফির– কারো কাজের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়; তোমরা তাঁর কাছে খাবার-পানি সরবরাহে বাধা দিও না; দেখো, রোমান ও পারসিকরাও বন্দীদেরকে খেতে দেয়, পানি পান করতে দেয়। তোমরা কি তাদের চেয়েও নিষ্ঠুর! এই লোক তো তোমাদের সাথে লাগেনি, তবে তোমরা কিসের ভিত্তিতে তাঁকে অবরোধ ও হত্যার মত জঘন্য বিষয় হালাল মনে করছ?' অবরোধকারীরা বলল, 'আমরা তাঁকে খেতে দেব না, পান করতে দেব না।' অবশেষে অপারগ হয়ে 'আলী (রা.) ফিরে গেলেন; তবে তাঁর প্রচেষ্টার প্রমাণস্বরূপ যাওয়ার আগে নিজের পাগড়িটি খালীফার বাসগৃহের অভ্যন্তরে ছুঁড়ে মারলেন।[৮৬] 'আলী (রা.) ও উম্মু হাবীবা (রা.)-এর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার খবর পেয়ে তালহা (রা.) ও আয-যুবাইর (রা.) গৃহে অবস্থানই শ্রেয় মনে করলেন।[৮৭]

অবরোধকালে পানি সরবরাহে বাধা সৃষ্টি করে খালীফা 'উসমান (রা.)-এর প্রতি যে অন্যায়-অবিচার ও কৃতঘ্নতার পরিচয় দেওয়া হয়েছিল তার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে পাওয়া যায় না। মাদীনার খাবার পানির সবচাইতে বড় আধার ছিল রূমা কূপ; এটি এক ইয়াহুদীর মালিকানায় ছিল। হিজরাতের পর মাদীনার জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে 'উসমান (রা.) বিপুল অর্থে কূপটি কিনে সর্বসাধারণের জন্য সাদাকাহ্ করে দেন। বিদ্রোহীদের অমানবিকতা এই পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, সেই কূপের পানি তার মালিকের কাছে সরবরাহের ক্ষেত্রে তারা বাধা সৃষ্টি করেছিল। একবার 'উসমান (রা.) এই নির্মমতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন: 'আল্লাহ্‌র দোহাই! তোমরা কি জান আমি রূমা কূপ ক্রয় করে তাতে আমার (বালতির) রশি ও মুসলিমদের (বালতির) রশির সমঅধিকার

---

৮৫. আত-তাবারী, ৪:৩৮৬; ইবনুল আসীর, ২:৪৪৪; ইবনু কাসীর, ৭:১৮৭।
৮৬. আত-তাবারী, ৪:৩৮৬; ইবনুল আসীর, ২:৪৪৪; ইবনু কাসীর, ৭:১৮৭।
৮৭. আত-তাবারী, ৪:৩৮৬-৮৭।

প্রদান করেছিলাম।' উপস্থিত জনতা হাঁ-সূচক জবাব দিলে 'উসমান (রা.) বললেন, 'তবে তোমরা কেন আজ আমাকে সে পানি হতে বঞ্চিত করছ?'

তীব্র অবরোধের সময় খালীফার পরিবারের মোটামুটি পানি ছাড়াই দিনযাপন করেছেন। প্রতিবেশী আম্‌র-পরিবার রাতের আঁধারে অতি সন্তর্পণে যেটুকু পানি সরবরাহ করত তাই ছিল তাঁদের একমাত্র সম্বল।[৮৮]

পনের. অবরুদ্ধ খালীফা আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাসকে (রা.) আমীরুল হাজ্জ হিসেবে মাক্কায় প্রেরণ করেন:

৩৫ হিজরীতে হাজ্জের মৌসুমে খালীফা 'উসমান (রা.) অবরুদ্ধ ছিলেন। ফলে সে বছর তিনি হাজ্জের কার্যাদি সম্পাদনে মু'মিনদের আমীরের দায়িত্ব পালন করতে পারেননি। প্রতিনিধি হিসেবে তিনি 'আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.)-কে আমীরুল হাজ্জ হিসেবে মাক্কায় প্রেরণ করেন। ইবনু 'আব্বাস শুরুতে রাজি হননি, তিনি বলেছিলেন, 'আমীরুল মু'মিনীন! আমাকে ছাড়ুন, আমি এদের প্রতিরোধে আপনার কাছে থাকতে চাই; আল্লাহর শপথ, এই বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়াই করা আমার কাছে হাজ্জে গমনের চাইতে প্রিয়।' খালীফা বললেন, 'আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি তোমাকে আমীরুল হাজ্জ করে প্রেরণ করব।' এ কথার পর ইবনু 'আব্বাস রাজি হয়ে যান।

'উসমান (রা.) শাহাদাতের ঘটনাপঞ্জির আলোচনায় হাজ্জ-এর বিষয়টি এ জন্য প্রাসঙ্গিক যে, খালীফা ইবনু 'আব্বাসের সাথে একটি পত্র প্রেরণ করেন, যা হাজ্জ সম্মিলনে জনগণ-মাঝে পাঠ করার নির্দেশ দেন। এই পত্রে মূলত বিদ্রোহীদের অভিযোগ ও দাবি-দাওয়ার প্রসঙ্গটি আলোচিত হয়েছে। এটিও একটি ঐতিহাসিক দলিল, যাতে বিদ্রোহীদের অভিযোগ সম্পর্কে খালীফার দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিদ্রোহ দমনে তাঁর সহনশীল কর্মনীতি পরিস্ফুট হয়েছে।

পত্রের শুরুতে তিনি আলকুরআনের বিশটি আয়াত উল্লেখ করেছেন, এগুলোতে ঐক্য ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা, মতভেদ পরিহার, আনুগত্যে বহাল থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তারপর তিনি বলেন,

'একদল লোক মানুষের কাছে এমন ভাব প্রকাশ করে যে তারা কিতাবুল্লাহ ও সত্যের দিকে আহবান করছে, তারা দুনিয়া চায় না; অথচ তাদের সামনে যখন সত্য উপস্থাপন করা হল তখন তারা নানা দলে বিভক্ত হয়ে গেল; একদল সত্যকে গ্রহণ করল, আরেক দল সত্য ত্যাগ করল এবং তারা অন্যায়ভাবে জিততে চায়। তাদের ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা অনেক দিনের। তারা নেতৃত্বলোভী, তাই তারা ভাগ্য তাড়াতাড়ি আনতে চায়। তারা ইতোপূর্বে তোমাদেরকে লিখেছিল যে, আমার দানে সন্তুষ্ট হয়ে তারা ফিরে

---

৮৮. আত-তাবারী, ৪:৩৮৭; ইবনু কাসীর, ৭:১৮৭

যাচ্ছে। আমি জানি না ওয়াদাকৃত কোন কিছু তাদেরকে প্রদান করতে কসুর করেছি কিনা? তারা মনে করত যে, তারা অন্যায়কারীর ওপর শাস্তি প্রয়োগ করতে চায়। আমি বললাম, মানুষের অধিকারের ব্যাপারে যে বাড়াবড়ি করেছে তার ওপর হদ কায়েম কর। যুলুমবাজের ওপর হদ জারি কর। তারা বলল, 'কিতাবুল্লাহ তিলাওয়াত করা হোক।' আমি বললাম, 'তাহলে, আল্লাহ যা নাযিল করেননি তা নিয়ে বাড়াবাড়ি যেন না করে কোন পাঠক।'

ওরা বলল, 'বঞ্চিতকে যেন দেওয়া হয়, সম্পদ যেন পুরোপুরিভাবে দেওয়া হয় আর এ ব্যাপারে যেন সুন্দর পন্থা প্রচলিত হয়, সাদাকাহ ও গানীমাতের সম্পদে বণ্টনে যেন বাড়াবাড়ি না করা হয়, শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত প্রশাসক যেন নিয়োগ করা হয়, মানুষের অভাব-অভিযোগের যেন প্রতিকার করা হয়।' আমি তাদের এইসব দাবি মেনে নিলাম..আমি তোমাদেরকে জানাচ্ছি, ওরা ভাগ্যের ব্যাপারে তড়িঘড়ি করছে, ওরা আমাকে সালাত আদায় করতে মাসজিদে গমনে বাধা দিচ্ছে, ওরা মাদীনায় জোরপূর্বক লুটতরাজ চালাচ্ছে। আমি তোমাদের উদ্দেশে এই পত্র এমন সময় লিখছি যখন ওরা আমাকে তিনটি অপশন দিয়েছে: যেসব লোককে আমি আইনগতভাবে (বা ভুলবশত) শাস্তি দিয়েছি তার বিনিময়ে আমার কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে বা আমাকে পদত্যাগ করতে হবে, তদস্থলে ওরা অন্য কাউকে খালীফা বানাবে, অথবা তারা সেনাবাহিনী ও বিভিন্ন শহরে বিদ্রোহের ডাক দেবে ফলে লোকজন আমার আনুগত্য ত্যাগ করবে।

আমি বললাম, 'তোমরা আমার কাছ থেকে হত্যার বদলা নিতে চাও? আমি তো কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করিনি! হ্যাঁ, বিচারের ক্ষেত্রে ভুল হতেই পারে। আমার পূর্বের খালীফারাও মানুষ ছিলেন, তাদেরও ভুল-ত্রুটি ছিল; কৈ, তাদের কাছ থেকে তো হত্যার বদলা দাবি করা হয়নি! আমি জানি এইসব দাবি-দাওয়ার আড়ালে এরা আমাকেই (হত্যা করতে) চায়। আমার পদত্যাগের দাবির প্রসঙ্গে বলতে চাই, ওরা যদি কীলক দিয়ে আমাকে আঘাত করে তবু এই দায়িত্ব আমি ত্যাগ করব না; কারণ এই দায়িত্ব আল্লাহ্ই আমার ওপর অর্পণ করেছেন। বিভিন্ন শহরে জনগণ ও সৈনিকদের আনুগত্য বর্জন সম্পর্কে বলতে চাই, আমি তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক নই, ইতোপূর্বে তাদেরকে আমি আনুগত্য করার জন্য বাধ্য করিনি, কিন্তু তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য স্বেচ্ছায় আনুগত্য প্রকাশ করেছে। তোমাদের কেউ যদি দুনিয়া অর্জন করতে চায় তবে আল্লাহ্র ফায়সালার বাইরে সে তা অর্জন করতে পারবে না। আর কেউ যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি, পরকালীন সাফল্য ও উম্মাহর কল্যাণ কামনা করে এবং রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও পূর্বসূরি খালীফাদ্বয়ের কর্মনীতি অনুসরণ করে তবে আল্লাহ্ই তাকে পুরস্কার-প্রতিদান দেবেন। তোমাদের প্রতিদান দেওয়ার সাধ্য আমার নেই, কারণ পুরো দুনিয়া

দিয়েও এর প্রতিদান দেওয়া হবে না। অতএব আল্লাহ্কে ভয় কর এবং তাঁর কাছে যে সাওয়াব আছে তার প্রত্যাশা কর। কেউ যদি ওয়াদা ভঙ্গ করে সন্তুষ্ট থাকতে চায় তবে আমি সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে চাই এহেন কাজে আমি সন্তুষ্ট নই, আল্লাহ্কে দেওয়া প্রতিশ্রুতি তোমরা ভঙ্গ করবে তা তিনিও পছন্দ করেন না। তোমরা আমাকে যে অপশনগুলো দিয়েছ তার সবকটিই প্রতারণামূলক.., অতএব আমি নিজেকে সংবরণ করলাম, আমার অনুসারীদের নিয়ন্ত্রণ করলাম। আমি খারাপ দৃষ্টান্ত স্থাপন, উম্মাহর বিভক্তি ও রক্তপাত পছন্দ করি না। আল্লাহর দোহাই! আমি তোমাদেরকে অনুরোধ করি, তোমরা কেবল সত্যকে আঁকড়ে ধরো আর সীমালঙ্ঘন ও বাড়াবাড়ি বর্জন কর, আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী ইনসাফ প্রতিষ্ঠা কর। আমি আবারো আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি, তিনি তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি রক্ষার ও আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়নে পারস্পরিক সহযোগিতার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ্ বলেন, নিশ্চয়ই তিনি সত্য বলেছেন,

وَ لَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ إِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوْا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُوْلًا.

ইয়াতীম বয়োপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সদুপায়ে ছাড়া তার সম্পত্তির নিকটবর্তী হয়ো না এবং প্রতিশ্রুতি পালন করো; নিশ্চয়ই প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে। [আলকুরআন ১৭:৩৪।]

এটি আমার কাছ থেকে আল্লাহর নিকট ওজরখাহি, আশা করি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে। অতঃপর আমি বলতে চাই, আমি নিজেকে নির্দোষ মনে করি না,

وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِيْ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوْءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيْ إِنَّ رَبِّيْ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ.

আমি নিজেকে নির্দোষ মনে করি না, মানুষের মন অবশ্যই মন্দ কর্মপ্রবণ, কিন্তু সে নয়, যার প্রতি আমার প্রতিপালক দয়া করেন। আমার প্রতিপালক তো অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। [আলকুরআন ১২:৫৩।]

আমি যদি কতিপয় ব্যক্তিকে শাস্তি দিয়েই থাকি তবে তদ্বারা কেবল কল্যাণ সাধনই উদ্দেশ্য ছিল। আমি যা কিছু করেছি তজ্জন্য আল্লাহর নিকট তাওবা করছি, তাঁর কাছে ক্ষমা চাই, তিনি ব্যতীত কেউ ক্ষমা করতে পারেন না, নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালকের রহমত সর্বব্যাপী, আল্লাহর রহমত প্রাপ্তির ব্যাপারে কেবল ভ্রষ্টরাই নিরাশ হয়ে থাকে। নিশ্চয় তিনি বান্দাদের তাওবা কবুল করেন এবং পাপ ক্ষমা করেন এবং তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত। আমি আল্লাহর কাছে দু'আ করি তিনি যেন আমাকে ও তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেন, এবং কল্যাণের ওপর এই উম্মাহর সদস্যদের অন্তরে বন্ধন সৃষ্টি করেন, বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের জন্য যেন এদের মনে ঘৃণা

সৃষ্টি করেন। হে মু'মিন-মুসলিমগণ! তোমাদের ওপর আল্লাহ্‌র সালাম, রাহ্‌মাত ও বরকত বর্ষিত হোক।'

ইবনু আব্বাস বলেন, 'আমি হাজ্জযাত্রীদের সামনে তারবিয়ার পূর্বে এই পত্র পাঠ করে শুনিয়েছি।'[৮৯]

ষোল. বিদ্রোহীদের অপশন: 'পদত্যাগ করুন নয়ত আপনাকে হত্যা করা হবে':

অবরুদ্ধ অবস্থায় একবার 'উসমান (রা.) বিদ্রোহীদের নেতা আল-আশতারকে ডেকে জিজ্ঞেস করেন, 'তোমরা আমার কাছে কি চাও?' তিনি বললেন, 'আপনাকে তিনটি অপশন দেয়া হচ্ছে: 'আপনি পদত্যাগ করে জনগণকে তাদের নেতা নির্বাচনের সুযোগ দিন, অথবা বিভিন্ন সময় জনসাধারণকে শাস্তি দিয়ে যে অপরাধ করেছেন তার বিনিময়ে নিজের ওপর কিসাস প্রতিষ্ঠা করুন। এই দু'টির কোনটি পালন না করলে আপনাকে হত্যা করা হবে।'[৯০]

'উসমান (রা.)-এর প্রতিক্রিয়া: বিদ্রোহীদের দাবির ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে 'উসমান (রা.) বলেন, 'তোমাদের দাবিগুলো পূরণ করা সম্ভব নয়; প্রথমতঃ আমি পদত্যাগ করব না, করতে পারবও না: لا أخلع سربالا سربلنيه الله 'যে জামা খোদ আল্লাহ আমাকে পরিয়েছেন তা আমি খুলে ফেলব না।' আল্লাহ্‌র শপথ! আমার গর্দান কেটে ফেললেও আমি পদত্যাগ করব না, কারণ আমি মুহাম্মাদের উম্মাহ্‌কে এমন অবস্থায় রেখে যেতে পারব না যে তারা একে অপরের ওপর হামলে পড়বে। আমার দুই পূর্বসূরিও অপরাধীদেরকে শাস্তি দিয়েছেন, কৈ! তাদের কাছ থেকে তো কিসাস দাবি করা হয়নি। দুষ্ট লোকদের শায়েস্তা করার অপরাধে যদি খালীফার কাছ থেকে কিসাস দাবি করা হয় তাহলে কোন শাসকের পক্ষে রাষ্ট্র পরিচালনা সম্ভব হবে না। তাছাড়া এই বুড়ো এতটাই দুর্বল যে তার শরীরের ওপর কিসাস প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। আর যদি তোমরা আমাকে হত্যা করতে চাও তবে তা করতে পার। তবে জেনে রেখো, আমাকে হত্যা করা হলে মুসলিম উম্মাহ্‌র ঐক্য চিরতরে বিনষ্ট হয়ে যাবে।' খালীফার জবাব শুনে আল-আশতার চলে গেল।[৯১]

চাপের মুখে পদত্যাগে অস্বীকৃতি: শত চাপের মুখেও 'উসমান (রা.) পদত্যাগে রাজি হননি। রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওয়াসিয়াত অনুযায়ী আল্লাহ কর্তৃক পরিয়ে দেওয়া জামা তিনি কারো মুখের কথায় খুলে ফেলেননি। বিশিষ্ট

---

৮৯. আত-তাবারী, ৪: ৪০৫-১১।

৯০. কোন কোন বর্ণনায় দেখা যায় যে, জাল চিঠির দায় মারওয়ানের ওপর চাপিয়ে তাকে সমর্পণের দাবি করেছিল। কোন প্রমাণ ব্যতীত মারওয়ানকে সমর্পণে 'উসমান (রা) রাজি হননি। আত-তাবারী, ৪: ৩৭১, ৩৭৫-৩৭৭; ইবনুল আসীর, ২:৪৪০; ইবনু কাসীর, ৭:১৮৬-৮৭।

৯১. আত-তাবারী, ৪:৩৭১-৭২।

সাহাবীগণ 'উসমান (রা.)-কে পদত্যাগ না করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। একবার ইবনু 'উমার (রা.), 'উসমান (রা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলেন। খালীফা তাঁকে বললেন, 'দেখো এই নির্বোধরা কি বলে, ওরা বলে পদত্যাগ করে জান বাঁচান।' ইবনু 'উমার (রা.) বললেন, 'পদত্যাগ করলে আপনি কি দুনিয়ায় চিরজীবী হবেন?' 'উসমান (রা.) বললেন, 'না।' ইবনু 'উমার (রা.) বললেন 'পদত্যাগ না করলে ওরা কি হত্যার চেয়ে বেশি কিছু করতে পারবে?' খালীফা বললেন, 'না।' ইবনু 'উমার (রা.) আবার বললেন, 'ওরা কি আপনার জান্নাত ও জাহান্নামের মালিক?' না সূচক জবাব পেয়ে তিনি বললেন, 'আমি মনে করি, যে পোশাক আল্লাহ আপনাকে পরিধান করিয়েছেন তা আপনি খুলবেন না, অন্যথায় এটি একটি বদ রেওয়াজে পরিণত হবে, লোকজন কোন খালীফার কাজ পছন্দ না করলেই তাকে পদত্যাগ করাতে চাইবে।'[৯২]

আল্লাহ মাযলুম খালীফা 'উসমান (রা.)-এর ওপর সন্তুষ্ট হোন। ইবনু 'উমার (রা.)-সহ অন্যান্য সাহাবীগণের পরামর্শে তিনি অত্যন্ত খারাপ রেওয়াজ হতে মুসলিম উম্মাহ্কে বাঁচিয়েছেন। বিদ্রোহীদের দাবি অনুযায়ী তিনি পদত্যাগ করলে এটি অত্যন্ত খারাপ একটি নযির হত। পরবর্তীতে খালীফাগণ অসৎ ও ফিতনাবাজদের ক্রীড়নকে পরিণত হতেন। তারা যখন ইচ্ছা তখন খালীফা নিয়োগ ও অপসারণ করতে পারত। কিন্তু 'উসমান (রা.) সাহসিকতা, বীরত্ব, ধৈর্য ও স্থৈর্যের সাথে পরিস্থিতি মুকাবিলা করেন। বিদ্রোহীদের দাবি অনুসারে পদত্যাগ না করে খালীফার পদকে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের ক্রীড়নকে পরিণত হওয়া থেকে রক্ষা করেন। একই সাথে তিনি কোন মুসলিমের (যদিও হোক না সে নামধারী) রক্তে নিজের হাত রঞ্জিত করেননি। বরং খালীফার পদমর্যাদা রক্ষার্থে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারের মাধ্যমে শাহাদাতের নজরানা পেশ করেছেন।

অবরুদ্ধ অবস্থায় একবার তিনি ঘরের প্রবেশদ্বারে এলেন; তখন বিদ্রোহীরা তাঁকে হত্যার হুমকি দিল। আপনজনদের কাছে ফিরে গিয়ে তিনি বললেন, 'ওরা একটু আগে আমাকে হত্যার হুমকি দিয়েছে।' তারা বললেন, 'আমীরুল মু'মিনীন, আপনার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।' তিনি বললেন, 'এরা আমাকে কেন হত্যা করতে চায় অথচ আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি

لا يحل دم امرئ مسلم إلا في إحدى ثلاث: رجل كفر بعد إيمانه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسا بغير نفس

কোন মুসলিমের রক্ত তিনটি কারণের কোন একটি ছাড়া বৈধ নয়: ঈমান আনার পর কুফরি করলে, বিবাহের পর যিনা করলে, মৃত্যুদণ্ড আরোপের যথেষ্ট কারণ ব্যতীত কাউকে হত্যা করলে।

আল্লাহর শপথ, আমি জাহিলী বা ইসলামী যুগে কখনো যিনা করিনি, আল্লাহ আমাকে

৯২. ফাদাইলুস সাহাবাহ, ১:৪৭৩।

হিদায়াত দানের পর আমি কখনো অন্য কোন দীন কামনা করিনি, কাউকে হত্যা করিনি, এদের কী হল যে এরা আমাকে হত্যা করতে চায়।[৯৩]

সতের. খালীফার সুরক্ষায় সাহাবায়ে কিরামের ভূমিকা:

সেই দুর্যোগের দিনগুলোতে সাহাবায়ে কিরাম খালীফার সুরক্ষা সাধ্যানুযায়ী প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন; কিন্তু শক্তি প্রয়োগে খালীফার অস্বীকৃতির কারণে তাদের সেই প্রচেষ্টা সফল হয়নি।

ক. আলী ইবনু আবি তালিব (রা.): অবরুদ্ধ অবস্থায় একদা খালীফার কাছে আলী (রা.) বার্তাবাহক পাঠিয়ে বললেন, 'আমার কাছে ৫০০ বর্মধারী যোদ্ধা আছে, আপনি অনুমতি দিন, আমি ওদের অনিষ্ট থেকে আপনাকে বাঁচাব। কারণ আপনি এমন কিছু করেননি যে আপনার রক্ত হালাল হয়ে গেছে।' জবাবে 'উসমান (রা.) বললেন, 'আপনাকে উত্তম প্রতিদান দেওয়া হবে, আমার কারণে রক্তপাত হোক তা আমি চাই না।'[৯৪]

খ. আয-যুবাইর ইবনুল 'আওয়াম (রা.): আবূ হাবীবা বলেন, আয-যুবাইর (রা.) আমাকে অবরুদ্ধ উসমান (রা.)-এর কাছে পাঠালেন। তাঁর কাছে গিয়ে দেখলাম, খালীফা চেয়ারে বসে আছেন, তথায় আল-হাসান ইবনু 'আলী (রা.), আবূ হুরাইরা (রা.), আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.) ও আবদুল্লাহ ইবনুয্ যুবাইর (রা.) উপস্থিত আছেন। আমি খালীফাকে আয-যুবাইরের সালাম পৌঁছিয়ে তাঁর পত্র পাঠ করলাম: 'আমি আনুগত্যের ওপর আছি, বদলে যাইনি বা বাই'আত ভঙ্গও করিনি। আপনি চাইলে আমি আপনার বাসায় আসব আপনার সাথেই অবস্থান করব। আমার গোত্র বানূ 'আমর ইবনু 'আউফ আমার কাছে এই ওয়াদা করেছে যে তারা আমার সাথে প্রস্তুত থাকবে, আমি যা নির্দেশ দেই তা পালন করবে।' পত্রপাঠ শুনে 'উসমান (রা.) বললেন, 'আল্লাহু আকবার, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমার ভাইকে রক্ষা করেছেন। তার নিকট আমার সালাম পৌঁছে দিও, তারপর তাকে বল, 'আপনি আমার প্রিয় মানুষ, আপনাদের সহযোগিতার প্রস্তাবের জন্য সাধুবাদ জানাই। আশা করি আপনার মাধ্যমে আল্লাহ আমাকে রক্ষা করবেন।' এরপর আবূ হুরাইরা (রা.) পত্রটি নিলেন, পাঠ শেষে তিনি বললেন, 'আমার দু'কান রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছ থেকে যা শুনেছে তা কি তোমাদেরকে বলব না?' উপস্থিত লোকেরা বলল, 'জি, বলুন।' তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে আমি বলতে শুনেছি, 'আমার পরে অনেক ফিতনা ও কাণ্ডকীর্তি সংঘটিত হবে।' একথা শুনে আমরা বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল! তা হতে

---

৯৩. আল-মুসনাদ, ১:৬৩।
৯৪. তারীখ দিমাশক, ৪০৩।

মুক্তির উপায় কি?' তিনি বললেন, 'তোমরা আল-আমীন ও তাঁর দলের সাথে থাকবে।' আল-আমীন বলে তিনি 'উসমান (রা.)-এর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। একথা শুনে উপস্থিত লোকজন দাঁড়িয়ে গেল, তারপর বলল, 'অর্ন্তদৃষ্টি আমাদেরকে সক্ষম করেছে, অতএব আপনি আমাদেরকে জিহাদের অনুমতি দিন।' 'উসমান (রা.) বললেন, 'আমি দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করছি, আমার অনুগত কেউ যেন কিছুতেই যুদ্ধ না করে।'[৯৫]

গ. আল-মুগীরা ইবনু শু'বা (রা.): একদিন অবরুদ্ধ খালীফার কাছে বিশিষ্ট সাহাবী আল-মুগীরা ইবনু শু'বা (রা.) উপস্থিত হয়ে তিনটি প্রস্তাব দিয়ে এর কোন একটি গ্রহণ করতে বললেন: ক) আপনার নিয়ন্ত্রণে অনেক সৈনিক আছে, আপনি বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে বিনা সংশয়ে যুদ্ধ করতে পারেন, কারণ আপনি সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত আছেন আর ওরা আছে বাতিলের ওপর। খ) আপনার বাসভবনের যে তোরণ বিদ্রোহীরা দখল করে আছে সেটি বাদ দিয়ে আপনি বের হওয়ার জন্য আরেকটি সুড়ঙ্গ তৈরি করুন। সেই পথ দিয়ে বের হয়ে আপনি মাক্কায় চলে যান। তথায় তারা আপনার অনিষ্ট সাধন করতে পারবে না। গ) কিম্বা আপনি সিরিয়া চলে যান, তথায় মু'আবিয়া (রা.) আছেন।'

জবাবে 'উসমান (রা.) বললেন, ১. এদের বিরুদ্ধে আমি যুদ্ধ করব না, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উত্তসূরিদের মাঝে তাঁর উম্মাতের মধ্যে আমি প্রথম রক্তপাতকারী হতে পারব না। ২. আমি মাক্কায়ও যাব না, কারণ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'কুরাইশের এক লোক মাক্কায় গিয়ে ধর্মত্যাগী হবে।' আমি সেই ব্যক্তি হব না। ৩. তোমার তৃতীয় প্রস্তাব সম্পর্কে বলছি, আমি আমার হিজরাতের জায়গা ও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতিবেশিত্ব হতে বিচ্ছিন্ন হতে পারব না।'[৯৬]

ঘ. কা'ব ইবনু মালিক (রা.): কা'ব ইবনু মালিক (রা.) খালীফাকে সাহায্য করার জন্য আনসারদেরকে উদ্বুদ্ধ করে বললেন, 'হে আনসার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর আনসারে পরিণত হও।' অতঃপর একদল আনসার যায়িদ ইবনু সাবিত (রা.)-এর নেতৃত্বে খালীফার তোরণ-পাশে এসে বললেন, 'আপনার দরজায় আনসাররা প্রস্তুত, আপনি নির্দেশ দিলে আমরা আল্লাহ্‌র আনসার হতে প্রস্তুত আছি।' খালীফা যুদ্ধ করার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বললেন, 'যুদ্ধের প্রয়োজন নেই, তোমরা সংবরণ কর।'

ঙ. আল-হাসান ইবনু 'আলী (রা.): অবরোধের একদিন আল-হাসান ইবনু 'আলী (রা.) আসলেন 'উসমান (রা.)-এর কাছে, বললেন, 'আমি কি তরবারি কোষমুক্ত করব?' খালীফা তাকে বললেন, 'না, তোমার তরবারি খাপে ভরে রাখো, আর ফিরে যাও তোমার পিতার কাছে।'[৯৭]

---

৯৫. ফাদাইলুস সাহাবাহ, ১:৫১১,৫১২।
৯৬. ইবনু কাসীর, ৭:২১১।
৯৭. মুসান্নিফ ইবনু আবি শায়বা, ১৫:২২৪।

চ. আবু হুরাইরা (রা.): একদিন আবূ হুরাইরা (রা.) এসে বললেন, 'আমীরুল মু'মিনীন! আঘাত করাই সমীচীন।' 'উসমান (রা.) বললেন, 'তুমি কি আমাকেসহ সমগ্র মানবজাতিকে হত্যা করতে পারলে খুশি হবে?' তিনি বললেন, 'না।' উসমান (রা.) বললেন, 'আল্লাহর কসম! তুমি যদি একজন মানুষকে হত্যা কর তাহলে সমগ্র মানবজাতি নিহত হবে।' একথা শুনে আবূ হুরাইরা (রা.) ফিরে গেলেন।

ছ. আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.): পরিস্থিতির ভয়াবহতা উপলব্ধি করে একদল সাহাবী 'উসমান (রা.)-এর অনুমতি ছাড়াই যুদ্ধপ্রস্তুতি নিয়ে তাঁর বাসভবনে গমন করেন। এঁদের মাঝে 'আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা.)ও ছিলেন। তিনি বর্ম পরিধান করে সশস্ত্র অবস্থায় গিয়েছিলেন। 'উসমান (রা.) তাঁকে চলে যেতে বলেন এই ভয়ে যে তিনি বিদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বেন।

জ. মাক্কা গমনের প্রস্তাব: সাহাবীগণ দেখলেন 'উসমান (রা.) বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের অনুমতি দিচ্ছেন না, অপরদিকে বিদ্রোহীরা তাঁকে হত্যা করার ব্যাপারে অনড়। এ পরিস্থিতিতে খালীফাকে বাঁচাতে হলে তাঁকে মাদীনার বাইরে পাঠিয়ে দিতে হবে। কয়েকজন সাহাবী খালীফাকে প্রস্তাব দিলেন যে তাঁরা সঙ্গোপনে ও নিরাপদে তাঁকে মাক্কায় পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন। প্রস্তাবকদের মাঝে ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর, আল-মুগীরা ইবনু শু'বা, উসামা ইবনু যায়িদ (রা.)। কিন্তু খালীফা তাঁদের এই প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি এঁদের সেই কথাই বললেন যা বলেছিলেন মু'আবিয়া (রা.)-কে: আমি কোন কিছুর বিনিময়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতিবেশিত্ব ছাড়তে পারব না।'

মহিলা সাহাবীগণের ভূমিকা:

সেই দুর্যোগপূর্ণ পরিবেশে খালীফা যখন অবরুদ্ধ ছিলেন তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র সহধর্মিণীগণসহ কয়েকজন মহিলা সাহাবী সাধ্যানুযায়ী ভূমিকা পালন করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের ভূমিকা আলোচিত হল:

ক. উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা (রা.): ইতোপূর্বে উম্মু হাবীবা (রা.)-এর সাথে বিদ্রোহীদের অশোভন আচরণের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। তা দেখে 'আয়িশা (রা.) খালীফাকে সহায়তা করার ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেন। তিনি বিদ্রোহীদের শক্তি খর্বের চেষ্টা করেন। তাঁর ভাই মুহাম্মাদ ইবনু আবি বাক্র বিদ্রোহীদের দলভুক্ত ছিলেন। 'আয়িশা (রা.) হাজ্জযাত্রার ঘোষণা দেন এবং ভাইকে তাঁর সাথে হাজ্জ পালনার্থে মাক্কা গমনের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। তাঁর আশা ছিল মুহাম্মাদ ইবনু আবি বাক্র যদি তাঁর সাথে হাজ্জে গমন করেন তাহলে বিদ্রোহীদের কিছুটা হলেও শক্তিক্ষয় হবে, ফলে খালীফার কিছুটা উপকার হতে পারে। সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করা সত্ত্বেও 'আয়িশা (রা.)-এর আহবানে

সাড়া দেননি তাঁর ভাই মুহাম্মাদ ইবনু আবি বাক্র। বিশিষ্ট সাহাবী হানযালাহ আল-কাতিব (রা.), মুহাম্মাদের এই আচরণে হতাশ ও বিস্মিত হয়ে বল্লেন, 'মুহাম্মাদ! তুমি উম্মুল মু'মিনীনের আহবানে সাড়া দিলে না! অথচ আরবের কতক চোর-বাটপার তোমাকে অবৈধ কাজ করার আহবান করল, আর তুমি তাতে সাড়া দিলে!' এহেন চেতনা জাগরুক বক্তব্যেও মুহাম্মাদের মনে কোন ভাবান্তর হল না। অতঃপর 'আয়িশা (রা.) বললেন, 'আল্লাহর শপথ! এদেরকে যদি আমি অভীষ্ট হতে ফিরাতে পারতাম তাহলে তাই করতাম।'[৯৮]

খ. আসমা বিনৃত 'উমাইস (রা.): মুহাম্মাদ ইবনু আবি বাকর (রা.)-এর মা ছিলেন আসমা বিনতু 'উমাইস (রা.)। তিনি তাঁর দু'পুত্র মুহাম্মাদ ইবনু আবি বাকর ও মুহাম্মাদ ইবনু জা'ফরকে বিদ্রোহীদের দলচ্যুত করার জন্য চেষ্টা করেন। তিনি বলেন, 'বাতি নিজেকে নিঃশেষ করে মানুষের জন্য আলো ছড়ায়, এমন এক ব্যক্তির ব্যাপারে তোমরা পাপে লিপ্ত হইও না যে তোমাদের প্রতি কোন অবিচার করেনি। যে ক্ষমতা অর্জনের জন্য তোমরা আজ চেষ্টা চালাচ্ছ আগামীকাল অন্যরা তার মালিক হবে। অতএব সাবধান, তোমাদের পদক্ষেপ যেন আফসোসের কারণ না হয়।' একথা শুনে দুই ভাই রাগে গজগজ করতে করতে বের হয়ে গেল, 'উসমান (রা.) আমাদের সাথে যা করেছেন তা আমরা কখনো ভুলতে পারব না।' তাদের মা বলল, 'কি করেছেন 'উসমান (রা.) তোমাদের সাথে? তিনি তো আল্লাহ্র আদেশ পালনে তোমাদেরকে বাধ্য করেছেন।'[৯৯]
উপরোল্লেখিত মহিয়সী নারীগণ ব্যতীত অন্যান্য সাহাবীয়াগণও অবরুদ্ধ খালীফাকে সহায়তা করতে সচেষ্ট হন।

আঠারো. অস্ত্রধারণে খালীফার নিষেধাজ্ঞা:

সাহাবায়ে কিরামসহ মাদীনার শান্তিপ্রিয় জনগণের বারংবার অনুরোধ সত্ত্বেও খালীফা অস্ত্রধারণে সম্মত হননি। শক্তিপ্রয়োগের প্রস্তাব তিনি বারবার প্রত্যাখ্যান করেছেন। অবরোধের শেষদিকে খালীফার প্রতিরক্ষার জন্য প্রায় সাতশ' সৈনিক প্রস্তুত ছিলেন; খালীফা সুস্পষ্টভাবে তাঁদেরকে অস্ত্রধারণ করতে বারণ করেন। তিনি বলেন,

اقسم على من لي عليه حق أن يكف يده وأن ينطلق إلى منزله

> আমি শপথ করে বলছি! যার ওপর আমার অধিকার আছে (অর্থাৎ যে আমার আনুগত্যের আওতায় থাকতে চায়) সে যেন তাঁর হাত সংবরণ করে আপন বাড়িতে চলে যায়।[১০০]

শাহাদাতের দিন তাঁর ঘরের দাসরা সশস্ত্র প্রতিরোধ করতে চাইলে তিনি বলেছিলেন,

---

৯৮. আত-তাবারী, ৪:৩৮৬।
৯৯. প্রাগুক্ত, ৪:৩৮৭।
১০০. ইবনু কাসীর, ৭:১৮১।

من أغمد سيفه فهو حر

যে তরবারি কোষবদ্ধ করবে সে স্বাধীন হয়ে যাবে।[১০১]

এভাবে অনুগতদেরকে তিনি তাঁর সপক্ষে অস্ত্রধারণ করতে দেননি।

'উসমান (রা.) কেন সাহাবায়ে কিরামকে যুদ্ধ করতে বারণ করলেন:

উপর্যুক্ত বিবরণে আমরা দেখেছি মাদীনায় অবস্থানরত সাহাবায়ে কিরামের অনেকে অবরুদ্ধ খালীফার উদ্ধারে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে প্রস্তুত ছিলেন। এদের বিরুদ্ধে অস্ত্র প্রয়োগের বৈধতার ব্যাপারে তাদের মনে বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না। তাই বারংবার খালীফার কাছে অস্ত্রধারণের অনুমতি প্রার্থনা করেছেন। কিন্তু খালীফা প্রতিবারই তাদেরকে বারণ করেছেন এবং বলেছেন, যে অস্ত্রধারণ করবে সে আনুগত্য পরিত্যাগ করবে। ফলে সাহাবায়ে কিরাম ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও খালীফাকে রক্ষায় সশস্ত্র প্রতিরোধ করতে পারেননি। প্রশ্ন হল: 'উসমান (রা.) বিদ্রোহীদের দমনে কেন অস্ত্রধারণ করলেন না এবং অন্যদেরকে কেন অস্ত্রধারণের অনুমতি দিলেন না? গবেষকগণ এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে কিছু মতামত পেশ করেছেন (প্রকৃত জ্ঞানতো আল্লাহরই হাতে):

১. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহূ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওয়াসিয়াত অনুসারে আমল করা: ফিতনার সময়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহূ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে ধৈর্যধারণের উপদেশ দিয়েছিলেন; অবরুদ্ধ অবস্থায় 'উসমান (রা.) এটি প্রকাশ করেছিলেন, 'আমি একটি ওয়াদায় আবদ্ধ যা পালনে আমি ধৈর্যধারণ করব।'[১০২]

২. অস্ত্রধারণ করতে নিষেধ করে 'উসমান (রা.) নিজেই বলেছেন,

لن أكون أول من خلف رسول الله في أمته بسفك دماء المسلمين

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহূ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতিনিধিদের (খালীফা) মাঝে আমি প্রথম ব্যক্তি হতে পারব না যে কিনা মুসলিমদের রক্তপাত করবে।[১০৩]

৩. 'উসমান (রা.) জানতেন বিদ্রোহীরা তাঁকেই হত্যা করতে চায়। তাই তিনি মু'মিনদের মাধ্যমে আত্মরক্ষা করতে চাননি, বরং আত্মোৎসর্গের মাধমে মু'মিনদেরকে রক্ষা করলেন।

৪. তিনি জানতেন এই ফিতনায় তাঁর মৃত্যু হবে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহূ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন তখন এই খবর দিয়েছিলেন যে, আপতিত বিপদে সত্যের ওপর অবিচল থেকে ও ধৈর্যধারণ করে তিনি শাহাদাতবরণ করবেন। পরিস্থিতি ইঙ্গিত দিচ্ছিল যে, তাঁর শাহাদাতের সময় ঘনিয়ে এসেছে, বিশেষত পূর্ব রাতের স্বপ্নে তিনি আরো নিশ্চিত হন যখন তিনি

---

১০১. প্রাগুক্ত।

১০২. ফাদাইলুস সাহাবাহ, ১:৬০৫।

১০৩. মুসনাদ, ১:৩৯৬।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আহ্বান শুনতে পান: أفطر عندنا القابلة। 'আগামীকাল আমাদের সাথে ইফতার কর।'[১০৪] এই স্বপ্নের ইঙ্গিতকে তিনি সত্য হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। কারণ শাইতান রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বেশধারণ করতে পারে না। তিনি যখন নিশ্চিত হলেন যে শহীদ হবেন, তখন তাঁর প্রতিরোধে মুসলিমদের রক্ত ঝরাতে চাননি।

৫. ইবনু সালামের পরামর্শ অনুযায়ী আমল করেছেন তিনি, 'নিবৃত হউন, নিবৃত হউন, কারণ এর মাধ্যমেই আপনি অধিক দ্রুততায় জান্নাতে পৌঁছতে পারবেন।'[১০৫]

উনিশ. বাচনিক প্রতিরোধ:

বিদ্রোহীদেরকে তাদের অভিষ্ট হতে ফিরানোর জন্য উসমান (রা.) সামরিক উপায় ব্যতীত অন্য সব উপায় অবলম্বন করলেন। তিনি বিদ্রোহীদের দাবির অসারতা প্রমাণ করেছেন, হত্যাকাণ্ডের পরিণাম সম্পর্কে সাবধান করেছেন, নিজের মর্যাদার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাদেরকে নিরস্ত করতে সচেষ্ট হয়েছেন।

ক. নিজের মর্যাদার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বিদ্রোহীদের নিরস্ত করার চেষ্টা: তিনি মানুষকে তাঁর মর্যাদা ও ইসলাম প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদানের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন, তাঁর বক্তব্যের সপক্ষে তিনি উপস্থিতির সমর্থন চাইলেন। তিনি বললেন, 'তোমাদের কে এই ঘটনার সাক্ষী যে, একবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে আমরা হেরা পাহাড়ের ওপর ছিলাম, পাহাড়টি কেঁপে ওঠলে তিনি পা দিয়ে আঘাত করে বলেছিলেন, اسكن حراء ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد 'হেরা! স্থির হও, তোমার ওপর একজন নাবী, সিদ্দীক ও শহীদ ছাড়া কেউ নেই।' কয়েকজন লোক তাঁর এই বক্তব্য সমর্থন করলেন। 'উসমান (রা.) আবার বললেন, 'তোমাদের মাঝে কে বাই'আতুর রিদওয়ানের দিনে উপস্থিত ছিলে, ঐদিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে মুশরিকদের সাথে আলোচনার জন্য মাক্কায় পাঠিয়েছিলেন। বাই'আতের সময় তিনি বললেন, 'এটি আমার হাত, আর এটি 'উসমান (রা.)-এর হাত।' তারপর তিনি নিজের এক হাতের সাথে অপর হাত মিলিয়ে আমার পক্ষ থেকে বাই'আত করলেন। একদল লোক 'উসমান (রা.)-এর এই বক্তব্যও সমর্থন করলেন। উসমান (রা.) বক্তব্য অব্যাহত রাখলেন, 'তোমাদের মধ্যে কে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে এই কথা বলতে শুনেছে যে, من يوسع لنا البيت في المسجد ببيت في الجنة 'কে জান্নাতের একটি বাড়ির বিনিময়ে আমাদের জন্য মাসজিদ-ঘরটি সম্প্রসারণ করে দেবে?' তখন আমি নিজ অর্থে জমি কিনে মাসজিদ সম্প্রসারণ

---

১০৪. ইবনু কাসীর, ৭:১৮২।
১০৫. ইবনু সাদ, ৩:৭১।

করেছি। তাঁর এই বক্তব্যও সমর্থিত হল। তারপর 'উসমান (রা.) বললেন, 'আল্লাহর দোহাই! তোমাদের মাঝে এমন কেউ আছে কি যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতিকালে এই কথা বলতে শুনেছ যে, من ينفق اليوم نفقة متقبلة 'কে আছো এমন যে আজ কবুল হওয়া দান করবে?' তখন আমি স্বীয় সম্পদ হতে যুদ্ধ প্রস্তুতির অর্ধেক খরচ মিটিয়েছি।' একদল লোক এর সত্যতা স্বীকার করলেন। অতঃপর 'উসমান (রা.) বললেন, তোমাদের মাঝে কে রূমা কূপ হতে পানি বিক্রি হতে দেখেছে? আমিই-তো ঐ কূপ কিনে জনগণের জন্য সাদাকাহ করে দিয়েছি।' এই বক্তব্যও সমর্থিত হল।[১০৬]

আবূ সাওর আল-ফাহমী বলেন, আমি 'উসমান (রা.)-এর ফটকের দোরগোড়ায় মিসরীয় বিদ্রোহীদের একটি দল দেখতে পেলাম, দেখলাম তাদের মনোভাব বেগতিক। তারপর মাসজিদে গিয়ে দেখলাম ওদেরই একজন ইবনু 'উদাইস আল-বালাবী খুতবায় 'উসমান (রা.) সম্পর্কে কটু কথা বলছে। পুরো ব্যাপারটি খালীফাকে অবহিত করলে তিনি বললেন, 'আল্লাহর কসম! ইবনু 'উদাইস মিথ্যা বলছে, আমি ইসলাম কবুলকারী ব্যক্তিদের মাঝে চতুর্থ, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর এক কন্যাকে আমার সাথে বিয়ে দেন। সে মারা গেলে আরেক কন্যার সাথে আমার বিয়ে দেন। জাহিলী বা ইসলামী- কোন যুগেই আমি চুরি বা যিনা করিনি, কখনো গান গাইনি, ইসলাম ভিন্ন অন্য কোন মতাদর্শকে দীন হিসেবে গ্রহণের চিন্তা কখনো আমার মনে উদ্রেক হয়নি, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাতে বাইয়াত গ্রহণের দিন হতে কখনো আমি ডান হাতে লজ্জাস্থান স্পর্শ করিনি, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে আমি কুরআন একত্র করেছি, এমন কোন জুমু'আর দিন অতিবাহিত হয়নি যেদিন আমি গোলাম আযাদ করিনি, তবে কোন জুমু'আবারে গোলাম না থাকলে পরের বারে দু'জন আযাদ করে কোটা পূরণ করেছি।'[১০৭]

খ. খালীফাকে হত্যার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক পরিণাম সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ:

খালীফা 'উসমান (রা.)-এর মর্যাদা সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য ও জনগণের সাক্ষ্য বিদ্রোহীদের মনে বিন্দুমাত্র রেখাপাত করল না। তারা অবরোধ অব্যাহত রেখে খালীফাকে হত্যার সংকল্প ব্যক্ত করল। 'উসমান (রা.) আবারো বাকশক্তি প্রয়োগে তাদেরকে নিরস্ত করতে সচেষ্ট হলেন, তাকে হত্যা করার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক পরিণাম সম্পর্কে তিনি সাবধান-সতর্ক করলেন। তিনি দিব্যচোখে দেখতে পাচ্ছিলেন যে, তাঁকে হত্যা করা হলে খিলাফাতের অপূরণীয় ক্ষতি হবে, উম্মাহর মাঝে চিরস্থায়ী বিভক্তি, ফাটল ও অনৈক্য সৃষ্টি হবে। তাই তিনি বাসভবনের দেয়ালের এক ছিদ্র দিয়ে বিদ্রোহীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে

---

১০৬. আত-তাবারী, ৪:৩৮৩।
১০৭. আস্-সুলামী, খিলাফাতু 'উসমান ইবনি 'আফ্ফান, ৯১।

বললেন, 'হে লোকেরা, তোমরা আমাকে হত্যা করো না, বরং আমাকে সন্তুষ্ট কর। আল্লাহর শপথ, তোমরা যদি আমাকে হত্যা কর, তাহলে আর কখনো ঐক্যবদ্ধভাবে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারবে না। তোমাদের মাঝে এমন মতভেদ সৃষ্টি হবে যে তোমরা এই রকম হয়ে পড়বে,' তিনি তার হাতের আঙ্গুল বিজড়িত করলেন।[১০৮]

ঐ দুর্যোগ মুহূর্তে তিনি আরো বলেছিলেন, 'হে লোকেরা, আমাকে হত্যা করো না; সঠিক সিদ্ধান্ত নিই বা ভুল সিদ্ধান্ত নিই আমি তো তোমাদের মুসলিম ভাই, শাসক। আল্লাহর কসম, আমি সাধ্যানুযায়ী সংস্কার করতে চাই। আমাকে হত্যা করা হলে তোমরা কখনো সম্মিলিতভাবে সালাত আদায় করতে পারবে না, তোমরা একতাবদ্ধ হয়ে কখনো যুদ্ধ করতে পারবে না, নিজেদের মাঝে গানীমাতের সম্পদও বণ্টন করতে পারবে না।'[১০৯] 'উসমান (রা.) বলেছিলেন, 'আমাকে হত্যা করা হলে তোমাদের পারস্পরিক ভালোবাসা বিদূরিত হবে।'

'উসমান (রা.)-এর আশঙ্কা সত্য প্রমাণিত হয়েছিল। তার হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর মাঝে যে বিভক্তির সূচনা হয় তা আজো মিটিয়ে ফেলা সম্ভব হয়নি। হাসান আল-বাসরী একবার বলেছিলেন, 'আল্লাহর শপথ, লোকেরা একত্রে সালাত আদায় করলেও তাদের অন্তরগুলো থাকে বিছিন্ন।'[১১০]

'উসমান (রা.)-এর সাবধান ও সতর্কতাবাণী সত্ত্বেও বিদ্রোহীদের অবরোধ অব্যাহত থাকে। এই সময় মাদীনায় অবস্থানরত সাহাবায়ে কিরাম নানাভাবে 'উসমান (রা.)-এর সাহায্যে এগিয়ে আসেন। খালীফাকে রক্ষার জন্য তারা জান কোরবানি করতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু শক্তি প্রয়োগের অনুমতি না দেওয়ার ব্যাপারে উসমান (রা.) অনড় ছিলেন। সাহাবায়ে কিরাম নানাভাবে খালীফাকে যে সহায়তা করেছেন তার বিবরণ ইতোপূর্বে দেওয়া হয়েছে।

বিশ. উসমান (রা.)-এর সর্বশেষ ভাষণ:

অবরোধের কয়েক সপ্তাহ পরে একদিন 'উসমান (রা.) মাদীনাবাসীদের ডেকে তাঁদের উদ্দেশ্যে শেষ ভাষণ দিলেন; শ্রোতাদের মাঝে সাবাঈ বিদ্রোহীরাও ছিল। বিশিষ্ট সাহাবীদের মাঝে 'আলী, তালহা ও আয-যুবাইর (রা.) উপস্থিত ছিলেন। বাসগৃহের তোরণে দাঁড়িয়ে খালীফা বললেন, 'আল্লাহ তোমাদেরকে এজন্যই দুনিয়া দিয়েছেন যাতে এর মাধ্যমে তোমরা আখিরাতের কল্যাণ তালাশ করতে পার। তিনি তোমাদেরকে দুনিয়া এজন্য দেননি যে তোমরা এর দিকে ঝুঁকে পড়বে। নিশ্চয় দুনিয়া নশ্বর আর আখিরাত অবিনশ্বর, নশ্বর পৃথিবী যেন তোমাদেরকে দাম্ভিক না বানায় এবং চিরস্থায়ী আখিরাত

---

১০৮. ইবনু সাদ, ৩:৭১।
১০৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭-৬৮।
১১০. ফিতনাতু মাকতালি 'উসমান, ১:১৫৭।

থেকে যেন বিমুখ না করে। স্থায়ী আখিরাতকে তোমরা অস্থায়ী দুনিয়ার ওপর প্রাধান্য দাও। কারণ দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে এবং প্রত্যাবর্তন আল্লাহর নিকট। আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় কর, কারণ তাঁর তাকওয়া ঢালস্বরূপ যা মানুষকে তাঁর শাস্তি থেকে রক্ষা করে। তোমরা ঐক্য বজায় রাখো এবং নানা দলে বিভক্ত হয়ো না। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَلَا تَفَرَّقُوْا وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ

তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর: তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু এবং তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেন, ফলে তার অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হয়ে গেলে। তোমরা তো অগ্নিকুণ্ডের প্রান্তে ছিলে, আল্লাহ তা হতে তোমাদেরকে রক্ষা করেছেন। এইরূপে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর নিদর্শনসমূহ স্পষ্টভাবে বিবৃত করেন যাতে তোমরা সৎপথ পেতে পার [আলকুরআন ৩:১০৩]।

তারপর তিনি বললেন, 'হে মাদীনাবাসী! আমি তোমাদেরকে আল্লাহর জিম্মায় রেখে যাচ্ছি, তাঁর কাছে আমি দু'আ করি আমার পরে তোমাদের খিলাফাত যেন ভাল চলে। আল্লাহর কসম, আমি আজকের পর কারো কাছে যাব না যতক্ষণ না আমার ব্যাপারে আল্লাহর ফায়সালা আসে। এই বিদ্রোহীদেরকে আমি তোরণের বাইরে রেখে দেব, তাদের কিছুই দেব না, তাদের এমন কোন দাবি মানব না যাতে তারা দীন বা পার্থিব বিষয়ে তোমাদের সাথে ঈর্ষা করতে পারে। আল্লাহ্ই এ ব্যাপারে তাঁর পছন্দানুযায়ী যা করার তাই করবেন।' অতঃপর তিনি মাদীনাবাসীকে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং অস্ত্রধারণ না করার ব্যাপারে তাদের কাছ থেকে শপথ নিলেন। আল-হাসান, মুহাম্মাদ ও ইবনুয যুবাইর এবং আরো কয়েকজন ছাড়া বাকিরা চলে গেলেন। এঁরা 'উসমান (রা.)-এর বাসগৃহের দরজায় বসে থাকলেন।[১১১]

একুশ. 'উসমান (রা.)-এর শাহাদাত:

হাজ্জ সম্পাদন শেষ হলে বিদ্রোহীরা তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তৎপর হয়ে ওঠল, তারা চিন্তা করল হাজ্জ শেষে মু'মিনরা মাদীনায় ফিরে এলে তারা লক্ষ্যে পৌছতে পারবে না, বিশেষত আয়িশা (রা.) ও ইবনু 'আব্বাসের (রা.) মত প্রভাবশালী সাহাবীদের

---

১১১. আত-তাবারী ৪:৩৮৪-৮৫।

মাদীনায় উপস্থিতি খালীফার শক্তিবৃদ্ধি করবে। ওদিকে বিভিন্ন প্রদেশ থেকে সাহায্যকারী বাহিনী এগিয়ে আসার সংবাদ পাওয়া গেল। 'উসমান (রা.) অবশ্য সামরিক সাহায্যের জন্য কোন পত্র প্রেরণ করেননি। কিন্তু প্রাদেশিক শাসকগণ স্ব-উদ্যোগে খালীফার প্রতিরক্ষায় বাহিনী প্রেরণ করেন; মু'আবিয়া সিরিয়া হতে হাবীব ইব্ন মাসলামা আল-ফিহ্রীকে একটি বাহিনীসহ খালীফাকে সহায়তার উদ্দেশ্যে মাদীনায় প্রেরণ করেন। কূফা হতে একটি বাহিনী নিয়ে আল-কা'কা' ইবনু 'আমর রওয়ানা হন। সাহায্যকারী বাহিনীর আগমনের খবর পেয়ে বিদ্রোহীরা দ্রুত কার্যসিদ্ধির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ওই বাহিনীগুলো মাদীনায় পৌঁছার পূর্বেই খালীফা শহীদ হন।

স্বপ্ন: শাহাদাতের পূর্বরাতে ঘুমন্ত অবস্থায় 'উসমান (রা.) স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম), আবূ বাকর (রা.) ও 'উমার (রা.)-কে দেখলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে বললেন, يا عثمان أفطر عندنا "উসমান আমাদের সাথে ইফতার কর।" স্বপ্ন দেখার পর তিনি রোযা রাখেন এবং সেদিনই শহীদ হন।[১১২]

বর্বর হত্যাকান্ড: ৩৫ হিজরীর ১৮ যুলহিজ্জা সকালে বিদ্রোহীরা 'উসমান (রা.)-এর বাসগৃহে হামলা চালাল। ওদিকে কয়েকজন তরুণ সাহাবীতনয় আল-হাসান ইবনু 'আলী, আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর, মুহাম্মাদ ইবনু তালহা প্রতিরোধ গড়ে তুললেন। তাঁদের সাথে আরো ছিলেন মারওয়ান ইবনুল হাকাম ও খালীফার কয়েকজন দাস। দু'পক্ষের মাঝে সংঘর্ষ শুরু হলে খালীফা চিৎকার করে তাঁর পক্ষে অস্ত্রধারণ না করার নির্দেশ দেন। গোলামদেরকে তিনি বলেন, 'যে অস্ত্রধারণ হতে নিরস্ত হবে সে মুক্ত।'[১১৩] তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় বলেন, 'আমি দৃঢ়তার সাথে পরিষ্কার ভাষায় নির্দেশ দিচ্ছি, যে ব্যক্তি মনে করে সে আমার আনুগত্যের আওতায় আছে সে যেন অবশ্যই অস্ত্র ত্যাগ করে।' এই নির্দেশের ব্যাখ্যা এই ছাড়া আর কি হতে পারে যে 'উসমান (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সুসংবাদ অনুযায়ী শাহাদাতের ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন; তাই তিনি চাননি তাঁর জন্য কোন মুসলিমের রক্ত ঝরুক।

আল-মুগীরা ইবনুল আখনাস সেই বছর হাজ্জে গমন করেছিলেন, মাদীনার গোলযোগপূর্ণ অবস্থার খবর পেয়ে তিনি হাজ্জ সমাপনান্তে দ্রুত ফিরে আসেন। খালীফাকে রক্ষা করার মানসে তিনি 'উসমান (রা.)-এর বাসগৃহে এসে বললেন, 'আমরা আমরণ লড়াই করে বিদ্রোহীদেরকে ঠেকিয়ে রাখতে পারি, এ অবস্থায় আপনার সুরক্ষার পদক্ষেপ যদি আমরা গ্রহণ না করি তবে আল্লাহর কাছে কি জবাব দেব?' ঐ সময় বিদ্রোহীরা খালীফার ঘর জ্বালিয়ে দেয়ার জন্য আসল। খালীফা সালাত আদায় করছিলেন, ফলে তিনি মানা করতে

১১২. ইবনু সাদ, ৩:৭৫।
১১৩. আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৭:১৯০।

পারেননি। ঘরের বাসিন্দা ও মুষ্টিমেয় সাহাবা প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। 'উসমান (রা.) তাঁদেরকে যুদ্ধ না করার নির্দেশ দিয়ে আবার সালাতে মগ্ন হলেন।

ঐ দিন চার জন কুরাইশি যুবক আহত হলেন, তারা হলেন আল-হাসান ইবনু 'আলী, 'আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর, মুহাম্মাদ ইবনু হাতিব ও মারওয়ান ইবনুল হাকাম, শহীদ হলেন অপর তিনজন: আল-মুগীরা ইবনুল আখনাস, নায়ার ইবনু আবদিল্লাহ আল-আসলামী ও যিয়াদ আল-ফিহরী। 'উসমান (রা.) প্রতিরোধকারীদের বুঝাতে সক্ষম হলেন, তাঁরা খালীফার বাসগৃহ ছেড়ে চলে গেলেন। মুষ্টিমেয় অনুচর ও গৃহবাসীসহ খালীফা অবরুদ্ধ হয়ে পড়লেন, তাঁর পক্ষে লড়াই করার জন্য কাউকে থাকতে দিলেন না তিনি; সম্মুখে এক দঙ্গল রক্ত পিপাসু বিদ্রোহী। দরজা খুলে তিনি কুরআন তিলাওয়াত শুরু করলেন।[১১৪]

এদিন তিনি অত্যন্ত শক্ত করে একটি জামা পরিধান করেছিলেন, লাজনম্র 'উসমান (রা.)-এর ভয় ছিল এই যে, ধস্তাধস্তির কোন পর্যায়ে তাঁর সতর যেন প্রকাশ হয়ে না যায়।[১১৫] প্রথমে কয়েকজন বিদ্রোহী খালীফাকে হত্যার জন্য তাঁর ঘরে প্রবেশ করে। কিন্তু 'উসমান (রা.) এর সামনে গিয়ে তাঁরা কিছুই করতে না পেরে ফিরে গেল। এরপর মুহাম্মাদ ইবনু আবি বাক্‌র প্রবেশ করে খালীফার দাড়ি আঁকড়ে ধরে তাঁর গলায় ধারালো ছুরি চালাতে উদ্যত হলেন। 'উসমান (রা.) বললেন, 'ভাতিজা, থামো, তুমি আমার দাড়ি ধরে টানছো অথচ তোমার পিতা এই দাড়িকে সম্মান করতেন।' একথা শুনে মুহাম্মাদ ইবনু আবি বাক্‌র লজ্জা পেয়ে ফিরে গেলেন; শুধু তাই নয়, তিনি বিদ্রোহীদেরকে ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টাও করেছিলেন, যদিও তা সফল হয়নি।[১১৬]

তিনি বের হতে না হতেই বানূ সাদূসের আল-মাওত আল-আসওয়াদ নামী এক লোক প্রবেশ করল। খালীফাকে তরবারি দিয়ে আঘাত করার আগে সে তাঁর গলা চেপে ধরল। পরে ঐ হন্তা বলেছিল: 'আল্লাহর শপথ, তাঁর গলা চেপে ধরার চেয়ে সহজ কিছু আমি পাইনি, আমি তাঁর গলা চেপে ধরার সময় দেখেছিলাম যে তাঁর প্রাণবায়ু নিরীহ সাপের মত।' লোকটির সাথে তাঁর ধস্তাধস্তির এক পর্যায়ে খুনী তাঁকে তরবারি দিয়ে আঘাত করে। খালীফা হাত দিয়ে আত্মরক্ষা করতে গেলে তাঁর হাত কেটে যায়। কর্তিত হাতের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আল্লাহর কসম, এটি হল সেই হাত যা সর্বাগ্রে আলকুরআন লিপিবদ্ধ করেছিল।'[১১৭] শাহাদাতের সুধা পান করার প্রাক্কালে সত্য বাণী উচ্চারণ করেছেন 'উসমান (রা.)। তিনি প্রাথমিক যুগের ওয়াহী লেখকগণের অন্যতম ছিলেন। সেই হাতে তিনি আলকুরআনের অনেক আয়াত লিপিবদ্ধ করেছিলেন। হাত কেটে

---

১১৪. আত-তাবারী, ৪:৩৮৮-৮৯।
১১৫. ইবনু কাসীর, ৭:১৮৩।
১১৬. আত-তাবারী, ৪:৩৭২; ইবনুল আসীর, ২:৪৪৮; ইবনু কাসীর, ৭:১৮৪-৮৫।
১১৭. আত-তাবারী, ৪:৩৮৪।

যাওয়ার সাথে সাথে ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হয়, সেই রক্তে সিক্ত হয় উন্মুক্ত কুরআন। এই আয়াতটির ওপর রক্ত লেগে যায়: فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 'তাদের বিরুদ্ধে তোমার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট। আর তিনি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ। [আলকুরআন ২:১৩৭] অতঃপর তরবারির আঘাতে হত্যা করা হয় খালীফাকে।

খালীফাকে হত্যা করার পাশাপাশি বিদ্রোহীরা গৃহবাসীর সাথে অশোভন আচরণ করে। দুষ্কৃতিকারীরা খালীফাকে হত্যা করার জন্য এগিয়ে এলে তাঁর স্ত্রী নায়িলা বিনতুল ফারাফিসাহ্ স্বামীর প্রতিরোধে সচেষ্ট হন। তিনি বলেন, 'তোমরা তাঁকে হত্যা কর বা ছেড়ে দাও– তবে জেনে রাখো তিনি এক রাক'আত সালাতে পূর্ণ কুরআন তিলাওয়াত করে রাত কাটিয়ে দিতেন।' তারপর তিনি স্বামীকে বাঁচাতে গেলে তরবারির আঘাতে তাঁর আঙ্গুল কেটে যায়। সরে যাওয়ার পথে সুদান ইবনু হুমরান নামক জনৈক দুষ্কৃতিকারী তাঁর সাথে অশোভন আচরণ করে।[১১৮]

কোন কোন বর্ণনায় দেখা যায়, মুহাম্মাদ ইবনু আবি বাক্‌র বের হয়ে যাওয়ার পর গাফিকী ইবনু হার্‌ব আল-'আক্কী কয়েকজন বিদ্রোহীসহ খালীফার বাসভবনে প্রবেশ করে। 'উসমান (রা.) তখন কুরআন তিলাওয়াতরত ছিলেন। আল-গাফিকী লাথি মেরে মুসহাফটি সরিয়ে লৌহখণ্ড দিয়ে খালীফার মাথায় আঘাত করলে তিনি শহীদ হন এবং তাঁর রক্তে কুরআন রঞ্জিত হয়। অপর বর্ণনায় হন্তা হিসেবে কিনানা ইবনু বিশ্‌র আত-তুজিবীর নাম এসেছে। মাথায় আঘাত পেয়ে ভূপতিত হওয়ার পর 'আমর ইবনুল হামিক খালীফার বুকে চেপে বসে তার শরীরে নয়টি আঘাত করে। অপরদিকে 'উমাইর ইবনু দাবি মৃত খালীফার পাঁজর ভেঙ্গে ফেলে। হত্যাকারীরা নিহত খালীফার দেহ হতে মাথা কেটে ফেলার মত নৃশংসতার পরিকল্পনা করেছিল। এটি দেখে নায়িলা ও উম্মুল বানীন আহাজারি শুরু করেন। তখন বিদ্রোহীদের নেতা ইবনু 'উদাইস আল-বালাবী বলে, 'যথেষ্ট হয়েছে, লাশটি যেভাবে আছে সেভাবে রেখে দাও, মাথা কাটার দরকার নেই।'[১১৯] হত্যাকাণ্ডের পরে খালীফার ঘরে আরো কিছু ঘটনা ঘটে; 'উসমান (রা.)-এর গোলাম নাজীহ্ খালীফাকে ভূপতিত দেখে হামলাকারী সুদানের ওপর আক্রমণ চালিয়ে তাকে হত্যা করে। এটি দেখে কুতাইরা ইবনু ফুলান আস-সাকুনী, নাজীহকে হত্যা করে। অপরদিকে 'উসমান (রা.)-এর আরেক গোলাম সুবাইহ, কুতাইরাকে হত্যা করে। এই হত্যাকাণ্ড ও প্রতিরোধের মাঝে বিদ্রোহীদের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে যে খালীফা নিহত হয়েছেন, তখন তাদের একজন ঘোষণা করে, 'যার প্রাণ আমাদের জন্য হালাল তার সম্পদ তো আমাদের জন্য হারাম হতে পারে না!' অব্যবহিত পরেই লুটেরার দল খালীফার বাসগৃহের সর্বস্ব লুট করে, এমনকি তারা মহিলাদের শরীর থেকে অলঙ্কার

---

১১৮. প্রাগুক্ত।

১১৯. আত-তাবারী, ৩৯৩-৯৪; ইবনুল আসীর, ২:৪৫০; ইবনু কাসীর, ৭:১৮৮-৮৯।

ছিনিয়ে নেয়। কুলসুম আত-তাজিবী নামক এক লুটেরা নায়িলা'র মুখ হতে অবগুণ্ঠন ছিনিয়ে নিয়ে তাঁর সাথে অশোভন আচরণ করে।

খালীফার বাসগৃহ লুট করে বিদ্রোহীদের লুণ্ঠন-ক্ষুধা মিটল না, এবার ওরা ছুটল বাইতুল মালের উদ্দেশ্যে, ঘোষক বলল, 'তোমাদের আগে যেন কেউ বাইতুল মালে পৌঁছতে না পারে।' বাইতুল মালের দ্বাররক্ষীদেরকে তাড়িয়ে দিয়ে ওরা তথায় লুটতরাজ চালাল, তবে তাদের লুণ্ঠন-তৃষা নিবারিত হয়েছিল বলে মনে হয় না। তখন বাইতুল মালে দুই বস্তা খাবার ছাড়া আর কিছু ছিল না।[১২০]

বিভিন্ন শহর হতে আগত বিদ্রোহীদের মাঝে নানা স্তরের মানুষ ছিল; এদের মাঝে আবদুল্লাহ ইবনু সাবা-এর মত পরিকল্পনাকারী ছিল, যারা খিলাফাতের সর্বনাশ করতে সংকল্পবদ্ধ ছিল। খালীফার হত্যাকাণ্ডে নিজেদের মনষ্কামনা পূরণ হওয়ায় তারা যারপরনেই খুশী হল। কিন্তু এদের সাথে একদল সাধারণ স্তরের উচ্ছৃখল জনতা ছিল যাদের গভীর কোন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল না। এরা ছিল সাধারণ মানুষ যাদেরকে প্ররোচনামূলক বক্তব্য দিয়ে খালীফার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা হয়েছিল। খিলাফাতের বিনাশ বা খালীফার হত্যাকাণ্ড এদের উদ্দেশ্য ছিল না। এরা মনে করেছিল, কিছু দাবিদাওয়া আদায়ের জন্য তাদেরকে মাদীনায় আনা হয়েছে। খালীফাকে হত্যা করার বিষয়টি এদের কল্পনার বাইরে ছিল। এই স্তরের লোকেরা খালীফার মৃত্যুতে ব্যথিত ও লজ্জিত হল। মাদীনার নেক বাসিন্দারা নিদারুণ ব্যথিত হলেন, মাদীনার ঘরে ঘরে কান্নার রোল পড়ে গেল। তবে তাদের করার কিছুই ছিল না। ইতোপূর্বে তারা সংগঠিত হয়ে খালীফার পক্ষে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু 'উসমান (রা.) বারণ করায় তা সম্ভব হয়নি। এখন মাদীনায় বিদ্রোহীরা গিজগিজ করছে, খিলাফাতের রাজধানী শহরটির কার্যকর শাসক ছিল মিসরীয় বিদ্রোহীদের নেতা আল-গাফিকী ইবনু হারব আল-'আক্কী। তাঁর সাথে পরিকল্পনাকারী আবদুল্লাহ ইবনু সাবাও ছিল।

বাইশ. কাফন-দাফন ও অন্যান্য প্রসঙ্গঃ

যেদিন 'উসমান (রা.) শহীদ হন সেদিন দিবাগত রাতে একদল সাহাবী তাঁর গোসল, কাফন ও দাফনের ব্যবস্থা করেন। একাজে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে ছিলেন, হাকীম ইবনু হিযাম, হুওয়াইতিব ইবনু আবদিল উজ্জা, আবু জাহম ইবনু হুযাইফা, জুবাইর ইবনু মুত'ইম, আয-যুবাইর ইবনুল আওয়াম, 'আলী ইবনু আবি তালিব (রা.)। খালীফার স্ত্রী নায়িলা, উম্মুল বানীন বিনতু 'উতবাসহ কয়েকজন মহিলাও অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর জানাযার ইমাম কয়েকজনের নাম বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছেঃ জুবাইর ইবনু মুত'ইম,

---

১২০. প্রাগুক্ত, ৪:৩৯২-৯৩।

আয-যুবাইর ইবনুল আওয়াম, হাকীম ইবনু হিযাম, মারওয়ান ইবনুল হাকাম ও মিসওয়ার ইবনু মাখরামা (রা.)।[১২১] তবে মুসনাদ আহমাদের এক শক্তিশালী বর্ণনার আলোকে প্রতীয়মান হয় আয-যুবাইর ইবনুল আওয়াম-ই তাঁর সালাতুল জানাযায় ইমামতি করেছিলেন। তাঁকে বাকী' গোরস্থানের পূর্ব-প্রাচীর সংলগ্ন হাশ-কাওকাব-এ দাফন করা হয়। মু'আবিয়া (রা.) খালীফা হওয়ার পর এটিকে বাকী''র অন্তর্ভুক্ত করেন।[১২২]

শাহাদাতের তারিখ: 'উসমান (রা.)-এর শাহাদাতের সন সম্পর্কে ঐহিতাসিকদের মাঝে কোন মতভেদ নেই, সবাই এ বিষয়ে একমত যে তিনি ৩৫ হিজরীতে শাহাদাত বরণ করেন। শাহাদাতের মাস সম্পর্কে কোন মতভেদ নেই: সবাই এ ব্যাপারে একমত যে তিনি যুলহিজ্জা (জিলহজ্জ) মাসে শাহাদাত বরণ করেছিলেন। ৩৫ হিজরীর যুলহিজ্জা মাসের কোন্ তারিখে কোন্ সময় শাহাদাত বরণ করেন তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মাঝে সামান্য মতভেদ আছে, তবে অধিকাংশের মতে তিনি যুলহিজ্জা মাসের ১৮ তারিখ শুক্রবার শাহাদাত বরণ করেন।[১২৩]

শাহাদাতের সময় তাঁর বয়স: মৃত্যুকালে 'উসমান (রা.)-এর বয়স কত ছিল, এ বিষয়ে প্রাচীন ঐতিহাসিকদের মাঝেও মতভেদ ছিল। তবে বিভিন্ন বর্ণনার পর্যালোচনায় মনে হয় মৃত্যকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর।[১২৪]

তেইশ. সাহাবায়ে কিরামের প্রতিক্রিয়া:

খালীফার মৃত্যুতে মাদীনায় অবস্থানরত বিশিষ্ট সাহাবীগণ যারপরনেই ব্যথিত হন। তাঁদের বিভিন্ন বক্তব্যে এটি প্রকাশিত হয়:

'আলী ইবনু আবি তালিব (রা.): 'উসমান (রা.)-এর শাহাদাতের খবর পেয়ে 'আলী (রা.) বললেন, আল্লাহ 'উসমান (রা.)-এর ওপর দয়াপরবশ হোন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তাঁকে বলা হল, হত্যাকারীরা লজ্জিত, অনুতপ্ত। একথা শুনে তিনি আলকুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করলেন:

كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّيْ أَخَافُ اللهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ. فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِخَالِدَيْنِ فِيْهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِيْنَ.

এরা শাইতানের মত, সে মানুষকে বলে, 'কুফরী কর'; অতঃপর যখন সে কুফরী করে তখন সে বলে, 'তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই, আমি তো জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি। ফলে উভয়ের পরিণাম

---

১২১. ইবনু কাসীর, ৭:১৯৯।
১২২. আত-তাবারী, ৪:৪১৩।
১২৩. প্রাগুক্ত, ৪:৪১৫।
১২৪. প্রাগুক্ত।

হবে জাহান্নাম। সেখানে এরা স্থায়ী হবে এবং এটিই যালিমদের কর্মফল [আলকুরআন ৫৯: ১৬-১৭]।

সা'দ ইবনু আবি ওয়াক্কাস (রা.): বিশিষ্ট সাহাবী সা'দ ইবনু আবি ওয়াক্কাস (রা.) খালীফা 'উসমান (রা.)-এর শাহাদাতের খবর শুনে বলেন, 'আল্লাহ্ 'উসমান (রা.)-এর ওপর রহমত নাযিল করুন।' অতঃপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন,

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِيْنَ أَعْمَالًا الَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا أُولئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِأيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوْا وَاتَّخَذُوْا أيَاتِي وَرُسُلِيْ هُزُوًا

বল, আমি কি তোমাদেরকে সংবাদ দেব কর্মে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্তদের? ওরাই তারা, পার্থিব জীবনে যাদের চেষ্টা পণ্ড হয়, যদিও তারা মনে করে যে, তারাই সৎকর্ম করছে, ওরাই তারা, যারা অস্বীকার করে তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী ও তাঁর সাথে সাক্ষাতের বিষয়। ফলে তাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়; সুতরাং কিয়ামাতের দিন তাদের জন্য ওজনের কোন ব্যবস্থা রাখব না। জাহান্নাম, এটাই তাদের প্রতিফল, যেহেতু তারা কুফরী করেছে এবং আমার নিদর্শনাবলী ও রাসূলগণকে গ্রহণ করেছে বিদ্রুপের বিষয়রূপে। [আলকুরআন ১৮: ১০৩-১০৬।]

আয-যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা.): আয-যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা.)-কে যখন 'উসমান (রা.)-এর শাহাদাতের সংবাদ দেওয়া হয় তখন তিনি বলেন, 'ইন্না লিল্লাহি ওয়ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রহম করুন।' যখন তাঁকে আবার বলা হল যে, হত্যাকারীরা অনুতপ্ত, লজ্জিত। তখন তিনি বললেন, (এখন অনুতাপের কোন মূল্য নেই), ওরাই তো পরিকল্পনামফিক সুনিপুণভাবে হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। তারপর তিনি নিম্নের আয়াত তিলাওয়াত করলেন,

وَحِيْلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُوْنَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوْا فِيْ شَكٍّ مُرِيْبٍ

এদের ও এদের বাসনার মধ্যে অন্তরাল করা হয়েছে, যেমন পূর্বে করা হয়েছিল এদের সমপন্থিদের ক্ষেত্রে। তারা ছিল বিভ্রান্তিকর সন্দেহের মধ্যে। [আলকুরআন ৩৪:৫৪।]

তালহা ইবনু 'উবাইদিল্লাহ (রা.): তালহা ইবনু 'উবাইদিল্লাহ (রা.)-এর কাছে খালীফার শাহাদাতের খবর পৌঁছলে তিনি বললেন, 'ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন।

আল্লাহ 'উসমান (রা.)-এর প্রতি রহম করুন।' লোকেরা বলল, হত্যাকারীরা অনুতপ্ত। জবাবে তালহা বললেন, 'ওরা ধ্বংস হোক।' অতঃপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করেন,

مَا يَنْظُرُوْنَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُوْنَ فَلاَ يَسْتَطِيْعُوْنَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُوْنَ.

এরা তো অপেক্ষায় আছে এক মহা নাদের যা তাদেরকে আঘাত করবে এদের বাক-বিতণ্ডাকালে। তখন তারা ওসিয়াত করতে সমর্থ হবে না এবং নিজেদের পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরে আসতেও পারবে না [আলকুরআন ৩৬: ৪৯-৫০]।[১২৫]

চব্বিশ. মাদীনায় সাহাবীদের উপস্থিতিতে কিভাবে 'উসমান (রা.)-কে হত্যা করা সম্ভব হল:

তৃতীয় খালীফা 'উসমান (রা.) যখন শহীদ হন তখনও মাদীনায় অনেক সাহাবী বেঁচে ছিলেন। সাহাবায়ে কিরামের বীরত্ব ও সাহসিকতা ছিল প্রবাদতুল্য; তাঁরা নিজেদের জান কুরবানী করে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় যে ভূমিকা পালন করেছিলেন তার নযির ইতিহাসে খুব একটা মেলে না। এমন সাহাবায়ে কিরামের উপস্থিতিতে কিভাবে খালীফা 'উসমান (রা.)-কে হত্যা সম্ভব হল? এই প্রশ্নের উত্তরে বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে:

ক. এটি সাহাবায়ে কিরামের কল্পনার বাইরে ছিল যে বিদ্রোহীরা খালীফাকে হত্যা করার মত জঘন্য কর্ম সংঘটিত করবে। কারণ বিদ্রোহীরা খালীফাকে হত্যা করার ঘোষণা দিয়ে মাদীনায় আসেনি। তাদের প্রধান দাবি ছিল খালীফার অপসারণ কিংবা মারওয়ানের সমর্পন; চাপ প্রয়োগের কৌশল হিসেবে তারা হত্যার কথা বলেছিল। তাঁদের ধারণা ছিল পদত্যাগের মাধ্যমে 'উসমান (রা.) এই সংকট থেকে মুক্তি পাবেন।

খ. সাহাবায়ে কিরাম সাধ্যানুযায়ী খালীফাকে সুরক্ষার চেষ্টা চালান। সশস্ত্র বিদ্রোহীদের প্রতিরোধে অস্ত্রধারণের বিকল্প ছিল না। কিন্তু উসমান (রা.) বারংবার অস্ত্রধারণে বারণ করেন। ফলে খালীফাকে রক্ষা করা সম্ভব হয়নি।

গ. 'উসমান (রা.)-এর হত্যাকাণ্ডের সময় অনেক সাহাবী ও মাদীনাবাসী হাজ্জপালনে মাক্কায় ছিলেন। ওদিকে বিভিন্ন প্রদেশ হতে সাহায্যকারী বাহিনীও মাদীনায় এসে পৌঁছেনি। বিদ্রোহীরা এটিকে সুবর্ণ সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করল। বিপুল সংখ্যক মাদীনাবাসীর অনুপস্থিতির এই সুযোগ নিয়ে বিদ্রোহীরা খালীফাকে হত্যা করে।

১২৫. 'উসমান (রা) হত্যার প্রেক্ষাপটে সাহাবী ও তাবি'ঈগণের প্রতিক্রিয়া জানতে দেখুন ইবনু কাসীর, ৭:১৯৩-৯৫।

ঘ. বিদ্রোহীদের সংখ্যা ছিল প্রায় তিন সহস্রাধিক। এদের মাঝে অনেক কুশলী অধিনায়কও ছিল। মাদীনায় অবস্থানরত সাহাবায়ে কিরাম হয়ত চিন্তা করেছিলেন রাষ্ট্রীয় কমান্ড ব্যতিরেকে এদেরকে প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। অপরদিকে তারা বিভিন্ন প্রদেশ হতে সাহায্যকারী বাহিনী ও হাজ্জ ফেরত মুসল্লিদের আগমনের অপেক্ষায় ছিলেন। কিন্তু তাদের আগমনের পূর্বেই এই মর্মন্তুদ ঘটনা সংঘটিত হয়।

উপসংহার

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রদর্শিত আদর্শ অনুযায়ী খুলাফা রাশিদূন রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন। তৃতীয় খালীফা রাশিদ 'উসমান (রা.) রাষ্ট্র পরিচালনার বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তাঁর দুই ন্যায়নিষ্ঠ পূর্বসূরির কর্মপন্থা ও আদর্শের অনুসরণ করেছেন। তাঁর আমলে ইসলামী রাষ্ট্রের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে। বর্তমান মানচিত্রে মরক্কো হতে আফগানিস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত রাষ্ট্রগুলো 'উসমান (রা.)-এর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে খিলাফাতের অন্ত র্ভুক্ত হয়েছিল। তাঁর নির্দেশনায় সর্বপ্রথম মুসলিম নৌবাহিনী গড়ে ওঠে। 'উসমান (রা.)-এর আমলেই মুসলিম নৌবাহিনী রোমান বাহিনীকে পরাজিত করে ভূমধ্যসাগরে রোমান আধিপত্যের অবসান ঘটায়। বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে মুসলিমদের উত্থান ও বিকাশ দেখে ইয়াহুদী ও পরাজিত জাতিগুলো ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে পড়ে। তারা খিলাফাতকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। খালীফার কিছু বৈধ কর্মকাণ্ডে অবৈধতার রঙ চড়িয়ে তারা মুসলিম সমাজের একাংশকে বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হয়। ফলে সমাজে বিদ্রোহাত্মক কর্মকাণ্ড ছড়িয়ে পড়ে। ষড়যন্ত্রকারী বিদ্রোহীরা অবৈধ দাবি তুলে চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে খালীফাকে পদত্যাগে বাধ্য করতে চেয়েছিল। কিন্তু 'উসমান (রা.)-এর নিকট নিজের প্রাণের চেয়ে খিলাফাতের পবিত্রতার গুরুত্ব অনেক বেশি ছিল। অবৈধ চাপ প্রয়োগকারী ও ষড়যন্ত্রকারীদের ক্রীড়নক হওয়ার হাত হতে তিনি খালীফার পদকে রক্ষা করেন। ধৈর্য ও দৃঢ়তার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

বস্তুত 'উসমান (রা.) ছিলেন একজন মাযলুম। বিদ্রোহীরা সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে তাঁকে হত্যা করেছিল। মাযলুম এই খালীফার ওপর যুল্‌মের ধারা তাঁর শাহাদাতের পরও শত শত বছর ধরে অব্যাহত রয়েছে। কতিপয় ঐতিহাসিক বিশেষত রাফিযী শী'আরা খালীফা হিসেবে 'উসমান (রা.)-এর ভূমিকা সম্পর্কে বহু মিথ্যা রটনা করেছিল, যার ওপর ভিত্তি করে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের অনেক ঐতিহাসিক তাঁর বিরুদ্ধে বিষোদগার করে তাঁর ওপর মরণোত্তর যুল্‌মের মাত্রা বৃদ্ধি করে চলছে।

এই গ্রন্থে আমরা 'উসমান (রা.)-এর জীবনকাল বিশেষত তাঁর খিলাফাত সম্পর্কে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে আলোচনা করেছি। তাঁর আমলে রাষ্ট্রপরিচালনা, প্রশাসন, বিচার ও অর্থব্যবস্থা সম্পর্কে সবিস্তারে আলোকপাত করা হয়েছে। সম্পূর্ণ নিরাসক্ত ভঙ্গিতে

পর্যালোচনা করে আমরা তাঁর ওপর আরোপিত অন্যায্য অভিযোগসমূহ খণ্ডন করার চেষ্টা করেছি। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবদ্দশায় ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপনে এককভাবে সর্বাধিক আর্থিক কুরবানী করেছেন 'উসমান (রা.)। তাঁর বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে রাষ্ট্রীয়সম্পদ আত্মীয়-স্বজনের মাঝে বিলি-বণ্টনের অভিযোগ উত্থাপন করা হয়। সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে তথ্যভিত্তিক পর্যালোচনার মাধ্যমে আমরা তা খণ্ডন করেছি। এমনিভাবে আমরা দেখেছি আলকুরআন একত্রীকরণ ও সংকলনের মাধ্যমে 'উসমান (রা.) মুসলিম উম্মাহ্ ও সমগ্র মানবতার বিশাল খিদমাত করেছেন। তাঁর এই মহান উদ্যোগের মাধ্যমে 'কুরআন সংরক্ষণের' ব্যাপারে আল্লাহ্র প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিই বাস্তবায়িত হয়েছে।

বস্তুত তৃতীয় খালীফা 'উসমান (রা.) নুবুওয়াতী আদর্শের আলোকে ন্যায়নিষ্ঠা ও সততার সাথে রাষ্ট্রপরিচালনা করেছেন। তাঁর খিলাফাতের প্রথমার্ধের পারফরমেন্সের ভিত্তিতে তাঁকে সফল খালীফা বলা যায়। তবে তাঁর ঔদার্য ও সহনশীলতার সুযোগ নিয়ে কতিপয় কুচক্রী তাঁর খিলাফাতের শেষার্ধে এমন বিশৃঙ্খলা ও বিদ্রোহের সূচনা করে, খালীফার জীবনোৎসর্গের মাধ্যমেও যা সমাপ্ত হয়নি; বরং তা মুসলিম উম্মাহ্কে চিরদিনের জন্য বিভক্ত করে দেয়।

– সমাপ্ত –

পরিশিষ্ট

স্থান পরিচিতি

[এই গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ে বিশেষত বিজয়াভিযান অধ্যায়ে অনেকগুলো স্থানের নাম উল্লেখিত হয়েছে। কিছু কিছু জায়গা এখনো স্বনামে অস্তিত্ব বজায় রাখতে পেরেছে। কিছু স্থান মানচিত্র থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আবার অনেকগুলো স্থানের নাম পরিবর্তিত হয়েছে। তাই বিজয়াভিযান অধ্যায়ে উল্লেখিত স্থানগুলোর পরিচিত এখানে দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি বিভিন্ন অঞ্চলে জন্মগ্রহণকারী 'আলিমগণের নামও উল্লেখ করা হয়েছে। পরিশিষ্ট অধ্যয়নে পাঠকবৃন্দ 'উসমান (রা.)-এর আমলে ইসলামী রাষ্ট্রের বিস্তৃতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারবেন।]

'আক্কা (عَكَّا/Acre): ফিলিস্তিনের অন্যতম প্রাচীন শহর ও বন্দর। ভূমধ্যসাগরের পূর্ব তীরের এই বন্দর জেরুসালেমের ১৮১ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। ২০০৮ সালের হিসাব অনুযায়ী ১৩.৫ বর্গকিলোমিটার আয়তনের এই শহরের জনসংখ্যা প্রায় ৪৬ হাজার।

খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দে কিন'আনীরা 'আক্কা বন্দর প্রতিষ্ঠা করে। তারপর ফিনিশীয়রা এটি দখল করে নেয়। পরবর্তীতে এটি গ্রীক, রোমান ও পারসিকদের অধীনে শাসিত হয়েছে। ১৬ হি./৬৩৬ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম সেনাপতি শুরাহ্বীল ইবনু হাসানাহ্ 'আক্কা শহর দখল করেন। ২০ হিজরীতে সিরিয়ার গভর্ণর মু'আবিয়া এখানে একটি জাহাজ নির্মাণ কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন। ২৮ হিজরীতে এই বন্দর হতেই মু'আবিয়া সাইপ্রাসে অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। ১১০৪ সালে ক্রুসেডাররা 'আক্কা বন্দর দখল করে। পরবর্তীতে ১২৯১ সালে মিশরের মামলুকী শাসক ক্রুসেডারদেরকে তাড়িয়ে দিয়ে বন্দরটি পুনর্দখল করেন। ১৯৪৮ সালের পর থেকে সমৃদ্ধ এই বন্দরটি ইসরাইলের অবৈধ দখলে রয়েছে। অটোম্যান ও ক্রুসেডারদের ঐতিহাসিক স্থাপনাসমৃদ্ধ এই শহর ২০০১ সালে ইউনেস্কো কর্তৃক 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট' এর মর্যাদা লাভ করেছে। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে এই শহরের বাসিন্দাদের অবদান রয়েছে; প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আল-হাসান ইবনু ইবরাহীম আল-'আক্কী এই অঞ্চলের সন্তান ছিলেন। [ইয়াকূত আল-হামাভী, *মু'জামুল বুলদান* (বৈরুত: দারু ইহয়াইত তুরাছিল 'আরাবী ১৯৭৯), ৪:১৪৩-৪৪]

আজারবাইজান (أذربيجان): পূর্ব ইউরোপ ও পশ্চিম এশিয়ার সংযোগস্থলে অবস্থিত ককেশাস অঞ্চলের একটি দেশ হল আজারবাইজান। দেশটির প্রাচীন নাম ছিল

আজারপাইগান; পাহলভী (প্রাচীন ফার্সী) ভাষায় আযার এর অর্থ হল আগুন, পাইগান এর অর্থ হল রক্ষক। সুতরাং আজারপাইগান এর অর্থ হল আগুনের রক্ষক। এতে বুঝা যায় এই অঞ্চলে মাজুসী বা অগ্নিউপাসক সম্প্রদায়ের লোকদের বসবাস ছিল। মুসলিম বিজয়ের পর আরবী উচ্চারণের প্রভাবে শব্দটি *আজারবাইজান*-এ রূপান্তরিত হয়। আরবীতে *আজরাবীজান*ও বলা হয়।

দ্বিতীয় খালীফা 'উমার (রা.)-এর আমলে হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা.) আজারবাইজান জয় করেন। তিনি কিছুদিন আজারবাইজানের শাসক ছিলেন। পরবর্তীতে 'উমার (রা.) তদস্থলে 'উতবা ইবনু ফারকাদকে আজারবাইজানের শাসক নিযুক্ত করেন। তৃতীয় খালীফা 'উসমানের (রা.) আমলের শুরুতে কূফার গভর্ণর আল-ওয়ালীদ আজারবাইজানের শাসক 'উতবাকে প্রত্যাহার করলে আজারীরা বিদ্রোহ করে। ২৫ হিজরীতে আল-ওয়ালীদ আজারবাইজানে অভিযান পরিচালনা করেন। আজারীরা হুযাইফার সন্ধির শর্তে চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে বশ্যতা স্বীকার করে। ইতিহাসের দীর্ঘ পরিক্রমার অন্তে ১৯১৮ সালে আজারবাইজান রিপাবলিক ঘোষিত হয়। কিন্তু ১৯২০ সালে কম্যুনিস্টরা ৯৫% মুসলিম জনসংখ্যার এই দেশটি দখল করে সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত করে। ১৯৯১ সালে আজারবাইজান স্বাধীনতা লাভ করে। [ইয়াকূত, ১:১২৮-২৯]

আন্তাকিয়া (أنطاكية/Antakya/Antioch): এন্টিয়ক নামে প্রসিদ্ধ এই শহরটি বর্তমান তুরস্কের দক্ষিণাঞ্চলে সিরিয়ার সীমান্তবর্তী হাতাই প্রদেশে অবস্থিত। ৩০৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে সম্রাট সেলুকাস এই শহর নির্মাণ করে স্বীয় পিতা এন্টিখূসের নামানুসারে এন্টিয়ক নাম রাখেন। খ্রিস্টপূর্ব ৬৪ সালে রোমানরা আন্তাকিয়া দখল করে। ৫৪০ খ্রিস্টাব্দে রোমান আধিপত্যের অবসান ঘটিয়ে সাসানী রাজা আন্তাকিয়া জয় করেন।

দ্বিতীয় খালীফা 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর আমলে ৬৩৭ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম সেনাপতি আবূ 'উবাইদা ইবনুল জার্‌রাহ্ আন্তাকিয়া জয় করেন। পরবর্তীতে 'উসমান (রা.)-এর আমলেও সিরিয়ার গভর্ণর মু'আবিয়া আন্তাকিয়ায় অভিযান পরিচালনা করেন। এরপর দীর্ঘদিন আন্তাকিয়া মুসলিম অধিকারে ছিল। ক্রুসেড যুদ্ধের সময় ১০৯৬ সালে ফরাসী বাহিনী আন্তাকিয়া দখল করে। দীর্ঘ প্রায় দু'শতাব্দী পর মামলুক সুলতান বাইবার্স ১২৬৮ সালে আন্তাকিয়া পুনর্দখল করেন। ১৫১৬ সালে ঐতিহাসিক এই শহরটি উসমানী তুর্কীদের অধিকারভুক্ত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর পরাশক্তির ভাগ-বাটোয়ারায় আন্তাকিয়া ফরাসীদের হাতে ন্যস্ত হয়। ১৯৩৯ সালে এটি আবার তুরস্কের অন্তর্ভুক্ত হয়।

আন্তাকিয়ার অত্যন্ত সমৃদ্ধ অতীত রয়েছে। রোমান আমলে রোম ও আলেকজান্দ্রিয়ার পর এটিকে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম শহর হিসেবে গণ্য করা হত। খৃস্টবাদের ইতিহাসে আন্তাকিয়া বা এন্টিয়কবাসীদের বিরাট অবদান রয়েছে। ঈসা (আ.)-এর অনুসারীরা সর্বপ্রথম এই শহরে খ্রিস্টান নামে পরিচিতি লাভ করে। শহরটি এখনো সিরিয় অর্থোডক্স খৃস্টানদের রাজধানী হিসেবে স্বীকৃত।

ইসলামী জ্ঞানচর্চা ও সম্প্রসারণে আন্তাকিয়ার অধিবাসীদের বিপুল অবদান রয়েছে। কিতাবুল মাকবুল-এর রচিয়তা 'আমর ইবনু 'আলী আল-আন্তাকী এই শহরের নাগরিক ছিলেন। তাছাড়া প্রখ্যাত 'আলিম ইবরাহীম ইবনু 'আবদির রায্যাক আল-আযদী আল-আন্তাকীসহ্ অনেকে এই নগরে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা ও প্রসারে ভূমিকা পালন করেছেন। [ইয়াকূত, ১:২৬৬-৭০]

আবরাশহ্র (أبرشهر): বর্তমান ইরানের রাজাভী খুরাসান প্রদেশের নিশাপুর (আরবীতে নাইসাবূর) কাউন্টির প্রধান শহরের নাম নিশাপুর। এই শহরেরই অপর নাম হল আবরাশহর। ফার্সী ভাষায় আবর-এর অর্থ হল মেঘ; সুতরাং শহরটির নামের অর্থ হল মেঘের নগর [ইয়াকূত, ১:৬৫]। বিস্তারিত বিবরণ নাইসাবূর ভুক্তিতে প্রদত্ত।

আবীওয়ার্দ (أبيورد): ইরানের অন্তর্গত রাজাভী খুরাসান প্রদেশের একটি শহরের নাম আবীওয়ার্দ যা সারাখ্স ও নাসা-এর মাঝে অবস্থিত। পারস্যের ইতিহাসে বর্ণিত হয়েছে যে, পারস্য সম্রাট কায়কাউস, বীওয়ার্দ নামে এক ব্যক্তিকে খুরাসানের এক খণ্ড ভূমি জায়গীর প্রদান করেন। সেখানে লোকটি নিজের নামানুসারে আবীওয়ার্দ নামে একটি শহর প্রতিষ্ঠা করেন। তৃতীয় খালীফা 'উসমান (রা.)-এর আমলে ৩১ হিজরীতে বাসরার গভর্ণর 'আবদুল্লাহ্ ইবনু 'আমির আবীওয়ার্দ জয় করেন। প্রখ্যাত পণ্ডিত আবুল মুযাফ্ফর মুহাম্মাদ ইবনু আহমদ (মৃ. ৫০৪ হিজরী) এই অঞ্চলের বাসিন্দা ছিলেন; ভাষাবিজ্ঞান, অলঙ্কারশাস্ত্র, বংশবিদ্যা ও ইতিহাসসহ্ জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাঁর প্রচুর লেখনি রয়েছে। [ইয়াকূত, ১:৮৬]

আম্মূরিয়া (عمُّورية/Amorium): এশিয়া মাইনরে অবস্থিত প্রাচীন ফ্রাইজিয়া সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত একটি শহর। বর্ণিত হয়েছে যে, নাবী নূহ (আ.)-এর প্রপৌত্রী 'আম্মূরিয়ার নামানুসারে শহরটির নামকরণ করা হয়েছিল। বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের অধীনে এই শহরটি উন্নতির শীর্ষে পৌঁছেছিল। তৃতীয় খালীফা 'উসমান (রা.)-এর আমলে সিরিয়ার গভর্ণর মু'আবিয়া এই শহরে অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। তবে তিনি এটি জয় করতে পারেননি। আব্বাসীয় খালীফা আল-মু'তাসিমের সেনাপতি আফশীন ৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে (২২৩ হিজরীতে) এই শহর জয় করেন। এই অভিযানের পর শহরটি পরিত্যক্ত হয়। শহরটির ধ্বংসাবশেষ বর্তমানে তুরস্কের আফয়ূনকারাহিসার প্রদেশে দেখতে পাওয়া যায় [ইয়াকূত, ৪:১৫৮; *আল-মুনজিদ ফিল আ'লাম* ৩৮০]।

আরগিয়ান (أرغيان): নাইসাবূর (নিশাপুর)-এর নিকটবর্তী একটি জিলার (كورة) নাম হল আরগিয়ান। এর আওতায় ৭১ টি গ্রাম ছিল। এই অঞ্চলের প্রধান শহরের নাম ছিল রাওয়ানীর। বর্তমান মানচিত্রে এলাকাটির সঠিক স্থান নির্ণয় করা খুবই কঠিন। তৃতীয় খালীফা 'উসমান (রা.)-এর আমলে ৩১/৩২ হিজরীতে বাসরার গভর্ণর 'আবদুল্লাহ্ ইবনু

'আমির এই এলাকা জয় করেন। এই অঞ্চলের অন্যতম বিখ্যাত 'আলিম হলেন আবুল ফাতহ সাহ্ল ইবনু আহমাদ ইবনু 'আলী আল-আরগিয়ানী (মৃ. ৪৯৯ হিজরী)। তাঁকে শাফি'ঈ মাযহাবের পঞ্চম স্তরের ফকীহগণের মাঝে গণ্য করা হয়। [ইয়াকূত, ১:১৫৩]

আর্দাশীর খুর্‌রা (أردشيرخرة): ফার্সের অন্যতম প্রাচীন ও সমৃদ্ধ অঞ্চল হল আর্দাশীর খুর্‌রা। সিরাজ, সাইরাফ ও খুযিস্তানসহ অনেকগুলো শহর এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই অঞ্চলের কেন্দ্রীয় শহরটির নাম ছিল জূর। পারস্য সম্রাট আর্দাশীর এই শহরটির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বর্তমান ইরানে এই নামে কোন অঞ্চলের অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। তবে গবেষকগণ মনে করেন ইরানের ফার্স প্রদেশের অন্তর্গত ফীরুযাবাদ শহরই হল প্রাচীন আর্দাশীর খুর্‌রা। তৃতীয় খালীফা 'উসমান (রা.)-এর আমলে ২৯ হিজরীতে বাসরার গভর্ণর আবদুল্লাহ্ ইবনু 'আমির এটি জয় করেন। [ইয়াকূত, ১:১৪৬]

আর্মেনিয়া (أرمينية): পশ্চিম এশিয়া ও পূর্ব ইউরোপের সংযোগস্থলে অবস্থিত ককেশাস অঞ্চলের একটি দেশ হল আর্মেনিয়া। প্রাচীন গ্রন্থাবলীতে বর্ণিত হয়েছে যে, নাবী নূহ (রা.)-এর জনৈক অধস্তন উত্তরসূরি আর্মেনিয়া ইবনু লানতা ইবনু আওমার ইবনু ইয়াফেস ইবনু নূহ ছিলেন এই অঞ্চলের সর্বপ্রথম বসতিস্থাপনকারী। তার নামানুসারে দেশটির নামকরণ করা হয় আর্মেনিয়া।

দ্বিতীয় খালীফা 'উমার (রা.)-এর আমলে ১৯ হিজরীতে আর্মেনিয়া মুসলিম অধিকারে আসে। এই অভিযানে বিশিষ্ট সাহাবী সাফওয়ান ইবনুল মু'আত্তাল (রা.) শহীদ হয়েছিলেন। আর্মেনিয়ায় তাঁর কবর অবস্থিত। তৃতীয় খালীফা 'উসমান (রা.)-এর আমলেও আর্মেনিয়ায় অভিযান পরিচালিত হয়। ৮৮৪ সাল পর্যন্ত আর্মেনিয়া খিলাফাতের অধীনে ছিল। তারপর বিভিন্ন শাসকগোষ্ঠীর অধীনে শাসিত হওয়ার পর ১৯১৮ সালে দেশটি স্বাধীন প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয়। তবে ক্ষণকাল পরেই কম্যুনিস্টদের আক্রমণে দেশটির স্বাধীনতা বিলুপ্ত হয়; ১৯২২ সালে এটি সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হয়। দীর্ঘ ৭০ বছরের কম্যুনিস্ট দখলদারিত্বের অবসান ঘটিয়ে ১৯৯১ সালে আর্মেনিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করে।

এই অঞ্চলের প্রখ্যাত 'আলিমদের মাঝে আবূ 'আবদিল্লাহ্ 'ঈসা ইবনু মালিক ইবনু শিম্‌র আল-আর্মানীর নাম উল্লেখ করা যায়। [ইয়াকূত, ১:১৫৯-৬১]

আস্‌ফারাইন (أسفرايين/**Esfarayen**): নাইসাবূর (নিশাপুর) ও জুরজানের মাঝামাঝি অঞ্চলে দুর্গসজ্জিত ছোট্ট শহর আসফারাইন। নিশাপুর শহরটি বর্তমান ইরানের খুরাসান রাজাভী প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত। অপরদিকে আসফারাইন অন্তর্ভুক্ত হয়েছে খুরাসান শিমালী বা উত্তর খুরাসান প্রদেশে। শহরটি প্রাদেশিক রাজধানী বোজনুর্দের সামান্য দক্ষিণে অবস্থিত। তৃতীয় খালীফা 'উসমান (রা.)-এর আমলে বাসরার গভর্ণর 'আবদুল্লাহ্ ইবনু 'আমির ৩১/৩২ হিজরীতে এই অঞ্চল জয় করেন।

এই অঞ্চলের বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও 'আলিমগণের মাঝে রয়েছেন: ১) প্রখ্যাত হাফিযুল হাদীস আবূ 'আওয়ানা ইয়াকূব ইবনু ইসহাক ইবনু ইবরাহীম আল-আসফারাইনী (মৃ. ৩১৬), ২) আবূ ইসহাক ইরবাহীম ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহীম আল-আসফারাইনী (৪১৮ হি), ৩) আবূ 'আলী আল-আসফারাইনী (৩৭২ হি.) ও ৪) শীর্ষস্থানীয় শাফি'ঈ ফকীহ আবূ হামিদ আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ আল-আসফারাইনী (৪০৬ হি.)।

ইস্তাখ্‌র (إصطخر): ইরানের ফার্স প্রদেশে অবস্থিত একটি প্রাচীন শহর। পারস্যগাথা অনুসারে বলা যায়, সর্বপ্রথম পারস্য সম্রাট তাহমূরাছ-এর পুত্র ইস্তাখ্‌র এই শহরটি প্রতিষ্ঠা করেন। আখমিনী বংশের আমলে এটি একটি সমৃদ্ধ শহরে পরিণত হয়েছিল। সাসানী বংশের আমলে ইস্তাখ্‌র রাজধানীর মর্যাদা লাভ করেছিল। পরবর্তীতে সম্রাট আরদাশীর রাজধানী জূর-এ স্থানান্তরিত করেন। ইসলামী বিজয়ের সময় শহরটির ব্যাপক ক্ষতি হয়। পরবর্তীতে এটি পুনর্নির্মিত হলেও হৃত গৌরব ফিরে পায়নি। পার্শ্ববর্তী শহর শিরাজের কাছে এটি মর্যাদা হারায়। বর্তমানে পরিত্যক্ত এই শহরে অতীত গৌরবের ইঙ্গিতবাহী কিছু ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় খালীফা 'উমার ইবনুল খাত্তাবের (রা.) আমলে ইস্তাখ্‌র বিজিত হয়। পরবর্তীতে এই শহরের বাসিন্দাদের বারংবার বিদ্রোহে ত্যক্তবিরক্ত হয়ে বাসরার গভর্ণর আবদুল্লাহ ইবনু 'আমির ২৯ হিজরীতে অভিযান পরিচালনা করেন। এই যুদ্ধে শহরটি প্রায় বিধ্বস্ত হয়। পরবর্তীতে মুসলিমরা শহরটি পুনঃনির্মাণ করেন।

এই শহরের কয়েকজন বিখ্যাত 'আলিম, মুহাদ্দিস ও ফকীহের নাম উল্লেখ করা হচ্ছে: ১) শীর্ষস্থানীয় শাফি'ঈ ফকীহ আবূ সা'ঈদ আল-হাসান ইবনু আহমাদ ইবনু ইয়াযীদ ইবনু 'ঈসা ইবনিল ফাদল আল-ইস্তাখ্‌রী (৩২৮ হি.), ২) আবূ সা'ঈদ 'আবদুল কারীম ইবনু সাবিত আল-ইস্তাখ্‌রী, ও ৩) আহমাদ ইবনুল হুসাইন ইবনু দানাজ আবুল 'আব্বাস আয-যাহিদ আল-ইস্তাখ্‌রী। [ইয়াকূত, ১:২১১]

কাবুল (كابل): আফগানিস্তানের রাজধানী। শহরটি তৃতীয় খালীফা 'উসমান (রা.)-এর আমলে প্রথমবারের মত বিজিত হয়।

কারকুইয়া (كركوية): সিজিস্তানের কাছাকাছি একটি শহর। এখানে অগ্নিউপাসক বা মাজূসীদের বড় একটি মন্দির ছিল। আধুনিক মানচিত্রে এর অবস্থান সঠিকভাবে নির্ণয় করা কঠিন। ধারণা করা হয়, প্রাচীন কারকুইয়া শহর যে এলাকায় অবস্থিত ছিল সেটি বর্তমানে ইরানের সিস্তান প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত। ৩২ হিজরীতে সেনাপতি আর-রাবী' ইবনু যিয়াদ আল-হারিসী কারকুইয়া জয় করেন। [ইয়াকূত, ৪:৪৫৩]

কারমান (كرمان/**Kerman**): প্রাচীন পারস্যের একটি বড় অঞ্চলের নাম কারমান

(ভিন্নপাঠে কিরমান)। প্রাচীন লেখকদের মতে, নাবী নূহ (রা.)-এর প্রপৌত্র কারমান-এর নামানুসারে অঞ্চলটির নামকরণ করা হয়। এর পূর্বে মাকরান, পশ্চিমে ফার্স ও উত্তরে খুরাসান অবস্থিত। প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদে ঋদ্ধ এই অঞ্চলের আওতায় অনেকগুলো শহর ছিল; যেমন জীরাফ্‌ত, মুকান, খাবীস, বাম (২০০৩ সনে সংঘটিত ভূমিকম্পে বাম শহরটি প্রায় ধ্বংস হয়ে যায়), সাইয়িরজান ও বুর্দাসীর ইত্যাদি। বর্তমানে ইরানের দক্ষিণাঞ্চলীয় একটি প্রদেশের নাম কিরমান।
দ্বিতীয় খালীফা 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর আমলে বাহরাইনের গভর্ণর 'উসমান ইবনু আবিল 'আস সাগর পাড়ি দিয়ে ফার্স জয় করেন। তিনি কারমানেও অভিযান পরিচালনা করেন। তবে তিনি তা জয় করতে পারেননি। তৃতীয় খালীফা 'উসমান (রা.)-এর আমলে বাসরার গভর্ণর আবদুল্লাহ ইবনু 'আমির খুরাসান অভিযানে বের হওয়ার হওয়ার প্রাক্কালে মুজাশি' ইবনু মাস'উদ আস-সুলামীকে কারমানে প্রেরণ করেন। তিনি সমগ্র কারমান জয় করেন। এই অঞ্চলের সবচাইতে বিখ্যাত 'আলিম হলেন আবূ ইউসূফ ইয়া'কূব ইবনু ইউসূফ আল-কারমানী আন-নাইসাবূরী আশ-শায়বানী। [ইয়াকূত, ৪:৪৫৪-৫৫]

কালীকালা (قاليقلا): প্রাচীন লেখকদের মতে কালীকালা বৃহৎ আর্মেনিয়ার অন্তর্গত একটি শহর। কালী নাম্নী এক রমণী শহরটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে এর নাম কালীকালা, যার অর্থ কালীর অনুগ্রহ। চতুর্থ শতকে আর্মেনিয়া রোমান ও পারস্য সাম্রাজ্যের মাঝে বণ্টিত হলে কালীকালা রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। বর্তমানে শহরটির নাম পরিবর্তিত হয়েছে। প্রাচীন কালীকালা শহরের আধুনিক নাম হল এরযুরুম/Erzurum (বা আরদুর রূম বা রোমান ভূমি); এটি তুরস্কের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত।
২৫ হিজরীতে সেনাপতি হাবীব ইবনু মাসলামা আল-ফিহরী কালীকালা জয় করেন। প্রখ্যাত আরবী সাহিত্যিক ও ভাষাবিদ আবূ 'আলী আল-কালী (৩৫৬ হি.) এই শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

কাশ (كش): ভূগোলবিদ ইয়াকূতের মতে ইরানের উত্তরাঞ্চলীয় শহর জুরজানের তিন ফার্লং দূরত্বে কাশ অবস্থিত। তবে ঐতিহাসিকদের বিবরণ হতে জানা যায় এটি আফগানিস্তানের যারান্‌জ শহরের নিকটবর্তী একটি গ্রাম। ৩২ হিজরীতে সেনাপতি 'আবদুর রহমান ইবনু সামুরাহ কাশ জয় করেন। [ইয়াকূত, ৪:৪৬২]

কায়ফ (كيف): ইয়াকূতের বিবরণ মতে বাযাগীসের সন্নিকটে প্রাচীন একটি শহরের নাম কায়ফ। ৩১ হিজরীতে সেনাপতি শুরাইক ইবনুল আ'ওয়ারের মুক্ত দাস শাকির কর্তৃক কায়ফ বিজিত হয়। [ইয়াকূত, ৪:৪৯৭]

কিন্নাসূরিন (قنسرين): সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলীয় শহর আলেপ্পোর (হালব) ৪০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত প্রত্নতাত্ত্বিক শহর। সিরিয় অর্থোডক্স খৃস্টবাদের ইতিহাসে কিন্নাসরিন

শহরের বিরাট গুরুত্ব রয়েছে। কিন্নাসরিনের খৃস্টীয় পাঠশালায় অর্থোডক্স ধর্মতত্ত্বের চর্চা হত। ১৭ হিজরীতে সেনাপতি আবূ 'উবাইদা ইবনুল জার্‌রাহ (রা.) কিন্নাসরিন জয় করেন। ৩৫১ হিজরীতে রোমান আক্রমণের মুখে শহরের মুসলিম বাসিন্দারা বিতাড়িত হয়। রোমানরা মাসজিদ-মাদরাসাসহ সমগ্র শহর জ্বালিয়ে দেয়। বিধ্বস্ত কিন্নাসরিন আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি। বর্তমানে এখানে কিছু ঐতিহাসিক স্থাপনার ধ্বংসাবশেষ ছাড়া কিছুই নেই। এই শহরের একজন 'আলিম হলেন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আবূ বাক্‌র মুহাম্মাদ ইবনু বারাকাহ ইবনিল হাকাম ইবনু ইবরাহীম আল-কিন্নাসরিনী। [ইয়াকূত, ৪:৪০৪]

কূনিয়া (كونية): বর্তমান তুরস্কের আনাতোলিয়া অঞ্চলের একটি শহর। সুপ্রাচীন এই শহরটি গ্রীক ও রোমান সভ্যতার পাদপীঠ ছিল। ধারণা করা হয় এখানে দার্শনিক প্লেটোর কবর রয়েছে। খ্রিস্টবাদ প্রচারে সেন্ট পল এই শহরে মিশনারী সফর করেছিলেন। তৃতীয় খালীফা 'উসমান (রা.)-এর আমলে সেনাপতি হাবীব ইবনু মাসলামা আল-ফিহ্‌রী এই শহরে অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। এটি ছিল সালজুক তুর্কীদের রাজধানী। পরবর্তীতে শহরটি উসমানী তুর্কীদের অধীনে শাসিত হয়। প্রখ্যাত মরমী কবি জালালুদ্দিন রূমীর কবরও এই শহরে অবস্থিত। [ইয়াকূত, ৪:৪১৫]

কূমিস (قومس): ইরানের রায় ও নাইসাবূরের মাঝখানে অবস্থিত একটি বড় জিলার নাম ছিল কূমিস; এর আওতায় অনেকগুলো শহর ও গ্রাম ছিল। কূমিস অঞ্চলের প্রধান শহরের নাম দামিগান। অন্যান্য শহরের মাঝে বিস্তাম, বিয়ার ও সিমনান উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে এটি ইরানের সিমনান প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত।

কুহিস্তান (قهستان): কূহ শব্দের অর্থ হল পাহাড়, স্থান শব্দের অর্থ হল জায়গা; সুতরাং কুহিস্তানের অর্থ হল পাহাড়ী স্থান বা পাহাড়ী জায়গা। ফার্সী ভাষায় যে কোন পাহাড়ী স্থানকে কুহিস্তান বলা হয়। তৃতীয় খালীফা 'উসমান (রা.)-এর আমলে ২৯ হিজরীতে বাসরার গভর্ণর আবদুল্লাহ ইবনু 'আমির কুহিস্তান নামে যে এলাকা জয় করেন সেটি ছিল বর্তমান আফগানিস্তানের হারাত ও ইরানের নাইসাবূরের মধ্যবর্তী পাহাড়ী এলাকা। [ইয়াকূত, ৪:৪১৬]

খাওয়ারিযম (خوارزم): মধ্য এশিয়ার একটি প্রাচীন ও সমৃদ্ধ রাষ্ট্র। ইয়াকূত লিখেছেন, প্রাচীনকালে মধ্য এশিয়ার এক রাজা তাঁর রাজ্যের ৪০০ জন লোককে জনমানবহীন এক স্থানে নির্বাসন দিয়েছেলেন। সেখানকার নদী হতে মাছ ধরে লাকড়ির আগুনে ঝলসিয়ে তারা ভক্ষণ করতো, স্থানীয় ভাষায় গোশ্‌তকে 'খাওয়ার' ও লাকড়িকে 'রাযম' বলে। ফলে ঐ স্থানটির নামকরণ করা হয় খাওয়ারিযম।

আমুদরিয়া বা জাইহূন নদীর বদ্বীপ অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা নিয়ে গঠিত এই রাষ্ট্র

'খাওয়ারিযম শাহ্'-এর বংশের শাসনামলে (১০৯৭-১২৩১) সমৃদ্ধির শীর্ষে পৌঁছেছিল। ওই সময় 'বুখারা' ও 'সমরকন্দ' এই রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। 'জুরজানিয়া' বা 'কুরকানাজ' ছিল এটির রাজধানী। ৬১৬ হিজরীতে ইয়াকূত খাওয়ারিয্ম সফর করেছিলেন। তিনি বলেন, 'এটির চাইতে বেশি আবাদকৃত দেশ আমি দেখিনি; বাড়িগুলো সন্নিহিত, গ্রামগুলো কাছাকাছি; এমনকি মরুভূমিতেও বিচ্ছিন্ন বাড়িঘর ও প্রাসাদ দেখা যায়। অনাবাদী বা বসতবিহীন কোন এলাকা তথায় তুমি দেখতে পাবে না। এতদসত্ত্বেও ওই এলাকায় প্রচুর গাছপালা রয়েছে, যার অধিকাংশই হল তুঁতগাছ। প্রতিটি শহরে দোকানপাটে পূর্ণ অনেক বাজার রয়েছে। এমন গ্রাম খুব কমই পাওয়া যাবে যেখানে একটিও বাজার নেই। এমন কর্মবহুল ও ব্যস্ত অঞ্চল হওয়া সত্ত্বেও সমগ্র খাওয়ারিযমে সর্বব্যাপী নিরাপত্তা ও শান্তি বিরাজ করে।'

মোঙ্গল নেতা চেঙ্গিস খানের আক্রমণে সমৃদ্ধ এই রাষ্ট্র ছারখার হয়ে যায়। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় খাওয়ারিযম বর্তমানে উজবেকিস্তান, কাজাখস্তান ও তুর্কমেনিস্তানের মধ্যে বণ্টিত।

খাওয়ারিযমে কত 'আলিম-উলামা, মুহাদ্দিস, ফকীহ্, ও জ্ঞানীগুণীর জন্ম হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। তাদের মাঝে দাউদ ইবনু রাশীদ আল-খাওয়ারিযমী অন্যতম। মধ্যযুগের বিখ্যাত মুসলিম গণিতবিদ আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইবনু মূসা আল-খাওয়ারিযমীও এখানে জন্মগ্রহণ করেন। [ইয়াকূত, ২:৩৯৭-৩৯৯]

খাবীস (الخبيص): কারমান অঞ্চলের একটি শহরের নাম ছিল খাবীস। শহরটির বর্তমান নাম হল শাহদাদ। এটি আধুনিক ইরানের কারমান প্রদেশের অন্তর্গত একটি জিলা বা বাখ্শ। তৃতীয় খালীফা 'উসমান (রা.)-এর আমলে বাসরার গভর্ণর আবদুল্লাহ ইবনু 'আমির ৩২ হিজরীতে এটি জয় করেন। [ইয়াকূত, ২:৩৪৫]

খিলাত (خلاط): মধ্য আর্মেনিয়ার একটি জিলার নাম ছিল খিলাত। প্রাকৃতিক সম্পদে ঋদ্ধ এই অঞ্চল ২০ হিজরীতে সেনাপতি 'ইয়াজ ইবনু গান্ম সন্ধিচুক্তির মাধ্যমে জয় করেন। তৃতীয় খালীফা 'উসমান (রা.)-এর আমলে সেনাপতি হাবীব ইবনু মাসলামা আল-ফিহরী খিলাতবাসীর সাথে সম্পাদিত পূর্বোক্ত চুক্তিটি নবায়ন করেন। ইয়াকূত লিখেছেন, শীতপ্রধান এই এলাকা ফসলে সমৃদ্ধ; এখানে প্রচুর ফলমূল জন্মে। খিলাতে এমন একটি হ্রদ আছে যার তুলনা দুনিয়ায় নেই। আশ্চর্যের বিষয় হল এই যে বছরের দশটি মাস এই হ্রদে মাছ বা ব্যাঙ দেখতে পাওয়া যায় না। কিন্তু শেষ দু'মাসে কোত্থেকে কে জানে প্রচুর মাছ ধরা পড়ে। এই জলাধারে তির্রিখ নামে এক প্রকার মাছ পাওয়া যায় যা সেকালে লবণ দিয়ে সংরক্ষণ করে দূরদুরান্তে রপ্তানি করা হত। ইয়াকূত বলেন, 'আমি এই হ্রদে উৎপাদিত তির্রিখ মাছ বাল্খ শহরে দেখতে পেয়েছি। তারপর আমি চার মাসের দূরত্ব পাড়ি দিয়ে গজনীতে এসে ওই প্রজাতির মাছ বাজারে বিক্রি হতে দেখেছি।'

খিলাত শহরটির বর্তমান নাম ভ্যান; এটি তুরস্কের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ ভ্যান-এর রাজধানী। খিলাত হ্রদের নামও পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমানে এটিকে ভ্যান গুলু হ্রদ বলা হয়। [ইয়াকূত, ২:৩৮০]

খুওয়াস্ত (خواشت): খুওয়াস্ত বা খাওয়াস্ত বাল্খের অধীন একটি গ্রামের নাম। বর্তমানে উত্তর আফগানিস্তানে অবস্থিত। প্রখ্যাত ফকীহ ও মুহাদ্দিস আবূ বাকর আহ্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদিল্লাহ ইবনু 'আলী আল-খুওয়াস্তী এই অঞ্চলের লোক ছিলেন। [ইয়াকূত, ২:৩৯৮]

খুরাসান (خراسان): অত্যন্ত বিস্তৃত প্রাচীন এক জনপদের নাম খুরাসান। প্রাচীন খুরাসান চার ভাগে বিভক্ত ছিল; প্রথম অংশের শহরগুলো হল: নাইসাবূর, কুহিস্তান, তাবাসান, হারাত, বূশান্জ, বাযাগীস ও তূস। দ্বিতীয় ভাগের শহরগুলোর মাঝে মার্ভ-শাহিজান, সারাখ্স, নাসা, আবীওয়ার্দ, মার্ভরূয, তালাকান, খাওয়ারিয্ম ও আমূল-এর নাম উল্লেখ করা যায়। খুরাসানের তৃতীয় অংশের গুরুত্বপূর্ণ শহর হল: ফারিয়াব, জূযাজান, আপার তুখারিস্তান, খাস্ত, বামিয়ান, বাগলান ও ওয়ালিজ। চতুর্থ অংশ হল ট্রান্স অক্সিয়ানা বা আমুদরিয়া ও শিরদরিয়ার ওপারের শহরগুলো, যথা- বুখারা, শাশ, তুরারবন্দ, নাসাফ, রুবিস্তান, ফারগানা ইত্যাদি। বৃহত্তর খুরাসান বর্তমানে ইরান, আফগানিস্তান ও তুর্কমেনিস্তানের মাঝে বণ্টিত হয়েছে। কেবল ইরানেই খুরাসান নামে তিনটি প্রদেশ রয়েছে: উত্তর খুরাসান, খুরাসান রাজাভী ও দক্ষিণ খুরাসান।

'উমার (রা.) ও উসমান (রা.)-এর আমলে খুরাসান মুসলিম অধিকারে আসে। বিজয়াভিযান অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। আবূ মুসলিম খুরাসানীর বিদ্রোহ উমাইয়া খিলাফাতকে তছনছ করে দেয়। খুরাসানের অন্তর্গত বিভিন্ন অঞ্চলের কয়েকজন বিখ্যাত 'আলিম হলেন: মুহাম্মাদ ইবনু ইসমা'ঈল আল-বুখারী, মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, আবূ 'ঈসা আত-তিরমিযী, ইসহাক ইবনু রাহওয়াইহ, আহমাদ ইবনু হাম্বল, আবূ হামিদ আল-গাযালী, আল-জুওয়াইনী ইমামুল হারামাইন, আল-হাকিম আবূ 'আবদিল্লাহ আন-নাইসাবূরী প্রমুখ। [ইয়াকূত, ২:৩৫১-৫৩।]

জীরাফ্ত (جيرفت): কারমান অঞ্চলস্থিত গুরুত্বপূর্ণ একটি শহরের নাম হল জীরাফ্ত। প্রশস্ত এই শহর কৃষি সম্পদে ঋদ্ধ ছিল। আল-ইস্তাখ্রী এই শহরের নাগরিকদের একটি ভাল নীতির কথা উল্লেখ করেছেন: গাছ থেকে যে খেজুর ঝরে পড়ে সেগুলো বৃক্ষ-মালিকরা সংগ্রহ করে না; বরং ভিক্ষুক ও নিরন্নদের জন্য তা রেখে দেওয়া হয়। প্রাচীন এ শহরটি এখনো অস্তিত্ব বজায় রেখেছে, বর্তমান ইরানের কারমান প্রদেশের অন্তর্গত একটি শহরের নাম জীরাফ্ত [অন্য নাম: সাবজিয়ারান]।

'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর আমলে সেনাপতি সুহাইল ইবনু 'আদী জীরাফ্ত জয় করেন। 'উসমান (রা.)-এর আমলে এটি পুনর্বিজিত হয়। এই শহরের অন্যতম প্রসিদ্ধ

'আলিম হলেন আবুল হাসান আহমাদ ইবনু 'উমার ইবনু 'আলী ইবনু ইবরাহীম ইবনু ইসহাক আল-জীরাফ্তী। আরবের আয্দ গোত্রের কিছু লোক জীরাফ্ত শহরে বসতি স্থাপন করেছিলেন। তাঁদের মধ্য হতে মুহাম্মাদ ইবনু হারূন খুবই খ্যাতি লাভ করেছিলেন। ইনি ছিলেন বংশবিদ্যা বিষয়ে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় 'আলিম। [ইয়াকূত, ২: ১৯৮]

জীলান (جيلان): তাবারিস্তানের পশ্চাতে অবস্থিত সুবিস্তৃত একটি অঞ্চলের নাম জীলান। এটির প্রাচীন নাম দীলাম। প্রাচীন কালে এই অঞ্চলে বড় কোন শহর ছিল না; বরং পাহাড়ের পাদদেশস্থিত বেশ কিছু গ্রাম নিয়ে গঠিত হয়েছিল জীলান এলাকা। গীলান নামে পরিচিত প্রাচীন জীলান বর্তমান ইরানের একটি প্রদেশ। 'উসমান ইবনু 'আফ্ফানের (রা.) আমলে জীলান বিজিত হয়।
এই অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেছেন অগণিত 'আলিম; তাঁদের অন্যতম হলেন আবূ 'আলী কূশিয়ার ইবনু লাবালীরূয আল-জীলী ও শাফি'ঈ ফকীহ্ আবূ মানসূর বাই ইবনু জা'ফর ইবনু বাই আল-জীলী। প্রখ্যাত মনীষী 'আবদুল কাদির জীলানীও এখানে জন্মগ্রহণ করেন [ইয়াকূত, ২:২০১]।

জুওয়াইন (جوين/**Joveyn**): প্রাচীন কালে বিস্তাম শহর হতে নাইসাবূরে যাওয়ার পথে দুই পাহাড়ের মধ্যে বিস্তৃত একটি এলাকা পড়ত, এটির নাম ছিল জুওয়াইন; এই অঞ্চলের প্রধান শহরের নাম ছিল আযাযওয়ার। ইয়াকূতের বর্ণনানুসারে জুওয়াইনের আওতায় ১৯৮ টি গ্রাম ছিল। বর্তমান ইরানের খুরাসান রাজাভী প্রদেশের জুওয়াইন শহরটি ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন অঞ্চলটির অস্তিত্বের ঘোষণা দিয়ে চলছে। 'উসমান (রা.)-এর আমলে ৩১/৩২ হিজরীতে সেনাপতি আল-আহনাফ ইবনু কায়স জুওয়াইন জয় করেন।
জুওয়াইন যে কত আলিম ও ইমামের জন্মস্থান তার কোন ইয়ত্তা নেই। এঁদের কয়েকজন হলেন, ১) মূসা ইবনুল 'আব্বাস ইবনু মুহাম্মাদ আবূ 'ইমরান আল-জুওয়াইনী আন-নাইসাবূরী, ২) আবূ মুহাম্মাদ 'আবদিল্লাহ্ ইবনু ইউসুফ আল-জুওয়াইনী, ৩) আবুল হাসান 'আলী ইবনু ইউসুফ আল-জুওয়াইনী (শাইখুল হিজায), ৪) আবুল মা'আলী 'আবদুল মালিক ইবনু আবী মুহাম্মাদ আবদিল্লাহ্ ইবনু ইউসুফ আল-জুওয়াইনী (প্রখ্যাত এই 'আলিম ইমামুল হারামাইন নামে পরিচিত)।

জূয্জান (جوزجان/**Jowzjan**): প্রাচীন মার্ভারূয ও বাল্খের মধ্যস্থিত একটি বিস্তৃত অঞ্চল। এর প্রধান শহরের নাম ছিল ইয়াহুদিয়া, অন্য শহরগুলোর মাঝে আনবার, ফারিয়াব ও কাল্লার উল্লেখযোগ্য। বর্তমান আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চলীয় একটি প্রদেশের নাম জূয্জান (জুযাজানও বলা হয়)। তৃতীয় খালীফা 'উসমান (রা.)-এর আমলে সেনাপতি আল-আকরা' ইবনু হাবিস জুযজান জয় করেন।
এই অঞ্চলে জন্মগ্রহণকারী বিখ্যাত 'আলিমগণের কয়েকজনের নামোল্লেখ করা হচ্ছে: ১) ইবরাহীম ইবনু ইয়া'কূব আবূ ইসহাক আস-সা'দী আল-জুযাজানী, ২) আবূ আহমাদ আহমাদ ইবনু মূসা আল-জুযজানী।

জুরজান (جرجان/**Gorgan**): প্রাচীন তাবারিস্তান ও খুরাসানের মধ্যবর্তী একটি সুপ্রসিদ্ধ শহরের নাম জুরজান (ফার্সীতে গুরগান বলা হয়)। বর্তমানে এটি ইরানের উত্তরাঞ্চলীয় প্রদেশ গুলিস্তানে অবস্থিত। দ্বিতীয় খালীফা 'উমার (রা.)-এর আমলে সেনাপতি সুওয়াইদ ইবনু মুকার্‌রান ১৮ হিজরীতে সন্ধিচুক্তির মাধ্যমে জুরজান জয় করেন।
এই শহরে জন্মগ্রহণকারী কয়েকজন বিখ্যাত 'আলিম হলেন, ১) বিখ্যাত ফকীহ্ আবূ নু'আইম 'আবদুল মালিক ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু 'আদী আল-জুরজানী আল-আস্ত্রাবাদী, ২) আবূ আহমাদ 'আবদিল্লাহ্ ইবনু 'আদী ইবনু 'আবদিল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনিল মুবারাক আল-জুরজানী (ইবনুল কাত্তান নামে পরিচিত), ৩) হামযা ইবনু ইউসুফ ইবনু ইবরাহীম ইবনু মূসা আস-সাহমী আল-জুরজানী।

জূর (جور): আর্দাশীর খুর্‌রা শহরের ভিন্ন নাম হল জূর। বর্তমান ইরানের ফীরূযাবাদ শহরই হল প্রাচীন জূর।

তাইলাসান (طيلسان): ফার্সী তালিশান (تالشان)-এর আরবী রূপ। জীলান ও খাযার এর সন্নিকটে অবস্থিত একটি প্রাচীন জনপদের নাম তাইলাসান। তৃতীয় খালীফার আমলে ২৫ হিজরীতে আল-ওয়ালীদ ইবনু 'উকবা এটি জয় করেন। [ইয়াকূত, ৪:৫৬]

তাবারিস্তান (طبرستان): তাবারিস্তান নামে পরিচিত কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ তীরবর্তী ভূখণ্ডটি বিশাল এলাকাব্যাপী বিস্তৃত ছিল। আলবুর্জ পর্বতশ্রেণি বেষ্টিত এই অঞ্চলের আওতায় অনেকগুলো শহর ছিল; যথা, দাহিস্তান, জুরজান (কেউ বলেন, এটি খুরাসানের অন্তর্গত), আস্ত্রাবাদ, আমুল, বাবুল, সারিয়া, শালূস ইত্যাদি। কাল পরিক্রমায় তাবারিস্তান নামটি বিলুপ্ত হয়ে তদস্থলে 'মাজান্দারান' চালু হয়। বর্তমানে ইরানের উত্তরাঞ্চলীয় একটি প্রদেশের নাম মাজান্দারান, এটিই প্রাচীন তাবারিস্তান। 'উসমান (রা.)-এর আমলে কূফার গভর্ণর সা'ঈদ ইবনুল 'আস ৩০ হিজরীতে তাবারিস্তান জয় করেন। ইতিহাসখ্যাত মুফাস্‌সির ও ঐতিহাসিক ইবনু জারীর আত-তাবারী তাবারিস্তানের আমুল শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। [ইয়াকূত, ৪: ১২-১৬]

তাবাসান (الطبسان): খুরাসানের প্রবেশদ্বার হিসেবে পরিচিত দু'টি দুর্গ, যা নাইসাবূর ও আসবাহানের (ইস্পাহান) মাঝামাঝি অবস্থিত ছিল। 'উসমান (রা.)-এর আমলে খুরাসান জয়ের প্রারম্ভে সেনাপতি ইবনু বুদাইল ইবনু ওয়ারকাহ তাবাসান জয় করেন। [ইয়াকূত, ৪:২০; আল-বালাযুরী, ৪০৩]

তামীসা (তামীস) (طميس/طميسة): খুরাসান ও জুরজান-সীমান্তস্থিত তাবারিস্তানের সর্বশেষ শহরের নাম ছিল তামীসা। এই শহরে একটি গিরিপথ ছিল যেটি এড়িয়ে তাবারিস্তান হতে জুরজান ও খুরাসানে গমন করা অসম্ভব ছিল। কূফার গভর্ণর সা'ঈদ তাবারিস্তান জয় করতে গিয়ে তামীসাও জয় করেন। এই শহরের বিখ্যাত একজন 'আলিম হলেন আবূ ইসহাক ইবরাহীম ইবনু মুহাম্মাদ আত-তামীসী [ইয়াকূত, ৪:৪১]

তারাসূস (طرسوس): তারসূস বা তারাসূস একটি সুপ্রাচীন নগরী। এন্টিয়ক ও আলেপ্পোর মাঝখানে ভূমধ্যসাগরের তীরে অবস্থিত একটি শহর। বর্তমানে এটি তুরস্কের মের্সিন প্রদেশের অন্তর্গত।

দু'হাজার বছরেরও বেশি প্রাচীন এই শহর ছিল নানা সভ্যতার মিলনস্থল। এটি যখন রোমান রাজ্য সিলিসিয়ার রাজধানী ছিল তখন এখানে রোমান সেনাপতি অ্যান্টনি ও মিশরীয় রাণী ক্লিওপেট্রার প্রথমবারের মত সাক্ষাৎ হয়েছিল। খৃস্টবাদের ইতিহাসে এই শহরের বিরাট গুরুত্ব রয়েছে। খৃস্টবাদের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা যাকে বলা হয় সেই পল বা সল এই শহরে জন্মগ্রহণ করেন। আল-কুরআনে বর্ণিত আসহাবুল কাহ্ফের গুহা এই শহরে অবস্থিত বলে ধারণা করা হয়।

৬৩৭ সালে সেনাপতি খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ তারসূস জয় করেন। ৯৬৫ সালে বাইজেন্টাইন সম্রাট নাকফূর এটি দখল করে নেন। এক শতাব্দীরও বেশি সময় পর ১০৯৭ সালে সেলজুক তুর্কীরা এটি পুনর্দখল করে। তারপর নানা শক্তির হাত বদলের পর ১৫১৬ সালে উসমানী শাসক প্রথম সালিম এটি জয় করেন।

ইসলামী জ্ঞানচর্চায় তারসূসবাসীর বিপুল অবদান রয়েছে। এই শহরে জন্মগ্রহণ করেছেন এমন কয়েকজন 'আলিম হলেন: ১) আবূ উমাইয়া মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহীম ইবনু মুসলিম ইবনু সালিম আত-তারসূসী, ২) মুহাম্মাদ ইবনু 'ঈসা ইবনু ইয়াযীদ আত-তারসূসী প্রমুখ। [ইয়াকূত, ৪:২৮-২৯]

তালাকান (الطالقان): তুখারিস্তানের সবচাইতে বড় শহর ছিল তালাকান। এটি মার্ভ ও বাল্খের মধ্যবর্তী একটি শহর। ৩২ হিজরীতে সেনাপতি আল-আহনাফ ইবনু কায়স শহরটি জয় করেন। বর্তমানে এটি আফগানিস্তানে অবস্থিত। এই শহরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 'আলিম হলেন আবূ মুহাম্মাদ মাহমূদ ইবনু খিদাশ আত-তালাকানী। [ইয়াকূত, ৪:০৬]

তিফলিস (تفلس/Tbilisi): প্রাথমিক যুগের আরব লেখকরা তিফলিসকে প্রথম আর্মেনিয়ার অন্তর্গত একটি শহর বলে গণ্য করতেন। বর্তমানে এটি (সাবেক সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র) জর্জিয়ার রাজধানী। তৃতীয় খালীফা 'উসমান (রা.)-এর আমলে সেনাপতি হাবীব ইবনু মাসলামা আল-ফিহ্রী তিফলিস জয় করেন। ইয়াকূত লিখেছেন, এই শহরের পেছনে (অর্থাৎ উত্তরে) কোন মুসলিম বসতি নেই। পরবর্তীতে দীর্ঘদিন তিফলিস মুসলিমদের অধীনে শাসিত হয়েছে। তবে ১১২২ খ্রিস্টাব্দে (৫১৫ হিজরীতে) জর্জিয়ার শাসক ডেভিড দ্য বিল্ডার তিফলিস দখল করেন। পরবর্তীতে মুসলিমদের পক্ষে এই শহর পুনর্জয় করা সম্ভব হয়নি। জর্জিয়ার রাজধানী শহরটিতে অনেক 'আলিম জন্মগ্রহণ করেছিলেন; তাঁদের একজন হলেন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আবূ আহমাদ হামিদ ইবনু ইউসুফ ইবনু আহমাদ ইবনিল হুসায়ন আত-তিফলিসী। [ইয়াকূত, ২:৩৫-৭]

তুখারিস্তান (طخارستان): তুখারিস্তান বা তাখারিস্তান একটি বিশাল এলাকার নাম; এর অধীনে অনেকগুলো শহর ছিল: খুল্‌ম, সিমিনজান, বাগলান, সাকলাকান্দ, ও তালিকান। প্রাচীন তুখারিস্তানের অন্তর্গত শহরগুলো বর্তমানে আফগানিস্তানে অবস্থিত। [ইয়াকূত, ৪:২৩]

তূস (طوس): খুরাসানের অন্তর্গত প্রাচীন নগরী। গ্রিকরা এটিকে সুসিয়া নামে জানতো। সম্রাট আলেকজান্ডার ৩৩০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে এটি দখল করেছিলেন। তৃতীয় খালীফা 'উসমান (রা.)-এর আমলে এটিকে মুসলিমরা জয় করেন। ইয়াকূত এটিকে অত্যন্ত সমৃদ্ধ নগরী হিসেবে দেখতে পেয়েছিলেন। এখানে শী'আ ইমাম আলী ইবনু মূসা আর-রিদা'র কবর রয়েছে। আব্বাসী খালীফা হারূনুর রশীদও এখানে সমাহিত হয়েছেন। প্রখ্যাত ফার্সী কবি আবুল কাসিম ফেরদৌসীর জন্ম এই শহরে। তিনিও এখানে কবরস্থ হন। ইতিহাসখ্যাত তূস নগরীর সেই গৌরব আজ আর অবশিষ্ট নেই। মোঙ্গল নেতা চেঙ্গিস খান এই শহরকে তছনছ করে দেন। পরবর্তীতে পার্শ্ববর্তী একটি নগর সানাবাদ-এর বিকাশ ঘটে, 'মাশহাদ' নামে পরিচিত ওই শহরটি বর্তমানে খুরাসান রাজাভী প্রদেশের রাজধানী ও আধুনিক ইরানের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরী। প্রাচীন তূস নগরীর স্মৃতিবাহী স্থাপনাগুলো বর্তমানে 'মাশহাদ' শহরের অন্তর্ভুক্ত।

এই শহর যে কত জ্ঞানী-গুণীর জন্মস্থান তার ইয়ত্তা নেই। এখানে কয়েকজনের নামোল্লেখ করা হচ্ছে: বিখ্যাত দার্শনিক আবূ হামিদ আল-গাজালী তূসী, বিখ্যাত মুহাদ্দিস তামীম ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু তামগাজ আবূ 'আবদির রহমান আত-তূসী, উজীর নিযামুল মুলক আল-হাসান ইবনু 'আলী, গণিতবিদ জাবির ইবনু হাইয়ান ও নাসিরুদ্দিন আত-তূসী প্রমুখ।

ত্রিপলি (طرابلس/Tripoli): ত্রিপলি লিবিয়ার রাজধানী। এটি গ্রীকদের প্রদত্ত নাম, এর অর্থ হল 'ত্রয়ী শহর'। আরবীতে বলা হয় তারাবুলুস। ভূমধ্যসাগরের পূর্ব তীরে অবস্থিত এই শহরটি খ্রিস্টপূর্ব ৭০০ সালে ফিনিশিয়রা প্রতিষ্ঠা করে। অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও প্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত এই নগর ২৩ হিজরীতে মুসলিমদের অধিকারে আসে; সেনাপতি আমর ইবনুল 'আস (রা.) এটি জয় করেন। পরবর্তীতে এটি কখনো মুসলিমদের হস্তচ্যুত হয়নি। লেবাননে ত্রিপলি নামে আরেকটি শহর আছে; দু'শহরের পরিচিতিকে পৃথক করার জন্য লিবিয়ার রাজধানীকে 'তারাবুলুস আল-গারব' বা 'পশ্চিমের ত্রিপলি' এবং লেবাননের ত্রিপলিকে 'তারাবুলুস আশ-শাম' বা 'সিরিয়ার ত্রিপলি' বলা হয়।

ত্রিপলির কয়েকজন বিখ্যাত 'আলিম হলেন: মালিকী ফকীহ 'উমার ইবনু আবদিল 'আযীয ইবনু 'উবাইদ ইবনু ইউসুফ আত-তারাবুলুসী, আবুল হাসান 'আলী ইবনু 'আবদিল্লাহ ইবনু মাখলুফ আত-তারাবুলুসী। [ইয়াকূত, ৪:২৫-৬]

দাওয়ার (داوار): সিজিস্তানের কাছাকাছি একটি প্রাচীন জনপদ, এটির অধীনে অনেকগুলো শহর ও গ্রাম ছিল। স্থানীয়রা এটিকে 'যিমিনদাওয়ার' বলত। তৃতীয় খালীফা

'উসমান (রা.)-এর আমলে সেনাপতি 'আবদুর রহমান ইবনু সামুরাহ এটি জয় করেন। প্রাচীন দাওয়ার বর্তমান মানচিত্রে আফগানিস্তানের অন্তর্ভুক্ত।
এই অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেছেন এমন কয়েকজন 'আলিম হলেন 'আবদুল্লাহ্ ইবনু মুহাম্মাদ আদ-দাওয়ারী ও আবুল মা'আলী আল-হাসান ইবনু 'আলী ইবনিল হাসান আদ-দাওয়ারী প্রমুখ। [ইয়াকূত, ২:৪৩৪]

দাবীল (دبيل): দাবীল ছিল আর্মেনিয়ার অন্তর্গত একটি শহর। বর্তমানে এটি তুরস্কের অর্ন্তভুক্ত। 'উসমান (রা.)-এর আমলে সেনাপতি হাবীব ইবনু মাসলামা আল-ফিহরী এটি জয় করেন। হাদীসবেত্তা আবদুর রহমান ইবনু ইয়াহইয়া আদ-দাবীলী এই শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। [ইয়াকূত, ২:৪৩৯]

দারাবজির্দ (دارابجرد): দারাবাজির্দ নামে প্রাচীনকালে অনেকগুলো স্থানের নাম ছিল: ১) ফার্সের অন্তর্গত একটি অঞ্চল, ২) ফার্সের অধীন ইস্তাখ্র শহরের আওতাভুক্ত একটি গ্রাম, ৩) নাইসাবূরের একটি জায়গার নাম। এই গ্রন্থের বিজয়াভিযান অধ্যায়ে দারাবজির্দ নামে যে স্থানের নামোল্লেখ করা হয়েছে সেটি ছিল ইস্তাখ্র-এর সন্নিকটে একটি জায়গা। [ইয়াকূত, ২:৪১৯]

নাইসাবূর (ফার্সী ভাষায় নিশাপুর) (نيسابور/**Neyshabur**): প্রাচীন খুরাসানের সর্ববৃহৎ শহর হল নাইসাবূর। পারস্য সম্রাট দ্বিতীয় সাবূর এটি নির্মাণ করেন বলে নাইসাবূর নামকরণ করা হয়েছে। শহরটি আবরাশহর বা 'মেঘের নগর' নামেও পরিচিত। ইয়াকূত বলেন, 'আমি বহু দেশ পরিভ্রমণ করেছি, নাইসাবূরের মত শহর আমি দেখিনি।' ৫৪০ হিজরীতে ভূমিকম্পে এই শহরটির বিরাট অংশ ধ্বংস হয়ে যায়। কয়েক বছর পর ৬১৮ হিজরীতে (১২২১ খ্রিস্টাব্দে) তাতার আক্রমণে নাইসাবূর সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়। এতদসত্ত্বেও কালের করালগ্রাস থেকে শহরটি রক্ষা পেয়েছে। বর্তমানে এটি ইরানের রাজাভী খুরাসান প্রদেশে অবস্থিত।
তৃতীয় খালীফা 'উসমান (রা.)-এর আমলে বাসরার গভর্ণর 'আবদুল্লাহ্ ইবনু 'আমির ৩১ হিজরীতে নাইসাবূর জয় করেন। ইসলামী জ্ঞানচর্চা ও বিতরণে নাইসাবূরের যেসব অধিবাসী অবদান রেখেছেন তাদের মধ্যে কয়েকজনের নামোল্লেখ করা হচ্ছে: ১) আল-হাফিয আল-ইমাম আবূ 'আলী আল-হুসাইন ইবনু 'আলী ইবনু যায়িদ ইবনু দাউদ ইবনু ইয়াযীদ আন-নাইসাবূরী, ২) 'উমার আল-খাইয়াম, ৩) মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ প্রমুখ। [ইয়াকূত, ৫:৩৩১-৩৩]

নাকয়ূস (نقيوس): রোমান মিশরের প্রাচীন এক শহরের নাম নাকয়ূস। রোমানরা এটিকে 'নাকয়ূ' বলত আর কপটিক ভাষায় এর নাম ছিল 'বাশাতি'। ফাতিমী শাসক আল-মুস্তানসিরের আমলে দুর্ভিক্ষের কবলে নাকয়ূস শহরটি ধ্বংস হয়ে যায়। প্রাচীন এই

শহরের স্মারক বর্তমানে মিশরের 'মানুফিয়া' জিলার 'শুহাদা' থানার অন্তর্গত 'যাভিয়াতুল বাকলী' গ্রামে দেখতে পাওয়া যায়।

নাশাসতাজ (نشاستج): কূফায় অবস্থিত একটি নদী বা ফসলি জমি। 'উমার (রা.) অনারব ভূমিতে আরবদের বসবাসের ওপর কড়াকড়ি আরোপ করেছিলেন। 'উসমান (রা.) এ ব্যাপারে শিথিলতা আরোপ করেন; সেই সুযোগে তালহা ইবনু 'উবাইদিল্লাহ্ তাঁর মালিকানাধীন খাইবারের কিছু জমির বিনিময়ে হিজাযে বসবাসকারী একদল ইরাকীর কাছ থেকে 'নাশাসতাজ' কিনে নেন। খুবই উর্বর এই জমিতে বিপুল পরিমাণে শস্য উৎপাদিত হত। [ইয়াকূত, ৫:২৮৫-৮৬]

নাশিরূয (ناشروذ): সিজিস্তানের একটি গ্রাম। ৩০ হিজরীতে 'আবদুল্লাহ্ ইবনু 'আমির কর্তৃক প্রেরিত সেনাপতি আর-রাবী' ইবনু যিয়াদ আল-হারিসী এটি জয় করেন। বর্তমান মানচিত্রে এই গ্রামের অবস্থান নির্ণয় দুঃসাধ্য। [ইয়াকূত, ৫:২৫১]

নাসা (نسا): নাসা (বা নিসা) প্রাচীন খুরাসানের একটি শহর। আবূ সা'ঈদ বলেন, আরবরা এই শহরে অভিযান পরিচালনার সময় এখানকার সব পুরুষ পালিয়ে গিয়েছিল। তখন মুসলিমরা পুরুষ যোদ্ধারা ফিরে না আসা পর্যন্ত যুদ্ধ স্থগিত করে। কারণ নারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যায় না। স্থগিত করাকে আরবীতে 'নাসা' বলা হয়। এভাবেই শহরটির নাম 'নাসা' রাখা হয়।
এটি বৃহত্তর খুরাসানের অন্তর্ভুক্ত ছিল। নাসা ও সারাখ্সের মাঝে দু'দিনের দূরত্ব। নাসা হতে মার্ভ ৫ দিন, আবীওয়ার্দ এক দিন ও নাইসাবূর সাত দিনের দূরত্বে অবস্থিত ছিল। বর্তমানে এটি তুর্কেনিস্তানের রাজধানী আশখাবাদ হতে ১৮ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত। এটি ইউনেস্কো ঘোষিত ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট-এর অন্তর্ভুক্ত।
তৃতীয় খালীফা 'উসমান (রা.)-এর আমলে বাসরার গভর্ণর 'আবদুল্লাহ্ ইবনু 'আমিরের নির্দেশে সেনাপতি উমাইন ইবনু আহমার আল-ইয়াশকুরী নাসা জয় করেন। প্রখ্যাত হাদীসবেত্তা ও *সুনানুন নাসাঈ*-এর সঙ্কলক ইমাম আবূ 'আবদিল্লাহ্ আহমাদ ইবনু শু'আইব ইবনু 'আলী ইবনু বাহ্র ইবনু সিনান আন-নাসাঈ এই শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। [ইয়াকূত, ৫:২৮১-৮২]

নাহাওয়ান্দ (نهاوند): হামাদান হতে তিন দিনের দূরত্বে অবস্থিত একটি শহর। বর্তমানে এটি ইরানের হামাদান প্রদেশের নাহাওয়ান্দ কাউন্টিতে অবস্থিত। 'উমার (রা.)-এর আমলে সেনাপতি হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান নাহাওয়ান্দ জয় করেন। [ইয়াকূত, ৫:৩১৩]

নূক (نوق): বালাযুরীর মতে, নূক একটি উপত্যকার নাম, সিজিস্তান জয়ের সময় মুসলিম বাহিনী এটি অতিক্রম করেছিলেন। অন্যদিকে ইয়াকূত বলেন, এটি বাল্খের একটি গ্রামের নাম। [ইয়াকূত, ৫:৩১২]

নূবা (نوبة/Nubia): আফ্রিকার একটি বিশাল ভূখণ্ডের নাম নূবা। মিশরের আসোয়ান থেকে শুরু করে সুদানের বিশাল ভূখণ্ডে এটি বিস্তৃত ছিল। প্রাচীন নূবা'র রাজধানী শহরটির নাম ছিল দুমকুলাহ। নাবী নূহ (আ.)-এর পৌত্র কূশ-এর নামানুসারে এখানে কূশী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রাচীন নূবা রাজ্য বর্তমানে দক্ষিণ মিশর ও উত্তর সুদানের মাঝে বণ্টিত হয়েছে।
'উমার (রা.)-এর আমলে সেনাপতি 'আমর ইবনুল 'আস ও 'উসমান (রা.)-এর আমলে 'আবদুল্লাহ্ ইবনু সা'দ ইবনু আবি সার্‌হ নূবা জয়ের চেষ্টা করেন। তবে অদম্য কালো যোদ্ধাদেরকে তাঁরা দমন করতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত ইবনু সা'দ তাদের সাথে চুক্তি করতে বাধ্য হন। [ইয়াকূত, ৫:৩০৮-০৯]

ফার্স (فارس): প্রাচীন পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত সুবিশাল এক অঞ্চলের নাম ফার্স। ইয়াকূত নিম্নরূপে এটির চৌহদ্দি উল্লেখ করেছেন, 'ইরাকের দিকে ফার্সের সীমানা হল আর্‌রাজান, কারমানের দিকে সাইয়িরজান, ভারত সাগরের দিকে সাইরাফ এবং সিন্ধের দিকে মাকরান।' ইয়াকূতের সফরের সময় ফার্সের প্রধান শহরের নাম ছিল শিরাজ (বর্তমানেও এটি ইরানের ফার্স প্রদেশের রাজধানী); অন্যান্য জিলাগুলোর মাঝে ইস্তাখ্‌র, আর্দাশীর খুর্‌রা, দারাবজির্দ, সাবূর ও কুবাযখুর্‌রা উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে ফার্সের আয়তন সঙ্কুচিত হয়ে গেছে। এটি ইরানের অন্যতম প্রদেশ ও সাংস্কৃতিক রাজধানী।
'উমার (রা.)-এর আমলে আংশিকভাবে ফার্স বিজিত হয়। 'উসমান (রা.)-এর আমলে সমগ্র ফার্স মুসলিমদের অধিকারে আসে। ফার্সের বিভিন্ন শহরের 'আলিমগণ ইসলামী জ্ঞানচর্চায় বিপুল অবদান রেখেছেন। সংশ্লিষ্ট শহরগুলোর বিবরণের সাথে তাঁদের পরিচয় প্রদত্ত হলো। [ইয়াকূত, ৪:২২৬-২৮]

ফারিয়াব (الفارياب): বৃহত্তর খুরাসানের অন্তর্গত জুযাজান অঞ্চলের একটি শহর। খুরাসানের এই অংশটি বর্তমানে আফগানিস্তানের অন্তর্ভুক্ত। বর্তমানে জুযাজান (রাজধানী: শেবেরগান) ও ফারিয়াব (রাজধানী: মায়মানা) আফগাস্তিানের স্বতন্ত্র দু'টি প্রদেশ। 'উসমান (রা.)-এর আমলে সেনাপতি আল-আহনাফ ইবনু কায়স ফারিয়াব জয় করেন। ইবনুন্ নাদীমের মতে বিখ্যাত মুসলিম দার্শনিক আল-ফারাবী এখানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। প্রখ্যাত ফকীহ সুফইয়ান আস-সাওরী-এর অন্যতম ঘনিষ্ঠ সহচর মুহাম্মাদ ইবনু ইউসুফ আল-ফারিয়াবীও এই শহরের বাসিন্দা ছিলেন। [ইয়াকূত, ৪:২২৮-৯]

ফিহ্‌রিজ (فهرج): সিজিস্তানের অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র শহর। ফার্সী ভাষায় ফাহ্‌রাজ বলা হয়। এটি বর্তমানে ইরানের কারমান প্রদেশের অন্তর্গত একটি কাউন্টি বা বিভাগ। 'উসমান (রা.)-এর আমলে বাসরার গভর্ণর আবদুল্লাহ ইবনু 'আমির খুরাসান জয়ের উদ্দেশে রওয়ানা করার সময় কারমান হতে সেনাপতি আর-রাবী' ইবনু যিয়াদকে

সিজিস্তানে প্রেরণ করেন। ইবনু যিয়াদ সিজিস্তানের পথে সর্বপ্রথম ফাহ্‌রাজ জয় করেছিলেন। [আল-বালাযুরী ৩৯৪]

বাখার্‌য (باخرز): প্রাচীন খুরাসানের আওতায় নাইসাবূর ও হারাতের মাঝে অবস্থিত একটি জিলার নাম ছিল বাখার্‌য। ১৬৮টি গ্রামের সমন্বয়ে গঠিত এই জিলার প্রধান শহরের নাম ছিল মালীন। বর্তমানে এটি ইরানের রাজাভী খুরাসান প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত একটি কাউন্টি বা বিভাগ, যার প্রধান শহরের নামও বাখার্‌য। 'উসমান (রা.)-এর আমলে বাসরার গভর্ণর 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমির খুরাসান জয়ের পথে বাখার্‌য জয় করেন। এই শহরে অনেক সাহিত্যিক, মুহাদ্দিস ও ফকীহ্ জন্মগ্রহণ করেছেন; তাঁদের একজন হলেন 'দুমইয়াতুল কাস্‌র' গ্রন্থের রচিয়তা 'আলী ইবনুল হাসান আল-বাখার্‌যী। [ইয়াকূত, ১:৩১৬]

বাগুন (باغون): প্রাচীন খুরাসানের অন্তর্গত বূশান্‌জ অঞ্চলের আওতাভুক্ত ছোট্ট জনপদ। এই নামে কোন স্থান বর্তমান মানচিত্রে পাওয়া যায় না। জায়গাটি খুব সম্ভবত বর্তমান আফগানিস্তানের হারাত প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত। 'উসমান (রা.)-এর আমলে বাসরার গভর্ণর 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমিরের নির্দেশে সেনাপতি আউস ইবনু সা'লাবা হারাত অধিকার করতে গিয়ে বাগুনও জয় করেন। [ইয়াকূত, ১:৩২৬]

বাবুল আবওয়াব/আল-বাব (باب الأبواب/ الباب/**Derbent**): কাস্পিয়ান সাগরের (আরবীতে বাহ্‌র কাযভীন বা বাহ্‌রুল খাযার বা বাহ্‌র তাবারিস্তান) তীরে অবস্থিত একটি বন্দর নগরী। আরবরা এটিকে আল-বাব বা বাবুল আবওয়াব বলত। এটিই হল বর্তমান রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত দাগেস্তান প্রজাতন্ত্রের দারবান্দ (Derbent) শহর। সেনাপতি সুরাকা ইবনু 'আমর ও 'আবদুর রহমান ইবনু রাবী'আহ্ ১৯ হিজরীতে আল-বাব জয় করেন। এই শহরের 'আলিমগণ ইসলামী জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন। এখানে আল-বাবের কয়েকজন 'আলিমের নাম উল্লেখ করা হচ্ছে: ১) যুহাইর ইবনু নু'আইম আল-বাবী, ২) ইবরাহীম ইবনু জা'ফর আল-বাবী, ৩) আল-হাসান ইবনু ইবরাহীম আল-বাবী, ৪) হিলাল ইবনুল 'আলা আল-বাবী, ৫) আবুল হাসান হাবীব ইবনু ফাহ্‌দ আল-বাবী ও ৬) মুহাম্মাদ ইবনু আবি 'ইমরান আল-বাবী। [ইয়াকূত, ১:৩০৫-০৬]

বাযাগীস (باذغيس / **Badghis**) : হারাত ও মার্ভরূযের অন্তর্গত একটি এলাকা। এই অঞ্চলের প্রধান শহরের নাম ছিল বাওন ও বামাইন। বর্তমানে এটি আফগানিস্তানের একটি প্রদেশ। আবদুল্লাহ ইবনু 'আমির খুরাসান বিজয়ের পর হারাতের শাসকের সাথে যে চুক্তি করেন তাতে বাযাগীস অঞ্চলও অন্তর্ভুক্ত ছিল। বাযাগীসের একজন কীর্তিমান ব্যক্তি হলেন কাযী আহমাদ ইবনু 'আমর আল-বাযাগীসী। [ইয়াকূত, ১:৩১৮]

বারকাহ্ (برقة/**Cyrenaica**): প্রাচীনকালে আলেকজান্দ্রিয়া ও আফ্রিকা (আরবীতে

ইফরীকিয়্যাহ)-এর মাঝখানে বারকাহ্ নামে একটি সুবিস্তৃত জনপদ ছিল। এই অঞ্চলের প্রধান শহরের নাম ছিল পেন্টাপলিস (ইংরেজী Pentapolis/ আরবী أنطابلس)। আলেকজান্দ্রিয়া হতে এক মাসের দূরত্বে অবস্থিত এই শহরটি ফুসতাত হতে ২২০ ফার্লং দূরত্বে অবস্থিত ছিল। প্রাচীন বারকাহ-ই হল আধুনিক লিবিয়ার পূর্বাঞ্চলীয় অঞ্চল সাইরেনিকা।

'উমার (রা.)-এর আমলে সেনাপতি 'আমর ইবনুল 'আস সন্ধির মাধ্যমে বারকাহ্ জয় করেন। বারকাহবাসী এতই শান্তিপ্রিয় ছিল যে তাদের কাছ থেকে কর আদায়ের জন্য কালেক্টর প্রেরণ করতে হত না; বরং তারা দূত মারফত মিসরের শাসকের কাছে কর পাঠিয়ে দিতেন। নির্জন ও শান্তিপ্রিয় এই জনপদ 'আমর ইবনুল 'আস এতটাই পছন্দ করেছিলেন যে তিনি প্রায়শ বলতেন, 'হিজাযে আমার স্থাবর সম্পদ না থাকলে আমি বারকায় থিতু হতাম।' বিশিষ্ট সাহাবী রুওয়াইফী' বারকাহ্ শহরে সমাহিত হয়েছিলেন। বারকাহ্র উল্লেখযোগ্য আহলুল 'ইলম হলেন ভ্রাতৃত্রয় আহমাদ, মুহাম্মাদ ও 'আবদুর রহীম আবনা 'আবদিল্লাহ। [ইয়াকূত, ১:৩৮৮-৮৯]

বাল্খ (بلخ): প্রাচীন খুরাসানের আওতাভুক্ত প্রসিদ্ধ ও সমৃদ্ধিশালী শহর। ইয়াকূত লিখেছেন, 'বালখ এত উর্বর ও শস্যবহুল এলাকা যে এখানকার উৎপাদিত ফসল ও খাদ্যদ্রব্য সমগ্র খুরাসানে, এমনকি খাওয়ারিয্মেও রপ্তানি করা হয়।' পরবর্তীতে বাল্খের গুরুত্ব কমে যায়; বর্তমান আফগানিস্তানে বাল্খ নামে একটি প্রদেশ থাকলেও বাল্খ শহরটি এই প্রদেশের রাজধানী নয়। প্রাদেশিক রাজধানীর নাম মাজার-ই-শরীফ। উসমান (রা.)-এর আমলে সেনাপতি আল-আহনাফ ইবনু কায়স সন্ধির মাধ্যমে বাল্খ জয় করেছিলেন। এই শহরে বহু 'আলিম ও মুহাদ্দিস জন্মগ্রহণ করেছিলেন; তাঁদের মাঝে উল্লেখযোগ্য হলেন ১) আবূ 'আবদিল্লাহ আল-বালখী ও ২) হাফিয আল-হাসান ইবনু শুজা' ইবনু রাজা' আবূ 'আলী আল-বাল্খী (ইনি ইমাম বুখারী ও ইমাম আবূ যুর'আহ-এর শিক্ষক ছিলেন)। [ইয়াকূত, ১:৪৭৯-৮০]

বালানজার (بلنجر): খাযার ভূমিতে বাবুল আবওয়াব বা দারবান্দ (Derbent) এর পশ্চাতে অবস্থিত একটি শহর। 'উসমান (রা.)-এর আমলে বালানজারের সন্নিকটে অনুষ্ঠিত এক যুদ্ধে মুসলিমরা খাযারদের কাছে পরাজিত হয় এবং সেনাপতি আবদুর রহমান ইবনু রাবী'আহ নিহত হন। ৭২২-২৩ সালে ভয়াবহ এক যুদ্ধে আরবরা বালানজার জয় করে এবং এই যুদ্ধে শহরটি প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। পরবর্তীতে শহরটি পুনর্নির্মিত হলেও খাযার রাজ্যের রাজধানী সামান্দারে সরিয়ে নেওয়া হয়। এবং দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে ইতিহাসের পাতা থেকে বালানজার বিলুপ্ত হয়ে যায়। তবে সোভিয়েত প্রত্নতত্ত্ববিদ মিখাইল আর্তামোনোব মনে করেন রুশ প্রজাতন্ত্র দাগেস্তানের মাকাচকালা শহরের দক্ষিণে

প্রাচীন যে শহরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে সেটিই ছিল এককালের প্রসিদ্ধ বালানজার শহর। [উইকিপিডিয়া]

বা'লাবাক্ক (بعلبك): লেবাননের একটি শহর ও প্রত্নতাত্ত্বিক সাইট। ফিনিশিয়রা শহরটির পত্তন করে। এই শহরে রোমান আমলের অনেক ঐতিহাসিক স্থাপনা রয়েছে। [আল-মুনজিদ.. ১৩০]

বাইহাক (بيهق): প্রাচীন খুরাসানের অন্তর্গত একটি বড় জিলা যা নাইসাবূর এবং কূমিস-এর মাঝে অবস্থিত ছিল। এই জিলার প্রধান শহরের নাম ছিল খুসরূজির্দ। পরবর্তীতে সাবযাওয়ার এটির প্রধান শহরে পরিণত হয়। বাইহাকের অধীনে ৩২১ টি গ্রাম ছিল। কালক্রমে বায়হাক গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে এবং তদস্থলে সাবযাওয়ার নামটি প্রসিদ্ধি লাভ করে। এটি বর্তমান ইরানের রাযাভী খুরাসান প্রদেশের একটি বিভাগ (কাউন্টি) ও শহরের নাম। ৩১ হিজরীতে গভর্ণর 'আবদুল্লাহ্ ইবনু 'আমিরের নির্দেশে সেনাপতি আদহাম ইবনু কুলসুম আল-আদাবী বাইহাক জয় করেছিলেন। এই অঞ্চলে রাফিযী শী'আদের প্রাধান্য থাকলেও আহলুস সুন্নাহ্‌র বহু 'আলিম এখানে জন্মগ্রহণ করেছেন। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম বাইহাকী খুসরূজির্দ শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। [ইয়াকূত, ১:৫৩৭-৩৮]
বীওয়ার্দ (بيورد)= আবীওয়ার্দ

বুশ্‌ত (بشت): বুশ্‌ত নামে দু'টি জায়গা ছিল: প্রথমটি হল নাইসাবূরের কাছাকাছি একটি জিলার নাম, অপরটি বাযাগীসের অন্তর্ভুক্ত একটি গ্রামের নাম। 'উসমান (রা.)-এর আমলে বাসরার গভর্ণর 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমির দুই বুশ্‌ত-ই জয় করেন। নাইসাবূরের বুশ্‌তের উল্লেখযোগ্য আহলুল 'ইলম হলেন ইসহাক ইবনু ইবরাহীম ইবনু নাস্‌র আবূ ইয়া'কূব আল-বুশ্‌তী, হাস্‌সান ইবনু মুখাল্লাদ আল-বুশ্‌তী, সা'ঈদ ইবনু আবি সা'ঈদ আল-বুশ্‌তী প্রমুখ। দ্বিতীয় বুশ্‌ত অর্থাৎ বাযাগীসের সেই ছোট্ট গ্রামেও অনেক প্রখ্যাত 'আলিম আবির্ভূত হয়েছেন; উল্লেখযোগ্য দু'জন হলেন আহমাদ ইবনু সাহিব আল-বুশ্‌তী ও তাঁর ভাই মুহাম্মাদ ইবনু সাহিব আল-বুশ্‌তী। [ইয়াকূত, ১:৪২৫]

বুসফুরজান (بسفرجان): আর্‌রান ভূমিতে অবস্থিত একটি জিলা। এর শহরের নাম হল নাকজাওয়ান। পারস্য সম্রাট আনূ শিরওয়ান বাবুল আবওয়াব বা দারবান্দ (Derbent) নির্মাণের সময় বুসফুরজানের পত্তন করেন। এটি বর্তমানে আজারবাইজানের নাকশিভান প্রদেশে অবস্থিত।

বূশানজ (بوشنج): হারাত শহর হতে দশ ফার্লং দূরত্বে অবস্থিত একটি শস্য-শ্যামল, উর্বর ও পত্র-পল্লবিত ক্ষুদ্র শহর। পরিব্রাজক ইয়াকূত নাইসাবূর হতে হারাত গমনের পথে দূর হতে বূশান্‌জ অবলোকন করেছিলেন, তবে তিনি শহরে প্রবেশ করেননি। ৩২ হিজরীতে মুসলিম সেনাপতি আউস ইবনু সা'লাবা হারাত ও বূশান্‌জ সন্ধির মাধ্যমে জয় করেন।

এই শহরের অন্যতম কৃতি সন্তান হলেন বিশিষ্ট আরবী সাহিত্যিক আল-মুখতার ইবনু 'আবদিল হামীদ ইবনু আল-মুনতাদা ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু 'আলী আবুল ফাতহ্ আল-বূশান্জী। [ইয়াকূত, ১:৫০৮]

মারগাব (المرغاب): মারগাব বা মুরগাব মধ্য এশিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ নদী। এটি উত্তর-পশ্চিম আফগানিস্তানে উৎপন্ন হয়ে আরো উত্তর-পশ্চিমে প্রবাহিত হয়ে তুর্কমেনিস্তানের মুরগাব জিলা অতিক্রম করে কারাকূম মরুভূমিতে গিয়ে শেষ হয়েছে। মধ্য এশিয়ার ইতিহাসে এই নদীর অত্যন্ত গুরুত্ব রয়েছে। প্রাচীনকালে এটি সাসানী সাম্রাজ্যের শেষ সীমানা হিসেবে কাজ করত। বিজয়াভিযানে এই নদীটি কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসেবে কাজ করেছে। সেনাপতি আল-আহনাফ ইবনু কায়স তুখারিস্তান জয়ের সময় মারগাব নদীর তীর সংলগ্ন উপত্যকা ব্যবহার করেছিলেন। 'উসমান (রা.)-এর আমলে মুসলিম বাহিনী এই নদী অতিক্রম করতে পারেনি। উমাইয়া খালীফা আল-ওয়ালীদের আমলে সেনাপতি কুতাইবা ইবনু মুসলিম সর্বপ্রথম মুসলিম বাহিনী নিয়ে মারগাব নদী পাড়ি দেন। [en.wikipedia.org/wiki/ نهر المرغاب]

মারবাল (مربال): প্রাচীন খিলাত বা বর্তমান তুরস্কের ভ্যান শহরের নিকটবর্তী একটি অঞ্চলের নাম ছিল মারবাল। ২৪/২৫ হিজরীতে সেনাপতি হাবীব ইবনু মাসলামা এই এলাকায় এলে স্থানীয় খ্রিস্টান বিশপ একটি চুক্তিপত্র নিয়ে হাজির হন, যেটি পূর্ববর্তী সেনাপতি 'ইয়াজ ইবনু গান্ম খ্রিস্টানদেরকে দিয়েছিলেন। পূর্বে সম্পাদিত চুক্তিটি হাবীব বহাল রাখেন। [ইয়াকূত ৫:৯৭]

মার্ভ (مرو): এই গ্রন্থের বিজয়াভিযান অধ্যায়ে মার্ভ নামে তিনটি স্থানের নাম এসেছে: মার্ভ, মার্ভরূয ও মার্ভ শাহিজান। মার্ভ ও মার্ভ শাহিজান অভিন্ন, এটি অপেক্ষাকৃত বড় শহর; পক্ষান্তরে মার্ভরূয ছোট শহর। দু'টি শহরের-ই পরিচয় দেওয়া হলো :

মার্ভ শাহিজান (مرو الشهجان): প্রাচীন খুরাসানের সর্ববৃহৎ শহর। ঐতিহাসিক সিল্ক রোডের ওপর অবস্থিত মধ্য এশিয়ার প্রধান ওয়েসিস শহর। এই শহরকে মার্ভ আল-উযমা বা মার্ভ আল-কুবরা (বড় মার্ভ) বা শুধু মার্ভও বলা হয়। প্রাচীন মার্ভ শহরের বর্তমান নাম হল মারী; এটি তুর্কমেনিস্তানের মারী প্রদেশের রাজধানী।

তৃতীয় খালীফা 'উসমান (রা.)-এর আমলে সেনাপতি আল-আহনাফ ইবনু কায়স মার্ভ জয় করেন। তারপর থেকে এটি অন্যতম সমৃদ্ধ ইসলামী শহর হিসেবে ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছে। দ্বাদশ শতকে মার্ভ পৃথিবীর সবচাইতে বড় শহরে পরিণত হয়েছিল। বিখ্যাত পরিব্রাজক ইয়াকূত হিজরী সপ্তম শতকের প্রারম্ভে মার্ভে অবস্থান করেছিলেন। তিনি মার্ভকে জ্ঞান-গরিমায় পুষ্ট ও প্রাকৃতিক সম্পদে ঋদ্ধ একটি শ্রেষ্ঠ শহর হিসেবে দেখতে পেয়েছিলেন। তাঁর বিবরণ অনুসারে মার্ভে একই সীমানা প্রাচীরের আওতায় শাফি'ঈ ও

হানাফীদের দু'টি মাসজিদে দুই মাযহাবের অনুসারীরা শান্তিপূর্ণভাবে ও সহাবস্থানের সহিত সালাত আদায় করতেন। ওই শহরে ইয়াকূত দশটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরী দেখতে পেয়েছিলেন, যেগুলো ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের দুলর্ভ পান্ডুলিপি দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। ১২২১ সালে মোঙ্গল আক্রমণে এহেন সমৃদ্ধ ইসলামী শহর প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল।

মার্ভে এমন কতিপয় মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছিল যারা ফিকহ, হাদীসসহ ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিপুল অবদান রেখেছিলেন। তাঁদের মধ্য হতে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হচ্ছে: আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু হাম্বল, সুফইয়ান ইবনু সা'ঈদ আস-সাওরী, ইসহাক ইবনু রাহাওয়াইহ্ ও 'আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক প্রমুখ। [ইয়াকূত, ৫:১১২-১১৫]

মার্ভরূয (مروالروذ): বড় মার্ভের কাছাকাছি একটি ছোট শহর; তাই এটিকে মার্ভ আস-সুগরাও বলা হয়। ফার্সী ভাষায় রূয অর্থ হল নদী, এই শহরটি নদীতীরে অবস্থিত ছিল বলে এটিকে মার্ভরূয বলা হত। ৩২ হিজরীতে সেনাপতি আল-আহনাফ ইবনু কায়স মার্ভরূয জয় করেন।

এই শহরের কয়েকজন বিখ্যাত 'আলিম হলেন: বিশিষ্ট শাফি'ঈ ফকীহ কাযী আবূ হামিদ আহমাদ ইবনু 'আমির আল-মার্ভারূযী, আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু সালিহ ইবনু হাজ্জাজ আল-মার্‌রূযী (ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বলের ঘনিষ্ঠ সহচর) প্রমুখ। [ইয়াকূত, ৫:১১২-১১৫]

মালাতইয়া (ملطية): সিরিয়ার সীমান্তে অবস্থিত একটি প্রসিদ্ধ রোমান শহরের নাম ছিল মালাতইয়া। বর্ণিত আছে যে, সম্রাট আলেকজান্ডার এটি নির্মাণ করেছিলেন। বর্তমানে তুরস্কের পূর্ব আনাতোলিয়া অঞ্চলের মালাতইয়া প্রদেশের রাজধানীর নাম হল মালাতইয়া।

ষষ্ঠ শতকে মালাতইয়া খৃস্টবাদের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হয়। 'উসমান (রা.)-এর আমলে সেনাপতি হাবীব ইবনু মাসলামা আল-ফিহরী এই শহর জয় করেন। পরবর্তীতে এটি পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য ও খিলাফাতের বিভাজন রেখায় অবস্থিত সীমান্ত-শহর হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। ১০৫৮ খ্রিস্টাব্দে সেলজুক তুর্কীদের হাতে বিধ্বস্ত হওয়ার পর মালাতইয়ার গুরুত্ব কমে যায়। ১৮৩৮ সালে অটোমানরা এটি পুনঃনির্মাণ করেন। এই শহরের কয়েকজন বিখ্যাত 'আলিম হলেন: ১) কারী মুহাম্মাদ ইবনু 'আলী ইবনু আহমাদ ইবনু আবি ফারওয়াহ আল-মালাতী (৪০৪), ২) হাফিয সুলাইমান ইবনু আহমাদ ইবনু ইয়াহইয়া ইবনু আবি সালাবাহ আল-মালাতী প্রমুখ। [ইয়াকূত, ৫:১৯২-৯৩]

মাকরান (مكران): প্রাচীন পারস্যের একটি প্রদেশ; এটির পশ্চিমে কারমান, উত্তরে সিজিস্তান এবং দক্ষিণ ও পূর্বে ভারত সাগর অবস্থিত ছিল। মাকরানের এই অবস্থান এখনো বহাল রয়েছে, এটি আধুনিক ইরানের সর্বদক্ষিণের প্রদেশ।

মুকান (موقان): ইবনুল কালবী বলেন, নাবী নূহ (আ.)-এর দু'প্রপৌত্রের নাম ছিল জীলান ও মুকান। তাঁদের নামানুসারে দু'টি শহরের নামকরণ করা হয়। ইয়াকূতের বিবরণ অনুসারে মুকান ছিল তুর্কমেন অধ্যুষিত একটি চারণভূমি এলাকা। এটি আজারবাইজানে অবস্থিত ছিল, আর্দাবীল হতে তাবরিয যাওয়ার পথে মুকান অতিক্রম করতে হত। আধুনিক ইরানের আজারবাইজান শারকী প্রদেশে আর্দাবীল ও তাবরিয নামে দু'টো শহর রয়েছে; কিন্তু মুকানের অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। এতে প্রতীয়মান হয় ইয়াকূতের বিবরণে মুকান আজারবাইজানের শহর হলেও বর্তমানে এটি ইরানের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে; তবে গুরুত্বহীন হয়ে পড়ায় আধুনিক মানচিত্রে শহরটি অস্তিত্বহীন হয়ে পড়েছে। ২৫ হিজরীতে সেনাপতি আবদুল্লাহ ইবনু শুবাইল আল-আহমাসী মুকান জয় করেছিলেন। [ইয়াকূত, ৫:২২৫]

মুরিয়ান (موريان): খুযিস্তানের অন্তর্গত একটি গ্রাম। আব্বাসীয় খালীফা আল-মানসূরের উজির আবূ আইউব আল-মুরিয়ানী এখানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। [ইয়াকূত, ৫:২২১]

যাওয়াহ (زاوة): নাইসাবূরের অন্তর্গত একটি জিলা। এর অধীনে ২২০ টি গ্রাম ছিল। [ইয়াকূত, ৩:১২৮]

যাবুলিস্তান (زابلستان): বালখ ও তুখারিস্তানের দক্ষিণে অবস্থিত একটি বিস্তৃত অঞ্চলের নাম যাবুলিস্তান; এটির প্রধান শহর হল গাজনা (গজনী)। এই অঞ্চলকে যাবুলও বলা হত। বর্তমানে আফগানিস্তানের দক্ষিণাঞ্চলীয় একটি প্রদেশের নাম হল যাবুল। 'উসমান (রা.)-এর আমলে সেনাপতি 'আবদুর রহমান ইবনু সামুরাহ চুক্তির মাধ্যমে যাবুলিস্তান জয় করেছিলেন। [ইয়াকূত, ৩:১২৫]

যারানৃজ (زرنج): সিজিস্তানের প্রধান শহরের নাম ছিল যারানৃজ। প্রাচীন সিজিস্তান বর্তমানে ইরান ও আফগানিস্তানের মাঝে বিভক্ত হয়েছে এবং এই বণ্টনে যারানৃজ আফগানিস্তানের ভাগে পড়েছে। এই দেশের নিমরূয প্রদেশের ইরান সীমান্তবর্তী একটি শহরের নাম হল যারানৃজ। 'উসমান (রা.)-এর আমলে সেনাপতি আর-রাবী' ইবনু যিয়াদ যারানৃজসহ সমগ্র সিজিস্তান জয় করেছিলেন। [ইয়াকূত, ৩:১৩৮]

যালিক (زالق): সিজিস্তানের অন্তর্গত একটি বিস্তৃত জিলার নাম ছিল যালিক। এটির অধীনে অনেক প্রাসাদ ও দুর্গ ছিল। বাসরার গভর্ণর 'আবদুল্লাহ্ ইবনু 'আমিরের নির্দেশে ৩০ হিজরীতে সেনাপতি আর-রাবী' ইবনু যিয়াদ আল-হারিসী যালিক জয় করেছিলেন। [ইয়াকূত: ৩:১২৭]

রাবাযা (الربذة): মাদীনা হতে ইরাক যাওয়ার পথে যাত-'ইরক নামক মীকাত হতে তিন দিনের দূরত্বে অবস্থিত একটি গ্রাম। এখানে একটি চারণভূমি ছিল। খালীফা 'উসমান

(রা.)-এর অনুমতিক্রমে সাহাবী আবূ যার গিফারী এখানে স্বেচ্ছানির্বাসন গ্রহণ করেছিলেন। ৩২ হিজরীতে তিনি রাবাযায় মারা যান। ৩১৯ হিজরীতে দারিয়্যাহ ও রাবাযার অধিবাসীদের মাঝে সংঘটিত দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে রাবাযা ধ্বংস হয়ে যায়। [ইয়াকূত, ৩:২৪-২৫]

রায় (الري): উত্তর ইরানের একটি সমৃদ্ধিশালী প্রাচীন শহর। নিশাপুর হতে এটির দূরত্ব ১৬০ ফার্লং। 'উমারের (রা.) আমলে রায় বিজিত হয়। পরবর্তীতে তৃতীয় খালীফা 'উসমানের (রা.) আমলে আবূ মূসা আল-আশ'আরী রায় পুনর্জয় করেন। বহু জগদ্বিখ্যাত 'আলিম এই শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন; তাঁদের মাঝে সুপ্রসিদ্ধ মুফাস্সির ফাখরুদ্দিন আর-রাজী উল্লেখযোগ্য। [ইয়াকূত, ৩:১১৬-১২০]

রুইয়ান (رويان): তাবারিস্তানকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়: সমতলের তাবারিস্তান ও পার্বত্য তাবারিস্তান। সমতলের তাবারিস্তানের সবচেয়ে বড় শহরের নাম হল আমুল, অপরদিকে পার্বত্য তাবারিস্তানের সবচেয়ে বড় জিলা ও শহরের নাম ছিল রুইয়ান। 'উসমান (রা.)-এর আমলে কূফার গভর্ণর সা'ঈদ ইব্নুল 'আস ৩০ হিজরীতে প্রথমবারের মত রুইয়ান জয় করেন। এই অঞ্চলে বহু খ্যাতনামা 'আলিম জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের মাঝে উল্লেখযোগ্য হলেন: বিখ্যাত শাফি'ঈ ইমাম আবুল মাহাসিন আবদুল ওয়াহিদ ইবনু ইসমা'ঈল ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ আর-রুইয়ানী আত-তাবারী, কাযী 'আবদুল কারীম ইবনু শুরাইহ ইবনু 'আবদিল কারীম ইবনু আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ আর-রুইয়ানী আত-তাবারী ও বান্দার ইবনু 'উমার ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ আর-রুইয়ানী প্রমুখ। [ইয়াকূত, ৩:১০৪-১০৫]

রুখ্খাজ (رخج/Arachosia): কাবুলের কাছাকাছি অবস্থিত একটি জিলা ও শহর। আরবীতে রুখ্খাজ বলা হলেও ইতিহাসে এটি আরাচোসিয়া নামে পরিচিত ছিল। প্রাচীন এই জনপদের বর্তমান অবস্থান হল আফগানিস্তানের দক্ষিণাঞ্চলে আরগান্দাব উপত্যকায়। 'উসমান (রা.)-এর আমলে বাসরার গভর্ণর 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমিরের নির্দেশে সেনাপতি 'আবদুর রহমান ইবনু সামুরাহ ৩২ হিজরিতে রুখ্খাজ জয় করেছিলেন। রুখ্খাজের অধিবাসী ফারজ ও তদীয় পুত্র 'উমার ইবনু ফারজ কাতিব হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। এঁরা আল-মামুন হতে মুতাওয়াক্কিল পর্যন্ত সকল আব্বাসী খালীফার অধীনে সচিব (কাতিব) হিসেবে চাকুরী করেছেন। [ইয়াকূত, ৩:৩৮]

শার্ওয়ায (شرواذ): সিজিস্তানের অন্তর্গত একটি এলাকার নাম ছিল শারওয়ায। সেনাপতি আর-রাবী' ইবনু যিয়াদ ৩০ হিজরীতে এটি জয় করেন। ইয়াকূতের মত বহু সফরের অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ ভূগোলবিদ ও পরিব্রাজক এটির অবস্থান নির্ণয় করতে পারেননি। [ইয়াকূত, ৩: ৩৩৯]

সাইপ্রাস (قبرص/قُبرس): পূর্ব ভূমধ্যসাগরে অবস্থিত একটি স্বাধীন দ্বীপরাষ্ট্র। আরবীতে কুবরুস বলা হয়। খৃস্টবাদের ইতিহাসে এই দ্বীপটির বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। নাবী ‘ঈসার অন্যতম হাওয়ারী বার্নাবাস এই দ্বীপে ধর্ম প্রচার করেন। গ্রীক বংশীয় খৃস্টান বসতিবিশিষ্ট এই দ্বীপটি মু‘আবিয়া (রা.) কর্তৃক ২৮ হিজরীতে বিজিত হয়। ১১৯১ সালে বৃটেনের রাজা চার্লস সাইপ্রাস দখল করে জনৈক ফরাসীর নিকট বিক্রি করে দেন। ষোড়শ শতকের সাতের দশকে উসমানী তুর্কীরা এটি দখল করেন। ১৮৭৮ সালে তুর্কীরা সাইপ্রাস দ্বীপটি ব্রিটেনের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হয়। দীর্ঘ সংগ্রামের পর ১৯৬০ সালে সাইপ্রাস ঔপনিবেশিক শাসন হতে মুক্তি লাভ করে। সাইপ্রাসের ৭৭% জনগোষ্ঠি গ্রীক বংশোদ্ভুদ খৃস্টান এবং ১৭% তুর্কী বংশীয় মুসলিম। [ar.wikipedia.org/wiki/قبرص]

সাইয়িরজান/সীরজান/শীরজান (السيرجان/الشيرجان): সাইয়িরজান, সীরজান ও শীরজান একই শহরের নামের পাঠভেদ। ফার্স ও কারমানের মাঝে অবস্থিত একটি শহরের নাম সাইয়িরজান। অবশ্য ইবনুল ফাকীহ বলেন, কারমান শহরেরই অপর নাম হল সাইয়িরজান। কালের বিবর্তনেও শহরটি স্বনামে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পেরেছে। বর্তমান ইরানের কারমান প্রদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর হল সীরজান। ‘উসমান (রা.)-এর আমলে বাসরার গভর্ণর ‘আবদুল্লাহ্ ইবনু ‘আমিরের নির্দেশে সেনাপতি মুজাশি‘ ইবনু মাস‘উদ আল-সুলামী সীরজান জয় করেন। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বলের ঘনিষ্ঠ শিষ্য হার্‌ব ইবনু ইসমা‘ঈল এই শহরের বাসিন্দা ছিলেন। [ইয়াকূত, ৩:২৯৫-৯৬]

সানারূয (سناروذ): সিজিস্তানের প্রধান নদীর নাম ছিল সানারূয, এটিকে হিন্দমান্দও বলা হয়। কেউ কেউ বলেন, এটি হিন্দমান্দের শাখা নদী। সানারূযের তীরবর্তী এলাকাও একই নামে পরিচিত ছিল। [ইয়াকূত, ৩:২৬০]

সাবূর (سابور): পারস্যে সাবূর নামে সাসানী বংশের একজন সম্রাট ছিলেন। তাঁর নামানুসারে ফার্সের একটি বিস্তৃত জিলা ও শহরের নাম সাবূর রাখা হয়। সাবূর অঞ্চলের আরো কয়েকটি শহরের নাম হল: কাযরূন, দাশতাবারীন, আপার ও লোয়ার খুমাইজান, কুন্দুরান ও নাওবান্দাযান ইত্যাদি। ইয়াকূত লিখেছেন, সাবূর ফুলের বাগানের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। এই শহরে কেউ আগমন করলে বের না হওয়া পর্যন্ত ফুলের সৌরভে বিমোহিত হয়ে থাকত। ২৫ হিজরীতে ‘উসমান ইবনু আবিল ‘আস সাবূর জয় করেন। [ইয়াকূত, ৩:১৬৮]

সার্‌ক (سرك): খুরাসানের তূসের অন্তর্গত একটি গ্রাম। আবদুল্লাহ ইবনু ‘আমির খুরাসান অভিযানের সময় এই গ্রামও জয় করেন। এই গ্রামে জন্মগ্রহণকারী প্রসিদ্ধ একজন ‘আলিম হলেন আবু ‘আবদিল্লাহ্ মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক ইবনু মূসা আল-মাখযূমী আস-সার্‌কী। [ইয়াকূত, ৩:২১৫]

সারাখ্‌স (বা সারখাস) (سرخس): নাইসাবূর ও মার্ভের মাঝে অবস্থিত প্রাচীন সিল্ক রোডের একটি বিশ্রামস্থল হল সারাখ্‌স। পারস্য সম্রাট কায়কাউস এর নির্দেশে সারাখ্‌স নামে এক ব্যক্তি শহরটি প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিজের নামানুসারে স্থানটির নামকরণ করেন। পরবর্তীতে যুলকারনাইন ও সম্রাট আলেকজান্ডার এটি পুনর্নির্মাণ করেন। একাদশ শতাব্দীতে এই শহরটি সমৃদ্ধির শীর্ষে পৌঁছেছিল; সেই সময় এখানকার প্রসিদ্ধ স্থাপত্য কলেজে সমকালীন শীর্ষস্থানীয় স্থাপত্যবিদগণ অধ্যাপনা করতেন। বর্তমানে ইরানের খুরাসান রাজাভী প্রদেশের সর্ব পূর্ব-উত্তরে সারাখস অবস্থিত। তবে শহরটির প্রাচীন অংশের সিংহভাগ এলাকা তুর্কমেনিস্তানে সারাগ্‌স অঞ্চলে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।
'উসমান (রা.)-এর আমলে বাসরার গভর্ণর 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমিরের নির্দেশে সেনাপতি 'আবদুল্লাহ ইবনু খাযিম সারাখ্‌স জয় করেন। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে এই শহরের নাগরিকদের বিপুল অবদান ছিল; প্রখ্যাত শাফি'ঈ ফাকীহ আবুল ফারাজ 'আবদুর রাহমান ইবনু আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদির রাহমান আস-সারাখসী এবং বিশিষ্ট ফকীহ ও মুহাদ্দিস আবূ 'আলী যাহির ইবনু আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু 'ঈসা আস-সারাখ্‌সী এই শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। হানাফী ফিকহের অন্যতম মৌলিক গ্রন্থ *আল-মাবসূত*-এর রচয়িতা শামসুদ্দিন আস-সারাখসীও এই শহরের বাসিন্দা ছিলেন। [ইয়াকূত, ৩:২০৮-০৯]

সিনূজ (سنج): মার্ভের অন্তর্গত একটি সমৃদ্ধ ও বর্ধিষ্ণু গ্রামের নাম ছিল সিন্‌জ। 'উসমান (রা.)-এর আমলে বাসরার গভর্ণর 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমিরের নির্দেশে সেনাপতি হাতিম ইবনুন্‌ নু'মান আল-বাহিলী সন্ধির মাধ্যমে মার্ভ জয় করেছিলেন। একই অভিযানে তিনি সিন্‌জও জয় করেন। তবে এক্ষেত্রে শক্তি প্রয়োগ করতে হয়েছিল। ইমাম মুসলিমের শিক্ষক আবূ দাঊদ সুলাইমান ইবনু মা'বাদ আস-সিন্‌জী এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এখানকার অন্যান্য প্রসিদ্ধ 'আলিমের মাঝে রয়েছেন শাফি'ঈ ইমাম আল-হাসান ইবনু শু'আইব আস-সিন্‌জী ও ইয়াহইয়া ইবনু মূসা আস-সিন্‌জী। [ইয়াকূত, ৩:২৬৪]

সিরাজতাইর (سراج طير): আর্মেনিয়া আস-সালিসা বা তৃতীয় আর্মেনিয়ার অন্তর্গত একটি জিলার নাম ছিল সিরাজতাইর। এটি বর্তমানে তুরস্কের অন্তর্ভুক্ত। ২৫ হিজরীতে মু'আবিয়া (রা.)-এর নির্দেশে সেনাপতি হাবীব ইবনু মাসলামা আল-ফিহরী সন্ধির মাধ্যমে সিরাজতাইর জয় করেন।

সীওয়াস/সীভাস (سيواس): তুরস্কের সীভাস প্রদেশের প্রধান শহরের নামও সীভাস। 'উসমান (রা.)-এর আমলে সেনাপতি হাবীব ইবনু মাসলামা আল-ফিহরী সীভাসে অভিযান পরিচালনা করেন।

সীসাজান (سيسجان): দাবীল হতে ১৬ ফার্লং দূরত্বে অবস্থিত একটি আর্মেনীয় শহর। বর্তমানে এটি তুরস্কের অন্তর্ভুক্ত। 'উসমান (রা.)-এর আমলে সিরিয়ার গভর্ণর মু'আবিয়ার (রা.) নির্দেশে সেনাপতি হাবীব ইবনু মাসলামা আল-ফিহ্‌রী সীসাজান জয় করেন। [ইয়াকূত, ৩:২৯৭]

সুবাইতিলা (سبيطلة/Sbeitla): রোমান আফ্রিকার রাজধানী। রোমান সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত বার্বার বংশীয় আফ্রিকার শাসক এই শহরকে কেন্দ্র করে শাসনকাজ পরিচালনা করতেন। 'আবদুল্লাহ্ ইবনু সা'দ-এর নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী এই শহরে সংঘটিত এক যুদ্ধে রোমান শাসক জারজিরকে পরাজিত করে আফ্রিকা জয় সম্পন্ন করেন। সুবাইতিলা শহরটি এখনো অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। বর্তমানে এটি তিউনিসিয়ার আল-কাসরাইন প্রদেশের অন্তর্গত। [ইয়াকূত, ৩:১৮৭]

হারাত (هراة): প্রাচীন খুরাসানের অন্যতম প্রধান শহর। সমৃদ্ধ এই শহর সম্পর্কে ইয়াকূত লিখেছেন, '৬০৭ হিজরীতে আমি খুরাসানের শহরগুলো পরিভ্রমণ করেছি। আমি হারাতের চেয়ে বড়, সুন্দর, সমৃদ্ধ ও জনবহুল শহর দেখতে পাইনি। এখানে অনেক বাগ-বাগিচা, উদ্যান ও জলাধার রয়েছে। তদুপরি আলিম-উলামার পদভারেও শহরটি ধন্য।' সমৃদ্ধির কারণে এই শহরকে 'জাওহারাতু খুরাসান' উপাধি দেওয়া হয়েছিল। ৬১৮ হিজরীতে অবিশ্বাসী তাতারীরা এই শহর ধ্বংস করে দেয়। ফলে ১২২২ থেকে ১২৩৬ সাল পর্যন্ত হারাত ধ্বংসস্তূপ হয়ে পড়েছিল। পরবর্তীতে হারাত পুনর্নির্মিত হয়। বর্তমানে আফগানিস্তানের একটি প্রদেশের নাম হেরাত, এটির রাজধানীর নামও হেরাত।
তৃতীয় খালীফা 'উসমান (রা.)-এর আমলে বাসরার গভর্ণর আবদুল্লাহ ইবনু 'আমিরের নির্দেশে সেনাপতি আল-আহনাফ ইবনু কায়স হারাত জয় করেছিলেন। এই অঞ্চলের একজন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হলেন আল-হুসাইন ইবনু ইদরিস ইবনিল মুবারাক ইবনিল হায়সাম ইবনু যিয়াদ আবূ 'আলী আল-আনসারী আল-হারাভী। [ইয়াকূত, ৩:৩৯৬-৯৭]

হায়সান (هيسان): আসবাহান বা ইস্পাহানের একটি গ্রামের নাম। [ইয়াকূত, ৩:৪২২]

হিন্দমান্দ (هند مند): সিজিস্তানের প্রধান নদীর নাম হিন্দমান্দ। ইয়াকূতের বিবরণ অনুসারে নদীটি রুখ্‌খাজ, দাওয়ার, বুস্‌ত ও সিজিস্তান অতিক্রম করে যারাহ্ হ্রদে পতিত হয়েছে। নদীটির বর্তমান নাম হেলমান্দ; এটি আফগানিস্তানের হেলমান্দ প্রদেশ ও ইরানের সিস্তান-বেলুচিস্তানের প্রদেশের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। দু'তীরে বিপুল আয়তনের জমি সেচের ক্ষেত্রে হিলমান্দের অনেক অবদান রয়েছে। [ইয়াকূত, ৫:৪১৮]

তথ্যসূত্র

ক. আল-কুরআনুল কারীম।

খ. আল হাদীস :

জামে আত-তিরমিযী, (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার ২০০৬)

মুসতাদরাকুল হাকিম (বৈরুত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ্ ১৯৯০)

সহীহুল বুখারী, কিতাবুল মানাকিব, (কায়রো: দারুত্ তাকওয়া ২০০১)

সহীহ মুসলিম, (কায়রো: দারুল হাদীস ১৯৯৭)

সুনান আবু দাউদ (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার ২০০৮)

আল-আলবানী, *সহীহ সুনানি ইবন মাজাহ* (রিয়াদ: মাকতাবুত-তারবিয়্যাহ আল-আরাবী ১৯৮৮)।

গ. অন্যান্য :

আকরাম দিয়া আল-'উমরী, *'আসরুল খিলাফাতির রাশিদা* (মাকতাবাতুল 'উলূম ওয়াল হিকাম ১৯৯৪)

'আবদুল আযীয নূর ওয়ালী, *আছারুত তাশাইয়ু' 'আলার রিওয়ায়াতিত তারীখিয়্যাহ* (মাদীনা: দারুল খুদাইরী ১৯৯৬)

'আবদুল 'আযীয সালমান, *ইরশাদুল 'ইবাদ লিল-ইসতি'দাদ লি ইয়াওমিল মা'আদ* (রিয়াদ: মাতাবি'উল খালিদ ১৪০৬ হি.)

'আবদুল ওয়াহ্হাব আল-নাজ্জার, *আল-খুলাফা আর-রাশিদূন* (বৈরুত: দারুল কালাম ১৯৮৬)

'আব্বাস মাহমূদ আল-'আক্কাদ, *উসমান ইবন 'আফ্ফান যুন্নূরাইন*

আবূ ইউসুফ, *আল-খারাজ* (বৈরুত: মাকতাবাতুর রিয়াদ আল-হাদীসাহ)

আবূ 'উবাইদ, *আল-আমওয়াল*

আবূ না'ঈম আল-আসবাহানী, *কিতাবুল ইমামাহ ওয়ার রাদ্দু 'আলার রাফিদাহ* (মাদীনা: মাকতাবাতুল 'উলূম ২০০১)

.. .. .., *হুলয়াতুল আউলিয়া* (বৈরুত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ্)

আবুল 'আব্বাস মুহাম্মাদ ইবন ইয়াযীদ, *আল-কামিল ফিল লুগাতি ওয়াল আদাব* (কায়রো: মুআস্সাসাতুর রিসালাহ ১৯৩৭)

আবুল হাসান আল-আশ'আরী, *আল-ইবানাহ ফী উসূলিদ দিয়ানাহ* (মাদীনা: আল-জামি'আ আল-ইসলামিয়্যাহ্ ১৯৭৫)

আহমাদ ইবন ইবন হাম্বল, *ফাদাইলুস সাহাবাহ* (দার ইবনিল জাওযী ১৯৯৯)

.. .. .. , *আয-যুহদ* (বৈরুত: দারুল কিতাবিল 'আরাবী ১৯৮৮)

আহমদ শালাবী, *মাওসূ'আহ আত-তারিখিল ইসলামী* (মাকতাবাহ আন-নাহ্দাহ আল-মিসরিয়্যাহ্)

ইবন আবদিল বার, *আল-ইস্তি'আব ফী মা'রিফাতিল আসহাব* (বৈরুত: দারুল জীল ১৯৯২)

ইবন 'আবদিল হাকাম, *ফুতূহু মিসর ওয়া আখবারুহা* (বাগদাদ: মাকতাবাতুল মুসান্না ১৯২০)

ইবন আবি দাউদ, *কিতাবুল মাসাহিফ*

ইবন আবি শায়বা, *আল-মুসান্নাফ ফীল হাদীস*

ইবন 'আসাকির, *তারিখু দিমাশক* (দামেশ্ক: আল-মাজলিসুল 'ইলমী ১৯৮৪)

ইবনুল আসীর, *আল-কামিল ফিত-তারীখ* (কায়রো: দারুল হাদীস ২০১০)

ইবন কাসীর, *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ* (কায়রো: মাতবা'আতুস সা'আদাহ, তাবি)

ইবনুল কায়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ, *যাদুল মা'আদ* (বৈরুত: মুআস্সাসাতুর রিসালাহ ১৪০৬ হি.)

ইবন কুদামা, *আর-রিক্কাহ ওয়াল বুকাহ* (দামেশ্ক: দারুল কালাম ২০০০)

ইবনুল জাওযী, *সিফাতুস সাফওয়াহ* (বৈরুত: দারুল মা'রিফাহ্)

ইবন তাইমিয়্যা, *মিনহাজুস সুন্নাতিন নাবাবিয়্যাহ*

ইবন শাব্বাহ, *তারীখুল মাদীনা*

ইবন সা'দ, *আত্-তাবাকাতুল কুবরা,* (বৈরুত: দারু সাদির ও দারু বাইরূত ১৯৫৭)

ইবন হাজর আল-আসকালানী, *আল-ইসাবা ফী তাময়ীযিস্ সাহাবাহ্* (বৈরুত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ ১৯৯৫)

.. .. .. , *তাহযীবুত তাহযীব* (বৈরুত: দারু সাদির)

.. .. .., *ফাতহুল বারী* (কায়রো: দারুত্ তাকওয়া লিন্ নাশরি ওয়াত্ তাওযী' ২০০০)

ইবন হাজর আল-হায়সামী, *আস-সাওয়া'ইকিল মুহরিকাহ ফির্ রাদ্দি 'আলা আহলি বিদা'ই ওয়ায যানদাকাহ* (বৈরুত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ্)

ইব্ন হিশাম, *আস্-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ* (দারু ইহয়াইত তুরাছ ১৯৯৭)

ইয়াকূত আল-হামাভী, *মু'জামুল বুলদান* (বৈরুত: দারু ইহয়াইত তুরাছিল 'আরাবী ১৯৭৯)

ইয়াহইয়া ইবরাহীম ইয়াহইয়া, *মারবিয়্যাতু আবি মিখনাফ ফী তারীখিত তাবারী* (রিয়াদ: দারুল 'আসিমাহ্ ১৪১০ হি)

ইয়াহ্ইয়া আল-ইয়াহ্ইয়া, *আল-খিলাফাতুর রাশিদা ওয়াদ দাওলাতুল উমাভিয়্যাহ মিন ফাতহিল বারী* (দারুল হিজরাহ ১৯৯৬)
আল-ওয়াকিদী, *আল-মাগাযী* (বৈরুত: 'আলাম আল-কুতুব ১৯৮৪)
ওয়াদিহ আস-সামাদ, *আদাবু সাদরিল ইসলাম*
কুত্ব ইবরাহীম মুহাম্মাদ, *আস-সিয়াসাতুল মালিয়্যা লি 'উসমান* (কায়রো: আল-হাইয়াতুল মিসরিয়্যাহ আল-'আম্মাহ্ লিল কিতাব ১৯৮৬)
আল-কুরতুবী, *আল-জামি' লি আহকামিল কুরআন* (বৈরুত: দারু ইহ্য়াইত তুরাসিল 'আরাবী ১৯৬৫)
খালীফা ইবন খাইয়াত আল-লাইসী, *তারীখু খলীফা ইবন খাইয়াত* (বৈরুত: দারুল কালাম ১৩৯৭ হি)
আল-জাহশিয়ারী, *কিতাবুল উযারা ওয়াল কুত্তাব* (কায়রো: দারুস সাবী ১৯৩৮)
আল-জাহিয, *আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন* (কায়রো: দারুল খানজী ১৯৬৮)
আত-তাবারী, *তারীখুর রুসুল ওয়াল মুলূক* (কায়রো: দারুল মা'আরিফ, ৫ম সং, ১৯৯২)
নাসির ইবন 'আলী, *'আকীদাতু আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ*
নূরুদ্দীন আল-হায়সামী, *মাজমা'উয যাওয়াইদ* (বৈরুত:দারুল কিতাবিল 'আরাবী ১৪০২ হি)
আল-বালাযুরী, আনসাবুল আশরাফ
.. .. .. , *ফুতূহুল বুলদান* (লাইডেন: ই জে ব্রিল ১৯৬৭)
মাহদী রিযকুল্লাহ্ আহমাদ, *আস্-সীরাতুন নাবাভিয়্যাহ ফী দাউইল মাসাদিরিল আসালিয়্যাহ* (রিয়াদ: মারকাযুল মালিক ফায়সাল লিল বুহূস ওয়াদ্ দিরাসাতিল ইসলামিয়্যাহ ১৯৯৯)
মাহমূদ শাকির, *আল-আমীন যুন-নূরাইন* (আল-মাকতাবুল ইসলামী ১৯৯৭)
আল-মায়দানী, *মাজমা'উল আমসাল* (বৈরুত: দারুল মা'রিফাহ্ ১৯৫৫)
মুহাম্মাদ 'আবদুর রহমান আল-মুবারকপুরী, *তুহফাতুল আহওয়াজী* (আবদুল মুহসিন আল-কাতবী)
মুহাম্মাদ 'আবদুল্লাহ্ আল-গাব্বান, *ফিতনাতু মাকতালি 'উসমান* (মাকতাবাতুল 'উবাইকান ১৯৯৯)
মুহাম্মাদ 'আলী আস-সাবূনী, *মুখতাসার তাফসীর ইবনি কাসীর* (বৈরূত: দারুল কুরআনিল কারীম ১৯৮১)
মুহাম্মাদ ইবন সামিল আস্-সুলামী, *খিলাফাতু 'উসমান ইবনি 'আফ্ফান* (মাক্কা: মাকতাবাতু সালিম ১৪১৯)

মুহাম্মাদ কুতব, *কায়ফা নাকতুবুত তারীখাল ইসলামী* (রিয়াদ: দারুল ওয়াতানিস্ সা'উদিয়্যাহ্ ১৪১২ হি.)

মুহাম্মাদ মাজদী ফাতহী আস-সাইয়িদ, *সহীহুত তাউছীক ফী সীরাতি ওয়া হায়াতি যিন-নূরাইন* (তানতা: দারুস সাহাবাহ ১৯৯৬)

মুহাম্মাদ রাওওয়াস কিল'আহ্জী, *মাওসূ'আতু ফিকহি 'উসমান ইবন 'আফ্ফান* (দারুন নাফাইস ১৯৮৩)

মুহাম্মাদ রাশীদ রিদা, *যুন্নুরাইন 'উসমান ইবন 'আফ্ফান* (বৈরুত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ ১৯৮২)

যাফির আল-কাসিমী, *নিযামুল হুক্ম ফীশ-শারী'আতি ওয়াত-তারীখিল ইসলামী*

আয-যাহাবী, *তারীখুল ইসলাম* (কায়রো: আল-মাকবাতাতুত তাওফীকিয়্যাহ, তাবি)

.. .. .. , *মীযানুল ই'তিদাল ফী নাকদির রিজাল* (কায়রো: দারু ইহইয়াউল কুতুবিল 'আরাবিয়্যাহ ১৩৮২ হি.)

.. .. .. , *সিয়ারু 'আলামিন নুবালা* (মুওয়াস্সাসাতুর রিসালাহ্ ১৪০২ হি.), ৪:২৫৩।

লূইস মা'লূফ, আল-মুনজিদ (বৈরূত: ক্যাথলিক প্রেস ১৯০৮)

সাদিক 'উর্জূন, *উসমান ইবন 'আফ্ফান* (আদ্দার আস-সা'উদিয়্যাহ্ ১৯৯০)

সাবির আবু সুলায়মান, *আদওয়াউল বায়ান ফী তারীখিল কুরআন* (বৈরুত: দারু 'আলামিল কুতুব ২০০০)

সুবহী আস-সালিহ, *মাবাহিস ফী 'উলূমিল কুরআন* (বৈরুত: দারুল 'ইল্ম লিল মালাঈন ১৯৯৯)

আস-সুয়ূতী, *আল-ইতকান* (কায়রো: মাতবা'আ হিজাযী ১৯৪১)

হামদ মুহাম্মদ আস-সামাদ, *নিযামুল হুকম ফী 'আহদিল খুলাফাইর রাশিদীন*

হাসান ইবরাহীম হাসান, *তারীখুল ইসলাম* (বৈরুত: দারুল জীল ১৯৯১)

লেখক পরিচিত

ড. যুবাইর মুহাম্মাদ এহসানুল হক ১৯৭৬ সালে কক্সবাজার জেলার সদর থানার খরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা: মরহুম আবু মুহাম্মদ এজহারুল হক কক্সবাজারের জেলা শিক্ষা অফিসার ছিলেন। মাতা: মরহুমা বেগম রহিমা হক। চট্টগ্রামের বিখ্যাত ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদরাসা হতে দাখিল ও 'আলিম এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগ হতে অনার্স ও মাস্টার্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ২০তম বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তথ্য ক্যাডারের কর্মকর্তা হিসেবে তিনি জয়পুরহাট ও নোয়াখালীতে জেলা তথ্য অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ২০০৩ সালে লেকচারার হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগে যোগদান করেন। ২০০৬ সালে সহকারী অধ্যাপক ও ২০১১ সালে সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি লাভ করেন।

সাহিত্য-সংস্কৃতি, ধর্ম, ইসলামের ইতিহাসসহ বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর প্রায় ২০টি প্রবন্ধ বিভিন্ন জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধের মাঝে রয়েছে:

1. *The Diwan School in Modern Arabic Literature*, The Dhaka University Studies, Vol. 62, No. 1, June 2005
2. *Women-Imamate in Prayer: An Analysis in the Light of Islamic Shari'ah*, Islamic Studies Journal of Dr. Serajul Haque Islamic Research Centre, 1st & 2nd Vol. January-December 2006
3. *Elegy for Lost Kingdoms and Ruined Cities in Hispano-Arabic Poetry*, Journal of the Asiatic Society of Bangladesh (Hum.), Vol. 52 (2), 2007
4. Early Arabic Contact with Chittagong: A Historico-Linguistic Analysis, Journal of Najmul Karim Study Centre, Dhaka University, June, 2011

ড. যুবাইর বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি ও বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারসহ বিভিন্ন গবেষণা সংস্থার সদস্য। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বিবাহিত ও দু'পুত্রের জনক।